শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী

জি জ্ঞা সা
কলিকাতা ৯ ॥ কলিকাতা ২৯

SILAIDAHA O RABINDRANATH

By Sachindranath Adhikari

প্রথম প্রকাশ :

২৫শে জানুয়ারি ১৯৫৪

প্রকাশক : শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড

জি জ্ঞা সা

১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ২৯

৩৩ এবং ১এ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর : শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার

শ্রীগোপাল প্রেস

১২১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

উৎসর্গ

আমার পরলোকগতা সহধর্মিণী
আশালতা দেবীর স্মৃতির উদ্দেশে

গ্রন্থকারের নিবেদন

আমার বহুল-প্রচারিত তিনখানা বই,— সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ, পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রমানসের উৎস-সন্ধানে— যখন প্রায় চার বৎসর যাবৎ কলকাতা বই-এর বাজারে নিঃশেষিত হয়ে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছিল, তখন 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশনার মালিক বন্ধুবর শ্রীশকুমার কুণ্ড ঐ বই ক'খানা পুনঃ-প্রকাশের আয়োজন করতে মনস্থ করেন। তিনি তিনখানা বই একত্র প্রকাশের উদ্দেশ্যে বই-এর নাম দেন "শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ"। বই-এর নামকরণটা অভিনব ও দুঃসাহসিক। তাই ত কবির চির আদরিণী—তাঁর 'যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের সাহিত্যরস সাধনার তীর্থস্থান' শিলাইদহ পল্লীর কাহিনী-সম্ভারকে বিবিধ মূল্যবান জ্ঞাতব্য তথ্যে সাজিয়ে সাহিত্যরসিকগণের নিকট উপস্থিত করতে সাধ্যমত চেষ্টা করেছি এই গ্রন্থে।

শিলাইদহ আমার জন্মভূমি, কর্মভূমি এবং আমার এই বৃদ্ধ বয়সের মনোভূমি। শিলাইদহের আনন্দ-বেদনা দেশবাসীর কাছে প্রকাশের জন্য আমি নানাভাবে চেষ্টা করে এসেছি। ঠাকুর এস্টেটে (শিলাইদহ ও কলকাতার দফ্তরে) আমার চাকুরি ও অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের। আজ সংসার থেকে বিদায় নেবার আগে আমার সেই পল্লীবৃন্দাবনের সামগ্রিক পরিচয় জানাবার সুযোগ দেবার জন্য আমি বন্ধুবর শ্রীশবাবুর নিকট কৃতজ্ঞ; তবে কাজটি দুঃসাহসিক জেনেও, গ্রন্থ প্রকাশের অর্থনৈতিক দিকটা উপেক্ষা করে মহৎ সাহিত্য প্রচারে তাঁর এই উদ্যম আমাকে একান্তই মুগ্ধ করেছে।

বিচিত্র চরিত্রের মানুষ রবীন্দ্রনাথের পল্লীজীবনের অজ্ঞাত অপরূপ রূপের যে সমস্ত কাহিনী ও তথ্য এতদিন পরিবেষণ করে এসেছি, তা যে আমার দেশবাসীর অন্তর স্পর্শ করেছে, শ্রীশবাবুর এই আন্তরিক বলিষ্ঠ উদ্যম তারই প্রমাণ। তাই আমার এই কাহিনীর মধুর পরিমণ্ডলকে সাহিত্যপদবাচ্য করবার জন্য সাহিত্য-রসিক শ্রীশবাবু যথাসম্ভব পরিমার্জিত করেছেন বন্ধুবর শ্রীঅরবিন্দ ভট্টাচার্যের সাহায্যে। এ বিষয়ে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের কর্মী বন্ধু শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবের তথ্য সরবরাহ, আমার পুত্র শ্রীমান সৌম্যেনের অঙ্কিত নকশা এবং সংগৃহীত আলোকচিত্র ও তথ্যাদি বর্তমান পুস্তক প্রণয়নে আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। এই সূত্রে আলোকচিত্রশিল্পী শ্রীঅজিতকুমার পোদ্দারের সাহায্যের কথাও সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ-সাধন আশ্রমের

(গড়িয়া) প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীসুধীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য মহাশয় দ্বারকানাথ-দেবেন্দ্র-নাথ-রবীন্দ্রনাথ-রথীন্দ্রনাথের ছবি এঁকে দিয়ে আমায় অশেষ ঋণে আবদ্ধ করেছেন। শ্রীসুবিমল লাহিড়ী মহাশয় প্রচ্ছদে ব্যবহৃত গ্রন্থনাম লিখে দিয়েছেন, তাঁকে আমার প্রীতি জানাই। শিল্পাচার্য নন্দলাল আমায় যে স্কেচগুলি 'সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ', 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন, সেগুলি বর্তমান গ্রন্থেও ব্যবহৃত হল। এই সুযোগে অমর শিল্পীর প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। সুরেন্দ্রনাথের ছবির জন্য আমি 'সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্ম শতবার্ষিক সমিতি'র কাছে ঋণী। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ও রবীন্দ্রসদনের ঋণ আমি বিনত চিত্তে স্বীকার করি। এই গ্রন্থপ্রণয়নে আমি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যাঁদের কাছে কিছুমাত্র সহায়তা লাভ করেছি তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

আমার কাহিনীগুলিতে আমি রবীন্দ্রজীবনীর প্রামাণিকতা যথাসম্ভব উল্লেখ করতেও ত্রুটি করিনি। এ পর্যন্ত অজ্ঞাত, ব্যক্তি-বিশেষের স্মৃতিতে মাত্র বিধৃত, অনেক বিষয় আমি আমার কাহিনীর মাধ্যমে বলবার চেষ্টা করেছি। জিজ্ঞাসু রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠক-পাঠিকা ও শিক্ষিত জনসাধারণ আমার সেই শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের পরিপূর্ণ রূপটি উপভোগ করতে পারলেই আমি কৃতার্থ হব।

সম্প্রতি বাংলাদেশ স্বাধীন হবার সময় থেকেই সোনার বাংলার ধ্বংসলীলার মধ্যেও বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল রবীন্দ্রনাথের সেই শিলাইদহ। সম্প্রতি স্বাধীন বাংলাদেশ রবীন্দ্রভাবধারা অনুশীলনের কেন্দ্রভূমি হিসাবে শিলাইদহকে যথাযোগ্য মূল্য দিতে চলেছেন,—এটি নিঃসন্দেহে সুসংবাদ।

'যে মর্মবাণী নিরালা নিভৃতে কাঁদে' তাকে প্রকাশ করাই আমার উদ্দেশ্য। আমার এই গ্রন্থে সেই মর্মকথাটা রূপায়িত হল কি না, তা অনুভবী পাঠক-পাঠিকা বিচার করে দেখবেন এবং কবির সেই "আনন্দরূপ শিলাইদহে" যদি সত্যসত্যই দ্বিতীয় শান্তিনিকেতন রচিত হয় তবে দুই বাংলার হৃদয়ের স্বপ্ন সফল হবে। রবীন্দ্রনাথের সাধের শিলাইদহের সর্বাঙ্গীন সমৃদ্ধি কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী

প্রকাশকের নিবেদন

১৯৬৯-এর মে-জুন মাসে একদিন শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বিশী মহাশয় 'সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ' 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ' 'রবীন্দ্রমানসের উৎস-সন্ধানে' প্রভৃতি বইগুলির দরদী লেখক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ অধিকারী মহাশয়কে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন তাঁর উক্ত প্রখ্যাত বইগুলির পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে। বইগুলির পরিচয় বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকদের অজানা নয়। বস্তুত 'মূঢ় ম্লান' পল্লীবাসীর সাদামাঠা সরল জীবনের সংস্পর্শে এসে আন্তরিকভাবে একটি মহান দরদী হৃদয় কীভাবে 'স্বদেশ' ও 'স্বজাতি'র সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিধানে মনে প্রাণে লিপ্ত হয়েছিলেন, তারই পরিচয়জ্ঞাপক সুবিন্যস্ত এমন গ্রন্থমালা আর দ্বিতীয় আছে বলে আমার জানা নেই। রবীন্দ্রজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় ১৮৯০-১৯১০। রবীন্দ্রনাথ পল্লীবাসী ; শুধু পল্লীবাসী নন পল্লীহৃদয়ের অন্তঃপুরের অধিবাসী। সর্বপ্রযত্নে তিনি সকলের সঙ্গে সমান হবার ব্রতে ব্রতী। 'যে মানুষকে মানুষ সম্মান করতে পারে না সে মানুষকে মানুষ উপকার করতে অক্ষম।' রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সমাজ গড়ে তুলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। 'বিদেশী রাজা চলিয়া গেলেই দেশ যে আমাদের স্বদেশ হইয়া উঠিবে তাহা নহে'—একথা তিনি ভালভাবেই জানতেন। তাই অকারণ বাক্য-বিলাসে কালক্ষেপ করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং তাঁর এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে একরকম একলাই চলেছেন—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলরে, একলা চল।' এই পল্লীমানুষের কল্যাণব্রতী জীবনপথের অসামান্য ফসল সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের অপরূপ ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। তারই কতকগুলি আন্তরিক প্রতিচ্ছবি শ্রদ্ধেয় অধিকারী মহাশয়ের গ্রন্থমালায় বিধৃত হয়েছে। রবীন্দ্র-পরিচয়-প্রসঙ্গে এই গ্রন্থমালা অসামান্য বললে অত্যুক্তি হবে না।

কর্মসূত্রে রবীন্দ্রগ্রন্থ পরিবেষণার সুযোগ পেয়েছি ব্যাবসায়িক ভিত্তিতে। তাই সাহিত্যের সমাদর শুধু পাওনা-গণ্ডায় হিসেব করে দেখাই অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। তবুও তারই মধ্যে মাঝে মাঝে বিস্ময় অনুভব করি অনন্য দরদী-হৃদয়ের কথা এবং রবীন্দ্র-মানসিকতার বিশ্বজনীনতা, সর্বব্যাপ্তি ভেবে। একদিন যৌবনারম্ভে তথাকথিত সমাজবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জমিদার রবীন্দ্রনাথের শ্রেণীগত ভাববিলাসকে উপলক্ষ করে অনেক অম্লমধুর কটাক্ষ করেছিলাম।

আজ হাসি পায় সে সব কথা মনে হলে। না জেনে, না পড়ে, না ভেবে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে অবোধের মত যে অবিচার করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য মনে প্রবল বাসনা মাঝে মাঝেই উঁকি-ঝুঁকি দিতে আরম্ভ করেছিল কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনন্য গ্রন্থ 'পিতৃস্মৃতি'র প্রথম প্রকাশকালেই। তারপর সেটা আরও বর্ধিত হল অজিত চক্রবর্তী মহাশয়ের অন্যতম জীবনীগ্রন্থ 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' পুনর্মুদ্রণ করার সময়ে। ইতিমধ্যে শ্রদ্ধেয় পুলিনবিহারী সেন মহাশয়ের সুযোগ্য সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথের 'পল্লীপ্রকৃতি' ও 'স্বদেশসমাজ' বইগুলিও প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থগুলির সংস্পর্শে এসে রবীন্দ্রনাথকে একান্ত আপনার করে পেয়েছি, মনে হয়েছে। এই অনুকূল পরিস্থিতিতে শ্রদ্ধেয় অধিকারী মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হলাম তাঁর বইগুলির পুনর্মুদ্রণের প্রসঙ্গে। মাথায় একটা চিন্তা খেলে গেল। অধিকারী মহাশয়কে দিয়েই তো আমার মনোবাসনা চরিতার্থ করা সম্ভব হতে পারে। মনের কথা প্রকাশ না করে সাধারণ ভাবেই সেদিন আলাপ শুরু করলাম। জানতে চাইলাম জমিদার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ও মতামত। ভদ্রলোক সেদিন যেন ভাবের সমুদ্রে প্লাবিত হলেন, চলে গেলেন সুদূর অতীতে। এক এক করে কত কথাই না বলে গেলেন মানুষ রবীন্দ্রনাথ, জমিদার রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। কথা প্রসঙ্গে একথাও জানালেন, ঠাকুর এস্টেটের একজন পুরাতন কর্মচারীরূপে তিনি তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যে লিখেও ফেলেছেন। উৎসাহবোধে সে লেখাটি দেখতে চাইলাম। দুদিন পরেই তিনি এলেন পাণ্ডুলিপি নিয়ে। এদিনও জমাট আলাপ হল। বইগুলো আমরা অবশ্যই প্রকাশ করব; তবে কীভাবে প্রকাশ করব তা একটু ভেবে দু চার দিন পরে গ্রন্থকারকে জানাব,—বললাম। আমার উদ্দেশ্য 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' নামে একখানি আকরগ্রন্থ প্রকাশ করা; এতে থাকবে ঠাকুর এস্টেটের ইতিবৃত্ত, গ্রন্থকারের পূর্ব-প্রকাশিত গ্রন্থমালার কাহিনীগুলির বিষয়ানুগভাবে বিবৃতি আর সেই সঙ্গে থাকবে রবীন্দ্রনাথ- ও শিলাইদহ-সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য এবং পল্লীপ্রকৃতি ও সমাজ-জীবনের যথাসম্ভব পরিচয়। গ্রন্থকারকে তখনও এসব কথা ভেঙে বলিনি, কেবলই অত্যুৎসাহে তাগিদের পর তাগিদ দিচ্ছি তাঁর সমগ্র জীবনের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ প্রসঙ্গে যাবতীয় সঞ্চয় লিপিবদ্ধ করে ফেলবার জন্য। আমাদের উৎসাহে অধিকারী মহাশয় খুবই অনুপ্রাণিত বোধ করলেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি যেন যৌবনের শক্তিতে মণ্ডিত হলেন। কী উৎসাহ, কী উদ্দীপনা!

ভাবের মানুষ অধিকারী মহাশয় ; পাথুরে বিচার বিশ্লেষণের বড় একটা ধার ধারেন না ; বলেন 'নরম মাটিতে মানুষ হয়েছি ; চিরকাল মাটি আর মাটির মানুষদের নিয়েই কেটে গেছে। এখন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আর আপনাদের পাথুরে প্রতীক দিনক্ষণের প্রমাণ ঠিকমত সাজিয়ে দিতে পারব না ; সে কাজ আপনারা করে নিন'। দিনের পর দিন তিনি 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' সম্পর্কিত মালমশলা দিয়ে যাচ্ছেন, আর সে সব গভীর আগ্রহ সহকারে আমার অনুজ প্রতীম বন্ধুবর সুরেন্দ্রনাথ কলেজের বাংলার অধ্যাপক শ্রীঅরবিন্দ ভট্টাচার্য মহাশয় তা পড়ে পড়ে ফাইল-জাত করে রাখছেন। ইতিমধ্যে আমার শুভানুধ্যায়ী অগ্রজতুল্য শ্রীবীরেন্দ্রকুমার নিয়োগী মহাশয়ও অধিকারী মহাশয়-প্রদত্ত সমস্ত পাণ্ডুলিপি পড়ে ফেলেছেন। প্রায়ই বসছি প্রস্তাবিত বইটির বিষয়বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জার কথা নিয়ে। গ্রন্থকারও এ আলোচনায় যোগ দিচ্ছেন। অনেক আলাপ-আলোচনার পর বর্তমান পরিকল্পনায় নতুন করে প্রতিটি বিভাগের নামকরণ গ্রন্থকারের সহায়তায়ই করা হল। তারপর শুরু করলাম ছাপার কাজ। এর মধ্যেও গ্রন্থকার অবিরাম দিয়ে যাচ্ছেন নিত্য নতুন নানাবিধ তথ্য। বাছাইয়ের কাজও সঙ্গে সঙ্গেই করে ফেলা হচ্ছে যথাসাধ্য সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করে। এজন্য প্রেসকেও কম ভোগান্তি সহ্য করতে হয়নি ; উপযুক্ত কারণেই ছাপার কাজ বিলম্বিত হতে থাকল। ইতিমধ্যে প্রতিবেশী পূর্ববাংলায় বিরাট গণঅভ্যুত্থান শুরু হল, খানসেনাদের অত্যাচার অনাচারে নিষ্পেষিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞা নিয়ে বাংলাদেশের মানুষ জীবনপণ করে সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। কত সিঁথির সিঁদুর মুছল, পিতা পুত্র, পুত্র পিতা হারালেন, মায়ের বুকে পাষাণ চাপা দিয়ে জঘন্যতম অত্যাচার চলল, সারা দেশ শ্মশানে পরিণত হল, মেঘনা-পদ্মা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র-ইচ্ছামতী-ধলেশ্বরীর জল রক্তে রাঙা হয়ে উঠল। তারপর একদিন সোনার বাংলা সার্থক ও সফল হল। সোনার বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি মনীষী রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য ধারণ বহনের অঙ্গীকার করলেন বিজয়ী বাঙালি।

রবীন্দ্র-স্মৃতি বিজড়িত শিলাইদহ নব শান্তিনিকেতনের রূপ পরিগ্রহ করবার পথে আয়োজন আজ শুরু হয়ে গিয়েছে। আমাদের পরিকল্পিত গ্রন্থ 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ'-এর প্রকাশনার কাজও সমাপ্ত হয়ে এল। প্রায় চারবছর একাজে কেটে গেছে। কিন্তু তবুও বইখানি নিখুঁত হয়েছে, একথা

আমি বলতে পারি না। তবে সাধুবাদ জানাব জিজ্ঞাসা গোষ্ঠীর ছোট, বড় সকলকে। বন্ধুবর ভট্টাচার্য মহাশয় ভাল লাগার আনন্দে অনলস ডুবে থেকে বইটির প্রকাশনার ব্যবস্থায় আমাকে যে ক্লান্তিহীন অনলস সাহায্য করেছেন, সেজন্য তাঁকে সাধুবাদ দিলে নিজেকেই ছোট করা হবে, শুধু বলব, একটি 'কাজের মত কাজ' তিনি করেছেন। বীরেনদার নীরব সেবার তুলনা নেই। সর্বোপরি অশীতিপর বৃদ্ধ গ্রন্থকারকে আমার সভক্তি প্রণাম জানাই। ভগ্নস্বাস্থ্য ও ক্ষীণদৃষ্টিশক্তি নিয়েও তিনি এই সুদীর্ঘকাল যেভাবে আমাদের সর্বপ্রযত্নে সহযোগিতা করে যে কার্য সিদ্ধ করেছেন তার নিদর্শন বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকগণই বিচার করে দেখবেন। এই সঙ্গে প্রণাম জানাই আমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহাশয়কে। তিনি যদি পরিচয় করিয়ে না দিতেন, তাহলে হয়ত আমার পক্ষে এ গ্রন্থ প্রকাশ করাই সম্ভব হত না। প্রসঙ্গত শ্রীপুলিনবিহারী সেন মহাশয়ের প্রেরণার কথাও আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

নানা বাধাবিঘ্ন সম্পাদনার পথে দেখা দিয়েছে। অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি স্বভাবতই এজন্য গ্রন্থে রয়ে গেল। আশা করি অনুরাগী পাঠকগণ আমাদের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিতে এবং সৎপরামর্শ দিতে পরাঙ্মুখ হবেন না। ভবিষ্যতে যদি কোন সংস্করণ প্রকাশ করবার সুযোগ পাই, তখন তাঁদের উপদেশ ও নির্দেশের যথাযোগ্য সমাদর করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলাম।

বিনীত

শ্রীশকুমার কুণ্ডু

সূচিপত্র

চিত্রসূচি

আলোকচিত্র

শিলাইদহ কুঠিবাড়ি
রবীন্দ্রনাথ-ব্যবহৃত আরাম কেদারা
শিলাইদহ কুঠিবাড়ির তেতলার ঘর
শিলাইদহ কুঠিবাড়ির পুষ্করিণীর বকুলতলা ঘাট
শিলাইদহ কাছারি ও পালকি
শিলাইদহে প্রজাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ
'পদ্মাবোট'-এ চিত্রাঙ্কনরত নন্দলাল বসু ও মুকুল দে
শিলাইদহে খোরসেদ ফকিরের দরগা
শিলাইদহ গোপীনাথ মন্দিরের তোরণদ্বার
শিলাইদহ গোপীনাথদেবের বিগ্রহ
রবীন্দ্রনাথকে প্রদত্ত উপহার : শিলাইদহের মহিলাদের তৈরি নকশি কাঁথা

নন্দলাল বসু-অঙ্কিত

ফটিক মজুমদার পৃ ৫১, নিমাই ঠাঁটা পৃ ৯৬, রামগতি মাঝি পৃ ১০২, মাধু বিশ্বাস পৃ ১৩৩, প্রজাদের মধ্যে মেছের সর্দার পৃ ১৩৫, আনন্দ ব্যাপারী পৃ ১৪৫, লালন ফকির পৃ ১৬৬, লালা পাগলা পৃ ১৭৫, তারণ সিং পৃ ৩০৪, মৌলবি সাহেব পৃ ৩১৩, দুজন চাষি পৃ ৩৬০

শ্রীসুধীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য-অঙ্কিত

[জমিদারির দায়িত্বগ্রহণে পিতা-পুত্র চিত্রমালা]

দ্বারকানাথ / দেবেন্দ্রনাথ
দেবেন্দ্রনাথ / রবীন্দ্রনাথ
রবীন্দ্রনাথ / রথীন্দ্রনাথ

প্রতিচিত্র ও নকশা

মহর্ষিদেবের হিসাব রাখার নমুনা পৃ ৪৬ 'জগতে আনন্দযজ্ঞে…', বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠি, ঠাকুর এস্টেটে ব্যবহৃত সীলমোহর ৩৯ শিলাইদহের নকশা পৃ ৫০ শান্তিনিকেতন ও ঠাকুর এস্টেটের নকশা ৩৮৪

গ্রন্থনামলিপি : শ্রীসুবিমল লাহিড়ী

শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ

পদ্মাপ্রবাহচুম্বিত শিলাইদহ

'আমার যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের সাহিত্যরসসাধনার তীর্থস্থান ছিল পদ্মা-প্রবাহ-চুম্বিত শিলাইদহ পল্লীতে'—রবীন্দ্রনাথের নিজের এই সুস্পষ্ট স্বীকৃতি রবীন্দ্রজীবনে শিলাইদহের স্থান সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। তাঁর তিরোধানের এক বছর পূর্বে একখানি চিঠিতে তিনি এই উক্তি করেছিলেন। তারও পূর্বে ১৩৪৫ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ আমার একখানা চিঠির উত্তরে তিনি লিখেছিলেন—'শ্রদ্ধার দান নানা স্থান থেকেই পেয়েছি, তোমাদের অর্ঘ্য সকলের চেয়ে মনকে স্পর্শ করেছে'। শিলাইদহের 'আনন্দরূপ' এবং সেই তাঁর চিরপরিচিত শিলাইদহকে দর্শন করবার আকাঙ্ক্ষা বারবার তাঁর 'নিভৃত স্মৃতিলোকে করুণ ধ্বনিতে গুঞ্জরিত হয়ে উঠতো'। কবিগুরুর এই করুণ গভীর আন্তরিক কামনা তাঁর ঐ দুইখানি চিঠির প্রতিটি অক্ষরে প্রকাশিত।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আট বছরে (কবির ২৬ থেকে ৩৪ বছর পর্যন্ত) লেখা ছিন্নপত্রাবলীতে প্রকাশিত প্রায় দুশো চিঠি, পুত্র রথীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে লেখা 'চিঠিপত্রের' কয়েক খণ্ডের এবং কবির সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীকে লেখা 'চিঠিপত্রের' প্রথম খণ্ডের চিঠিগুলি কবির ব্যক্তিগত জীবনের আনন্দ, বেদনা ও চিন্তাভাবনার পরিচয় বহন করে। তা অনুভবী পাঠক-পাঠিকা কবির দীর্ঘ কর্ম- ও ভাব-জীবনের একটি উজ্জ্বল ইতিহাস বলে গণ্য করবেন। তখন তার সেই পদ্মাতীরের শিলাইদহের পরিবেশ সেখানের মনোরম পল্লী-শোভা, প্রকৃতি ও জীবনের গভীর নিভৃত চিন্তাভাবনার মধ্যে তাঁর বিরাট কর্ম- ও ভাব-জীবনের একটা প্রস্তুতি-যুগ চলছিল—'চারিদিক হতে অমর জীবন' আহরণ করে নীরবে আপনার মাঝে আপনাকে পূর্ণ করে করে বলতে পারবেন—'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগোরে সকল দেশ'। জীবনের মহত্তম কীর্তি বিশ্বভারতীর (তখনকার তপোবন) মানসমূর্তিও কবির এই নিভৃত বাসের মধ্যেই ফুটে উঠেছিল।

রবীন্দ্রজীবনী ভালভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রজীবনভূমির চারটি স্তর আছে। প্রথম—তাঁর জন্মনগরী কলিকাতার জীবন। দ্বিতীয়—

কর্ম ও সাহিত্যরসসাধনার আদি তীর্থ শিলাইদহ জীবন। তৃতীয়—জ্ঞান-ও কর্ম-যজ্ঞের তপস্থায় বীরভূমের কঙ্করময় শান্তিনিকেতন জীবন। চতুর্থ—তাঁর বিশ্বপথিক জীবন। এই চারটি স্তরের তাৎপর্য আলোচনাসাপেক্ষ। তাঁর জীবনের দ্বিতীয় স্তর শিলাইদহ-জীবন সম্বন্ধে উপযুক্ত আলোচনার আজও অভাব রয়েছে; যদিও তাঁর জীবনের অপর তিনটি স্তরের বিভিন্ন আলোচনা শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বৃহৎ রবীন্দ্রজীবনীতে এবং অন্যান্য সুখ্যাত সুধীদের গ্রন্থে ও প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে। মানুষ, কবি, কর্মী ও সাহিত্যিক জীবনের পরমলগ্ন উপস্থিত হয়েছিল তাঁর শিলাইদহ-সাজাদপুর-কালীগ্রামের কবি-জমিদার হিসাবে প্রায় দীর্ঘ ত্রিশ বছর বাসের ফলে। আজকালকার গণতান্ত্রিক যুগে জমিদার বহুনিন্দিত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কীভাবে মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র বিলোপের সূত্রপাত করেছিলেন তার প্রকৃত পরিচয় আজও আমরা ঠিক অনুধাবন করতে পারি নি। দেশপ্রেম ও পল্লীপ্রেমের কতখানি গভীর আন্তরিকতা থাকলে একজন নগরবিলাসী ধনী অভিজাত বংশের সুশিক্ষিত তরুণ নাগরিক বিলাস ত্যাগ করে স্ত্রীপুত্রকন্যাসহ কলিকাতা থেকে ১১৬ মাইল দূরবর্তী ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত পল্লীতে একাদিক্রমে তিন বৎসর বাস করেছিলেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। কত বড় বলিষ্ঠ আদর্শবাদী সত্যদর্শী পল্লীপ্রেমিক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, যিনি সেকালেও যথেষ্ট প্রগতিবাদী হয়ে বলতে পেরেছিলেন দ্বিধাহীন কণ্ঠে—

আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি
সুসভ্যতার আলোক,
আমি চাই না হতে নববঙ্গে
নবযুগের চালক।
আমি নাই বা গেলেম বিলাত,
নাই বা পেলেম রাজার খিলাত,
যদি পরজন্মে পাইরে হতে
ব্রজের রাখাল বালক—
তবে নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে
সুসভ্যতার আলোক।

—জন্মান্তর, ক্ষণিকা, ১৩০৭

নদীমাতৃক সুজলা সুফলা বাংলার সন্তান, প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর

শিলাইদহ জমিদারি অঞ্চলেই পেয়েছিলেন কল্লোলময়ী নবযৌবনা অপরূপা কীর্তিনাশা পদ্মা, গোরাই, ইছামতী, যমুনা প্রভৃতি নদীর মনোরম আতিথ্য ও শুশ্রূষা যৌবন থেকে প্রৌঢ়কাল পর্যন্ত। তাই তাঁর প্রেয়সী পদ্মাকে বলেছিলেন পদ্মারই বুকে বসে—

এক দিন জনহীন তোমার পুলিনে,
গোধূলির শুভলগ্নে হেমন্তের দিনে,
সাক্ষী করি পশ্চিমের সূর্য অস্তমান
তোমারে সঁপিয়াছিনু আমার পরান।
... ...
নিভৃতে শরতে গ্রীষ্মে শীতে বরষায়
শত বার দেখাশুনা তোমায় আমায়।

—পদ্মা, চৈতালি, ১৩০২

তাঁর প্রেয়সী পদ্মার রূপবর্ণনায় ছিন্নপত্রাবলী বইখানি ভরপুর। পদ্মাতীরের এই জীবন তাঁর জীবনের ইতিহাস নয়—এক অপূর্ব রোম্যান্টিক মহাকাব্য।

শিলাইদহ অঞ্চলেই পল্লীবাংলার ঐশ্বর্য শস্যক্ষেত্র, মাঠ, ঘাট, বন, কৃষকের কুটির কতবার দেখে মুগ্ধ হয়ে গেয়েছিলেন—

নদী ভরা কূলে কূলে খেতে ভরা ধান
আমি ভাবিতেছি বসে কী গাহিব গান।

পল্লীপ্রকৃতির আকর্ষণ

ঐ অঞ্চলেই তিনি পেয়েছিলেন বাংলার চাষী, গৃহস্থ, শ্রমিক, বৈষ্ণব, বাউল, ফকির—বাংলামায়ের কোলের সন্তানদের নিবিড় সাহচর্য, প্রাচীন বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবনধারার আসল পরিচয়। ঐ অঞ্চলেই তিনি প্রতিদিন প্রাণভরে দেখেছেন দীনদুঃখী অশিক্ষিত সরল সহজ অবহেলিত শোষিত নিরুত্তম মাটির মানুষদের। তাদের বিচিত্র চরিত্র, শিক্ষা-দীক্ষা, মনোরাজ্যের ঘাত-অভিঘাত তিনি এঁকেছেন তাঁর অপরূপ কথাসাহিত্যে ও কাব্যে। এই গ্রাম-বাংলাতেই তিনি নিয়েছিলেন দেশপ্রেমের প্রথম পাঠ, দেশসেবার অনুপ্রেরণা। বিদেশের ধার-করা রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতির আলেয়ার সন্ধানে তাঁকে ছুটতে হয় নি। এই বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার আকাশ, বাতাস, মানুষ তাঁকে দিয়েছিল প্রত্যক্ষ সত্যের যথার্থ পরিচয়।

নিজের জীবনভাষ্য তিনি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন—

বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব, চলন্ত বৈচিত্র্যের নূতনত্ব। শুধু তাই নয়, পরিচয়ে-অপরিচয়ে মেলা-মেশা করেছিল মনের মধ্যে। বাংলাদেশকে তো বলতে পারি নে বেগানা দেশ, তার ভাষা চিনি, তার সুর চিনি। ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দরমহলে আপন বিচিত্র রূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে, যে উদ্‌বোধন এনেছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোটো গল্পের নিরন্তর ধারায়। সে-ধারা আজও থামত না যদি সেই উৎসের তীরে থেকে যেতুম, যদি না টেনে আনত বীরভূমের শুষ্ক প্রান্তরের রুদ্র সাধনের ক্ষেত্রে।

এইখানেই রবীন্দ্রমানসের উৎসসন্ধানের ক্ষেত্রে আরো বলেছেন—

আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানি নি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি, বৈশাখের খররৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষলধারাবর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জন-সজনের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁচচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি, সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয় নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবলোকের মধ্যে নিত্য সচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা। এই সময়কার প্রথম কাব্যের ফসল ভরা হয়েছিল সোনার তরীতে। তখনই সংশয় প্রকাশ করেছি, এ তরী নিঃশেষে আমার ফসল তুলে নেবে, কিন্তু আমাকে নেবে কি?

—সোনার তরী কাব্যের সূচনা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬-৭, ১৩৪৭, ২৫ বৈশাখ

পদ্মাতীরের বনরাজিনীলা শান্ত পল্লী-প্রকৃতি, তীরস্থ শিলাইদহ প্রভৃতি সরল সহজ গ্রাম্যজীবনলীলার অপরূপ তাৎপর্য কবির ভবিষ্যৎ জীবনেও কী সমারোহ

এনেছিল তার প্রকৃত চিত্র এইখানেই উদ্‌ঘাটিত হল। ঐ সময়ে মানুষ ও জীবনের নির্জন-সজনের নিত্যসংগমে কবির কাব্য ও কর্ম কিরকম বাস্তবরূপ নিয়েছিল তার প্রামাণিক বিবরণ দুষ্প্রাপ্য। তার কারণ কবি নিজেই বলেছেন কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত ১৩৩৫ সালের ২৫শে শ্রাবণের পত্রে—

কল্যাণীয়েষু,

শিলাইদহে আমার জীবন যাপনের যে বর্ণনা বাঙ্গলার কথায় প্রকাশ করিয়াছ তাহা পড়িয়া দেখিলাম। আমার সেই সময়কার অজ্ঞাতবাসের কথা কেহই ঠিকমত জানিবে না। তখন আমি অপেক্ষাকৃত অখ্যাত ছিলাম বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। আজ আমি জনতার মধ্যে নিরাশ্রয়—আমার বাসা ভাঙিয়াছে। মোটের উপর তখনকার সহরের বাতাসও এমন বিষাক্ত ছিল না—আজ দেখি, মানুষের অধিকার যতই সঙ্কীর্ণ তাহার ঔদ্ধত্যও ততই প্রবল। আজই পদ্মার নিভৃত শুশ্রূষা আমার পক্ষে একান্ত আবশ্যক ছিল, আজই তাহা দুর্লভ হইয়াছে। ইতি—২৫ শ্রাবণ, ১৩৩৫।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই জন্যই কবি বলেছেন 'কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে'। জানি না, সেই 'অজ্ঞাতবাসের জীবনের' কতটুকু প্রকাশ করতে পারব।

আমার এই গ্রন্থ খানিকটা ইতিহাসগন্ধী মনে হতে পারে। কিন্তু তখনকার কবিজীবনের অজ্ঞাতবাসের ইতিহাস অলিখিত, তা কবি নিজেই বলেছেন। এই সূত্রে কিছুটা অবান্তর হলেও একটা কথা বলে নিই। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রখ্যাত রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার, অন্নদাশঙ্কর রায়, স্বর্গীয়া প্রতিমা দেবী প্রভৃতি আমাকে ঠাকুর এস্টেটের ইতিহাস লিখতে অনুরোধ করেছিলেন এইজন্য যে, আমি ঐ বিষয়ে ওয়াকিবহাল। হঠাৎ রবীন্দ্রভবনের সংগ্রহশালায় ঠাকুর জমিদারির কিছু মূল্যবান দলিলপত্রও পেয়ে গেলাম। প্রায় একমাসকাল ঐসব দলিল তন্নতন্ন করে ঘেঁটে বুঝলাম, উপকরণ বিরাট জটিল পারম্পর্যহীন অসীম শ্রমসাধ্য এই গবেষণাকার্য আমার সাধ্যাতীত। এই সমস্ত প্রাচীন জমিদারির গতানুগতিক মামলা-মোকদ্দমার একঘেয়ে নীরস বিবরণ নিয়ে কী লাভ হবে? ঠাকুর জমিদারির বহু পরিবর্তন হয়েছে একশো বছর ধরে। কিন্তু এই জটিল প্রমাণপ্রয়োগের কচকচির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কৈ? ঐ পণ্ডশ্রম থেকে কী শিখবো? রবীন্দ্রনাথের জমিদার হিসাবে কৃতিত্ব কোথায়,

তা ঐ জঙ্গলে নেই, বরং আমার স্মৃতি ও শ্রুতিতে যতটুকু আছে, তাই ধরে রাখবার চেষ্টায় হয়তো কিছু মূল্য আছে। আমার এই জীবনসন্ধ্যায় সেটুকু জানিয়ে রাখা মন্দ নয়। তবু অনেক বাধা। অসামান্য মহামানব রবীন্দ্রনাথকে ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমি কতটুকু বুঝি? 'যে আমি স্বপনমুরতি গোপনচারী, যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি।' রবীন্দ্রচরিত্রে বহু জটিলতা। তাঁর তেজস্বী মনের বৈচিত্র্য ও অসাধারণ প্রগতির পরিচয় কজন পেয়েছেন জানি না। তবু কর্তব্যের অনুরোধে রবীন্দ্রজীবন সম্বন্ধে সত্যিকার কৌতূহলী জিজ্ঞাসুগণের জন্যে আমার অস্পষ্ট স্মৃতি ও শ্রুতির ঝুলি ঝেড়ে যতটা পারি দিতে চেষ্টা করছি, অবশ্য আমার প্রণীত তিনখানা গ্রন্থের কাহিনীতে অনেক তথ্য পরিবেশন করেছি। তার মধ্যে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নেই। শিলাইদহের ইতিহাস সঠিক পাওয়া যায় না। ঐ বিষয়ে তিনটি কিংবদন্তী এই গ্রন্থে আছে—কল্যাণ রায়, যুগল সা ও খোরসেদ ফকির।

দুঃখের বিষয়, কালীগ্রামে আমি জীবনে মাত্র একবার গিয়েছি। যতটুকু জেনেছি তা এই গ্রন্থে আছে। সাজাদপুরে আমি কখনো যাই নি। সেখানকার শোনা কথার একটিমাত্র এই বইতে আছে। আমি ছিলাম শিলাইদহবাসী। অতএব সে সম্বন্ধে যতটা জানি তাই বলব।

শিলাইদহ পরিচয়

পূর্বতন নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত বিখ্যাত কুমারখালি থানার অধীনে শিলাইদহ গ্রাম। কুমারখালি একটি ঐতিহাসিক সহর। বাংলার অনেক মহাপুরুষ এখানে বাস করেছেন, অনেক কীর্তি রেখে গেছেন। শিলাইদহের ছয় মাইলের মধ্যে তিন কোণে তিনটি সহর—কুমারখালি, কুষ্টিয়া ও পাবনা (সদর), পাবনা, নদীয়া ও ফরিদপুর এই তিনটি জেলা শিলাইদহে যেন পরস্পর মুখ চুম্বন করছে। কলনাদিনী ভীমা কীর্তিনাশা পদ্মা শিলাইদহের উত্তরবাহিনী; পদ্মা ও গোরাই নদীর সংগমস্থলে শিলাইদহের কুঠিরহাট। গোরাই নদী কুষ্টিয়া ও কুমারখালির পদ ধৌত করে প্রবাহিত। এর তীরে ঠাকুর এস্টেটের তিনটি বড় বড় মহাল এবং গঞ্জ—কয়া, কুমারখালি ও জানিপুর; কিছু দূরে গোরাইয়ের একটি শাখানদীর (ডাকুয়াখাল) তীরে ঠাকুর জমিদারির পাস্তীমহাল, যশোহর জেলার সীমানায়। পদ্মা থেকে ইছামতী নদী বের হয়ে পাবনা সহর প্রায় প্রদক্ষিণ করে প্রবাহিত। ইছামতী নদী বর্তমানে চরে

পরিণত। পাবনা জেলাসহরের গঞ্জ বাজিতপুর পদ্মার উত্তর সীমায়। পাবনা সহরও পদ্মাতীরে। শিলাইদহের ঠিক বিপরীতে পাবনার বিখ্যাত শীতলাই জমিদারের অট্টালিকা দেখা যায়। পাবনা বাজিতপুরের খেয়াঘাট থেকে শিলাইদহ গ্রামের বিশাল উচ্চশীর্ষ ঝাউগাছের নয়নাভিরাম ছবি চোখে পড়ে। পদ্মা ও গোরাইয়ের সংগমস্থলে বুনাপাড়ার কাছে প্রাচীন নীলকর সাহেবদের বিরাট কুঠি এখন পদ্মাগর্ভে বিলীন। এই কুঠিবাড়ির দোতলায় ও তেতলায় সেকালে ঠাকুরবাবুরা (রবীন্দ্রনাথও) বাস করতেন, একতলায় কাছারি হত। প্রাচীন স্মৃতি হিসাবে তখনও ছিল দুটি কবর—নীলকর শেলী সাহেব ও তাঁর মেম সাহেবের। এইখানেই কুঠিরহাট ও গঞ্জ এবং শিলাইদহ খেয়াঘাট। গোরাই নদী এই সময়ে প্রায় ভরাট হয়ে গিয়ে তালবেড়িয়ার কাছ থেকে কুষ্টিয়া সহরের পাশ দিয়ে বইছে—কুষ্টিয়ার কাছেই কালীগঙ্গা নদীর ভরাট অংশ এখন লোকালয় ও মাঠে পরিণত। এরই অতি নিকটে ছেঁউড়িয়া গ্রামে সুবিখ্যাত লালনশাহ্‌ ফকিরের আস্তানা বা আখড়া। বর্তমানে পাকিস্তান সরকার ও পাকিস্তানের সাহিত্যিকগণ এখানে ফকির লালনশাহের স্মৃতিমন্দির নির্মাণ করেছেন।

শিলাইদহের ভদ্রপল্লী রবীন্দ্রনাথের আমলে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কুমার, কর্মকার, সূত্রধর, গোপ, জেলে, তাঁতি প্রভৃতি জাতির দ্বারা পূর্ণ ছিল। মাইনর স্কুল, বালিকাবিদ্যালয়, পোস্ট অফিস্, হাটবাজার, ডাক্তার, কবিরাজ গ্রামের সমৃদ্ধি ঘোষণা করত। গ্রামের বিশিষ্ট প্রসিদ্ধি ও আকর্ষণ ছিল গোপীনাথদেবের মন্দির ও খোরশেদ ফকিরের দরগা; সেকালের যুগল সাহার বাড়ির কালীমন্দির, পুকুর ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। গোপীনাথ-দেবের রথ ছিল প্রকাণ্ড, কাঠের তৈরি। সে রথ আমরা দেখি নি, তবে তার পাঁচ ছয়খানা কাঠের সুন্দর কারুকর্মে যে পুতুলগুলো ছিল, তাতে মনে হয় রথটা খুবই প্রকাণ্ড ছিল। রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সে কুষ্টিয়া রেল স্টেশনে নেমে (কলিকাতা, শিয়ালদহ থেকে ১১১ মাইল) গোরাই নদী দিয়ে জলপথে নৌকায় বা স্টীমারে শিলাইদহে আসা যেত। পলি পড়ার দরুন গোরাই বন্ধ হয়ে গেলে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত রাস্তা তৈরি করে দেন। ঐ রাস্তা এখন 'রবীন্দ্র রোড' নামে খ্যাত। রবীন্দ্রনাথ বহু টাকা ব্যয়ে এখানে যে দাতব্য ডাক্তারখানা তৈরি করে দেন তার নাম 'মহর্ষি দাতব্য চিকিৎসালয়'। গ্রামের রাস্তাও তাঁরই. তৈরি। গোপীনাথবাড়ির সংস্কার করে, ঐ দেবমন্দিরের

অতিথিশালা, কাছারি ও সিংদরজা তৈরি করে গ্রামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। গ্রামে হিন্দু ও মুসলমান পল্লী পৃথক পৃথক ভাবে অবস্থিত। রবীন্দ্রনাথের আমলেই এ অঞ্চল ক্রমে মুসলমানপ্রধান হয়ে পড়ে। হিন্দু-মুসলমানে কলহ তখন আদৌ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ এখানে তিনবার বিরাট মেলার অনুষ্ঠান করেছিলেন, তার বিবরণ আমার কাহিনীতে দিয়েছি। পদ্মার ইলিশ মাছ, চর অঞ্চলের মটর ও কলাই এবং গৃহস্থবাড়ির পাকাকলার জন্য শিলাইদহ ছিল চিরবিখ্যাত। গ্রামে পূর্বে যাত্রার দল ছিল, তার থেকে শখের নাটকের দল গঠিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে। একবার রাখীবন্ধন উৎসবের সময় গ্রাম্য তরুণেরা নতুন থিয়েটারের দল গড়বার জন্য তাঁকে ধরে বসল। আমার পিতার আমলের সিন-স্টেজ ইত্যাদি শিলাইদহ কাছারির মহাফেজখানায় পড়ে ছিল। রবীন্দ্রনাথের আদেশে ও ব্যবস্থায় গ্রাম্য তরুণেরা ঐ স্টেজ মেরামত করে নিয়ে নতুন ভাবে অভিনয় করে। তখন বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কলের খুব খ্যাতি। থিয়েটারের নামকরণ তিনিই করলেন 'বঙ্গলক্ষ্মী নাট্যসমাজ'। তাঁর সময়ে কাছারিতে পুণ্যাহ ও গোপীনাথদেবের পালপার্বণে, জানিপুরের বিখ্যাত শিবু সাহার কীর্তন, লালন ফকিরের বাউলগান ও যাত্রা-থিয়েটার অনুষ্ঠানে নিরানন্দ পল্লী সঞ্জীবিত হয়ে উঠত। এছাড়া আমীনশার ভাসানযাত্রা ও বুনাপাড়ার 'অষ্টসখী'র গানের আসর বসত গেরস্তবাড়িতে। গগন হরকরার নাম অনেকে শুনেছেন। গগনচন্দ্র দাম আমাদের গ্রামেরই লোক—তাঁর গান 'আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে' অনেকেই শুনেছেন। সেই মরমী গগনের ছিল 'সখীসংবাদের' দল। এর বিবরণ আমি দিয়েছি। এই প্রাণহীন গানহীন নিরানন্দ পল্লী রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে এইরকম ভাবে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। মুকুন্দ মালাকার চমৎকার কীর্তন গাইতেন, আর মাথায় বাবরি চুল নিয়ে নাচতেন, সে ছবি আজও ভুলি নি। প্রায়ই বৈশাখ ও কার্তিক মাসে নগরসংকীর্তন বের হত এবং সে গান কুঠিবাড়িতে গিয়ে 'বাবুমশাইকে' শুনিয়ে আসতে হত। তারপরে হত 'হরির লুট' ('প্রেমানন্দে হরি বল রে ভাই')। কবি-জমিদার এক দুর্বার মধুর আকর্ষণে শিলাইদহের ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। সে রবীন্দ্রনাথকে স্বচক্ষে দেখেছেন এমন ভাগ্যবান এখন কজন আছেন? পোশাকি বিশ্বকবিকে দেখেছেন যাঁরা, তাঁদের দেখার সঙ্গে সেকালের রবীন্দ্রনাথকে দেখার আসমান-জমিন্ ফারাক্।

রবীন্দ্রজীবনে শিলাইদহ অপরূপ অবিস্মরণীয়!

শিলাইদহ জমিদারি

শিলাইদহ অর্থাৎ পরগণা বিরাহিমপুর (নদীয়া কালেক্টরির ৩৪৩০ নং তৌজি) প্রিন্স দ্বারকানাথের আমলের প্রাচীন জমিদারি। সাজাদপুরের জমিদারির মালিক মহর্ষির ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ (১৮২০-৫৪), পরে তাঁর পুত্র গুণেন্দ্রনাথ (১৮৪৭-১৮৮১) তিন নাবালকপুত্র (গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র, অবনীন্দ্র) রেখে মারা যান। সম্পত্তি পৃথক হলেও নাবালকদের অভিভাবক হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে এই সম্পত্তি দেখাশুনা করতে হত। এই জমিদারি পাবনা জেলায়—আকারে এবং প্রকারে শিলাইদহ জমিদারির দ্বিগুণ। তারপরে উড়িষ্যার কটক জেলায় যে জমিদারি ছিল তা মহর্ষিদেবের আমলেই পৃথকভাবে মহর্ষির তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথের (১৮৪৪-১৮৮৪) অধিকারভুক্ত হয়। বাংলার বাইরের এই সম্পত্তির ভারও রবীন্দ্রনাথকে বহন করতে হয়েছিল, কারণ হেমেন্দ্রনাথের ছেলেরাও তখন নাবালক। এ জমিদারি ছিল খুব বড়। ঐ এক ও দুনম্বর বাদে ছিল তিন নম্বর বিরাহিমপুর পরগণা (নদীয়া, পাবনা, ফরিদপুর), সদর শিলাইদহ এবং চার নম্বর কালীগ্রাম পরগণা (রাজসাহী জেলা), সদর পতিসর। এই দুই জমিদারির মালিক দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৮৪০-১৯২৬) সত্যেন্দ্রনাথ (১৮৪২-১৯২৩) ও রবীন্দ্রনাথ। বীরেন্দ্রনাথ বিকৃতমস্তিষ্ক, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিঃসন্তান, উপরন্তু স্টীমার কোম্পানির জন্য দেনাগ্রস্ত এবং সোমেন্দ্রনাথও বিকৃতমস্তিষ্ক বলে সম্পত্তি পেলেন না; মহর্ষির উইল অনুসারে মাসিক মাসোহারা পেলেন। এজমালিভাবে এই চারটি জমিদারির ভার রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করতে হল ১২৯৭ সালের প্রথমে। এত বড় জমিদারির দায়িত্ব কত কঠিন ও পরিশ্রম-সাপেক্ষ তা বুঝতে কষ্ট হয় না। এই তিন ভাইয়ের (দ্বিজেন্দ্র, সত্যেন্দ্র, রবীন্দ্র) দুই জমিদারি। তিন ভাইয়েরই বড় সংসার। তার মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ স্বয়ং উপার্জনক্ষম। রবীন্দ্রনাথকেও উপার্জনক্ষম বলা চলে; কিন্তু বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ উপার্জন করতেন না, অথচ তার সংসার ঐ দুজনের সংসার থেকেও বড় এবং তখনই তিনি দাদামশাই হয়েছেন। সেজন্য মহর্ষিদেবের জীবিতকালেই স্থির হল যে কালীগ্রাম ও শিলাইদহ এই দুই জমিদারির বাবদ দ্বিজেন্দ্রনাথের এক-তৃতীয় অংশ ইজারা সূত্রে (২০ মে, ১৯১২ ইজারা পাট্টা) সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ভোগ করবেন এবং ইজারা খাজনা হিসাবে ঐ দুজন দ্বিজেন্দ্রনাথকে বার্ষিক সাড়ে বাইশ হাজার হিসাবে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দেবেন। তাঁদের দুজনের আয় যাই-ই হক না কেন তাঁরা দুজনে মোট পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দিতে বাধ্য।

এই ব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ঐ চার জমিদারির দেখাশুনার (ইন্‌স্‌পেকশন) ভার পেলেন। তার পাঁচ বছর পরে ঐ কয়টি জমিদারির সর্বময় দায়িত্ব তাঁকে গ্রহণ করতে হল মহর্ষিদেবের ব্যবস্থায়। (পাওয়ার অব অ্যাটর্নী বাই দেবেন্দ্রনাথ ট্যাগোর। ৮ই আগস্ট ১৮৯৬ খ্রী:)

একজন তরুণ কবি ও সাহিত্যিকের পক্ষে এই গুরুভার দায়িত্ব যে কতদূর পরিশ্রমসাপেক্ষ (বিশেষত সুদূর উড়িষ্যার জমিদারি) তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। এর উপরেও আর একটি ব্যাপার হয়েছিল, যা হয়তো অনেকেই জানেন না। শিলাইদহের ছয় সাত মাইল দূরে ইতিহাসখ্যাত কুমারখালিতে মহাত্মা কাঙাল হরিনাথ 'গ্রামবার্তা' নামে পত্রিকা পরিচালনা করতেন। ঐ পত্রিকায় শিলাইদহ জমিদারিতে প্রজাপীড়নাদির সংবাদ পরোক্ষভাবে প্রকাশিত হলে মহর্ষিদেব ঐ সংবাদ জানতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ঐ সমস্ত জমিদারিতে সাময়িক দেখাশুনার ভার ছিল হেমেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, দ্বিপেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলীর (ইনি শিলাইদহে মারা যান) উপর। স্বভাবতই বহুজনের কর্তব্যশিথিলতা ও অনভিজ্ঞতার কারণে ঐ রকম প্রজাপীড়নের কারণ ঘটেছিল। মহর্ষিদেবের নিকট তরুণ রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঐ মনোবেদনার কারণ জানতে পেরেছিলেন এবং সাবধান বাণী শুনেছিলেন। সেজন্যেই জমিদারি-প্রথার আমূল সংস্কারের চিন্তা জেগেছিল তাঁর মনে।

রবীন্দ্রনাথ মহর্ষিদেবের আদেশে কি ভাবে ও কি ব্যবস্থায় জমিদারির কাজে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন তা জানা যাবে মহর্ষিদেবের এক পত্রে (তারিখ ২২ অগ্রহায়ণ ৫৪ ব্রাহ্ম অব্দ—বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫০ ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা)—

এইক্ষণে তুমি জমিদারির কার্য পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রস্তুত হও; প্রথমে সদর কাছারিতে নিয়মিতরূপে বসিয়া সদর আমিনের নিকট হইতে জমা ওয়াশীল বাকি ও জমাখরচ দেখিতে থাক এবং প্রতিদিনের আমদানি-রপ্তানি পত্রসকল দেখিয়া তার সারমর্ম নোট করিয়া রাখ। প্রতি সপ্তাহে আমাকে তাহার রিপোর্ট দিলে উপযুক্তমতে তোমাকে আমি উপদেশ দিব এবং তোমার কার্যে তৎপরতা ও বিচক্ষণতা আমার প্রতীতি হইলে আমি তোমাকে মফঃস্বলে থাকিয়া কার্য করিবার ভার অর্পণ করিব।

পিতার পূর্ব অভিপ্রায়মত তরুণ কবির ব্যারিস্টার হবার আশা নির্মূল হলে এইভাবে তিনি প্রথমে পরিদর্শক হিসাবে ও পরে পরিচালকরূপে পারিবারিক জমিদারির ভার গ্রহণ করেন। পল্লীবাংলায় ঘনিষ্ঠভাবে বছরের পর বছর বাস

করার ফলে তিনি কাব্য ও সাহিত্যসাধনার সঙ্গে সঙ্গে জমিদারি পরিচালনার কাজে প্রচুর দক্ষতা অর্জন করেন। প্রজা-জমিদার সম্পর্কের তাৎপর্য-উপলব্ধির, তৎসংক্রান্ত সমস্যা ও সমাধানের যে চেষ্টা তিনি করেছেন, সে বিষয়ে আইনজ্ঞ ব্যারিস্টার প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) লিখেছেন—

> রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসাবে মহাজনের কবল থেকে প্রজাকে রক্ষা করবার জন্য আজীবন কী ক'রে এসেছেন, তা আমি সম্পূর্ণ জানি— কেননা তাঁর জমিদারি সেরেস্তায় আমিও কিছুদিন আমলাগিরি করেছি। আর আমাদের একটা বড় কর্তব্য ছিল সাহাদের হাত থেকে সেখদের বাঁচানো— কিন্তু সেই সঙ্গে এও আমি বেশ জানি যে, বাংলার জমিদার মাত্রেই রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুর নন। রবীন্দ্রনাথ কবি হিসাবেও যেমন জমিদার হিসাবেও তেমনি Unique.
>
> —রায়তের কথা, পৃঃ ১৯

ঐ বইয়ের ভূমিকায় (সবুজপত্র ১৩৩৩ সাল) কবি-জমিদার লিখেছেন—

> আমার জন্মগত পেশা জমিদারি। কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমান-দারি। এই কারণেই জমিদারির জমি আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিষটার পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি, জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট্, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না করে, উপার্জন না করে, কোনো যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না করে ঐশ্বর্য ভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস করে তুলি। যারা বীর্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে আমরা সে জাতের মানুষ নই। প্রজারা অন্ন জোগায়, আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়— এর মধ্যে পৌরুষও নেই, গৌরবও নেই।

বাংলার কৃষিজীবন সম্বন্ধে তাঁর মূল্যবান মতামত ঐ প্রবন্ধেই তিনি নির্ভীক-ভাবে প্রকাশ করেছেন। 'পরিত্রাণ' নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর অভিনব চরিত্র-চিত্রণ তাঁর জমিদারি জীবনেরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল। কবিরচিত গোরা-চরিত্র তাঁর গ্রামসংগঠনের অনেক ইঙ্গিত বহন করে। অনেকগুলি প্রবন্ধে, বিশেষত রাশিয়ার চিঠিতে তুলনামূলকভাবে তিনি তাঁর স্বদেশের দুর্দশার চিন্তা-ভাবনা লিপিবদ্ধ করেছেন। আধুনিক কৃষকদরদী নেতারা সেযুগের বৃটিশ শাসনের আমলেও তাঁর জাতিগঠনের বৈপ্লবিক ভাবধারা থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারবেন। মোটকথা উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে বাংলার প্রাচীন

জমিদারি প্রথার আমূল সংস্কারপ্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে পল্লীসংগঠনের সুপরিকল্পিত কর্মপ্রণালী গ্রহণের প্রবর্তনা কবি রবীন্দ্রনাথের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার ফলশ্রুতি। ধনীসন্তান হয়েও, পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ থেকেও তিনি সেকেলে সামন্ততন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন। এতখানি আদর্শনিষ্ঠা এযুগে বিরল। ভঙ্গিসর্বস্ব দেশপ্রেম তাঁর ছিল না।

এইবারে আসল কথায় আসা যাক্। রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে ঐ চারটি জমিদারি পরিচালনে উদ্যত হয়ে আমলামহলে বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন তা পরে বলব। জমিদারির সুনাম রক্ষা, দুর্নীতি নিরোধ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে তিনি প্রায় এক ডজন সুশিক্ষিত ভদ্রসন্তানকে জমিদারি সেরেস্তায় চাকরি দিয়েছিলেন। এর বিবরণ আমার কাহিনীগুলোতে আমি বলেছি। যৌবনে রবীন্দ্রনাথের জমিদারির আমূল সংস্কার ও মামলা-মোকদ্দমার উৎসাহ দেখে তাঁকে অনেকে 'মধ্যাহ্নসূর্য' বলতেন এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিন্দা রটাতেন। মহর্ষিদেব তখনও জীবিত। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন যে, রবীন্দ্রনাথ বহু বাধার বিন্ধ্যাচলের মধ্যে অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্রমেই ক্লান্ত হচ্ছেন। তাই তিনি প্রথমে উড়িষ্যার জমিদারি ও সাহাজাদপুরের জমিদারির ভার পৃথকভাবে তাদের মালিকদের ফিরিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের পরিশ্রমের লাঘব করলেন। এখন রবীন্দ্রনাথের দায়িত্ব রইল বিরাহিমপুর (শিলাইদহ) ও কালীগ্রাম (পতিসর) এই দুটি জমিদারির উপর। হেড অফিস শিলাইদহে রেখে রবীন্দ্রনাথ ঐ দুই জমিদারির কাজ চালাতে লাগলেন। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ জমিদারির ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ছিলেন। তাই ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও কৃষিবিদ্যায় শিক্ষিত নিজ পুত্র রথীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ জমিদারিতে এনে হাতেকলমে কাজ শেখাতে লাগলেন। অন্নপূর্ণার সন্তান কৃষক-প্রজারা গ্রামে বাস করে উপোস করবে কেন? তাই পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও জামাতা নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকে আমেরিকা থেকে কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি শিখিয়ে জমিদারির কাজে লাগিয়ে দিলেন। অর্থ উদ্যম পরিশ্রমের যথেষ্ট অপব্যয় হল। কিন্তু আন্তরিক ও ঐকান্তিক চেষ্টা একেবারে নিষ্ফল হয় না; কিছু ফল হল, চাষীদের চোখ খুলল। জমিদারিতে পাট ইত্যাদির ব্যবসার পত্তন করলেন রবীন্দ্রনাথ ভাইপো বলেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথের উপর ভার দিয়ে— উদ্দেশ্য, চাষীরা দালালের হাতের পুতুল না হয়ে নিজ পরিশ্রমের যোগ্য মূল্য পাক, অধিকন্তু সংসারের খরচের কিছুটা সুরাহা হক। স্মরণ রাখা দরকার, এ সময়ে প্রিন্স দ্বারকানাথের বিপুল ঐশ্বর্যের পড়তি অবস্থায় একান্নবর্তী বিরাট ঠাকুর

পরিবারের মধ্যে অভাব, অভিযোগের সৃষ্টি হয়েছিল। এই সময়ে ব্যবসা দুষ্ট আমলাদের চক্রান্তে গণেশ উলটাল, বহু সহস্র টাকার জন্য দায়ী হলেন কবি-জমিদার; কারণ তখনও দুই ভাইপো সম্পত্তির মালিক নন এবং তাদের উপার্জনও ছিল না।

আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ যখন পুরাদস্তুর জমিদার ও পল্লীবাসী, তখন যুগপৎ তিনি সাধনার সম্পাদক, ভারতীর লেখক, শান্তিনিকেতন আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, মাসিক মাত্র ২৫০ টাকা মাসোহারাভোগী তিন চারটি সন্তানের স্বাধীনচেতা পিতা, পাটের ব্যবসায়ে প্রায় ৩০ হাজার টাকা ঋণী এবং পারিবারিক মৃত্যুশোকগ্রস্ত। এই সময়েই নিজের পুত্র ও তিন জামাতাকে তিনি বিদেশে পাঠিয়ে সুশিক্ষিত করবার অভিপ্রায়ে ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হন নি, আবার ঊনপঞ্চাশ পবনের মত শান্তিনিকেতন, কলিকাতা, শিলাইদহ, কালীগ্রাম, সুদূর উড়িষ্যা পর্যন্ত প্রভৃতি জমিদারিতে অবিরত গমনাগমন করেছেন। তারই মধ্যে চলেছে জীবনের শ্রেষ্ঠ কাব্য ও সাহিত্যসৃষ্টি। তাঁর জীবনকে বনস্পতি কল্পনা করলে মনে হবে তাঁর দ্বিতীয় পর্বের শিলাইদহ জীবনই ঐ বনস্পতির কাণ্ড। মূল কলিকাতা জন্মনগরী, ফল বিশ্বভারতী, শাখাপ্রশাখা বিশ্বপথিকের সমারোহ বিস্তৃতি। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার লিখেছেন—

> রবীন্দ্রনাথ যদি কেবলমাত্র কবি হইতেন, তবে হয়তো তাঁহার জীবনচরিত রচনারই প্রয়োজন হইত না, কারণ কাব্যই কবিজীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য এবং সে-দান তিনি প্রচুর পরিমাণেই রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনসত্তায় কবি ও কর্মীর যে যুগ্মরূপ ফুটিয়াছে, তাহা ইতিপূর্বে কোনো কবি বা কর্মীর জীবনে এমন সুন্দররূপে পরিস্ফুরণের অবকাশ পায় নাই। রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিতে কবি বা কর্মীরূপের কোনো একটিকে বাদ দিয়া অপরটির আলোচনা অসংগত হইবে, কারণ এই দুই-ই এক বৃহৎ রচনার অঙ্গ।
>
> —ভূমিকা, রবীন্দ্রজীবনী, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৫৬

রবীন্দ্রজীবনের এই পর্বের বিস্তারিত ইতিহাস জানতে হলে এই প্রসঙ্গে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থের 'শিলাইদহের স্মৃতি' (পৃঃ ২৬-৫২) 'আবার শিলাইদহে' (পৃঃ ১২১-১২৩), 'পতিসর' (পৃঃ ২১৫-২৩৪) পড়বার জন্য পাঠকগণকে অনুরোধ করি।

মহর্ষিদেব দেহরক্ষা করলেন ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে। জমিদারির রথ সারথি রবীন্দ্রনাথের চালনায় অপ্রতিহত বেগে চলল। এর মধ্যে শিলাইদহ জমিদারির

সঙ্গে ধোবড়াকোল জমিদারি-মহালটা (নদীয়া জেলা) কেনা হল রবীন্দ্রনাথের ব্যবস্থায় মার্টিন কোম্পানির কাছ থেকে। এর থেকে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের হাতে জমিদারির ক্রমোন্নতি যথেষ্ট হয়েছিল। সুদখোর মহাজনদের কবল থেকে দরিদ্র কৃষকদের রক্ষার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে কালীগ্রামে পরে শিলাইদহে 'কৃষিব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করলেন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে প্রচুর টাকা আমানত হিসাবে নিয়ে। শেষে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে (১৩২২ বাং?) বিরাহিমপুর ও কালীগ্রাম পরগণা ভাগ করা হল। তখন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে জমিদারি পরিচালনা চলতেই পারে না। এর মধ্যে অন্য পারিবারিক কারণও ছিল। এই ভাগের ফলে রবীন্দ্রনাথের ভাগে শিলাইদহ না পড়ে পড়ল পতিসর (কালীগ্রাম পরগণা)। শিলাইদহের মালিক হলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এর আগে কিছুকাল প্রমথ চৌধুরী ঐ উভয় জমিদারের ম্যানেজিং এজেন্ট রূপে কাজ করেছিলেন। প্রমথ চৌধুরী ঠাকুরবাড়ির জামাই, সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা ইন্দিরা দেবীর স্বামী। সুরেন্দ্রনাথের আমলে শিলাইদহের জমিদারির অবস্থা হল শোচনীয়। সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সাধারণ সম্পাদক থাকাকালে কলিকাতা নগরীর ভবিষ্যৎ প্রসারের সম্ভাবনা বুঝতে পেরে ল্যাণ্ড স্পেকিউলেশন ব্যবসা চালিয়ে ঋণজালে জড়িয়ে পড়েন এবং ভাগের পরই বাধ্য হয়ে ভাগ্যকুলের বিরাট ধনী জমিদারদের নিকট তাঁর শিলাইদহের অংশ জমিদারি বন্ধক দেন। শিলাইদহের দুর্ভাগ্য সুরু হল। ভাগ্যকুলের দেনা পরিশোধ তো হলই না, শিলাইদহ ওয়ার্ড এস্টেট, রিসিভার এস্টেট প্রভৃতির খোলস পরেও তা আত্মরক্ষায় সমর্থ হল না। শেষকালে ভাগ্যকুলের জমিদারবাবুরা শিলাইদহ (বিরাহিমপুর) জমিদারির মালিক হলেন। এই নিয়ে ঠাকুরবাবুদের সঙ্গে কিছুদিন মামলা-মোকদ্দমাও করলেন। অবশেষে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে বঙ্গবিভাগ হওয়ায় শিলাইদহ পূর্বপাকিস্তানে চলে গেল। এখানে ঠাকুরবংশের কোন সংস্রবই রইল না। আবার এর দুবছরের মধ্যে পূর্বপাকিস্তান সরকার ভাগ্যকুল জমিদারবাবুদের বাধ্য করলেন শিলাইদহ জমিদারি ছেড়ে দিতে। সেই থেকে আজ শিলাইদহ পূর্বপাকিস্তানের একটি উল্লেখযোগ্য পল্লী। শিলাইদহ জমিদারির এই শেষ ইতিহাস।

শিলাইদহে দৈনন্দিন জীবন

কবি-জমিদারের জীবনপর্বের দৈনন্দিন চিন্তা সুখ ও দুঃখ মিশ্রিত। কুঠি-বাড়িতে যখন থাকতেন তখন জমিদারির কাজ সেরেও কবিতালক্ষ্মীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করতেন। ভাববাদী ও বস্তুবাদী জীবনের সমন্বয় সাধন করতেন। সকালে ও বিকালে জমিদারির আমলাগণ আসতেন নানা জটিল বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে। প্রজারা আসত তাদের অভাব অভিযোগ নিয়ে। মামলা-মোকদ্দমার নথিপত্রও তাঁকে দেখতে হত, আবার অতিথি-অভ্যাগতদের আলাপ-আলোচনায়ও যোগ দিতেন তিনি। প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে উপাসনা ও সামান্য জলযোগ সেরে বেড়াতে বেরোতেন মাঠের মধ্যে একাকী। তাঁর অলক্ষিতে একজন বরকন্দাজ দূরে দূরে থাকত। দু তিন মাইল বেড়াতেন। প্রজাদের 'সেলাম হুজুরের' উত্তরে তাদের সঙ্গে নানা আলোচনায় মত্ত হতেন। কুঠি-বাড়িতে ফিরতেন গুনগুনিয়ে গাইতে গাইতে। গান লিখতেন অবিরাম—'ফুলের মতন আপনি ফুটাও গান'। তারপর বসত আমলা ও প্রজাদের দরবার। বেলা এগারটার মধ্যে আহারাদি সেরে লেখনী ধারণ করতেন। দিবানিদ্রা তাঁর ছিল না। জলনিবাস বোটে থাকতেও এই অবস্থা। মনের মত করে সুন্দর বৃহৎ জলনিবাস তৈরি করিয়েছিলেন— পদ্মা, চিত্রা, নাগরবোট ও আত্রাই, লাল ডিঙ্গি। দাঁড়িমাল্লা বাদেও সর্বক্ষণের জন্য দুজন প্রবীণ বরকন্দাজ বোটে থাকত— মেছের সর্দার ও তারণ সিং। থাকত বাবুর্চি ফটিক ফরাস, গফুর, ভৃত্য বিপিন ইত্যাদি। মাঝে মাঝে আসত পাগল লালাপাগলা ইত্যাদি। বোট বাঁধা থাকত বুনাপাড়ার কোলে অথবা হানিফের ঘাটে। সেখানে প্রায় সারাদিন পল্লীরমণীদের আনাগোনা। কবি পরমানন্দে তাদের আলাপ-বিলাপ শুনতেন। সাহিত্যসৃষ্টির কড়া তাগিদ এলে তিন চার দিনের জন্য পদ্মার কোন জনহীন কোলের মধ্যে বোট বাঁধা থাকত। হুকুম ছিল কেউ সেখানে যেতে পারবে না। সে কয়দিন কবির জমিদারি চাকরির 'ক্যাজুয়েল লিভ'। জ্যোৎস্না রাত্রে প্রায়ই চরে ভ্রমণ করতেন। প্রায়ই গ্রাম-ভ্রমণে বেরোতেন।

একাদিক্রমে দীর্ঘকাল নৌকাবাসে কবি অভ্যস্ত। জল-ঝড়, হাওয়া, প্রখর রৌদ্র তাঁকে কম বিপদাপন্ন করে নি। এর বিবরণ দিয়েছেন ছিন্নপত্রাবলীতে। প্রথমে এই নির্জন একক অজ্ঞাতবাসে কবির উদাসীন মনে জীবনের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিষ্ফলতার আঘাত লাগত—

দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি, মন নাহি মোর কিছুতে,
তাই ত্রিভুবন ফিরিছে আমার পিছুতে।

আবার অপরিসীম দুরন্ত আবেগে—

শুধু অকারণ পুলকে
নদীজলে-পড়া স্রোতের মতন ছুটে যা ঝলকে ঝলকে।

—উদ্‌বোধন, ক্ষণিকা, ১৩০৭

এই নির্জন বাসেও কবি অনুভব করতেন জীবনের তীব্র গতি, সমস্ত কিছু তুচ্ছ করে বীরের মত অবিরাম অগ্রগতির প্রেরণা। দুঃখ ছিল তাঁর নিত্যসহচর। স্বার্থচিন্তা ও বৈষয়িকতা কবির কাছে ছিল বড় দুঃখের। খ্যাতির সঙ্গে নিন্দা-তিরস্কারের তীব্র বেদনা তিনি সহ্য করতেন।

যতই বৈষয়িক জ্ঞানসম্পন্ন হোন, আসলে তিনি কবি, সত্য-শিব-সুন্দরের নিত্য উপাসক। গগনেন্দ্রনাথদের সাজাদপুর জমিদারি নিয়ে জটিল মামলা-মোকদ্দমা এবং তার জন্য বিরুদ্ধ সমালোচনা সহ্য করেছেন। সেজন্য মহর্ষিদেব সাজাদপুর জমিদারি পৃথক করে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কারণ এর মালিকেরা তখন সাবালক। কিন্তু কবি সাজাদপুরের আনন্দ ভুলতে পারছেন না, এর আকর্ষণও বড় তীব্র। চৈতালিতে (শ্রাবণ ১৩০৩) তাই মনের ক্ষোভে লিখেছেন 'চলিয়াছি রণক্ষেত্রে সংগ্রামের পথে', 'হে বন্ধু, প্রসন্ন হও, দূর কর ক্রোধ', 'ওরে যাত্রী, যেতে হবে বহুদূর দেশে' ইত্যাদি! এই সব মানসিক বিক্ষোভময় কবিতা তার প্রমাণ। সাজাদপুর ত্যাগের এই ক্ষত আরোগ্য করে দিয়েছিল তাঁর মানসপ্রিয়া পদ্মা আর শিলাইদহ বাসের আনন্দ।

শিলাইদহ জমিদারির সঙ্গে কালীগ্রামের জমিদারির আমূল সংস্কারের এবং নবপ্রবর্তিত 'মণ্ডলী-প্রথা' সেখানে প্রতিষ্ঠার কাজে নিন্দা-তিরস্কার তিনি কম সহ্য করেন নি। শান্তিনিকেতন-সৃষ্টির প্রথম পর্বে তিনি খেয়ালি কবি বলে অতি নিকট আত্মীয়স্বজনের কাছেও উপহসিত হয়ে দারুণ অর্থাভাবে দুশ্চিন্তায় দগ্ধই হচ্ছিলেন, মা লক্ষ্মী যেন মা সরস্বতীর সঙ্গে ঘোরতর শত্রুতা জুড়ে দিয়েছিলেন, সাহিত্যক্ষেত্রে সুশিক্ষিত নিন্দুকের দল তাঁর নিন্দায় পঞ্চমুখ, দারুণ অর্থাভাবে পড়ে সে সময়কার তাঁর রচনাসম্ভার নামমাত্র মূল্যে হিতবাদীর কাছে বিক্রি করতে হল, বিক্রি করতে হল পত্নীর গহনা, পুরীর বাড়িখানাও। তিনি ধনীর সন্তান হয়েও নির্ধন। অর্থব্যয়ে শোকতাপে তিনি জর্জরিত, সংসারে অপরিসীম দায়িত্বের পাহাড় ঘাড়ে করে তাঁকে চলতে হচ্ছে অনিশ্চিত বন্ধুর











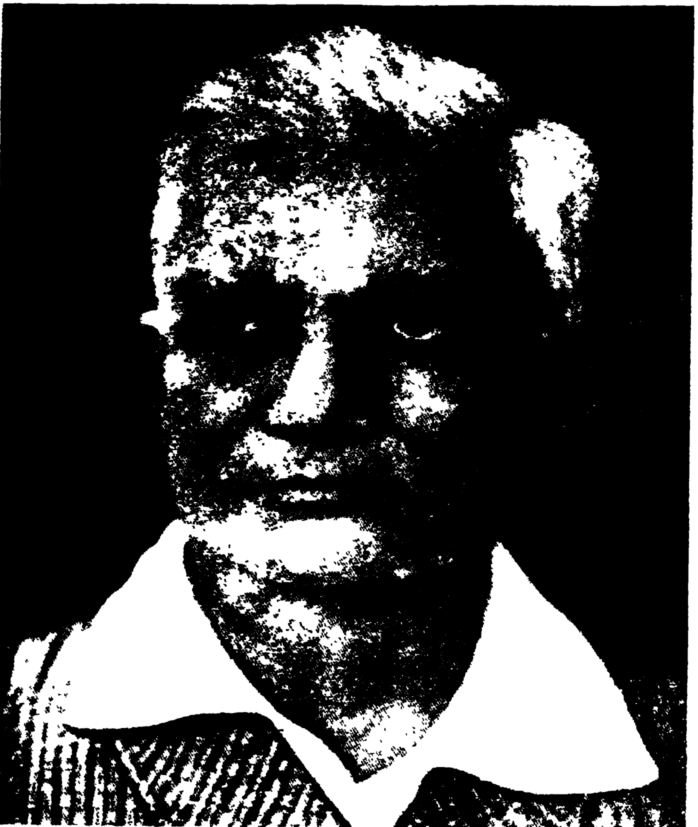
রবীন্দ্রনাথ : প্রৌঢ়াবস্থায়



রবীন্দ্রনাথ : যৌবনে



শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ (১৮৯০)



সুরেন্দ্রনাথ



রবীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ



ইন্দিরা দেবী　　রবীন্দ্রনাথ　　সুরেন্দ্রনাথ

পথে। অসাধারণ ধৈর্য, তিতিক্ষা, আদর্শবাদ তাঁর জীবনের সম্বল। রাত্রে কয়েকঘণ্টা মাত্র ঘুমাতেন, বিশ্রাম কি বস্তু তা তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত জানতে পারেন নি। তখনও তিনি বিশ্বখ্যাতি অর্জন করে দেশে বিদেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি ও সহানুভূতি পান নি। তবুও তিনি ছুটেছেন, অবিরাম গতিতে ছুটেছেন নিজের আদর্শের পথে, অন্তর্দেবতাকে বুকের মধ্যে সযত্নে রক্ষা করে উদাত্ত স্বরে বলেছেন—

ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা বসে ক্রন্দন,
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুলশেজ-রচনা।
আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ-অঙ্গন
উষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির আঁকা—
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

—কল্পনা, ১৫ বৈশাখ, ১৩০৪

ক্রমে উপনিষদের শিক্ষা— 'চরৈবেতি' হয়ে উঠল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা।

কবি-জমিদারের কৃতিত্ব

জমিদার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কীর্তি রবীন্দ্রজীবনী পাঠকদের কাছে নিশ্চয়ই খুব কৌতূহলের বস্তু। এর কোন ইতিহাস কেউ জানেন না। কারণ কোন লিখিত বিবরণ নেই। তবু সংক্ষেপে বলা চলে, কাব্য ও সাহিত্য সৃষ্টি ছাড়াও তিনি বাংলাদেশের জমিদারি-প্রথার ভিত্তিতে প্রচণ্ড আলোড়ন এনে দেখলেন, বাংলাদেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো ঢেলে সাজাতে না পারলে পল্লীসংগঠন সম্ভব নয়। তবু পল্লীসংগঠনই জাতিসংগঠনের অগ্রদূত। এই পরাধীন জাতির স্বরাজলাভ কত দূরে কে জানে! তাই পরবর্তী জীবনে শান্তিনিকেতনের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হিসাবে যোগ করলেন শ্রীনিকেতনকে, কারণ প্রবীণ বয়সে ঐখানেই তাঁর কর্মযজ্ঞের হবে তপস্যার ক্ষেত্র। জানতেন, শিলাইদহ কালীগ্রাম হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি শ্রীনিকেতনে পল্লীসংগঠনের প্রতিষ্ঠা করলেন, সহযোগী পেলেন এল. কে. এলম্‌হার্স্ট্‌কে, কর্মী পেলেন কালীমোহন ঘোষকে। তবু শিলাইদহের মায়া ত্যাগ করতে পারেন নি— কী দুর্বার শিলাইদহপ্রীতি ও শিলাইদহের আকর্ষণ! ঐ বছরের মার্চ মাসেই এলেন তাঁর চিরপরিচিত শিলাইদহে।

তখন তাঁর বয়স ৬১ বছর। পূর্বে শিলাইদহের অর্ধশিক্ষিত জোতদারেরা তাঁকে ভাল চোখে দেখত না। সন্দেহ করত। কিন্তু কালীগ্রামের অশিক্ষিত মুসলমান প্রজারা তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। সেখানে তাঁর পল্লীসংগঠন প্রচেষ্টা একটা বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এ বিবরণ রথীন্দ্রনাথ 'পিতৃস্মৃতি'তে লিখেছেন। তবু হতভাগ্য শিলাইদহ এতদিন পরেও কবি-জমিদারের সারাটা মন জুড়ে বসে আছে। ঐ শেষবার তাঁর শিলাইদহ দর্শন। তার বিবরণ আমি দিয়েছি এই গ্রন্থে। শিলাইদহে কৃষির উন্নতি ও পরীক্ষানিরীক্ষার যে বিরাট আয়োজন করেছিলেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও জামাতা নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে, তার বিবরণ রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন পিতৃস্মৃতিতে।

যাঁরা প্রকৃতপক্ষে জমিদার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে জিজ্ঞাসু তাঁরা আমার 'রবিতীর্থ' গ্রন্থে (নলেজ হোম, ৫৯ বিধান সরণি কলিকাতা-৬) 'পল্লীসংগঠনে রবীন্দ্রনাথ' (পৃঃ ১৮৮-১৯৪ দ্বিতীয় খণ্ড) পড়ে দেখতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি হলেও অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান জমিদার ছিলেন। বিপরীতধর্মী এই দুটি রূপ রবীন্দ্রচরিত্রের বিশেষত্ব। আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে তাঁকে যে রকম বিপ্লবী জমিদার মনে করি, সংক্ষেপে তার রূপরেখা দেওয়া হল।

ইংরাজ সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম করে জমিদারগণকে ইংরেজ সরকারের রাজস্ব-আদায়কারী তহশিলদারে পরিণত করেছিলেন এবং ক্ষমতাও বড় কম দেন নি। চতুর জমিদারগণ এই ব্যবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। ফলে অষ্টাদশ শতকে জমিদারদের বিলাসব্যসন ও প্রজাপীড়ন চরমে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ এর প্রত্যক্ষদর্শী। এদিকে রাজস্বের চাপ বাড়ছেই, ছোট জমিদারগণ 'ত্রাহি মা মধুসূদন' ডাকলেন। প্রজাদের খাজনা বৃদ্ধি না করলে জমিদারির খরচ বহন করে ভাল মুনাফা পাওয়া সম্ভব ছিল না। মহর্ষিদেবের আদেশে রবীন্দ্রনাথ প্রজাদের খাজনা বৃদ্ধি করতে গিয়ে মহা বিপদে পড়লেন। প্রজাদের তিনি অন্তরের সঙ্গে ভালবাসতেন, অথচ তারাই বিদ্রোহী হয়ে উঠল। বুদ্ধিমান প্রজা ও জোতদারদের প্রত্যক্ষভাবে এই সমস্যা বুঝিয়ে তিনি অতি কৌশলে খাজনা বৃদ্ধি করলেন। মহর্ষিদেব এই গুরুতর সমস্যার সমাধানে তাঁর পুত্রের অসাধারণ ধীশক্তি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বুদ্ধিমান ম্যানেজার বামাচরণ বসু এর পুরস্কার পেলেন ঘড়ির সোনার চেন। একাজে অধিকারীবাবুরা রবীন্দ্রনাথের পক্ষ সমর্থন করেন প্রবলভাবে। এজন্য রবীন্দ্রনাথ অধিকারীবাবুদের আত্মীয়ের মত গণ্য করতেন। তাঁদের বাড়ি, কাছারি

ও নীলকুঠির প্রাসাদ পদ্মাগর্ভে চলে যাওয়ায় বর্তমান কুঠিবাড়ি নির্মাণের জন্য তাঁরাই দশ বিঘা জমি দিলেন, খাজনা সামান্য, তারও দাবি করলেন না। তাঁদের এ খাজনা বহুদিন পরে দেওয়া হয়। প্রজা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হবেন, দেহি দেহি রবে আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করে ভিখারির মত জমিদারকে বিপন্ন করবেন না—প্রজা-ভূম্যধিকারীর সেইরকম সম্বন্ধ ছিল তাঁর একান্ত কাম্য। নাম কিনবার জন্য অজস্র দান-খয়রাত করে অসহায় প্রজাকে আরও অসহায় করে তোলার তিনি আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না।

জমিদারের কর্তব্য মহাপুণ্য কর্ম, প্রজাপালন, প্রজার উন্নতিসাধন করবার ভার পাওয়া সৌভাগ্য বলে তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করতেন। এই হচ্ছে শাশ্বত রাজা-প্রজা সম্বন্ধ। গভর্নমেণ্ট যতই ক্রূর-কৌশলী হন না কেন, সত্যিকার জমিদার সে সময়ে যতখানি ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তার থেকে তাঁরা চেষ্টা করলেই নিজ জমিদারিতে স্বরাজের পত্তন করতে সক্ষম—এই ধারণা ছিল তাঁর প্রবল। যে সব সুবিধাবাদী জমিদারিত্যাগী নগরবাসী হয়ে বিলাসব্যসনে মত্ত হয়ে জমিদার নামের কলঙ্কস্বরূপ হবেন, তাঁরা মহা অপরাধী ধর্মের কাছে, দেশের কাছে, সমাজের কাছে। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি আসলে ঐ চিন্তার ফলেই রচিত, অন্য কারণ থাকলেও তা নগণ্য। রাষ্ট্রের বলশালী অংশ হলেও জমিদারগণ পরাধীন। তাই জমিদারদের কর্তব্য হচ্ছে প্রজাদের আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করা। এজন্য তিনি লেখনী চালনা কম করেন নি। কিন্তু দুএকজন শিক্ষিত রাজা মহারাজা ছাড়া বহুযুগব্যাপী প্রজাশোষক বিলাসী স্বার্থপর জমিদারগণ তাঁর ঐসব মতকে রবি ঠাকুরের কবিতা বলে উপেক্ষা করতেন। ত্রিপুরার মহারাজা ও কুমারকে লেখা কবির পত্রাদি পড়লে পাঠক এ কথার সত্যতা বুঝতে পারবেন।

সেকালে জমিদারির আমলারা দশ পনের টাকা বেতন পেয়ে বাড়িতে দুর্গোৎসব করতেন কি করে, তা রবীন্দ্রনাথ জানতেন। মামুলি ধারণা নিয়ে অশিক্ষিত আমলাকে তিনি আদৌ প্রশ্রয় দেন নি, শাস্তি দিয়েছেন, ক্ষমাও করেছেন। উপযুক্ত আমলাকে বিশ্বাসও করেছেন খুব। অত্যাচারিত দরিদ্র প্রজা অশিক্ষিত হলেও কোন আমলার বিরুদ্ধে নালিশ করলে তিনি প্রজার কথাই বিশ্বাস করতেন, কারণ সে সত্যিই অত্যাচারিত না হলে ক্ষমতাবান আমলার বিরুদ্ধে নালিশবন্দি হতে সাহস পাবে না।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে সামন্তযুগীয় জমিদার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব

কোথায়, তাঁর কীর্তির তাৎপর্য কি, এই প্রশ্ন অনেক কৌতূহলী পাঠকেরই। এই প্রশ্নের উত্তর আজকের দিনে কেউ সঠিক দিতে পারবেন কিনা জানি না। রবীন্দ্রচরিত্রের এই বিশেষত্ব নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে শিলাইদহ প্রভৃতি জমিদারির ভার গ্রহণ করে নিজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য পুরো দুতিন বছর জমিদারির আভ্যন্তরীণ অবস্থা, প্রজাদের জীবন ও তাদের নৈতিক, অর্থনৈতিক পটভূমিকা তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করে বুঝলেন, জাতির জীবনের ঐ সন্ধিক্ষণে এই সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতিতে জমিদারি ব্যবস্থার আনুপূর্বিক সংস্কারের প্রয়োজন। মহর্ষিদেবের সেরূপ উপদেশও তিনি পেয়েছিলেন। সে সময়ে শিলাইদহ সদর কাছারির অধীনে আটটি ডিহি কাছারি ছিল। ধোবড়াকোল জমিদারি কেনবার পর দাঁড়াল নয়টি। জামাতা নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী শিলাইদহ কৃষিব্যাঙ্কের কাজ ছেড়ে চলে যাওয়ায় ঐ ব্যাঙ্কের জন্যও একটি পৃথক সেরেস্তার প্রয়োজন হল। তখনকার মামুলি প্রথা ও দুর্নীতিপরায়ণ আমলাদের আচার-ব্যবহারের পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ, এমন কি অসম্ভব। এদিকে প্রাচীন গ্রামীণ পঞ্চায়েৎ প্রথা, মামলা-মোকদ্দমার সালিশি নিষ্পত্তি প্রভৃতি কাজেও তিনি হাত দিয়েছেন। দেখলেন, সদর, নয়টি ডিহি কাছারি, কৃষিব্যাঙ্ক, মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে একপাল আমলাফয়লা বরকন্দাজ হালসনা উকিল মোক্তার সমন্বিত মামুলি বিকট কুরুক্ষেত্র ব্যাপার। অর্থ, ক্ষমতা, অধ্যবসায়ের শোচনীয় অপব্যবহারের নামান্তর। পল্লীবাংলার বিরাট উজ্জ্বল সম্ভাবনা তাঁর সম্মুখে। এ বিষয়ে তাঁর আগ্রহও ঐকান্তিক। তিনি জমিদারির জীর্ণ দুর্গে হানলেন গুরুতর আঘাত। নয়টি ডিহি কাছারি নিয়ে তিনটি বিভাগীয় (Divisional Kutchery) কাছারি তৈরি করলেন শিলাইদহ সদর কাছারির অধীনে। এর ফলে জমিদার একজন বাইরের লোক বা শুধু খাজনা আদায়ের যন্ত্র হবেন না, প্রজা-জমিদার সমবায় পল্লীতে একটা বলিষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হবে। এ ব্যাপারটাকে তখন সবাই 'ডিভিশন সিস্টেম' বা মণ্ডলী-প্রথা বলতেন। এর প্রকৃত তাৎপর্য কেন্দ্রীয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। প্রবীণ ম্যানেজার বিপিনবাবু আইনজ্ঞ ও উচ্চশিক্ষিত। তিনি এই বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বহু তর্কবিতর্ক করে রবীন্দ্রনাথের ন্যায়সঙ্গত যুক্তি স্বীকার করলেন।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তিন জমিদারির প্রায় প্রত্যেক বার্ষিক পুণ্যাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। ঐ উৎসবে বিরাট প্রজাসমাবেশে তাঁর অনন্যকরণীয়

ভাষায় নিজের উচ্চ আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবার সুযোগ পেতেন। বোটের মধ্যে বৃদ্ধ প্রজাদের নিয়ে দরবার করতেন। ঐ রকম এক দরবারে আমি আড়ি পেতে তাঁর এই ক'টি কথা শুনেছিলাম, 'তোমাদের কথা ভেবে ভেবে আমার চুলদাড়ি সাদা হয়ে গেল'। তাঁর এই আচরণ মন্ত্রের মত কাজ করেছিল।

কাজে হাত দিয়ে দেখা গেল বড় কঠিন কাজ। বহু কালের উপেক্ষিত প্রজাসাধারণ আনন্দিত, কিন্তু শিক্ষিত জোতদার প্রজা ও আমলাতন্ত্র বিমর্ষ, এমন কি বাধাদানে উদ্যত। সদর কাছারির আমলারা তাঁদের ক্ষমতাহ্রাসের চিন্তায় শঙ্কিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিকল্পনা নানারকমে বোঝালেন। তিনটির মধ্যে মাত্র একটি বিভাগীয় কাছারি খোলা হল চরমহালে। আর দুটির জন্য উপযুক্ত আমলার অভাব। কারণ অনেক দুর্নীতিপরায়ণ ধুরন্ধর আমলা বিতাড়িত হয়েছেন। জগদানন্দবাবু-প্রমুখ যে সমস্ত সুশিক্ষিত তরুণ ভদ্রসন্তানদের কাজ দিয়ে জমিদারির দুর্নাম ঘোচাবার বাসনা করেছিলেন, তাঁরা সকলেই শান্তি-নিকেতনের কাজে চলে যান। জোতদার শ্রেণীর মধ্যবিত্ত অর্ধশিক্ষিত প্রজারা মনে করলেন, বাবুমহাশয়ের এটা একটা ফন্দি—তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন পুরোনো বহুদর্শী বিতাড়িত আমলারা। ম্যানেজার বিপিনবাবুর কাজ বেড়ে গেল ; রবীন্দ্রনাথ গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন সাধারণ প্রজাদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টায়। পুনরায় চার পাঁচজন শিক্ষিত ভদ্রযুবক নিয়োগ করে ম্যানেজার-বাবুকে আশ্বস্ত ও উৎসাহিত করলেন। ওদিকে বাকি দুটি বিভাগীয় কাছারিও রবীন্দ্রনাথ মহা উৎসাহে গড়লেন, ভদ্রপ্রজাদের স্বমতে টেনে আনলেন। কবি-জমিদারের এই পরিকল্পনা কর্মবীর অতুল সেন কালীগ্রামে চালু করে নিরুৎসাহ রবীন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করলেন ; কালীমোহন ঘোষ চলে এলেন শিলাইদহে। রথীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে ফিরে শিলাইদহে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ সম্বন্ধে পরীক্ষানিরীক্ষা চালালেন, ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ এসে খুড়োমহাশয়কে সাহায্য করলেন। কিন্তু আসল বাধা দূর হল না। ম্যানেজার বিপিনবাবু সাধ্যমত চেষ্টা করে চাকরি ছেড়ে চলে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ কালীগ্রাম থেকে জানকী রায়কে এনে শিলাইদহের ম্যানেজার করলেন। শ্রান্ত, ক্লান্ত রবীন্দ্রনাথ অসুস্থও হয়ে পড়লেন। বিপন্ন পিতার সাহায্যের জন্য পুত্র রথীন্দ্রনাথ তাঁর সদ্য-অর্জিত বিদেশী অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বিরাট শ্রমসাপেক্ষ জমাওয়াশিল বাকির কাগজের পরিবর্তে কার্ডের ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য পরিশ্রম করতে লাগলেন, কিন্তু কৃতকার্য হতে পারলেন না। আমি স্বচক্ষে ঐ সমস্ত কার্ড ইনডেকস্

বোর্ড দেখেছি। এ কাজটি জমিদারি সেরেস্তায় অভিনব। তবু দুএকবছর গেল, তখনও ঐ দুই জমিদারি বিভক্ত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ জমিদারির বাৎসরিক বাকি খাজনার বাবদ তামাদি আরজি দাখিলের রাজসূয় ব্যাপার বন্ধ করে দিয়েছেন। অথচ দুঃখের কথা, কৃষিব্যাঙ্কের লগ্নি টাকার জন্য আদালতে শরণাপন্ন হওয়ার দরকার হচ্ছে; কৃষিব্যাঙ্কের (শিলাইদহের) অবস্থা শোচনীয়, আমানতকারীরা টাকা চাইছেন। তখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে রবীন্দ্রনাথকে জমিদারি ধ্যানজ্ঞান করে ঘুরে বেড়ালে চলছে না; দেশের নানা কাজে, শান্তিনিকেতনের জন্য ও সাহিত্য সাধনায় তাঁকে ভারতের নানাস্থানে যাতায়াত না করলে নয়। অতএব জমিদারি হল গৌণ। ঐ সময়ে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় কিছুকাল ঐ দুই জমিদারির ম্যানেজিং এজেন্ট মনোনীত হলেন। শিলাইদহে ঐ 'ডিভিশান সিস্টেমের' বিরাট আয়োজন সুরু হয়ে গেল। জানকীবাবু এসে দেখলেন শিলাইদহ ও কালীগ্রামের জমির অনেক পার্থক্য।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। আমি ১৩২৪ সালের প্রথমে, অর্থাৎ জমিদারি বিভাগের পরই, কলিকাতা সদর কর্মচারীরূপে নিযুক্ত হয়ে শিলাইদহ সদর কাছারিতে সহকারী মুন্সিরূপে জমিদারি কাজে শিক্ষানবিশি করি। আমাকে ম্যানেজারবাবু রবীন্দ্রনাথের আমলের পুরো নথিপত্র পড়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে উপদেশ দেন। আমি তাঁর আদেশ সম্পূর্ণ পালন করি দীর্ঘ আট মাস ধরে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি ১. একখানা খুব বড় মরক্কো চামড়ায় বাঁধা খাতায় জমিদারি ব্যবস্থার আদায় তহশিল, জরিপ জমাবন্দি, মামলা-মোকদ্দমা, জমিজমা বন্দোবস্ত, হিসাবপত্র ও শাসন-সংরক্ষণাদি সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ নিয়মাবলি ছিল। পরবর্তীকালে ঐসব নিয়মাবলির সংশোধন অথবা নূতন বিধির স্লিপ যথাস্থানে আঁটা দেখি। আমি বুঝলাম কোর্ট অব ওয়ার্ডস্-এর ওয়ার্ডস্ ম্যানুয়েল-এর এ যেন একটা সংস্করণ জমিদারিতেও, ২. কোন্ সময়ে কোন্ নূতন ফসল চাষ করতে হবে, তার প্রকরণ কি, সার কি ইত্যাদি বিবরণ খুব সহজ ভাষায় ছাপিয়ে সার্কুলারের মত মহালে বিলি করা হত। এমনি ছাপা সার্কুলার আমি দেখেছি, ৩. প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে জমিদারির আয়ব্যয়ের বরাদ্দ তৈরি হত ইংরেজি কায়দায়। তার মধ্যে জমিদারির আয়ব্যয়ের বিবরণ থাকত, ৪. প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসেরই সদর মফঃস্বল সমস্ত কাছারির সর্বশ্রেণীর

কর্মচারীর মাসিক বেতন (নতুন নিয়োগ), বেতন বৃদ্ধি, সদর মফঃস্বলে যাতায়াত, খোরাকির হার, বার্ষিক পার্বণির বিবরণ স্বয়ং জমিদারের দ্বারা পাশ করান হত। পার্বণির টাকা পূজোর ছুটিতে দেওয়া হত, ৫. জ্যৈষ্ঠের মধ্যে ঐ সমস্ত কাজ সেরে আষাঢ়ের কোন শুভদিনে সদর শুভ পুণ্যাহ অনুষ্ঠিত হত; বৈশাখের প্রথমে ডিহি কাছারিগুলির পুণ্যাহ হত, ৬. বার্ষিক কত মুনাফা, কত কিস্তিতে জমিদারবাড়িতে ইরসাল করতে হবে, মফঃস্বল ডিহি-দারগণকে বারো মাসে কার কি বরাদ্দমতে টাকা সদরে ইরসাল করতে হবে, তার হিসাব থাকত, ৭. বৎসরে দুইবার (আশ্বিন, চৈত্র) জমিদারির স্বাস্থ্য, জলবায়ু, ফসলের বিবরণাদি সম্বলিত আর্থিক অবস্থার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্ট দিতে হত। এইরকম রিপোর্ট আমরা কোর্ট অব ওয়ার্ডস্‌-এও একবার দিতাম। খাজনা সেলামি-খাতের রেমিশন স্টেটমেণ্ট পাঠান হত, ৮. পেশকারবাবু প্রতি বছরের হিসাব পরীক্ষা করে কলিকাতা আপিসে রিপোর্ট পাঠাতেন। প্রত্যেক স্বর্তের মামলা দায়ের করার আগে মামলার বিবরণ পাঠিয়ে জমিদারের মঞ্জুরি নেওয়া হত, ৯. কর্মচারী নিয়োগ বরখাস্ত রিপোর্ট করে মঞ্জুরি নিতে হত, ১০. ম্যানেজারবাবুর কৃতকর্মের বা বিচারের বিরুদ্ধে প্রজাগণ জমিদার-বাবুর নিকট আপিল করতে পারত ও বিচার হত। কারণ তখন পঞ্চায়েৎ-প্রথা চলে নি। তাঁর প্রবর্তিত সালিশি বিচারও চলে নি।

রবীন্দ্রনাথ যে পল্লী-পঞ্চায়েতের আদর্শ গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছিলেন, তিনি তার সাফল্য দেখতে পান নি, কারণ পল্লীর বাতাস তখন কলুষিত। এই প্রথাই ব্রিটিশ সরকার ঢেলে সাজিয়েছিলেন 'ইউনিয়ন বোর্ডের' প্রতিষ্ঠায়। তাই বড় দুঃখে লিখেছিলেন—

> পল্লীসমাজের পঞ্চায়েত-প্রথা গবর্মেণ্টের চাপরাশ গলায় বাঁধিয়া আত্মহত্যা করিয়া ভূত হইয়া পল্লীর বুকে চাপিতেছে, দেশের অন্নে টোলের আর পেট ভরিতেছে না, দুর্ভিক্ষের দায়ে একে একে তাহারা সরকারি অন্নসত্রের শরণাপন্ন হইতেছে; দেশের ধনীমানীরা জন্মস্থানের বাতি নিবাইয়া দিয়া কলিকাতায় মোটর গাড়ি চড়িয়া ফিরিতেছে, এবং বড়োবড়ো কুলশীল আপনার যথাসর্বস্ব এবং কন্যাটিকে লইয়া বি. এ. পাশ-করা বরের পায়ে বৃথা মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে। এই-সমস্ত দুর্লক্ষণের জন্য কলিযুগকে বিদেশী রাজাকে বা স্বদেশী ইংরেজিনবিশকে গালি দিয়া কোনো ফল নাই। আসল কথা, আমাদের দিনেরবেলাকার প্রভু তাঁহার চাপরাশি পাঠাইয়াছেন;

আমাদের সনাতন শয়নাগার হইতে সে আমাদিগকে টানিয়া বাহির না করিয়া ছাড়িবে না। জোর করিয়া চোখ বুজিয়া আমরা অকালে রাত্রি সৃজন করিতে পারিব না।

—সমাজভেদ, রবীন্দ্ররচনাবলি ২৬শ খণ্ড পৃঃ ৫৫৯

রবীন্দ্রনাথ স্বকীয় স্বাধীন দৃষ্টিকোণ দিয়ে পল্লীসমাজকে সে সময়ে দেখে কী সমস্যায় উপনীত হয়েছিলেন, তা ঐ প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন। এসব সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন প্রচুর কিন্তু এই অনগ্রসর দেশে তা কার্যে পরিণত করতে পারেন নি। তাই 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়' নীতিতে যতখানি পেরেছেন, নিজেই তা করবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন এবং এ সংগঠন কাজের দায়িত্ব প্রায় ষোল আনা জমিদারের, তাই বুঝে জমিদারি-প্রথার আমূল সংস্কার করতে অভিলাষী হয়েছিলেন। তখনকার বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বাঙালি সমাজে যে একটা আশার আলো দেখে তিনি ঐ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তার পরিণতিতে আলোর জায়গায় দেখতে পেয়েছিলেন ধোঁয়া। সেজন্য তিনি ঐ ঘূর্ণাবর্ত পরিত্যাগ করে, জাতির সর্বাংগীণ সংগঠনের জন্য নিভৃতে নীরবে বসলেন তাঁর শান্তিনিকেতনের সৃষ্টির ক্ষেত্রে। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে।' এজন্য দেশের শিক্ষিত সমাজের সমালোচনার ভাগীও হয়েছিলেন। তবুও আদর্শ ও নিষ্ঠা ত্যাগ করেন নি। মহাত্মাজীর নন্-কোঅপারেশন আন্দোলন তাঁর আদর্শবিরোধী জেনে তিনি তাঁর বিরুদ্ধেও লেখনী চালনা করেছিলেন কিন্তু আসলে তিনি কবি, দেশকে পরিচালন করবার কাজ তাঁর নয়। তাঁর অনেক ব্যর্থতার মধ্যে মহান শিক্ষার বীজ লুকিয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথের মত ও কর্ম, আদর্শ ও নিষ্ঠার মধ্যে কোন ফাঁকি ছিল না। তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

জমিদার রবীন্দ্রনাথের নিজের আদর্শ সম্বন্ধে স্বাধীন মতামত প্রকাশ করেন ১৩০৫ সালে ভারতী পত্রিকায় 'মুখুজ্যে বনাম বাঁড়ুজ্যে' প্রবন্ধে। তখন উত্তর পাড়ার জমিদার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ও বাংলার মুকুটহীন রাজা বা নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব নিয়ে বাদানুবাদ চলছিল। ঐ বিতর্কের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ উক্ত প্রবন্ধে লেখেন—

সেকালের ধনী জমিদারগণ নবাব সরকারের প্রতিপত্তি ও পদবী লাভের জন্য চেষ্টা করিতেন কিনা তাহা আমরা ভালরূপ জানি না। তখন নবাব

দরবারে প্রসন্নতা হইতে কেবল শূন্যগর্ভ খেতাব ফলিত না, তখন সম্মানের মধ্যে সৌভাগ্য এবং রাজপদের মধ্যে সম্পদ পূর্ণ থাকিত; অতএব তাহা লাভের জন্য অনেকেই চেষ্টা করিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তখনকার যাহা সাধারণ হিতকার্য— অর্থাৎ দীঘিখনন, মন্দিরস্থাপন, বাঁধ নির্মাণ— এই সকলই তাঁহারা যথার্থ কীর্তি বলিয়া জ্ঞান করিতেন, খেতাবলাভ নহে। দেশের নিকট ধন্য হইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের প্রবল ছিল। তখন এই-সকল কার্য রাজ-সম্মানের মূল্যস্বরূপ ছিল না, ইহাতে সাধারণের সম্মান আকর্ষণ করিত। সেই সাধারণের সম্মানের প্রতি তাঁহাদের উপেক্ষা ছিল না। ...জমিদারগণ নিজ গৌরবেও উচ্চ নহেন, সর্বসাধারণের সহিত ঐক্য দ্বারাও বৃহৎ বলিষ্ঠ নহেন। ইহারা বিলাতের লর্ডদের ন্যায় স্বতন্ত্র নহেন, বিলাতের জননায়কদের ন্যায়ও প্রবল নহেন। ইহারা বনস্পতির ন্যায় বিচ্ছিন্ন বৃহৎ নহেন, ওষধির মতো ব্যাপ্ত বিস্তৃতও নহেন; ইহারা কুষ্মাণ্ড লতার ন্যায় একমাত্র গভর্নমেন্টের আশ্রয় যষ্টি বাহিয়া উন্নতির পথে চড়িতে চাহেন,— ভুলিয়া যান যে সেই রাজদণ্ডবাহী উচ্চতা অপেক্ষা গুল্মসমাজের খর্বতা শ্রেয় এবং তৃণসমাজের নম্রতা শোভন। ...এদেশে পূর্বকালে জমিদার সম্প্রদায়ের যে গৌরব ছিল তাহা খেতাব অবলম্বনে ছিল না, তাহা দান, অর্চনা, কীর্তিস্থাপন, আর্তগণের আর্তিচ্ছেদ, দেশের শিল্প-সাহিত্যের পালন ও পোষণের উপর নির্ভর করিত। সেই মহৎ গৌরব এখনকার জমিদারগণ প্রতিদিন হারাইতেছেন।

ঐ প্রবন্ধে তিনি শুধু তাঁর জমিদার-ভ্রাতৃগণের উপর নয়, তৎকালীন দেশ-নেতাদের প্রতিও আক্রমণ চালিয়েছিলেন, কারণ দেশের ন্যাচার্যাল লিডার ঐ নেতৃগণ বিকট বিজাতীয় দৃষ্টিতে স্বদেশকে দেখতেন, অশিক্ষিত উপেক্ষিত জনসাধারণের কাছে ইংরেজি কেতায় দেশপ্রেম দেখাতেন। তাই লেখেন—

আমরা দেশের হিত করিব, কিন্তু দেশকে স্পর্শ করিব না, ইহা হইতে পারে না। ...ইংরাজের প্রবল আদর্শ যদি মাতার ভাষা এবং ভ্রাতার বস্ত্র হইতে আমাদিগকে দূরে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া যায়, তবে জননায়কের পদ গ্রহণ করিতে যাওয়া নিতান্তই অসংগত।

যে গভীর আন্তরিকতা নিয়ে তিনি জমিদারি-প্রথার সংস্কারব্রতী হয়েছিলেন সে বিষয়ে তাঁহার নিজের উক্তি প্রণিধানযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ নিজের জমিদারি কর্মের চমৎকার বিবরণ নিজেই দিয়েছেন

১৩৪৬ সালে শ্রীনিকেতনের পল্লীকর্মীদের কাছে 'শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ' ভাষণে—

আমি শহরের মানুষ, শহরে আমার জন্ম। আমার পূর্বপুরুষেরা কলকাতার আদিম বাসিন্দা। পল্লীগ্রামের কোনো স্পর্শ আমি প্রথম বয়সে পাই নি। এইজন্য যখন প্রথম আমাকে জমিদারির কাজে নিযুক্ত হতে হল তখন মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়েছিল, হয়তো আমি একাজ পারব না, হয়তো আমার কর্তব্য আমার কাছে অপ্রিয় হতে পারে। জমিদারির কাজকর্ম, হিসাবপত্র, খাজনা-আদায়, জমা-ওয়াশীল—এতে কোনোকালেই অভ্যস্ত ছিলুম না; তাই অজ্ঞতার বিভীষিকা আমার মনকে আচ্ছন্ন করেছিল। সেই অঙ্ক ও সংখ্যার বাঁধনে জড়িয়ে প'ড়েও প্রকৃতিস্থ থাকতে পারব এ কথা তখন ভাবতে পারি নি।

কিন্তু কাজের মধ্যে যখন প্রবেশ করলুম, কাজ তখন আমাকে পেয়ে বসল। আমার স্বভাব এই যে, যখন কোনো দায় গ্রহণ করি তখন তার মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন করে দিই, প্রাণপণে কর্তব্য সম্পন্ন করি, ফাঁকি দিতে পারি নে। এক সময়ে আমাকে মাস্টারি করতে হয়েছিল, তখন সেই কাজ সমস্ত মন দিয়ে করেছি, তাতে নিমগ্ন হয়েছি এবং তার মধ্যে আনন্দ পেয়েছি। যখন আমি জমিদারির কাজে প্রবৃত্ত তখন তার জটিলতা ভেদ করে রহস্য উদ্ঘাটন করতে চেষ্টা করেছি। আমি নিজে চিন্তা করে যে-সকল রাস্তা বানিয়েছিলুম তাতে আমি খ্যাতিলাভ করেছিলুম। এমন-কি পার্শ্ববর্তী জমিদারেরা আমার কাছে তাঁদের কর্মচারী পাঠিয়ে দিতেন, কী প্রণালীতে আমি কাজ করি তাই জানবার জন্যে।

আমি কোনোদিন পুরাতন বিধি মেনে চলি নি। এতে আমার পুরাতন কর্মচারীরা বিপদে পড়ল। তারা জমিদারির কাগজপত্র এমন ভাবে রাখত যা আমার পক্ষে দুর্গম। তারা আমাকে যা বুঝিয়ে দিত তাই বুঝতে হবে, এই তাদের মতলব। তাদের প্রণালী বদলে দিলে কাজের ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, এই ছিল তাদের ভয়। তারা আমাকে বলত যে, যখন মামলা হবে তখন আদালতে নতুন ধারার কাগজপত্র গ্রহণ করবে না, সন্দেহের চোখে দেখবে। কিন্তু যেখানে কোনো বাধা সেখানে আমার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, বাধা আমি মানতে চাই নে। আমি আদ্যোপান্ত পরিবর্তন করেছিলুম, তাতে ফলও হয়েছিল ভালো। *

* জমিদারিতে মণ্ডলী-প্রথা (বিভাগ-প্রথা, Division System) প্রচলনের ইতিহাস।

প্রজারা আমাকে দর্শন করতে আসত, তাদের জন্য সর্বদাই আমার দ্বার ছিল অবারিত—সন্ধ্যা হোক, রাত্রি হোক, তাদের কোনো মানা ছিল না। এক-এক সময় সমস্ত দিন তাদের দরবার নিয়ে দিন কেটে গেছে, খাবার সময় কখন অতীত হয়ে যেত টের পেতেম না। আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে একাজ করেছি। যে ব্যক্তি বালককাল থেকে ঘরের কোণে কাটিয়েছে, তার কাছে গ্রামের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। কিন্তু কাজের দুরূহতা আমাকে তৃপ্তি দিয়েছে, উৎসাহিত করেছে, নূতন পথনির্মাণের আনন্দ আমি লাভ করেছি।

যতদিন পল্লীগ্রামে ছিলেম ততদিন তাকে তন্নতন্ন করে জানবার চেষ্টা আমার মনে ছিল। কাজের উপলক্ষে এক গ্রাম থেকে আর-এক দূর গ্রামে যেতে হয়েছে, শিলাইদা থেকে পতিসর, নদীনালা-বিলের মধ্য দিয়ে—তখন গ্রামের বিচিত্র দৃশ্য দেখেছি। পল্লীবাসীদের দিনকৃত্য, তাদের জীবনযাত্রার বিচিত্র চিত্র দেখে প্রাণ ঔৎসুক্যে ভরে উঠত। আমি নগরে পালিত, এসে পড়লুম পল্লীশ্রীর কোলে—মনের আনন্দে কৌতূহল মিটিয়ে দেখতে লাগলুম। ক্রমে এই পল্লীর দুঃখদৈন্য আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, তার জন্যে কিছু করব এই আকাঙ্ক্ষায় আমার মন ছট্‌ফট্ করে উঠেছিল। তখন আমি যে জমিদারি-ব্যবসায় করি, নিজের আয়-ব্যয় নিয়ে ব্যস্ত, কেবল বণিক্-বৃত্তি করে দিন কাটাই, এটা নিতান্তই লজ্জার বিষয় মনে হয়েছিল। তার পর থেকে চেষ্টা করতুম—কী করলে এদের মনের উদ্‌বোধন হয়, আপনাদের দায়িত্ব এরা আপনি নিতে পারে। আমরা যদি বাইরে থেকে সাহায্য করি তাতে এদের অনিষ্টই হবে। কী করলে এদের মধ্যে জীবনসঞ্চার হবে, এই প্রশ্নই তখন আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এদের উপকার করা শক্ত, কারণ এরা নিজেকে বড়ো অশ্রদ্ধা করে। তারা বলত, 'আমরা কুকুর, ক'ষে চাবুক মারলে তবে আমরা ঠিক থাকি।'

আমি সেখানে থাকতে একদিন পাশের গ্রামে আগুন লাগল। গ্রামের লোকেরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল, কিছু করতে পারে না। তখন পাশের গ্রামের মুসলমানেরা এসে তাদের আগুন নেবালো। কোথাও জল নেই, তাদের ঘরের চাল ভেঙে আগুন নিবারণ করতে হল।

নিজের ভালো তারা বোঝে না, ঘর ভাঙার জন্য আমার লোকেরা তাদের মারধর করেছিল। মেরে ধ'রে এদের উপকার করতে হয়।

অগ্নিকাণ্ড-শেষ হয়ে গেলে তারা আমার কাছে এসে বললে, 'ভাগ্যিস

বাবুরা আমাদের ঘর ভাঙলে, তাই বাঁচতে পেরেছি!' তখন তারা খুব খুশি, বাবুরা মারধর করাতে তাদের উপকার হয়েছে তা তারা মেনে নিল, যদিও আমি সেটাতে লজ্জা পেয়েছি।

আমার শহুরে বুদ্ধি। আমি ভাবলুম, এদের গ্রামের মাঝখানে ঘর বানিয়ে দেব; এখানে দিনের কাজের পর তারা মিলবে; খবরের কাগজ, রামায়ণ-মহাভারত পড়া হবে; তাদের একটা ক্লাবের মতো হবে। সন্ধ্যাবেলায় তাদের নিরানন্দ জীবনের কথা ভাবতে আমার মন ব্যথিত হত; সেই একঘেয়ে কীর্তনের একটি পদের কেউ পুনরাবৃত্তি করছে, এইমাত্র।

ঘর বাঁধা হল, কিন্তু সেই ঘর ব্যবহার হল না। মাস্টার নিযুক্ত করলুম, কিন্তু নানা অজুহাতে ছাত্র জুটল না।

তখন পাশের গ্রাম থেকে মুসলমানেরা আমার কাছে এসে বললে, 'ওরা যখন ইস্কুল নিচ্ছে না তখন আমাদের একজন পণ্ডিত দিন, আমরা তাকে রাখব, তার বেতন দেব, তাকে খেতে দেব।'

এই মুসলমানদের গ্রামে যে পাঠশালা তখন স্থাপিত হয়েছিল তা সম্ভবত এখনও থেকে গিয়েছে। অন্য গ্রামে যা করতে চেয়েছিলুম তা কিছুই হয় নি। আমি দেখলুম যে, নিজের উপর নিজের আস্থা এরা হারিয়েছে।...

আমার জমিদারিতে নদী বহুদূরে ছিল, জলকষ্টের অন্ত ছিল না। আমি প্রজাদের বললুম, 'তোরা কুয়ো খুঁড়ে দে, আমি বাঁধিয়ে দেব।' তারা বললে, 'এ যে মাছের তেলে মাছ ভাজবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমরা কুয়ো খুঁড়ে দিলে, আপনি স্বর্গে গিয়ে জলদানের পুণ্যফল আদায় করবেন আমাদের পরিশ্রমে!' আমি বললুম, 'তবে আমি কিছুই দেব না।' এদের মনের ভাব এই যে, 'স্বর্গে এর জমাখরচের হিসাব রাখা হচ্ছে—ইনি পাবেন অনন্ত পুণ্য, ব্রহ্মলোক বা বিষ্ণুলোকে চলে যাবেন, আর আমরা সামান্য জল মাত্র পাব!'

আর-একটি দৃষ্টান্ত দিই। আমাদের কাছারি থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত উঁচু করে রাস্তা বানিয়ে দিয়েছিলুম। রাস্তার পাশে যে-সব গ্রাম তার লোকদের বললুম, 'রাস্তা রক্ষা করবার দায়িত্ব তোমাদের।' তারা যেখানে রাস্তা পার হয় সেখানে গোরুর গাড়ির চাকায় রাস্তা ভেঙে যায়, বর্ষাকালে দুর্গম হয়। আমি বললুম, 'রাস্তায় যে খাদ হয় তার জন্যে তোমরাই দায়ী, তোমরা সকলে মিলে সহজেই ওখানটা ঠিক করে দিতে পারো।' তারা জবাব দিলে, 'বাঃ, আমরা রাস্তা করে দেব, আর কুষ্টিয়া থেকে বাবুদের যাতায়াতের সুবিধা

হবে!' অপরের কিছু সুবিধা হয় এ তাদের সহ্য হয় না। তার চেয়ে তারা নিজেরা কষ্টভোগ করে সেও ভালো। এদের ভালো করা বড়ো কঠিন।...

যারা বহুযুগ থেকে এইরকম দুর্বলতার চর্চা করে এসেছে, যারা আত্ম-নির্ভরে একেবারেই অভ্যস্ত নয়, তাদের উপকার করা বড়োই কঠিন। তবুও আরম্ভ করেছিলুম কাজ। তখনকার দিনে এই কাজে আমার একমাত্র সহায় ছিলেন কালীমোহন।...

এইরকমে আমি কাজ আরম্ভ করেছিলুম। কুঠিবাড়িতে বসে দেখতুম, চাষীরা হাল-বলদ নিয়ে চাষ করতে আসত; তাদের ছোটো ছোটা টুকরো টুকেরা জমি। তারা নিজের নিজের জমি চাষ করে চলে যেত, আমি দেখে ভাবতেম—অনেকটা শক্তি তাদের অপব্যয় হচ্ছে। আমি তাদের ডেকে বললুম, 'তোমরা সমস্ত জমি একসঙ্গে চাষ করো; সকলের যা সম্বল আছে, সামর্থ্য আছে তা একত্র করো; তা হলে অনায়াসে ট্রাক্টর দিয়ে তোমাদের জমি চাষ করা চলবে। সকলে একত্র কাজ করলে জমির সামান্য তারতম্যে কিছু যায়-আসে না; যা লাভ হবে তা তোমরা ভাগ করে নিতে পারবে। তোমাদের সমস্ত ফসল গ্রামে এক জায়গায় রাখবে, সেখান থেকে মহাজনেরা উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কিনে নিয়ে যাবে।' শুনে তারা বললে, খুব ভালো কথা, কিন্তু করবে কে? আমার যদি বুদ্ধি ও শিক্ষা থাকত তা হলে বলতুম, আমি এই দায়িত্ব নিতে রাজি আছি। ওরা আমাকে জানত। কিন্তু উপকার করব বললেই উপকার করা যায় না। অশিক্ষিত উপকারের মতো এমন সর্বনেশে আর-কিছুই নেই।...

তখন থেকে আমার মনে হয়েছে যে, পল্লীর কাজ করতে হবে। আমি আমার ছেলেকে আর সন্তোষকে পাঠালুম কৃষিবিদ্যা আর গোষ্ঠবিদ্যা শিখে আসতে। এই রকম নানা ভাবে চেষ্টা ও চিন্তা করতে লাগলুম।

ঠিক সেই সময় এই বাড়িটা কিনেছিলুম। ভেবেছিলুম, শিলাইদহে যা কাজ আরম্ভ করেছি, এখানেও তাই করব।...

এই কাজে আমার বন্ধু এল্‌ম্‌হার্স্ট্‌ আমাকে খুব সাহায্য করেছেন। তিনিই এই জায়গাকে একটি স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র করে তুললেন।*...

সব-শেষে একটি কথা তোমাদের বলতে চাই—চেষ্টা করতে হবে যেন

* বিশ্বভারতীর অন্যতম শাখা শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

এদের ভিতর থেকে, আমাদের অলক্ষ্যে একটি শক্তি কাজ করতে থাকে। যখন আমি 'স্বদেশী সমাজ' লিখেছিলুম, তখন এই কথাটি আমার মনে জেগেছিল। তখন আমার বলবার কথা ছিল এই যে, সমগ্র দেশ নিয়ে চিন্তা করবার দরকার নেই। আমি একলা সমস্ত ভারতবর্ষের দায়িত্ব নিতে পারব না। আমি কেবল জয় করব একটি বা দুটি ছোটো গ্রাম। এদের মনকে পেতে হবে, এদের সঙ্গে একত্র কাজ করবার শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সেটা সহজ নয়, খুব কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন। আমি যদি কেবল দুটি-তিনটি গ্রামকেও মুক্তি দিতে পারি অজ্ঞতা অক্ষমতার বন্ধন থেকে, তবে সেখানেই সমগ্র ভারতের একটি ছোটো আদর্শ তৈরি হবে—এই কথা তখন মনে জেগেছিল, এখনও সেই কথা মনে হচ্ছে।

—পল্লীপ্রকৃতি, শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ পৃঃ ৯৬—১০৪

শিলাইদহে পল্লী সংগঠন প্রচেষ্টা ও জমিদারিতে মণ্ডলী-প্রথা প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠকপাঠিকা কবির পত্র ১. মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত ৩০ আষাঢ় ১৩১৫ সাল (দ্র : পল্লীপ্রকৃতি পৃঃ ২২৭), ২. অবলা বসু মহাশয়াকে লিখিত পত্র (এপ্রিল ১৯০৮) (ঐ পুস্তক পৃঃ ২২৯), ৩. রথীন্দ্রনাথকে লিখিত ৫ ফাল্গুন ১৩১৪ পত্র পড়লে উপকৃত হবেন। কালীগ্রাম সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অসম্পূর্ণ বলে সেখানকার তথ্য দিলাম না।

শিলাইদহ জমিদারির সীমানায় ছিল মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর জঙ্গলি ডিভিশন জমিদারি। মহারাজ কবির অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। নড়াইলের রাজার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল মোকদ্দমা করে জয় লাভ করেন। এই মোকদ্দমার নাম বিখ্যাত 'তের ছটাকের মামলা'। নলডাঙ্গার মহারাজের সঙ্গে হয় কুষ্টিয়ার দীনু ঘোষের মুদাফতি জমি নিয়ে দীর্ঘকালের মামলা, সে মামলাতে জয়ী হন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ নাটোরের ছোট তরফের রাজার সঙ্গেও ভৈরবপাড়ার দীর্ঘস্থায়ী মামলায় জয়ী হন। নাটোরের বড় তরফের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন, তিনি দুতিনবার শিলাইদহে এসেছিলেন। পাবনার শীতলাইয়ের জমিদার যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দেওয়ানি মোকদ্দমা ভাল বুঝতেন। বলতেন, মামলা জিনিসটাই খারাপ, তবে দেওয়ানি বুদ্ধি ও কৌশলের খেলা স্বার্থসিদ্ধির জন্য। ফৌজদারি মোকদ্দমা হলে আগুনের মত জ্বলে উঠতেন, সংশ্লিষ্ট আমলাকে প্রায়ই বরখাস্ত করতেন। কোন প্রজা নিজ

স্বার্থ রক্ষার জন্য তাঁদের নামে মোকদ্দমা করলে তিনি বিরক্ত না হয়ে বরং খুশি হতেন। অধিকারীবাবুরা তার প্রমাণ।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বরে তিনি সাম্যবাদের জন্মদাতা লেনিনের গড়া সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণে সেখানকার মূল্যবান,অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন; বলেন, 'আমি যা বহুকাল ধ্যান করেছি রাশিয়ায় দেখলুম এরা তা কাজে খাটিয়েছে, আমি পারি নি বলে দুঃখ হল।' কৃষি ও শিক্ষার উন্নতি বিষয়ে তিনি রাশিয়ার আদর্শ গ্রহণ কবেন, বলেন 'আমাদের জমিদারি যেন আমাদের প্রজাদেরই জমিদারি হয়, আমরা যেন ট্রাষ্টির মতো থাকি।' তখন ভারতের অবস্থা অন্যরূপ, পরাধীন ভারতে রাশিয়ার আদর্শ চলবে না। তাই সেই সময় থেকেই তিনি জমিদারিকে 'ব্যবসা' বলে ঘৃণা করতেন, ধিক্কার দিতেন। যেখানে গ্রামোন্নয়নের কোন কাজের কথা শুনেছেন, সেখানেই ছুটে গিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। ডেনিয়েল হ্যামিল্টন সাহেবের গোসাবায় ঘুরে এলেন, সাহেবকে শ্রীনিকেতনে আনলেন। ডাক্তার গোপাল চ্যাটার্জি গ্রামাঞ্চলে সমবায় সমিতির মাধ্যমে ম্যালেরিয়া নিবারণে ব্রতী হলে তিনি গোপালবাবুকে ডেকে আনলেন, সাধুবাদ দিলেন। গোপালবাবুর আদর্শে শিলাইদহে যে রেজিস্টার্ড সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হল, আমি তার সম্পাদকরূপে শিলাইদহের চেহারা বদলে দিয়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সমিতির চারজন কর্মীকে নিজ খরচে শ্রীনিকেতনে নিয়ে গিয়ে তাদের কয়েকটি গৃহশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিলেন; তখন তাঁর সঙ্গে শিলাইদহের সংস্রব ছিল না। তবু এল্‌ম্‌-হার্‌স্ট্‌ সাহেব ও কালীমোহনবাবুকে শিলাইদহে পাঠালেন। হায় হতভাগা শিলাইদহ! শত অপরাধ করলেও তুমি কবি-জমিদারের প্রাণপ্রিয়। তোমার কী মায়া, কী মোহ? কী মায়ায় তুমি তাঁকে জীবনের সায়াহ্ন পর্যন্ত ভুলিয়ে রেখেছিলে!

শিলাইদহে কবিবন্ধু জগদীশ বসু, অবলা বসু, লোকেন পালিত, নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ, ভগিনী নিবেদিতা, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, নন্দলাল বসু প্রভৃতি মনীষীরা কতবার এসেছেন। কবির যে কোন বন্ধুকে কবি আমন্ত্রণ করে তাঁর প্রিয়তমা পদ্মাবিধৌত এই পল্লীবৃন্দাবনকে দেখিয়েছেন, এর মাঠে গ্রামে পথে তাঁদের নিয়ে ভ্রমণ করেছেন। তিনি শিলাইদহে থাকলেই বিখ্যাত শিবু সার কীর্তন, লালন ফকিরের বাউল গান, বরকন্দাজদের লাঠিখেলা প্রভৃতির অনুষ্ঠান হত কাছারির কদমতলায়। এই কদমতলার গোড়াটা তিনি শান বাঁধিয়ে দেন

বন্ধুদের সঙ্গে বসে রসালাপের জন্য। কীর্তনীয়া শিবু সা, গগনহরকরাকে বোটের মধ্যে ডেকে নিভৃতে কত রাত্রি পদাবলি কীর্তন ও মরমী সংগীত শুনেছেন।

কবির অসংখ্য কবিতায়, ছোট গল্পে, 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা' উপন্যাসে এই শিলাইদহের মানুষ, এই শিলাইদহের ছবি কত বার কত ভাবে চিত্রিত হয়েছে। তাঁর তিরোধানের পর দেশবিদেশের কত গুণী কবিতীর্থ শিলাইদহের পদ্মাতীর দর্শনের জন্য সেখানে গিয়েছেন। শিলাইদহের রবীন্দ্র রোড (কুষ্টিয়া থেকে শিলাইদহ) ভাগ্যকুলের জমিদাররা মেরামত না করায় নদীয়া জেলা বোর্ড এই রাস্তাকে তাদের তালিকাভুক্ত রাস্তা হিসাবে মেরামত করেছে। শিলাইদহের গোপীনাথ দেবের সেবাপূজায় যেখানে ঠাকুরবাবুরা বহু সহস্র মুদ্রা খরচ করতেন, অতিথি সেবা করতেন, সেই পল্লীবিগ্রহ আজ নৈবেদ্যের চালে তুষ্ট হয়ে মন্দিরে বসে কাঁদছেন। সেই কল্লোলময়ী কবির প্রেয়সী সুন্দরী যৌবনোন্মত্তা পদ্মা আজ বিশীর্ণা বুড়ির মত বালুসৈকতে শুয়ে অসুখে হাঁপাচ্ছেন। শিলাইদহে মহাকবি মনীষীর স্মৃতিরক্ষার জন্য পাকিস্তান সরকার একটা ব্যবস্থা করেছেন, যাকে বলে দূর থেকে সেলাম আলিকুম্।

আমরা ঐ শিলাইদহে গ্রামোন্নতিজনক বহু অনুষ্ঠানে কবিগুরুর নাম নিয়ে বাংলাদেশে যখন যে মনীষীদের আমন্ত্রণ করেছি, তাঁরা শুধু ঐ পদ্মাপ্রবাহচুম্বিত কবিতীর্থ শিলাইদহ দর্শনের জন্য উপস্থিত হয়েছেন। আমি ধন্য গর্বিত, এই কবিতীর্থের একজন নগণ্য সন্তান বলে।

বিশেষ উল্লেখ্য যে জমিদার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের আমলের পুরানো চিঠিপত্র ও হুকুমের ফাইল পরবর্তী কালে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্-এর দাবি আমলে জমিদারির স্বার্থের প্রতিকূল হবে ভেবে নদীয়ার কালেক্টর ভস্মীভূত করে দেন। তাই আজ কবির জমিদারি-জীবনের প্রামাণিক বিবরণ লেখার জন্য উপকরণের অভাব হয়েছে। আমার বক্তব্যের প্রমাণ আমি উপস্থিত করতে পারছিনে।

এই প্রসঙ্গে একটা বিষয়ে পাঠকগণের জিজ্ঞাস্যের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। পল্লীসংগঠনাদির ব্যয়ের টাকা কোথা হতে পাওয়া যেত? মনে রাখা দরকার, বাংলার রাজা-মহারাজাদের মত ঠাকুরবাবুরা ধনী ছিলেন না। কিন্তু এ অঞ্চলে ঠাকুর-জমিদারদের সম্মান ও প্রতিপত্তি কারও অপেক্ষা কম ছিল না। প্রজাদের কাছ থেকে হাল-বকেয়া খাজনায় টাকা প্রতি তিন পয়সা হিসাবে একটা বৃত্তি আদায় হত। এ টাকা প্রজারা স্বতঃস্ফূর্ত হয়েই দিত। কালীগ্রামে এর নাম ছিল 'হিতৈষী বৃত্তি'। এর খরচের ব্যবস্থা করত সেখানকার হিতৈষী সভা।

শিলাইদহে 'কল্যাণবৃত্তি' ছিল টাকায় তিন পয়সা। এর জন্য পৃথক রসিদ দেওয়া হত। বৎসরে এই ভাবে পাঁচ ছয় হাজার টাকা উঠত। জমিদার এই আদায়ী টাকার অনুরূপ টাকা দিতেন। এছাড়া সায়রাত মহাল বন্দোবস্ত হলে মোট নজরের শতকরা ২½ টাকা ও নাম খারিজের নজরানা সরকারি আইনে শতকরা ৫ টাকা আদায় হত। এর হিসাব প্রতিবৎসর পরীক্ষার পর পাশ করার রীতি ছিল।

সেকালে জমিদারি আমলাদের বেতন খুবই কম ছিল, সেই কারণে তারা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ত। ঠাকুর জমিদারির আয়ের বিরাট অংশ গভর্নমেণ্ট রাজস্ব, সেস্, পত্তনি খাজনা, ইজারা খাজনা ও মহর্ষিদেবের উইল অনুযায়ী মাসোহারার টাকায় ব্যয় হত। শিলাইদহ জমিদারির প্রায় এক চতুর্থাংশ চরমহাল। এই চরে শিকস্তি-পয়স্তিতে জমির অবস্থার পরিবর্তন হত, আর সেই পরিবর্তিত জমি বন্দোবস্ত করে সেলামি খাজনা আদায় হলে জমিদার সরকার বরাদ্দ অনুযায়ী মুনাফা পেতেন। কিন্তু অনেক সময় নতুন-ওঠা জমি শুধু বালুময় হয়ে পড়ত ; বাধ্য হয়ে নজরানা মকুব দিতে হত। চরমহাল বহুরূপী। সেজন্য মহালে আয় যদিও ভাল হত, ক্ষতিও বড় কম হত না। বন্দোবস্তের কড়াকড়ি আইনকানুন ছিল। রবীন্দ্রনাথ কর্মচারীদের বেতন সাধ্যমত দুবার বাড়িয়েছিলেন। কিন্তু বার্ষিক আয় অস্থির হবার দরুন আর বাড়াতে সাহস করেন নি। তাই অল্প বেতনভোগী আমলাদের জন্য চরঅঞ্চলে জমি দেবার ব্যবস্থা চালু করেন। এই সমস্ত জমিকে বলা হত 'আমলানছাম'। চরের স্থায়ী (জলি জ্যৈষ্ঠকর) জমি বন্দোবস্ত হলে ধার্য-নজরের শতকরা ৫ টাকা পর্যন্ত আদায় হত। প্রজারা ঐ জমিতে ভাল ফসল পেত, তাই তারা ঐ টাকা দিতে আপত্তি করত না। এই বাবদ আদায়ী টাকাও জমিদারির কর্মচারীদের মধ্যে বণ্টন করা হত। কর্মচারীদের চাকরির শেষে পেনশনের ব্যবস্থা ছিল, উপযুক্ত সঞ্চয় তহবিলও ছিল। রবীন্দ্রনাথ আমলাদের দুর্নীতি নিবারণের বহু-প্রকার চেষ্টা করেছেন, দাতব্যও দিয়েছেন। আদায়কারী আমলাদের জন্য পূর্বে কোন জামিন ছিল না, কিন্তু পরে বাধ্য হয়ে জামিনের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। জমিদারির আইন প্রয়োগের শিথিলতা রবীন্দ্রনাথ কখনও সহ্য করতেন না। কুষ্টিয়া, কৃষ্ণনগর ও পাবনা মোকামে কাজের সুবিধার জন্য আমমোক্তার ও রেভিনিউ এজেণ্ট নিয়োগেরও ব্যবস্থা ছিল। জমিদারির আয়ের তুলনায় ব্যয়ের আধিক্য দেখে রবীন্দ্রনাথ নিজের ব্যয় সম্বন্ধে কার্পণ্য করতেন।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী মশাইকে যে পত্রগুলি লেখেন, তা 'চিঠিপত্রে'র পঞ্চম খণ্ডে ছাপা হয়েছে। ঐ চিঠিগুলিতে ঐ সময়কার রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মানসিক অবস্থার চিত্র পাওয়া যাবে।

জমিদারি প্রথার সংস্কারের এই বিরাট প্রচেষ্টা ব্যর্থকাম জমিদার রবীন্দ্রনাথের একটি মহাকীর্তি। এত বড় কাজ বাংলার কোন জমিদার আজ পর্যন্ত করতে পেরেছেন কিনা জানি না। এছাড়াও তাঁর আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কীর্তি, পল্লীঅঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানের সুচিন্তিত ব্যবস্থা।

শিলাইদহ জমিদারিতে মুসলমান ক্রমবর্ধমান, কালীগ্রাম ও সাজাদপুর মুসলমানপ্রধান। রবীন্দ্রনাথ দেখলেন, তাঁর জমিদারিতে মুসলমান প্রজারা বরকন্দাজের চাকরি করে। তারা এজন্য দুঃখিত। রবীন্দ্রনাথ সামান্য শিক্ষিত মুসলমানদের অনেককে জমিদারির মুহুরি ও আমিনের কাজ শেখাবার ব্যবস্থা করেন। আতুড়ি খাঁ, আইনদ্দিন খাঁ প্রভৃতিকে আমিন ও তসিলদার পদে উন্নীত করেন। জমিদারির কোনও শিক্ষাভিলাষী তরুণ মুসলমানকে তিনি নানাপ্রকারে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন বলে আমি জানি। চরমহালগুলিতে পূর্ববঙ্গ থেকে নমশূদ্র সমাজকে এনে বসিয়েছিলেন, জমি দিয়েছিলেন। পরস্পর বন্ধুভাবে বাসের ফলে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সমস্যা দূর হয়েছিল, তাঁর আমলে জমিদারিতে হিন্দু-মুসলমানে কোন বিরোধ ছিল না। শিলাইদহ জমিদারিতে তিনি ছোটবড় চারটি মক্তব মাদ্রাসা স্থাপন করে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতেন।

বিভিন্ন পল্লীসংগঠনের ব্যাপারে ব্যর্থকাম রবীন্দ্রনাথ ঐ সময়ে সমবায় নীতির মর্ম উপলব্ধি করেন এবং পরবর্তী জীবনে একজন বিশিষ্ট সমবায়ী হয়ে পড়েন। ডাক্তার গোপাল চট্টোপাধ্যায় সমবায়ের নীতিতে পল্লীতে ম্যালেরিয়া নিবারণের যে অভিযান চালিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার একজন প্রধান ও সক্রিয় পৃষ্ঠপোষক। ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দের প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর তিনি বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এর থেকে তিনি বুঝেছিলেন, দেশের হিত করাই শিক্ষিত ভদ্রলোকের একমাত্র কর্ম নয়, গরিব গ্রামবাসীকে অনুগ্রহের দৃষ্টিতে না দেখে শ্রদ্ধা সহকারে উন্নত করাও তাদের কাজ এবং সেজন্য দেশের শিক্ষিত সমাজ দায়ী। প্রায় পঁচিশ বৎসর বিবিধ কর্মযজ্ঞে ব্যর্থকাম হয়ে তিনি বড় দুঃখে লিখেছিলেন—

যতবার আলো জ্বালাতে যাই, নিভে যায় বারে বারে।
আমার জীবনে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে।

রাশিয়ার ধনবণ্টননীতি বিষয়েও তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতেন। তাঁর চিঠিপত্রে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। ছিন্নপত্রাবলীর কোন কোন চিঠিতে দেখা যায় তিনি নিজের জন্যও অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করতেন।

একজন মানুষ বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি করেও কী বিরাট কর্মজালে আপনাকে জড়িত করেছিলেন তা আমার কাহিনীগুলিতে লিখেছি। ঐগুলি পড়লেই জানা যাবে, তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহযোগে শিলাইদহ সদর কাছারিতে তাঁতের কারখানা খুলে বাংলাদেশে স্বাদেশিকতার উষালোক এনেছিলেন, কুষ্টিয়া সহরে ট্যাগোর অ্যাণ্ড কোং নামে রেজিষ্ট্রি-করা কোম্পানি করেছিলেন পল্লীঅঞ্চলে দুটি প্রধান অর্থকরী পণ্য পাট ও আখের কলের ব্যবসার জন্য। পান্টিতে সুতো ও কাপড়ের হাট প্রতিষ্ঠা করে এবং বস্ত্রাভাবে দেশকে ম্যাঞ্চেস্টারের মুখাপেক্ষী হবার পথ বন্ধ করে দেশে মহাজাগরণ আনতে চেষ্টা করেছিলেন। তখনও কুষ্টিয়ার বিখ্যাত মোহিনী মিল জন্মগ্রহণ করে নি। কত বড় আত্মবিশ্বাস ও আত্মিক শক্তি তাঁর ছিল যে ঐ ইংরেজের যুগে তিনি কালীগ্রাম ও শিলাইদহে একটি বেসরকারী রেজিষ্ট্রি-না-করা ব্যাঙ্ক গড়েছিলেন গ্রাম্য মহাজনদের হাত থেকে হতভাগ্য চাষিদের বাঁচাবার জন্য। এই ব্যাঙ্ক প্রায় ত্রিশ বছর বেঁচেছিল। পরে এই ব্যাঙ্কের শেষ চিহ্ন ছিল শান্তিনিকেতন কল্যাণকোষে। সর্বত্রই তিনি ব্যর্থ হয়েছেন, ব্যথা পেয়েছেন, কিন্তু থামেন নি। তথাপি এই ব্যর্থতাই রবীন্দ্রচরিত্রের গৌরব।

উপসংহারে আমার বক্তব্য, 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' নামকরণে এই গ্রন্থে ঐ শিলাইদহ অঞ্চলে তাঁর সমস্ত কাব্য ও কর্মের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সহজ নয়। সে সময়ে কবি-জমিদার শিলাইদহ, শান্তিনিকেতন, কলিকাতা, কালীগ্রাম, সাজাদপুর—এই বিরাট অঞ্চলে একটা অভিনব বিরাট কর্মজালে আবদ্ধ হয়ে উনপঞ্চাশ পবন গতিতে পরিক্রমায় 'ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ' এই চিন্তা চরিতার্থতায় ঘুরেছেন। তার অধিকাংশই রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতবাবু বহুবর্ষ রবীন্দ্র-অনুধ্যানের ফলে প্রকাশ করতে পেরেছেন। আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ তার ক্রোড়পত্র মাত্র, তবে আমার কাহিনীগুলি প্রামাণিক কিনা, তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি—'আমার সেইসময়কার অজ্ঞাতবাসের কথা কেহই ঠিকমত জানিবে না। তখন আমি অপেক্ষাকৃত

অজ্ঞাত ছিলাম বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছিল।' প্রভাতবাবু আমাকে ঐ জন্যই কবির শিলাইদহ-জীবন সম্বন্ধে লিখতে উপদেশ দিয়েছিলেন। একাজে যে গবেষণার প্রয়োজন, আমার মত চাকরিজীবীর পক্ষে তা করা সম্ভব হয় নি। রবীন্দ্রজীবনের এই পর্ব কতখানি মূল্যবান ও শিক্ষাপ্রদ তা জীবনীকার প্রভাত-বাবু বুঝেছিলেন। অন্যতম রবীন্দ্রপরিকর স্বর্গীয় আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন ১৩৪৯ সালে আমাকে লিখেছিলেন—'আপনি তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) জমিদারীতে যে একটি স্নেহময় কল্যাণময় রূপ আছে তাহার পরিচয় দিয়া ভাল করিয়াছেন। অনেকে তাহা পারিতেন না, কেহ কেহ তাঁহাকে সেখানে নিচু করিয়া দেখিতেই পছন্দ করিতেন।' তাঁর ধারণা মিথ্যা নয়। তাই এই মূল্যবান মন্তব্যটুকু শিরোধার্য করে আমার সাধ্যে যতটুকু সম্ভব তা আমার বর্তমান গ্রন্থে (আরও একখানি পল্লী কবিতাগ্রন্থে, 'কবিতীর্থের পাঁচালী') কবিজীবনের সেই স্বর্ণযুগের কাহিনীসম্ভারের যে পরিমণ্ডল রচনার চেষ্টা করেছি এবং যা রবীন্দ্রজীবনের মূল্যবান উপাদান হিসাবে আজ স্বীকৃত হয়েছে তাকেই আমার জীবনের আনন্দ ও চরিতার্থতা বলে গণ্য করি। কাহিনীগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় লিখবার জন্য মাঝে মাঝে যে পুনরুক্তি দোষ ঘটেছে, আশা করি রসগ্রহণে তা বাধা স্বরূপ হবে না।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় তাঁর স্বদেশ শুধু মৃন্ময় নয় চিন্ময়। তিনি একাধারে ভাবুক কবি ও কর্মী। তাঁর ভাবুকতা ও কবিত্বের পরিচয় আজ বিশ্বজনবিদিত ; কিন্তু তাঁর বিপ্লবী কর্মজীবন আজ আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির বিশ বছর পরেও আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি বলে মনে হয় না।

কবিজীবনের আপাততুচ্ছ অথবা ব্যক্তিগত নিজস্ব সংবাদ কবি নিজে বা তাঁর জীবনীকার প্রকাশ করতে পারেন নি। কিন্তু সেই মূল্যহীন অপ্রত্যক্ষ বিষয় যখন কালক্রমে মহামূল্য সম্পদ বলে মানুষের চোখে ধরা পড়ে তখন তার প্রামাণিকতা খুঁজতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আজ স্বাধীনতা-প্রাপ্ত এ দেশের যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার সূচনা ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত। তাঁর সময়ে এদেশে এত কলকারখানা সৃষ্টি হয় নি। দেশটা ছিল আগাগোড়া কৃষিপ্রধান, তার পরে হিন্দু-মুসলমান সমস্যাজর্জরিত। পশ্চিমী রাজনৈতিক ধ্যানধারণা, আন্দোলন প্রভৃতি এবং আজকের দিনের এই শ্রেণীসংগ্রাম, আত্ম-কলহ, সংগ্রামী মানসিকতার আগুন তাঁর সময়ে এদেশে জ্বলে ওঠে নি। কিন্তু বাংলার জনগণের মৌল সমস্যা কোথায় তা তিনি সেই পুরাতন যুগে মর্মে মর্মে

উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেজন্য দেশের আত্মশক্তিকে জাগরিত ও অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন ভাববাদ ও বস্তুবাদ উভয়ের সমন্বয় সাধন করে। সুস্থ সবল সমাজ গঠন রাজনীতির আন্দোলনের বাইরেও সম্ভব। বর্তমানে অনুসৃত রাজনীতি তো কূটনীতির নামান্তর। এতে দেশের সমস্যাগুলি ক্রমে জটিলতর হয়ে পড়ছে পশ্চিমী কূটনীতির অনুকরণে, সমাধানের পথ দূরে সরে যাচ্ছে। খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সমস্যাদি জটিলতর পর্যায়ে এসেছে।

ঠাকুর এস্টেট-শিলাইদহ

ঠাকুর এস্টেটের ইতিহাস রচনার উপকরণের অভাব। অনুসন্ধানে যত দূর জানা যায় তার থেকে মনে হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে (আনুমানিক ১৭৮০ খ্রীঃ) এই বংশের রামলোচন ঠাকুর কিছু সম্পত্তি খরিদ করেন। তার পরে তাঁর পালিত পুত্র ইতিহাস-বিখ্যাত দ্বারকানাথ আরও যে সমস্ত জমিদারি খরিদ করেন বাংলার বিভিন্ন জেলায় তার বিবরণের পারম্পর্য পাওয়া যায় না, অথচ দ্বারকানাথের বিপুল ব্যবসাবাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত ঐসব জমিদারির সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য বহু জটিলতাপূর্ণ। তবে সে যুগের কিংবদন্তীমূলক ইতিহাস, কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'দ্বারকানাথের স্মৃতিকথা', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী', ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী' ইত্যাদি গ্রন্থ অনুসরণে যেটুকু ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায় তা-ই অনেকটা নির্ভরযোগ্য মনে করা যেতে পারে।

এই সম্পর্কে ঠাকুরবংশের বংশলতার নিম্নলিখিত বিষয়টি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : ঠাকুরবংশ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ভট্টনারায়ণ এই বংশের আদি পুরুষ। ভট্টনারায়ণ-পুত্র দীন কুশারিশাখার প্রতিষ্ঠাতা বলে গণ্য হন। এই বংশের জগন্নাথ কুশারি বিবাহসূত্রে যশোহরে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর উত্তরপুরুষ পঞ্চানন* ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন।

* পঞ্চানন কুশারী ইংরেজ 'কাপ্তেন'দের জাহাজে মালপত্র ওঠানো নামানো ও খাদ্য পানীয় সংগ্রহাদি কর্মে প্রবৃত্ত হন। এই সব শ্রমসাধ্য কাজে স্থানীয় হিন্দুসমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তাঁর সহায় ছিল। তারা পঞ্চাননকে তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী 'ঠাকুর মশায়' বলে সম্বোধন করত। কালে জাহাজের 'কাপ্তেন'দের কাছে ইনি পঞ্চানন 'ঠাকুর' নামেই পরিচিত হয়ে গেলেন। সেই থেকে 'ঠাকুর' পদবী এই বংশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে।

পঞ্চানন কুশারী (বন্দ্যোপাধ্যায়), ঠাকুর পদবীধারী

জয়রাম (মৃত্যু ১৭৫৬)

নীলমণি (মৃত্যু ১৭৯১) (জোড়াসাঁকো ঠাকুর বংশ)

দর্পনারায়ণ (১৭৩১-৯৩) (পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর বংশ)

রামলোচন (নিঃসন্তান) ১৭৫৪-১৮০৭

রামমণি ১৭৫৯-১৮৩৩

রামবল্লভ ১৭৬৭-১৮২৪

দ্বারকানাথ (দত্তকপুত্র) ১৭৯৪-১৮৪৬

দ্বারকানাথ

দেবেন্দ্রনাথ ১৮১৭-১৯০৫

নরেন্দ্রনাথ

গিরীন্দ্রনাথ ১৮২০-৫৪

ভূপেন্দ্রনাথ ১৮২৬-৩৯

নগেন্দ্রনাথ ১৮২৯-৫৮ স্ত্রী ত্রিপুরাসুন্দরী

১। দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৮৪০-১৯২৬)
২। সত্যেন্দ্রনাথ (১৮৪২-১৯২৩)
৩। হেমেন্দ্রনাথ (১৮৪৪-৮৪) উড়িষ্যার কটক জেলার পাণ্ডুয়া, বালিয়া প্রভৃতি জমিদারির মালিক (প্রথমে এজমালি)
৪। বীরেন্দ্রনাথ (১৮৪৫-১৯১৫) বিকৃতমস্তিক
৫। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৮৪৯-১৯২৫) নিঃসন্তান
৬। পুণ্যেন্দ্রনাথ (? ১৮৫১-৫৭) নিঃসন্তান
৭। সোমেন্দ্রনাথ (১৮৫৯-১৯২২) নিঃসন্তান, বিকৃতমস্তিক
৮। রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১)
৯। বুধেন্দ্রনাথ (১৮৬৩-৬৪) বাল্যে মৃত।

গণেন্দ্রনাথ ১৮৪১-৬৯ নিঃসন্তান

গুণেন্দ্রনাথ ১৮৪৭-৮১

গগনেন্দ্র ১৮৬৭-১৯৩৮

সমরেন্দ্র ১৮৭০-১৯৫১

অবনীন্দ্র ১৮৭১-১৯৫১

এই তিন ভ্রাতা পাবনা জেলার সাজাদপুর জমিদারির মালিক (প্রথমে এজমালি)

জমিদারিবিভাগের সর্বশেষ স্তরের অবস্থা—

২—সত্যেন্দ্র—বিরাহিমপুর পরগণার (শিলাইদহ) নদীয়া জেলা—মালিক

৮—রবীন্দ্র—কালীগ্রাম পরগণার (পতিসর) রাজসাহী জেলা—মালিক

১—দ্বিজেন্দ্র—ইজারাসূত্রে বিরাহিমপুর ও কালীগ্রামের এক-তৃতীয়াংশের মালিক।

ঠাকুর এস্টেটে ব্যবহৃত সীলমোহর



সূচনা

পঞ্চানন ঠাকুর থেকেই ঠাকুরবংশের উল্লেখযোগ্য ইতিহাসের সূচনা। তাঁর কীর্তিকলাপের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। পঞ্চাননের পুত্র জয়রাম ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমিনগিরি করে প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হন। এই সময়ে ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিবাদ আরম্ভ হয়। সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর কলিকাতা সহর পুনর্গঠনের জন্য ইংরেজ কোম্পানি জয়রামের পুত্র নীলমণি ও দর্পনারায়ণকে তাঁদের কলিকাতাস্থ ধনসায়র সম্পত্তি খরিদের জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ বহু টাকা দেন। নীলমণি (রবীন্দ্রনাথের বৃদ্ধ প্রপিতামহ) ও দর্পনারায়ণ কলিকাতায় পাথুরিয়া-ঘাটার জমি কিনে বাড়িঘর করে বসবাস করেন। নীলমণি কোম্পানির অধীনে উড়িষ্যার নিমকমহলের চাকরিতে বেশ ধনসম্পত্তির অধিকারী হন।

ক্রমে দুই ভাই নীলমণি ও দর্পনারায়ণের মনোমালিন্য হওয়ায় নীলমণি জোড়াসাঁকো পল্লীতে বৈষ্ণবচরণ শেঠের নিকট থেকে জমি কিনে বাড়িঘর তৈরি করে পৃথকভাবে বাস করতে থাকেন। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে নীলমণির মৃত্যু হল। রেখে গেলেন বিধবা স্ত্রী অলকা দেবীকে আর তিনপুত্র—রামলোচন, রামমণি ও রামবল্লভকে। বড়ভাই রামলোচন সর্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী ও বিচক্ষণ ছিলেন, কিন্তু নিঃসন্তান থাকায় তাঁর ভাই রামমণির মধ্যমপুত্র দ্বারকানাথকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। তখন দ্বারকনাথের বয়স পাঁচ বছর। রামলোচন স্বীয় প্রতিভাবলে তৎকালীন ইংরেজ সরকারের প্রিয়পাত্র হয়ে পড়েন ও দায়িত্বপূর্ণ জরিপাদি কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তখন ইংরেজগণ এদেশে আগন্তুক। প্রতিপত্তিশালী বুদ্ধিমান রামলোচন এই সময়ে পর পর কয়েকটি ছোটবড় জমিদারি খরিদ করেন। ঐ সমস্ত জমিদারির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—১. পাবনা (পরে নদীয়া) জেলার কুষ্টিয়ার অন্তর্গত বিরাহিমপুর পরগণা (সদর শিলাইদহ) এবং ২. উড়িষ্যার কটক জেলার অন্তগত পাণ্ডুয়া, বালিয়া প্রহরাজপুর প্রভৃতি তৌজির জমিদারি। এই সম্পত্তি আরও বৃদ্ধি করেন তাঁর দত্তকপুত্র সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ বঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। দ্বারকানাথের 'পারিবারিক খাতা' অনুসরণে রচিত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী' থেকে জানা যায়, দ্বারকানাথের ঐ দুটি সম্পত্তির আয় ছিল মাত্র ত্রিশ হাজার টাকা এবং তিনি মাত্র ষোল বৎসর বয়সে ঐ সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন। ঐ দুটি জমিদারিতে প্রচুর পতিত জমি ছিল, ঐগুলি ঠিকমত বিলিব্যবস্থা করায় ক্রমে প্রচুর আয় বৃদ্ধি হয়েছিল।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমল

উপরোক্ত দুটি জমিদারির সঙ্গে দ্বারকানাথ স্বোপার্জিত আরও সম্পত্তির অধিকারী হয়ে বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ জমিদার ও অসামান্য প্রতিপত্তিশালী মহাপুরুষ বলে গণ্য হন। ইংরেজ রাজপুরুষগণের সঙ্গে দায়িত্বপূর্ণ চাকরি ও ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদিতে প্রতিভাবান, ইংরেজি-বাংলা-সংস্কৃত-আরবি-পারসিতে অভিজ্ঞ ও কীর্তিমান দ্বারকানাথ নবভারতের জন্মদাতা রাজা রামমোহন রায়ের সহযোগিতায় জমিদারি ছাড়াও ব্যাঙ্ক পরিচালনা, রেশম, নীল ও কয়লাকুঠির মালিকানা এবং এ দেশের বিবিধ রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারে অগ্রগণ্য হয়ে পড়েন। তিনিই রাজা রামমোহনের পর ইউরোপে দুবার ভ্রমণ

করে যে কীর্তির অধিকারী হন তা সুবিদিত। তিনি যেমন প্রচুর ধনের অধিকারী হয়েছিলেন তেমনি মুক্তহস্তে প্রচুর অর্থব্যয়ও করেছিলেন বিলাস-ব্যসনে ও দেশের উন্নতিকর বিবিধ প্রতিষ্ঠান গঠনে ও পরিচালনে। তিনি সেজন্য সর্বত্র 'প্রিন্স' আখ্যায় ভূষিত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশে আরও জমিদারি খরিদ করে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ধনীরূপে সুপরিচিত হন। তাঁর অর্জিত বহু জমিদারির মধ্যে এই দুটি জমিদারির পরিচয় খানিকটা পাওয়া যায়—১. ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রাজসাহী জেলার কালীগ্রাম পরগণা (সদর পতিসর) ও ২. ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পাবনা জেলার সাজাদপুর পরগণা (সদর সাজাদপুর)। এর পরে তিনি যে জমিদারিগুলির মালিক হন তার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। যেটুকু পাওয়া যায় তা তাঁর পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী' (সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর সম্পাদিত, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৬২ খ্রীঃ, পৃঃ ৮৫-৮৬) থেকে উদ্ধৃত করা হল—

আমার পিতা ১৭৬৩ শকের পৌষ মাসে (৯ই জানুয়ারী ১৮৪২) য়ুরোপে প্রথম বার যান। তখন তাঁহার হাতে হুগলী, পাবনা, রাজশাহী, কটক, মেদিনীপুর, রঙ্গপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলার বৃহৎ বৃহৎ জমিদারী এবং নীলের কুঠী, সোরা, চিনি, চা প্রভৃতি বাণিজ্যের বিস্তৃত ব্যাপার। ইহার সঙ্গে আবার রাণীগঞ্জে কয়লার খনির কাজও চলিতেছে। তখন আমাদের সম্পদের মধ্যাহ্ন-সময়। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে এই সকল বৃহৎ কার্য্যের ভার আমাদের হাতে পড়িলে আমরা তাহা রক্ষা করিতে পারিব না। আমাদের হাতে পড়িয়া যদি বাণিজ্য-ব্যবসায়-কার্য্যের পতন হয়, তবে স্বোপার্জ্জিত যে সকল বৃহৎ বৃহৎ জমিদারী আছে তাহাও তাহার সঙ্গে বিলুপ্ত হইবে, এবং পৈতৃক বিষয় বিরাহিমপুর ও কটকের জমিদারীও থাকিবে না। তাঁহাব বাণিজ্য-ব্যাপারের ক্ষতিতে আমরা যে পূর্ব্বপুরুষদিগের বিষয় হইতেও বঞ্চিত হইব, এইটি তাঁহার মনে অতিশয় চিন্তার বিষয় ছিল। অতএব য়ুরোপে যাইবার পূর্ব্বে, ১৭৬২ শকে (১৮৪০ সালের ২০শে আগষ্ট) আমাদের পৈতৃক বিষয় বিরাহিমপুর ও কটকের জমিদারীর সঙ্গে তাঁহার স্বোপার্জ্জিত ডিহি সাহাজাদপুর ও পরগণা কালীগ্রাম একত্র করিয়া এই চারিটি সম্পত্তির উপরে একটি ট্রষ্ট্ ডীড্ লিখিয়া তিনজন ট্রষ্টী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ সমস্তের অধিকারী তাঁহারাই হইলেন; আমরা কেবল তাহার উপস্বত্বভোগী

রহিলাম। তাঁহার এই কার্য্যে আমাদের প্রতি তাঁহার স্নেহ ও সূক্ষ্ম ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, উভয়ই প্রকাশ পাইয়াছে।

তিনি প্রথম বার য়ুরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার ছয় মাস পরে, ১৭৬৫ শকের ভাদ্রমাসে (১৬ই আগষ্ট, ১৮৪৩) একটা উইল করিলেন। তাহাতে তাঁহার সমুদায় বিষয় আমাদের তিন ভাইকে সমান ভাগে বিভাগ করিয়া লিখিয়া দিয়াছিলেন; ভদ্রাসন বাড়ী আমাকে, তেতালার বৈঠকখানা বাড়ী আমার মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথকে এবং বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য ২০,০০০ বিশ হাজার টাকার সহিত ভদ্রাসন বাড়ীর পশ্চিম প্রাঙ্গণের ভূমি সমুদায়টা আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথকে দিয়া গিয়াছিলেন।

এই বিবরণটি একটি মূল্যবান তথ্য বটে কিন্তু এই ট্রাস্ট্ ডীডে মাত্র চারটি জমিদারির উল্লেখ আছে। অন্য সব জমিদারি কোথায় গেল, সে তথ্যটুকু অজ্ঞাত থাকল। আরও উল্লেখযোগ্য এই যে জমিদারির জেলার নাম থেকে জমিদারির পরিচয় মেলা সম্ভব নয়। ঐ গ্রন্থের ৩৫৬ পৃষ্ঠায় ৪০নং পরিশিষ্টে আরও যে তথ্যটুকু পাওয়া যায় তারও উল্লেখ করছি—

এই সময়ে দ্বারকানাথ কার-ঠাকুর কোম্পানী ব্যতীত, শিলাইদহে ও অন্যান্য স্থানে নীলের কুঠি, কুমারখালিতে রেশমের কুঠি, রাণীগঞ্জে কয়লার খনি, ও রামনগরে চিনির কারখানা চালাইতেছিলেন; এবং রাজশাহীতে কালীগ্রাম, পাবনায় শাহাজাদপুর, রঙ্গপুরে স্বরূপপুর, হুগলীতে মণ্ডলঘাট পরগণার তের-আনা অংশ, দ্বারবাসিনী ও জগদীশপুর, যশোহরে মহম্মদশাহী এবং কটকে শরগড়া প্রভৃতি পরগণা ক্রয় করিয়া স্বীয় পৈত্রিক জমিদারী সম্পত্তি বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

...দ্বারকানাথের মেদিনীপুর ও ত্রিপুরা জেলার জমিদারীর এবং সোরা ও চায়ের কারবারের উল্লেখ কোনও পুস্তকে বা পত্রিকায় পেলাম না; এজন্য তার বিশেষ বিবরণ দিতে পারা গেল না। 'পরগণা বিরাহিমপুর' নদীয়া জেলার কুমারখালি ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের নাম।

উক্ত গ্রন্থের সঙ্কলকের সমস্যা আমারও সমস্যা। দ্বারকানাথের ও মহর্ষি-দেবের সময় ঠাকুর এস্টেটের সমস্ত জমিদারির সামান্যতম পরিচয়ও পাওয়া যায় না। আমি ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে রবীন্দ্রসদনে সংগৃহীত দলিলপত্রাদি একমাস ধরে পরীক্ষা করে হতাশ হয়ে একখানা নিকাশি জমাখরচের দলিলে যে বিবরণ সংগ্রহ করেছি, তা এ বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করতে পারে।

এজন্য সেই জমাখরচের অবিকল নকল দিলাম—

ট্রাষ্টী বাবু ডি. ঠাকুর ১২৯১ সালের জমা, খরচ—

১.	পরগণে বিরাহিমপুর জমা—		৫২,৮৫৭৲	খরচ—	
				(পৃথক হিসাব পাইনি)	
২.	ডিঃ সাহাজাদপুর	„ —	৭৮,৩৩৮ ।৪॥	„	০
৩.	পরগণা কালীগ্রাম	„ —	৫০,৪২০ ।⁄	„	০
৪.	তালুক পাওুয়া	„ —	১৭,৮৪৫৲	„	০
৫.	তালুক বালিয়া	„ —	৫,৭০০৲	„	০
৬.	কিসামত সদকী	„ —	৪৩১৲	„	০
৭.	মৌজে বিরাটগ্রাম	„ —	২৩৫৲	„	০
			২,৩২,৯৪৯ ॥⁄		
	গতবর্ষের বাকি—		১৩২৫ ৸৶		
			২,৩৪,২৭৫ ॥		
	মোট খরচ—		২,২৯,৬৫১ ৶৯		
			৫২,৮৫৭৲		

১২৯০ সালেরও ঐরূপ জমাখরচ পাওয়া যায়। ঐ সব জমিদারির তাতে মোট বার্ষিক জমার অঙ্ক ২,২৩,৫৩১ ৶৯। ঐটি বাদে আর একটি সম্পত্তির খোঁজ পাওয়া গেল—

৮. পরগণা মুরনগরের ১২৮৬ সালের জমাখরচ—

মোট জমা—১০,৪৪৫ ।⁄৬ (আর কোন হিসাব পাইনি)।

৯. নদীয়া জেলা বাজার সেরকান্দি মৌজা—(বিরাহিমপুরের মধ্যে)—ঐ

১০. হুগলী জেলার অধীন মৌজে আয়মা হরিপুর (মণ্ডলঘাট-?)—ঐ

১১. পাবনা জেলার পত্তনি তালুক তরফ, চাপড়ি।

শেষেরটির কোন জমাখরচ পাই নি, তবে বহু জটিল মোকদ্দমার হুকুমনামা ও চিঠি পেয়েছি। আমি যখন চাকরি করি তখন এই মহাল ঠাকুরবাবুদের অধিকারে ছিল না। কি কারণে এই মহাল তাঁদের হাতছাড়া হয়ে যায় জানা যায় না। এ তালুকে আমাদের অধিকারীদের ৶ তিন আনা অংশ ছিল জানি। এটা বেশ বড় সম্পত্তি, বহু শরিকের অংশ আছে। ১৬-১৭নং অর্ডারে দেখা যায় এই মহালের এক বছরের বাকি খাজনার দাবি ১২,৬১১ ।⁄৭॥। অতএব ইহা লাভের সম্পত্তি।

১২. নদীয়া জেলার ধোবড়াকোল পীরপুর ইত্যাদি চর-সম্বলিত জমিদারি।

পুরানো ঐ সব দলিলে এর মর্টগেজ ব্যাপার দেখলাম। আসল ব্যাপার দুর্বোধ্য। আমার চাকরির আমলে জানি, ঐ মহাল মার্টিন কোম্পানির নীল-কুঠির প্রকাণ্ড জমিদারি রবীন্দ্রনাথের আমলে (১৩১৮ সালে?) খরিদ হয়ে শিলাইদহ জমিদারির ভুক্ত হয়েছিল। ১৩২৮ সালে এই জমিদারি হস্তান্তরিত হল ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর নামে। এ সম্পত্তি আদিতে দ্বারকানাথের অর্জিত ছিল কিনা বলা যায় না।

আমার অভিজ্ঞতায় ঐ ১২ দফার জমিদারির প্রকৃত অবস্থা শেষ পর্যন্ত এইরূপ—ঠাকুরবাবুদের ১, ২, ৩, ৪, ৫ দফা জমিদারি শেষ পর্যন্ত ঠিক ছিল। ৬নং দফা বিরাহিমপুরের অন্তর্গত (শিলাইদহ এস্টেট) (৭ দফা সাজাদপুরের অন্তর্গত, ৮ দফা অজ্ঞাত) ৯ দফা বিরাহিমপুরের সামিল। এর আয় শান্তিনিকেতনের প্রাপ্য। ১০ দফা একজন চুঁচুড়া নিবাসী ভদ্রলোক দেখাশুনা করতেন। এর আয় শান্তিনিকেতনের প্রাপ্য। ১১ দফা সম্ভবত বিক্রি হয়ে একটা বিরাট শরিকি সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছিল। ১২ দফা শেষ পর্যন্ত ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর জমিদারি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আমল

দেবেন্দ্রনাথ যথার্থ বৈষয়িক জ্ঞানসম্পন্ন হলেও মূলত তত্ত্বজ্ঞানী সাধু, ধর্ম-সংস্কারক মহাপুরুষ ছিলেন। পিতা দ্বারকানাথের আমলে বিষয়সম্পত্তিতে অমনোযোগের জন্য তিনি পিতার কাছে তিরস্কৃত হয়েছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের সময়েই তাঁর বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি নিজেই এটা লিখেছেন। তবু তিনি বহু সম্পত্তি পিতৃঋণ শোধের জন্য হারিয়েও একটা বিরাট ঐতিহ্যময় একান্নবর্তী পরিবারের স্বাধীনভাবে জীবিকানির্বাহের জন্য উপযুক্ত আর্থিক ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ মমতা ছিল, কারণ নিঃসন্তান নগেন্দ্রনাথ ঋণে জড়িত ছিলেন এবং মহর্ষির জীবিতকালেই মারা যান। সেজন্য তাঁর স্ত্রীর আজীবন ভরণপোষণের জন্য মাসিক একহাজার টাকা হিসাবে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি যে শেষ উইল করেন (দি লাস্ট উইল অ্যাণ্ড কডিসিল, ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর—এম. এম. চ্যাটার্জি সলিসিটর) তার মধ্যে ভবিষ্যৎ বংশীয়দের আজীবন সমৃদ্ধভাবে জীবনযাপন করবার ব্যবস্থা এবং সেজন্য নিজ সম্পত্তির অধিকারীদিগকে

দায়িত্ব অর্পণ করে যান। কৌতূহলী পাঠকের অবগতির জন্য উইলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম—

(ক) জীবনাবধি লিগেসি—

১.	শ্রীমতী ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী (স্বামী ৺নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর	মাসিক	১০০০৲
২.	শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নিঃসন্তান	"	১২৫০৲
৩.	" দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর	"	৫০০৲
৪.	" সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিকৃতমনা (উহার স্বতন্ত্র ক্যাসে জমা দেওয়া হয়)	"	২০০৲
৫.	শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী জঃ* বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	"	১০০৲
৬.	শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (জীবিতকাল পর্যন্ত)	"	১০০৲
৭.	শ্রীমতী সাহানা দেবী (জঃ ৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	"	১০০৲
			৩২৫০৲

(খ) মাসিক এ্যালাউয়্যান্স (জীবিতকাল)—

কন্যাগণ—শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী ··· ২৫৲		
" শরৎকুমারী দেবী···২০০৲		
" স্বর্ণকুমারী দেবী ··· ৮৭৷৷০		
" বর্ণকুমারী দেবী ··· ৮৭৷৷০		
" সুকুমারী দেবী ··· (১৪ বৎসর বয়সে মৃত)		৪০০৲
		৩৬৫০৲
	বাৎসরিক—	৪৩,৮০০৲

(গ) চিরদিনের জন্য দেওয়া লিগেসির বিবরণ—

কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ—মাসিক—২০০৲	}--বাৎসরিক ৫০০ × ১২	
শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়— " ৩০০৲		=৬০০০৲
সেবায়েৎ—দেবসেবা—	"	২০০০৲
সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের মাসোহারা ৫০৲ হিসাবে	"	৬০০৲
		৮,৬০০৲
	সর্ব একুনে—	৫২,৪০০৲

এই টাকার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ দায়ী। ইহা বাদে দ্বিজেন্দ্রনাথের ইজারা পাট্টার (২২শে মে, ১৯১২ সাল) ইজারা খাজনা ২২,৫০০৲ হিসাবে ৪৫,০০০৲ টাকার জন্য সত্যেন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁদের ওয়ারিশগণ দায়ী

* জঃ = জওজে—অর্থাৎ—স্বামী

বিরাহিমপুর

১২৭১ সাল ফিতে জমা বাদ ডৌল ও বাকি বকেয়া ৭২,৫০৮.
১২৭৭ সাল ফিতে জমা বাদ ডৌল ও বাকি বকেয়া ৭৫,১৪৭

১২৭১ সাল উশুল হাল বকেয়া ও বকেয়া সমেত ৭৭,৭৫৯
১২৭৭ সাল উশুল হাল বকেয়া ও বকেয়া সমেত ৭১২৮৯

১২৭১ সালে ইংরাজ খুরচা ৪১,৪৪৮। সদর খাজানা ১১৬০২। [illegible] খরচা ১১৯৫৮ = ৮০৪০৫.
১২৭৭ সালে ইংরাজ খুরচা ৪৩,৬২৭। সদর খাজানা ১১,৬০২। [illegible] খরচা ১৫৮৮৪ = ৭১৮৫১.

কালীগ্রাম

১২৭৯ সালের ৬ই [illegible] কালীগ্রামের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জমী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জমী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible]
[illegible] জমী [illegible]

জমি ৫০০/ বিঘা জমা ৪২২॥
এই জমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

১১ [illegible]
১৮৭৪ [illegible]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের হিসাব রাখার নমুনা

শিলাইদহ (বিরাহিমপুর পরগণা)

এই জমিদারির আদি ইতিহাস পাওয়া গেল না। তবু সে ইতিহাসের আভাস পাওয়া যেতে পারে আমার সংগৃহীত শিলাইদহ জমিদারির মহর্ষি দেবের আমলের বাকি খাজনার আরজির জবানিতে। আরজির অবিকল নকল নিচে দিলাম—

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর তৌজীর ৩৪৩০ নং মহাল পরগণা বিরাহিমপুর বাদীর স্বর্গীয় পিতা ৺বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের জমিদারী। বাদীর পিতার পরলোকান্তে ঐ সম্পত্তি ও ত্যক্ত এষ্টেটের অন্যান্য সম্পত্তি বাদীর পিতার ১৮৪০ সালের ২০শে আগষ্ট তারিখের ডিড্ অব সেটেলমেণ্ট নামক দলিলের সর্ত্তানুসারে ও উক্ত এষ্টেটের স্বার্থভোগী বাদী ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের নিয়োগমতে ট্রাস্টী পরম্পরায় ও পরিশেষে কথিতরূপ ট্রাষ্টসূত্রে বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায় বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ও বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ট্রাষ্টীত্রয়ের তত্ত্বাবধানে থাকনাবস্থায় গত ১৮৯৭ সালে বাদী ও শেষোক্ত ট্রাষ্টীও অন্যান্যের মধ্যে কলিকাতার মহামান্য হাইকোর্টের অরিজিন্যাল বিভাগে ৫৮৫ নম্বরে পার্টিসান্ সুট উপস্থিত হইয়া ঐ মোকর্দ্দমায় পক্ষগণের সোলেনামা সূত্রে যে ডিক্রী হয় তদনুসারে ট্রাষ্টীগণের ট্রাস্টস্বত্ব ১৩০৫ সালের সুরু হইতে লোপ পাইয়া অন্যান্য জমিদারীসহ উল্লিখিত পরগণে বিরাহিমপুর ষোল আনা রকম ওতৎসংক্রান্ত সর্বপ্রকার পাওনা বাদী নিজাংশে প্রাপ্ত হইয়া জমিদারীরস্বত্বে কালেক্টরীতে নামজারী পূর্বক সদর মফঃস্বল কর আদায়ে স্বত্ববান্ ও দখলীকার আছেন ও কথিত সোলেনামামত শেষ ট্রাষ্টীত্রয়ের দখলীসময়ের বাকী বকেয়া খাজনা আদায় করিয়া লইবার স্বত্বাধিকারী হইয়াছেন···

ঐ আরজিতেই বোঝা যায় যে বহুপ্রকার আইনঘটিত ক্রিয়ায় এই জমিদারি দ্বারকানাথের বিরাট ঋণশোধের ব্যাপারে তখন ঐরূপ দাঁড়িয়েছিল।

শিলাইদহ্ সম্বন্ধে আরও গল্প পাওয়া যায় এবং তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। সে সময় বাংলার সর্বত্র নীলকর সাহেবদের রাজত্ব থাকায় স্থানীয় জমিদারগণ এবং দ্বারকানাথও এদেশীয় লোকের পরিবর্তে সাহেব ম্যানেজার রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর শিলাইদহের ম্যানেজার ছিলেন রাইস সাহেব (টি. এফ. রাইস)। এই রাইস সাহেবের আমলে শিলাইদহের প্রজারা, বিশেষত মুসলমান প্রজারা জমিদারের খজিনা দিতে চাইত না। এর কারণ সম্বন্ধে দ্বারকানাথের

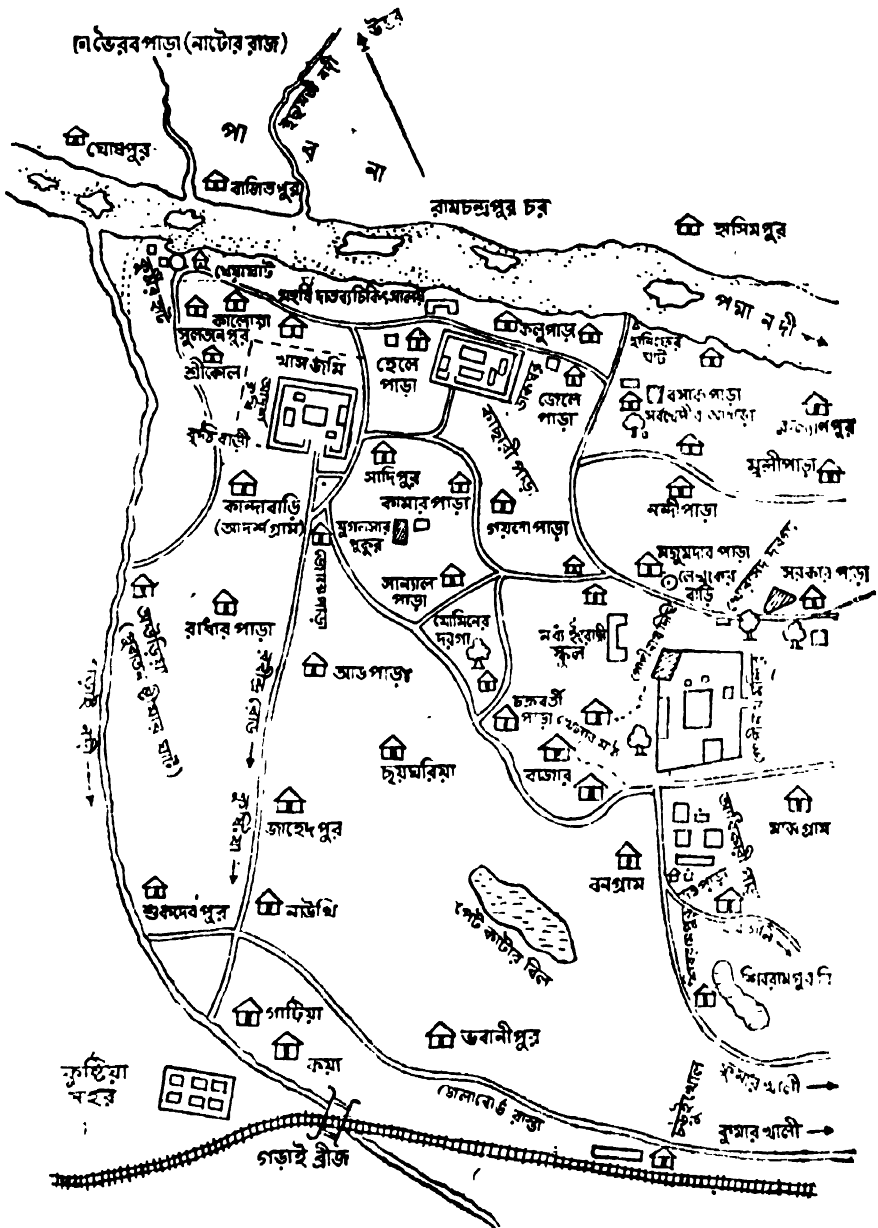
চিঠির উত্তরে সাহেব ম্যানেজার গোলমাল করেন। প্রজারা সুযোগ বুঝে সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জমিদারের নামে মিথ্যা অভিযোগ এনে দরখাস্ত করে। দ্বারকানাথ স্বয়ং জমিদারিতে এসে ব্যাপার বুঝলেন যে সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট নিতান্ত খেয়ালের বশবর্তী হয়ে প্রজাদের পক্ষে বিচার করতে চান। দ্বারকানাথ নিজের পরিচয় দিলে সাহেব ম্যানেজার বুঝলেন, ইনি যেমন তেমন দেশীয় জমিদার নন, ইনি সাহেবের চাকরি খেয়ে দিতে পারেন। তখন ব্যাপারটার মীমাংসা হয় ও সাহেব ক্ষমা চান।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জমিদারি দেখাশুনার জন্য তিনচার বার শিলাইদহে গিয়েছিলেন। তখন গোয়ালন্দ থেকে পাবনা পর্যন্ত বিশাল পদ্মানদীর তীরে হাজার হাজার বিঘা চর ছিল। চরের শিকস্তিপয়স্তি রূপান্তরে বেশ ভাল ফসল হত। স্থানীয় জমিদারেরা জোরজবরদস্তি করে ঐ সব জমি নিয়ে মারামারি খুনোখুনি করতেন, অথচ ঠাকুরবাবুদেরই চরের জমির অধিকার বেশি। তিনি অন্যান্য ছোট জমিদারদের ডেকে বিস্তৃত চরের আইনগত অধিকার সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে দেন। তার ফলে ঐ জমিদারগণ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে তাঁকে খুব ভক্তি প্রদর্শন করেছিল। মহর্ষিদেব বোটে যাতায়াত করতেন ও বোটেই থাকতেন প্রায়ই ধ্যানধারণায় মগ্ন হয়ে। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে ভদ্র প্রজারা তাঁর সাধু সুমিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ হতেন। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে দেবেন্দ্রনাথ কুমারখালি, কুষ্টিয়া ও পাবনায় তিনটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। শেষবয়সে তিনি জমিদারিতে যেতেন না। প্রথমে বড় ছেলে দ্বিজেন্দ্রনাথ, তার পরে দ্বিপেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি জমিদারি দেখতেন। শেষ পর্যন্ত সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় (দৌহিত্র) শিলাইদহ জমিদারি দেখাশোনার ভার গ্রহণ করে শিলাইদহেই থাকতেন। যে বছরে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয় সেই বিবাহের পূর্বদিনে তিনি শিলাইদহেই মারা যান। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ কিশোর রবীন্দ্রনাথকে কয়েকবার শিলাইদহে বেড়াতে নিয়ে যান। সেই কাহিনীর কিছু কিছু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে লিখেছেন। শিলাইদহের বিশ্বনাথ শিকারী, চামরু বুনা, আবদুল মাঝির গল্প শুনিয়েছেন তিনি।

শিলাইদহ খুব একটা বড় জমিদারি বা রাজত্ব নয়। কিন্তু এই জমিদারির খ্যাতি বহু রাজরাজড়াদেরও শ্লাঘনীয়। শিলাইদহের আশেপাশে নাটোর ছোট-তরফ, কাশিমবাজার, নড়াইল, নলডাঙ্গা প্রভৃতি রাজাদের রাজ্য। তবু

লোকে বলত—'নড়ালের লাঠি আর ঠাকুরবাবুর মাটি'। নিকটবর্তী পাবনাতে শীতলাই প্রভৃতি অনেক ছোটবড় জমিদারি ছিল, কুমারখালির তিলিবাবুদেরও কিছু কিছু জমিদারি ছিল। কিন্তু ঠাকুরবাবুদের খ্যাতিতে তাঁরা নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করতেন।

বিরাহিমপুর পরগণার জমিদারির মাটির মালিক ঠাকুরবাবুরা, কিন্তু জলকরের (পদ্মানদীর) মালিক ইজারাসূত্রে আমলাসদরপুরের জমিদার শ্রীমতী গোপীসুন্দরী দাসী। এ ব্যাপারে যে সব মামলা-মোকদ্দমা হয় রবীন্দ্রনাথ তার মীমাংসা করে দেন। বিশাল কয়েক মাইলব্যাপী চরমহাল শিলাইদহ জমিদারির বড় সম্পদ। যখন পাটের বাজার আগুন তখন শুধু চরমহালের আয় হয়েছিল আশি হাজার টাকা। এই চরমহালের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রবীন্দ্রনাথ যে সব বিধিব্যবস্থা করেছিলেন, তা তাঁর অদ্ভুত বিচক্ষণতার পরিচায়ক। তবু ঐ মহালে মাঝে মাঝে প্রজাবিদ্রোহ মাথাচাড়া দিত। কিন্তু যতদিন রবীন্দ্রনাথ জমিদার ছিলেন, ততদিন ঐ দুর্ধর্ষ বিদ্রোহী প্রজারা তাঁর অত্যন্ত অনুগত ছিল। রবীন্দ্রচরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। বিভিন্ন চরিত্রের প্রজাশাসনের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল মনস্তত্ত্ববিদ কবির। জমিদার ও জনসাধারণের চরিত্রচিত্রণে তাঁর অপরূপ দক্ষতার প্রমাণ আছে 'গল্পগুচ্ছের' অনেক কাহিনীতে।


ভৈরবপাড়া (নাটোর রাজ)
উত্তর
ঘোষপুর
পা
র
না
রামচন্দ্রপুর চর
হাসিমপুর
খোয়াঘাট
মহর্ষি দাতব্যচিকিৎসালয়
পদ্মা নদী
কালোয়া
সুলতানপুর
কলুপাড়া
খাসজমি
হেলে পাড়া
শ্রীকোল
জেলে পাড়া
কাছারী বাড়ী
সাদিপুর
কামারপাড়া
মল্লীপাড়া
কান্দাবাড়ি (আদর্শগ্রাম)
গয়লাপাড়া
মজুমদার পাড়া
সরকার পাড়া
সান্যাল পাড়া
মোমিনের দরগা
রাধার পাড়া
আড়পাড়া
মধ্য ইংরাজী স্কুল
চক্রবর্তী পাড়া
ছয়ঘরিয়া
বাজার
জাহেদপুর
বনগ্রাম
নাউথি
ভবানীপুর
গাটিয়া
কয়া
কুষ্টিয়া সহর
জেলাবোর্ড রাস্তা
কুমারখালী →
গড়াই ব্রীজ

শিলাইদহের নকশা

ফটিক মজুমদারের দরবার

সেরকাঁদির বাজার নিয়ে মোকদ্দমা চলছে ঠাকুরবাবুদের সঙ্গে কুমারখালির ফটিক মজুমদারের। ভয়ঙ্কর জিদের মামলা। দুই পক্ষেই টাকার শ্রাদ্ধ হচ্ছে। সেরকাঁদির বাজারের দখল কায়েম রাখবার জন্য ফটিক মজুমদার জোর তদ্‌বির চালাচ্ছেন। নিম্ন আদালতে তিনিই ডিক্রি পেয়েছে। ঠাকুরবাবুরা হাইকোর্টে আপিল চালাচ্ছেন। তাঁদের পক্ষে আছেন তখনকার উকিল রাসবিহারী ঘোষ ও দ্বারিকানাথ মিত্র। সেকালের বিখ্যাত সেরকাঁদির বাজারের পত্তনি-খাজনা পত্তনিদার প্রজা ফটিকচন্দ্র মজুমদারের কাছ থেকে আদায় করা নিয়ে এই মামলার সৃষ্টি।



ফটিক মজুমদার

ফটিক মজুমদার কুমারখালির বিখ্যাত ধনী— তিলি বংশের সন্তান এবং ঠাকুরবাবুদের প্রজা। তাঁর নাতি পান্নালাল মজুমদার আজকাল কুমারখালি অঞ্চলের একজন নামকরা জমিদার। ঠাকুরবাবুদের জমিদারির অন্তর্গত সেরকাঁদির বাজার সেকালের অতি বিখ্যাত গঞ্জ ও বাজার। ঐ অঞ্চলের তাঁতের

উৎকৃষ্ট ধুতি, শাড়ি, ছিট, গামছা, মশারির থান আর নানা রকমের রঙিন সুতো বিক্রির জন্য সেকালে সেরকাঁদির বাজার নদীয়া জেলার শ্রেষ্ঠ গঞ্জ বলে প্রসিদ্ধ ছিল। কালক্রমে সেই সেরকাঁদির হাটই বর্তমান কুমারখালির সুতাহাট নামে সুবিখ্যাত হয়ে পড়েছে। নানা কারণে ঐ হাট ভেঙে যাবার পর সেরকাঁদি মৌজাটি ঠাকুরবাবুদের ব্যবস্থায় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের একটি ট্রাস্ট-সম্পত্তিরূপে পরিণত হয় এবং ঐ মৌজাটির সমস্ত আয় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আয় বলে গণ্য করা হয়।

কলিকাতায় হাইকোর্টে মোকদ্দমার শুনানি চলছে। উকিলদের সওয়াল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে; উভয়পক্ষে খুব তদবির, ছুটোছুটি এবং আইনের তর্ক চলছে। এমন সময় স্বয়ং ফটিক মজুমদার হাজির হলেন কলকাতায় ঠাকুর-বাবুদের জোড়াসাঁকো ভবনে দরবার করতে। জোড়াসাঁকো বাড়ির সদর অফিসের কর্মচারীরা তো অবাক। জমিদারের বিপক্ষে এতদিন ধরে লড়তে লড়তে আজ কী মনে করে স্বয়ং ফটিক মজুমদার জমিদারবাবুদের কাছে হাজির, নিশ্চয়ই অবস্থা খুব গুরুতর।

সত্যিই তাই। অবস্থা গুরুতরই বটে। হাইকোর্টের আপিলের শুনানি প্রায় শেষ হতে চলেছে। এই আপিলে ঠাকুরবাবুরাই যে জিতবেন তার অনেক কিছু ভাবে বোঝা যাচ্ছে; আর এক সপ্তাহের মধ্যে রায় বেরোবে মনে হচ্ছে।

তখন রবীন্দ্রনাথ খাঁটি জমিদার। সেরকাঁদির মোকদ্দমার সমস্ত বিষয় তিনি খুব ভাল করে জানেন, কাগজ-পত্রও তন্ন তন্ন করে ঘেঁটেছেন, মোকদ্দমার সব খোঁজখবর রাখছেন। সে সময় মাঝে মাঝে জ্যোতিবাবুও (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) জমিদারি দেখতে যেতেন, কিন্তু তিনি খুব কড়া রাসভারি মনিব বলে প্রজারা তাঁকে বেশ ভয় করত এবং তাঁর কাছে কোন দরবার করতে এগোত না, তারা দরবার চাইত রবীন্দ্রনাথের কাছেই।

ফটিক মজুমদার কদিন ঘুরে ঘুরে রবীন্দ্রনাথকে আর ধরতে পারেন না, তবু তিনি হাল ছাড়ছেন না, এমন সময় তাঁকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সামনে হাজির হতে হল। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছেই তিনি দরবার জানালেন। শুনেই জ্যোতিবাবু বললেন, 'গোরু মেরে জুতো দান, তা হয় নাকি হে? আমার কাছে ওসব কিছু হবে না। রবির কাছে যাও ওসব অদ্ভুত দরবার নিয়ে। আমি ওসব বুঝি না।' ফটিক মজুমদার তাই তো চান;

আরও একদিন ঘোরার পর একদিন দুপুরে তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দেখা পেলেন বেশ সুবিধাজনক ভাবে।

হাইকোর্টের আপিলে ঠাকুরবাবুদের জয়লাভ হবে বুঝতে পেরেই ফটিক মজুমদার তাঁর কাছে দরবারে এসেছেন, একথা রবীন্দ্রনাথের বুঝতে দেরি হল না। তবু তিনি ফটিক মজুমদারের সমস্ত বক্তব্য খুব ধীরভাবে শুনলেন, কয়েকটি প্রশ্ন করে ফটিক মজুমদারের মনের অভিপ্রায়টুকু বেশ করে বুঝে নিলেন, কিন্তু খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তুমি আমাদের এস্টেটের বিদ্রোহী প্রজা বলে জ্যোতিদাদা যদি তোমাকে কোনরূপ অনুগ্রহ করতে না চান, তবে আমিও তো কোন অনুগ্রহ করতে পারি না।'

কথা শুনে ফটিক মজুমদারের পিলে চমকে গেল; কিন্তু তিনি জানেন, রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত বৈষয়িক জমিদার হলেও অবিবেচক নন এবং তিনি সত্যিকার প্রজাহিতৈষী। তার অনেক প্রমাণ তিনি এই মামলার ব্যাপারেই পেয়েছেন। তাঁর মোটামুটি প্রার্থনা এই যে, এই মামলায় তিনি হাইকোর্টে হেরে যাবেন তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু তিনি এই মামলায় খরচের দায় থেকে অব্যাহতি চান। তবে পত্তনি খাজনা তিনি দেবেন। কারণ আইন তাঁকে পত্তনি খাজনার জন্য দায়ী করবেই।

এই রকমের প্রার্থনা কেউ কখনও মঞ্জুর করে? বিশেষ করে তিনি এই মামলায় মনিবের সঙ্গে কী লড়াই না লড়েছেন! রবীন্দ্রনাথ হাসলেন, বললেন, 'তোমরা বলে থাক যে, আমরা প্রজাদের মাফ-মকুব দিই না, আমাদের বদনাম তোমরা দাও; কিন্তু তোমার মত লোক এতদিন মামলা করে লড়ে খরচার টাকা মাফ চাইছ! আমাদের কত খরচা হয়েছে, তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পার।'

এইবার সুচতুর পাকা বৈষয়িক ফটিক মজুমদার দরবার করবার সুযোগ খুঁজে পেলেন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নের সদুত্তর দিলে যে তাঁর কাজ হাসিল হতে পারে তা বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন, 'হুজুর, আইন যে আমার একেবারেই বিপক্ষে নয়, তা তো অনেকটা বুঝতে পেরেছেন— আমি যে নিম্ন আদালতে ডিক্রি পেয়েছি। আইনের নিজের সর্ত বুঝে নেওয়ার মত বুকের পাটা সকলের নেই। আমি হুজুরের পুরুষানুক্রমিক একজন সম্ভ্রান্ত বড় জোতদার। হুজুরের সেরেস্তার বহু টাকার মালগুজারি করি। দেশের মধ্যে ফটিক মজুমদারকে চেনে না এমন লোক নেই এবং সে সম্মান পাচ্ছি আমি হুজুরের

প্রজা বলেই। ভুলই বুঝি আর যা-ই বুঝি, নিজের ন্যায্য অধিকার পাবার জন্যই আমি হুজুরের মত মনিবের সঙ্গে লড়েছি। সেরকাঁদির বাজার বসাতে, তার উন্নতি করতে এবং হুজুরের সম্মান বজায় রাখতে ফটিক মজুমদার যা করেছে তা আমলাবাবুরা বোঝেন নি, কিন্তু হুজুর নিশ্চয়ই বুঝেছেন।'

রবীন্দ্রনাথ নিরুত্তর রইলেন। তিনি মানুষের কাজের চেয়ে উদ্দেশ্য বেশি বুঝতেন। ফটিক মজুমদার রবীন্দ্রনাথের মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারলেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কথার সারাংশ গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর বক্তৃতার ফল ফলতে সুরু করেছে। তিনি বললেন, 'হুজুর, ফটিক মজুমদার এ মামলায় হেরেছে এ সংবাদ তো পরগণায় রাষ্ট্র হয়ে যাবে। কিন্তু আমি হুজুরের অনুগ্রহ না পেয়ে উপরন্তু মামলায় হেরে দেশে ফিরলে, দেশে আর মুখ দেখাতে পারব না। আপনার এই তুচ্ছ প্রজা ফটিক মজুমদারকে দেশের সবাই চেনে। হুজুরের সঙ্গে মোকদ্দমায় হেরেছি, কিন্তু হুজুরের অনুগ্রহ পেয়েছি— এই সম্মানটাই আমার কামনার জিনিস। আমি দেশে গিয়ে গর্ব করে বলব যে, আমি এই মামলায় বাবুমশায়ের বিরাগভাজন না হয়ে তাঁর কাছে অনুগ্রহই পেয়ে এসেছি।'

রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই মোকদ্দমায় তোমার গোড়া থেকে কত খরচ হয়েছে?'

'প্রায় আড়াই হাজার টাকা খরচ হয়েছে; হুজুর, এতগুলো টাকা গোরাইয়ের জলে ফেলেছি।' বলে ফটিক মজুমদার চাদরটা গলায় জড়িয়ে হাতজোড় করলেন।

'অনুগ্রহ নেওয়া কি মানুষের কাজ— বিশেষ তোমার মতন লোকের? আমাদেরও বহু টাকা খরচ করতে হয়েছে।' বলে রবীন্দ্রনাথ মাটির দিকে তাকালেন।

'হুজুরের তো টাকার অভাব নেই। খরচার যে টাকা হুজুর ডিক্রি পাবেন, তা হুজুরের না পেলে কিছু আসবে যাবে না; কিন্তু মামলাতে হেরেও আমি দেশে গিয়ে লোককে বলব, আমি জিতেছি— বাবুমশায়ের অনুগ্রহ পেয়েছি। এ মামলায় হারাটা আমার পক্ষে আদৌ অগৌরবের নয়।' এই বলে ফটিক হাঁটু গেড়ে বসলেন।

'আচ্ছা, আমি তোমার কথা বিবেচনা করছি।' বলে রবীন্দ্রনাথ সেখান থেকে চলে গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই ফিরে এসে বললেন, 'এই অনুগ্রহে যদি তুমি সম্মানিত হও তবে তাই হবে, এই খরচার টাকা মাফ দিলুম। কিন্তু

অমন সুন্দর বাজারটার জন্য আমি অত্যন্ত চিন্তিত হয়েছি। এত মামলা-মোকদ্দমার ধাক্কায় বাজারটা ভাঙতে বসেছে। কিন্তু ঐ বাজারটা তোমাদের গৌরব, আমার জমিদারিরও একটা গৌরবের জিনিস।' এই বলে তিনি ফটিক মজুমদারের উত্তরের অপেক্ষায় তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

ফটিক মজুমদার বললেন, 'অমন সুন্দর বাজারটার জন্য হুজুরের যখন এত মায়া, তখন আমি ফটিক মজুমদার আজ হুজুরের সামনে বাক্যিদত্ত হয়ে যাচ্ছি, যতকাল ফটিক মজুমদার উত্তরশিওরি না হবে ততদিন ঐ বাজারের একচুল ক্ষতি হবে না। আমি সেজন্য হুজুরের কাছে দায়ী রইলাম।'

পরিহাসপ্রিয় রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'দেখ ফটিক, প্রজারা আমার দুর্নাম গেয়ে বেড়ায় যে, আমি তাদের খাজনাদি মাফ-মকুব দিই না। অবস্থাপন্ন প্রজারাই ভুল বুঝে আমাকে এই ভাবে দোষ দেয়। আজ তোমাকে আমি এই খরচার টাকা মাফ দিলুম, কারণ আমি বুঝি, ঐ হাটটার জন্যে তোমার কতখানি দরদ। আজ তোমার কথায় আমি খুব আশ্বস্ত হলুম, খুব খুশি হলুম যে, অমন সুন্দর হাটটা তুমি রক্ষা করবে।'

ফটিক মজুমদার তাঁর এই প্রার্থনা জানিয়ে একখানা দরখাস্ত লিখে এনেছিলেন। সেখানা রবীন্দ্রনাথ পড়ে দেখে তাতে বেশ পরিষ্কার করে হুকুম লিখে দিলেন। জমিদারির একটা উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্যে তিনি কতখানি আগ্রহশীল তা ঐ হুকুমের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশিত ছিল।

'আমি শিলাইদহে গেলে একবার আমার সঙ্গে দেখা করো।' এই বলে রবীন্দ্রনাথ চেয়ার ছেড়ে উঠতেই ফটিক মজুমদার তাঁর সামনে বসে হাতজোড় করে বললেন, 'জমিদারিতে এবারে গেলে একবার আমাদের কুমারখালিতে হুজুরের পায়ের ধুলো দিতে হবে এই হুকুমটা চাই হুজুর।'

'আচ্ছা, যাব একবার।' বলে রবীন্দ্রনাথ সেখান থেকে উঠে গেলেন।

ফটিক মজুমদার ঠাকুরবাবুদের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল মোকদ্দমার পর অনুগ্রহের কণামাত্র পাবেন তা আশা করেন নি। তিনি খুব অবাক হয়ে চলে এলেন।

তার পরের দিন ভোরে দেখা গেল, একটা ঘোড়ার গাড়ির ভিতরে ও ছাদের উপরে বোঝাই রুইমাছ, নানান রকম ফলফুলারি ও মিঠাই-মিষ্টান্ন নিয়ে ফটিক মজুমদার জোড়াসাঁকো ভবনের রান্নাবাড়ির দিকে যাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ তাকে ঐসব নিয়ে যেতে দেখেই বললেন, 'এসব কেন ফটিক? এসব আবার কেন এনেছ?'

'অতি সামান্যই হুজুর, কিন্তু এসব ফটিক মজুমদারের সম্মান।' বলে তিনি সব জিনিস নামিয়ে থরে থরে সাজিয়ে রাখলেন।

জিনিসপত্রের সমাবেশ দেখে জোড়াসাঁকো ভবনের আমলাবাবুরা বলাবলি করতে লাগলেন,'টাকার কুমির ফটিক মজুমদার যে টাকা আজ মাপ পেয়েছে তার ডবল মনিবের সম্মান দেখিয়েছে।'

জমিদারবাহাদুর

মাঘ মাসের কনকনে শীত। অতি প্রত্যুষ। সূর্য এখনও ওঠে নি। পদ্মার তীরে শিলাইদহ গ্রামের ধারে দুখানা সুন্দর বড় বজরা নোঙর করা রয়েছে, পাশে দুখানা ডিঙি নৌকা বাঁধা। এখনও কুয়াশা ভাল করে কাটে নি। নদীর শান্ত বুকখানা শিউরে উঠছে। এখনও সাদা পাল তুলে নৌকাগুলো পদ্মার বুকে ছড়িয়ে পড়ে নি। গাঁয়ের মেয়েরা কেউ এখনও নদীর ঘাটে আসে নি। চরের গাংশালিকেরা এখনও কিচিরমিচির শুরু করে নি।

বড় বজরাখানা থেকে একজন দীর্ঘকায় পুরুষ বেরিয়ে এলেন। তাঁর গায়ে হলুদ রংয়ের প্রকাণ্ড জোব্বা পা পর্যন্ত পড়েছে। মস্ত বড়লোক জমিদার। সৌম্যমূর্তি, মাথায় রেশমের মত গোছা গোছা চুল, মুখে দাড়ি, পায়ে জুতো। সেই কুয়াশার মধ্যেও একটা আলোর মত তাঁকে দেখা যাচ্ছে। তাঁর মুখখানা প্রসন্ন দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ। গুন্ গুন্ করে গাইতে গাইতে সৌম্য দীর্ঘকায় পুরুষটি চলেছেন একা বজরা ছাড়িয়ে তীরের উপর দিয়ে সবুজ মাঠের দিকে, যে সবুজের গায়ে শিশির কেবল ঝল্মল্ করছে, শির্-শির করে বাতাস বইছে।

জোব্বা-পরা দীর্ঘকায় পুরুষটি নদীর ধার দিয়ে ধানের মাঠের দিকে চলতে লাগলেন। তাঁর পেছনে পেছনে একজন বেঁটে জোয়ান লোক শীতের পোশাকে সর্বাঙ্গ ঢেকে পট্টিসট্টি পরে কান-মাথা বেশ করে কমফার্টারে জড়িয়ে নীরবে তাঁর অনুসরণ করতে লাগল। তার হাতে লাঠি। এমন জোয়ানমর্দ মানুষটি শীতে আড়ষ্ট হয়ে চলেছে।

হঠাৎ পেছন দিকে তাকিয়ে তাকে দেখতে পেয়েই সেই দীর্ঘকায় পুরুষটি বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'কেন তুই আমার সঙ্গে আসছিস্, আমি একাই

বেড়াব। আবার পেছনে তুই আসছিস্ কেন? যা, তোর জায়গায় যা, আমার সঙ্গে আসিস্ না।'

পাইকটি 'হুজুর' বলে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল। তিনি বিরক্ত হয়ে আবার বলতে লাগলেন, 'কেন তুই আমার সঙ্গে আসছিস্? আমি বেড়াব, লোকের সঙ্গে আলাপ করব, তুই কেন সঙ্গে সঙ্গে থাকবি? আমায় সারাদিন জমিদার সাজিয়ে রেখে দিবি তোরা? যা তোরা, তোদের যা কাজ আছে করগে যা, আমার সঙ্গে আসবি নে। আমি একাই বেড়াব।'

এই বলে তিনি হন্ হন্ করে জোরে পা চালিয়ে দিলেন মাঠের সবুজ আল ধরে শিশিরভেজা ঘাসের উপর দিয়ে। পাইকটি কিন্তু গেল না। সে আর কোন কথাটি না বলে দূরে দূরে তার প্রভুর অলক্ষ্যে তাঁর অনুসরণ করতে লাগল। সে জানে এই তার দস্তুর।

জমিদারবাবু যখনতখন একা একাই বেড়ান, সকলের সঙ্গে গল্পগুজব করেন। এ তো দস্তুর নয়। সামান্য একজন আমলা পর্যন্ত একজন পাইক সঙ্গে না নিয়ে রাস্তায় বেরোন না, জমিদারের ম্যানেজার আগে-পিছে বন্দুকধারী সেপাইবরকন্দাজ না নিয়ে একলা এগোন না; আর কিনা স্বয়ং জমিদার বাহাদুর একা একা মাঠে মাঠে বেড়াবেন? অসম্ভব। পাইক বরকন্দাজ লোকলস্কর আমলাফয়লায় ঘেরা থেকে জমিদারবাবু যেন হাঁপিয়ে ওঠেন।

ঐ জমিদার বাহাদুরটি কে? উনিই রবীন্দ্রনাথ। আর ঐ বরকন্দাজটি শিলাইদহ ঠাকুর এস্টেটের সুবিখ্যাত লেঠেল মেছের সর্দার। আর এই গল্পটি বলেছেন স্বয়ং শিল্পাচার্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু। তিনি ছিলেন এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী।

বাবুমশায়ের নজরানা

রবীন্দ্রনাথ পালকিতে চলেছেন ধূ-ধূ মাঠের মধ্যে দিয়ে। ষোল বেহারার প্রকাণ্ড বাদামি রংয়ের পালকি বেহারাদের কাঁধে তীরবেগে ছুটেছে কুষ্টিয়ার দিকে। গোরাই নদীর মুখ বন্ধ হয়ে গেছে; তাই বজরা ছেড়ে তাঁকে পালকিতে চেপে কুষ্টিয়ায় যেতে হচ্ছে কালোয়ার পথে। কারণ তখন কুষ্টিয়া থেকে শিলাইদহের

রাস্তা তৈরি হয় নি। বরকন্দাজ তারণ সিং, মোহন সিং, কেতু ঢালি, মেছের সর্দার ছুটেছে পালকির আগুপিছু।

ফাল্গুন-চৈত্র মাস। সারা মাঠ চষা-ঢিলে এবড়োখেবড়ো রুক্ষমূর্তি, সেই দুপুরের ঝাঁ-ঝাঁ রৌদ্রে খাঁ খাঁ করছে। রৌদ্রের তাপ যেন আগুনের হলকা। বেহারা-বরকন্দাজেরা সবাই ঘেমে গিয়েছে। পালকির বেহারারা গলা ছেড়ে পালকি বওয়ার গান গেয়ে অগ্নিমূর্তি সূর্যিঠাকুরের কাছে মিনতি জানাচ্ছে।

এমন সময় তারণ সিং দেখতে পেল, কে যেন কালোয়ার চর পাড়ি দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে পালকির দিকে সেই চষা মাঠের ঢিল ভেঙে। লোকটা পালকিকে লক্ষ্য করে হরদম ছুটছে আর মাঝে মাঝে হাত তুলে চেঁচিয়ে কী যেন বলছে। চোখ-ঝলসানো রৌদ্রে তাকে আদৌ চেনা যাচ্ছে না, কিন্তু সে বেচারি ছুটছে অবিরাম চলন্ত পালকিখানাকে লক্ষ্য করে।

তারণ সিং মাথার ঘাম মুছে বললে, 'লোকটা পাগল নাকি? দেখছো মেছের সর্দার?' সবাই ভাল করে তাকে লক্ষ্য করে দেখল, লোকটা প্রাণপণ-শক্তিতে, চষা মাঠে মাঝে মাঝে হোঁচট খেয়েও, বেগে ছুটেছে বাবুমশায়ের পালকি লক্ষ্য করে। তার যেন কোনো হুঁশ নেই— পলকিটাকে সে ধরবেই। ক্রমশ তার হাতনাড়া আর চিৎকার শোনা গেল, 'থামাও, পালকি থামাও, সর্দারভাইরা একটি বার পালকি থামাও।'

বরকন্দাজদের আলোচনায় পালকির বেগ কিছু কমেছে। রবীন্দ্রনাথ পালকিতে বসেই তাদের আলোচনা শুনতে পাচ্ছেন, লোকটার ঐ ভীষণ রৌদ্রে ঠিক দুপুরবেলা প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়ও লক্ষ্য করছেন; তবুও তাঁর সন্দেহ হচ্ছে, হয়তো লোকটা বিশেষ কোন বিপদে পড়ে অন্য কোথায়ও দৌড়ুচ্ছে,— তার লক্ষ্য হয়তো পালকির দিকে নয়।

কিন্তু পালকি থামে না। হো-হো শব্দে বেহারারা তাদের কাজ করছে, আর লোকটা পেছন থেকে জোরে চেঁচাচ্ছে, 'সর্দারভাই, পালকি থামাও, একটু থামাও।' তবু কে শোনে? এইবারে রবীন্দ্রনাথের সন্দেহ দূর হল, লোকটাও খুব কাছে এসে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ হুকুম দিলেন, 'ওরে, পালকি থামা।'

বেহারারা বাবুমশায়ের হুকুমে পালকি কাঁধে করে দাঁড়িয়ে রইল। জমিদারবাবুদের পালকি কোথাও মাটিতে নামাবার দস্তুর নেই। লোকটা গলদ্‌ঘর্ম হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে পালকির কাছে এসে সোজা বাবুমশায়ের পায়ে

হাত দিয়ে প্রণাম করে কাপড়ের খুঁট থেকে একটা চক্‌চকে টাকা বের করে দুই হাতের তালুর উপরে টাকাটা নজরানা স্বরূপ বাবুমশায়ের সামনে ধরল। তার মাথা দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে ঘাম গড়াচ্ছে তখন।

বাবুমশাই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিগো, কী দরকার তোমার? এই দুপুরবেলা ছুটতে ছুটতে কেন? টাকা কিসের?'

সে বলল, 'হুজুরের নজরানা। আজ সকালে এত পেরজা নজরানা দিল, দরবার করল। আমায় ঢুকতে দিল না, আমার তো কোনো দরখাস্ত ছিল না। তাই হুজুরের নজর দিতে এলাম। হুজুর আজই চলে যাচ্ছেন, ভাগ্যিস ধরতে পেরেছি।' আনন্দে হেসে কপালের ঘাম মুছল। লোকটা আধাবয়সি, কিন্তু বেশ বলিষ্ঠ।

বাবুমশাই বললেন, 'তোমার কোন দরখাস্ত ছিল না, কোন দরবারই ছিল না, তাইতেই তোমায় ঢুকতে দেয় নি। খামখা টাকাটা আনলে কেন, তাও এই দুপুরে রৌদ্রে— এত দৌড়োদৌড়ি করে? টাকাটা নাও তুমি। তোমার সেলাম আমি নিয়েছি। এত কষ্ট করতে গেলে কেন?'

লোকটা অত্যন্ত ব্যথিত ও লজ্জিত হয়ে বলল, 'তাও কি হয়? হুজুর পরগণায় এসেছেন, আর আমি নজর দেব না? সবাই দিল, আমি কি হুজুরের পেরজা নই? আমি কি একেবারে মরে গেছি?'*

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'গরীব মানুষ তুমি, কী দরকার মিছামিছি টাকা নষ্ট করে? কত কষ্ট করে টাকা উপায় করতে হয় তা তো জান?'

লোকটা যেন অপমানিত হল। ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, 'হুজুরের পায়ে নজর দিলাম, মনে কত সুখ হল। হুজুরকে সামনে পেয়ে চোখ ভরে দেখলাম, দুটো কথা শুনতে পেলাম। মনের আনন্দে নজরানা দিলাম। আমি গরীব চাষা হতে পারি, কিন্তু এ যে আমার কত বড় 'গৈরব' তা হুজুর বুঝতে পারবেন না।' বলে আবার প্রণাম করল পায়ে হাত দিয়ে। বাবুমশাই নীরবে তাকে দেখতে লাগলেন।

স্ফূর্তিতে লোকটার সেই দুপুরেও বাবু-মশায়ের সঙ্গে গল্প করার শখ জেগে উঠল, বললে, 'হুজুর, পরগণায় আসেন না কেন? মাঝে মাঝে প্রায়ই আসবেন, তবে তো আমরা দেখতে পাব।'

---

* এই রকমের ঘটনা কালীগ্রাম জমিদারিতেও দুএকবার হয়েছিল। তারা বলেছিল—আমরা না দিলে তুই খাবি কি? কে দেবে?

রবীন্দ্রনাথ একটু ভাঙা গলায় বললেন, 'আমার অনেক কাজ, প্রায়ই তো আসি তোমাদের কাছে। মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই আসব।'

লোকটা আনন্দের আতিশয্যে বললে— 'এই চৈতে খরার মধ্যে ঠিক দুপুরে কি কোথাও যেতে হয়? বড্ড গরম।' তার ইচ্ছেটা, এখন সে বাবুমশাইকে একটু হাওয়া করলে সুখী হয়।

বাবুমশাই বললেন, 'আমার বড্ড জরুরি কাজ কলকাতায়, তাই তাড়াতাড়ি যাচ্ছি। তোমাদের দেখতে মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই আসব।'

তাঁর ইঙ্গিতে পালকি চলতে শুরু করল। লোকটি হাঁ করে সেইখানে কতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে রইল,-কে জানে!

শিলাইদহ কুঠিবাড়ি

শিলাইদহ কুঠিবাড়ি সেকালের রবীন্দ্রভবন হিসাবে শুধু বাংলার কেন সারা ভারতের রবীন্দ্রসংস্কৃতিসেবীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। পাকিস্তান সরকার বহু বিলম্বে বহু পুণ্যস্মৃতিপূত এই ঐতিহাসিক ভবনটিকে রবীন্দ্র-মিউজিয়ামে পরিণত করতে ইচ্ছা করেছেন, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যসেবী ও অনুরাগিগণ এতদিন এদিকে আদৌ মনোযোগ দেন নি। এইটেই আশ্চর্যের বিষয়।

শিলাইদহ কুঠিবাড়ির ইতিহাস সাহিত্যসেবিগণের কৌতূহল উদ্রেক করবে, কারণ এই মনোরম পরিবেশের মধ্যেই কবিগুরুর সাহিত্য-সাধনার মূল উৎসের সন্ধান পাওয়া যাবে। ভীমা ভয়ঙ্করী বিশাল কল্লোলময়ী পদ্মার তীরে সুন্দরী রহস্যময়ী এই বিচিত্র পল্লী-পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানসের বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে প্রথম শুভদৃষ্টি বিনিময় হয়েছিল।

নদীয়া জেলার (বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার) কুষ্টিয়া মহকুমার কুমারখালি থানার অধীন শিলাইদহ প্রাচীন সমৃদ্ধ গ্রাম হিসাবে এককালে সুপরিচিত ছিল। রাজা সীতারাম রায় এবং পরবর্তী কালে নাটোরের রানি ভবানীর অধিকারভুক্ত জনপদ হিসাবে গ্রামটি সমুন্নত ছিল; তারপর নীলকর সাহেবদের অধিকারে ও অত্যাচারে গ্রামটি শ্রীহীন হয়ে পড়ে। দ্বারকানাথ ঠাকুর এই জমিদারি নাটোর রাজবংশ থেকে (সম্ভবত নিলামে) কিনে নেন বেনামিতে। পরে মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথ এই সম্পত্তি অধিকার করেন ও জমিদারি পরিচালনার ব্যবস্থা করেন।

মহর্ষিদেবের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ ১২৯৮ সালে (৩০ বৎসর বয়স) প্রকৃতপক্ষে জমিদারির (ঠাকুরবংশের তৎকালীন সমগ্র জমিদারির) ভার গ্রহণ করেন। তিনি ১২৯৪ সালেও কিছুদিন শিলাইদহে বাস করেছিলেন। তারও বহু পূর্বে বাল্যকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে ১৯/২০ বৎসর বয়সে তিনি শিলাইদহে বাস করেছিলেন। তাঁর নিজের বর্ণনায় পাওয়া যায় 'পুরোনো নীলকর সাহেবের কুঠী', টাট্টু ঘোড়ায় রথতলার মাঠে বেড়ান, বিশ্বনাথ শিকারির সঙ্গে শিলাইদহের জঙ্গলে বাঘ শিকার, শিলাইদহের মালীর তোলা ফুলের রসে কবিতা লেখা প্রভৃতি শিলাইদহের প্রাচীন স্মৃতিকাহিনী, (ছেলেবেলা ৬১-৬৭ পৃষ্ঠা)। সে সময়ে যে বাড়িতে তাঁরা থাকতেন সে ভবনটি বর্তমান শিলাইদহ কুঠিবাড়ি নয়— সেটি 'পুরোনো নীলকর সাহেবদের কুঠী'। এই কুঠির বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ করেছেন—

পুরোনো নীলকুঠী তখনো খাড়া ছিল। পদ্মা ছিল দূরে। নীচের তলায় কাছারি, উপরের তলায় আমাদের থাকবার জায়গা। সামনে খুব মস্ত একটা ছাদ। ছাদের বাইরে বড় বড় ঝাউগাছ, এরা একদিন নীলকর সাহেবের ব্যবসার সঙ্গে বেড়ে উঠেছিল। আজ কুঠীয়াল্ সাহেবের দরবার একেবারে থম্‌থম্ করছে। ...সেদিনকার আর যা কিছু সব মিথ্যে হয়ে গেছে, কেবল সত্য হয়ে আছে দুই সাহেবের দুটি গোর। লম্বা লম্বা ঝাউগাছগুলি দোলাদুলি করে বাতাসে, আর সেদিনকার রায়তদের নাতি-নাত্‌নিরা কখনো কখনো দুপুররাত্রে দেখতে পায় সাহেবের ভূত বেড়াচ্ছে কুঠীবাড়ির পোড়ো বাগানে।

ঐ গোর দুটি শেলিসাহেব ও তাঁর স্ত্রীর বলে অনুমান করা যায়। শিলাইদহ নামটি উক্ত নীলকর পুঙ্গব 'শেলি' সাহেবের নাম থেকে প্রচলিত। একখানা পুরাতন পুস্তকে (মেমোয়্যার অব প্রিন্স দ্বারকানাথ ট্যাগোর) এই তথ্যটি পাওয়া যায়। অনুমান ১২৯০ সালে এই বৃহৎ নীলকুঠি বাগানসহ পদ্মাগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। উক্ত সাহেব-মেমের গোর দুটিও ১৩৪৩ সালের ভাঙনে শিলাইদহ 'কুঠীর হাট' বুনাপাড়াসহ পদ্মার গর্ভে অন্তর্হিত হয়। ঐ কুঠির হাট বটগাছ ও গোর দুটির পার্শ্বস্থ বেলগাছের গুঁড়িতে রবীন্দ্রনাথের জলনিবাস বজরা বা বোট (পদ্মা বোট) বহু দিন বাঁধা থাকত এবং বুনাপাড়ার অধিবাসী-অধিবাসিনীদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ও গল্প জমত। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বেও কবি এই গাছদুটির কথা বলতেন। এর কিছু পূর্বে 'হানিফের ঘাটে'ও

তিনি বহুদিন বোটে বোটে বাস করেছিলেন। এই সমস্ত স্থানের স্মৃতি কবি কখনো ভোলেন নি। 'হানিফ সেখ' 'মাধু বিশ্বাস' প্রভৃতি চাষির পুরাতন স্মৃতি দরদি কবির পক্ষে ভোলা সম্ভবপর ছিল না।

শিলাইদহ গ্রামখানি পদ্মার দক্ষিণ পারে অবস্থিত, আবার এর তিন মাইল দূরে গোরাই নদী। এককালে শিলাইদহ কুঠির হাটের সম্মুখেই পদ্মা ও গোরাইয়ের সঙ্গমস্থল ছিল। সেদিনকার সেই পদ্মার বিশাল অপরূপ দৃশ্য আজ আর কল্পনা করা যায় না। পদ্মার পরপারেই (বাজিতপুর) পাবনা সহর। কুষ্টিয়া সহর বর্তমান গোরাইনদীর তীরে; শিলাইদহ থেকে পাঁচ মাইল। আবার শিলাইদহের পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে কুমারখালি সহর। তিনটি সহরের মধ্যস্থলে, নদীয়া, পাবনা ও ফরিদপুর তিনটি জেলার মিলনস্থানে পদ্মাতীরবর্তী শিলাইদহ অপরূপ সৌন্দর্যে রবীন্দ্রনাথকে কতখানি গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল, সে বিষয় ১৩৪৬ সালে ১লা চৈত্র তারিখে শিলাইদহ পল্লীসাহিত্য সম্মেলনের সম্পাদককে লিখিত পত্রে জানা যাবে—

> আমার যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের সাহিত্যরস-সাধনার তীর্থস্থান ছিল পদ্মা প্রবাহচুম্বিত শিলাইদহ পল্লীতে। সেখানে আমার যাত্রাপথ আজ সহজগম্য নয়, কিন্তু সেই পল্লীর স্নিগ্ধ আমন্ত্রণ সরস হয়ে আছে আজও আমার নিভৃত স্মৃতিলোকে, সেই আমন্ত্রণের প্রত্যুত্তর অশ্রুতিগম্য করুণ ধ্বনিতে আজও আমার মনে গুঞ্জরিত হয়ে উঠছে, সেই কথা এই উপলক্ষ্যে পল্লীবাসীদের আজ জানিয়ে রাখলুম।

শিলাইদহ এককালে কবি-জমিদারের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল। সেই পুরনো কর্ম ও স্নেহের বন্ধন তিনি প্রকাশ করেছিলেন ১৩৪৫ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠে লিখিত আর একখানি পত্রে—

> শিলাইদহে দীর্ঘকাল তোমাদের সঙ্গে যে আত্মীয়তাসূত্রে যুক্ত ছিলাম, আজো তোমাদের মন থেকে তা ছিন্ন হয়ে যায়নি, তারই প্রমাণ পাওয়া গেল তোমার সুন্দর চিঠিখানিতে। শ্রদ্ধার দান নানা স্থান থেকেই পেয়েছি; তোমাদের অর্ঘ্য সকলের চেয়ে মনকে স্পর্শ করেছে। অনেকবার শিলাইদহ দর্শন করে আসবার ইচ্ছা করেছি, কিন্তু সেই আমার চিরপরিচিত শিলাইদহ এখন আর সেদিনকার সেই আনন্দরূপে প্রতিষ্ঠিত নেই নিশ্চয় জেনে নিরস্ত হয়েছি।

রবীন্দ্র-সাহিত্যরসিকমাত্রেই কবির এই দুর্নিবার শিলাইদহ-আকর্ষণ প্রত্যক্ষ

করেছেন তাঁহার বিশাল সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে।

শিলাইদহ পদ্মার তীরে নীলকর সাহেবদের কুঠির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেলে বর্তমান কুঠিবাড়ি নির্মিত হয় ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের শেষে এবং 'কুঠীবাড়ি' নামেই সুপরিচিত হতে থাকে। এই বাড়ি তৈরির ভার ছিল কবির জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর (চিঠিপত্র ১ম খণ্ড)। পরে পুত্র রথীন্দ্রনাথ বর্তমানরূপে পরিণত করেন এই কবি-ভবনকে। এই সুদৃশ্য সুরম্য ভবনে রবীন্দ্রনাথ অনেকবার দীর্ঘকাল স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-জামাতাসহ বাস করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ঠাকুরবংশের প্রায় সকলেই এই মনোরম পল্লীভবনে বাস করে পদ্মা-গোরাইবিধৌত পল্লী-প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র, নাটোররাজ জগদিন্দ্রনাথ, লোকেন্দ্রনাথ পালিত, প্রমথ চৌধুরী দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ দেশগৌরব মনীষিগণও এই কুঠিবাড়িতে বহুবার বাস করেছেন। চারদিকে ঝাউ, শিশু ও শালবীথিকায় ঘেরা কবিগুরুর এই পল্লীভবনের মনোরম অপরূপ শোভা বহুদূরের পথিককে আকর্ষণ করে থাকে। নিকটেই শিলাইদহ সদর কাছারি।

এই কুঠিবাড়ির পাশ দিয়ে প্রায় ৬ মাইল দীর্ঘ রাস্তা গিয়েছে কুষ্টিয়া সহরের গোরাইয়ের তীর পর্যন্ত। এই রাস্তা রবীন্দ্র রোড নামে বিখ্যাত। রাস্তার দু পাশের বাবলাগাছের সুগন্ধ পথিককে বিহ্বল করে।

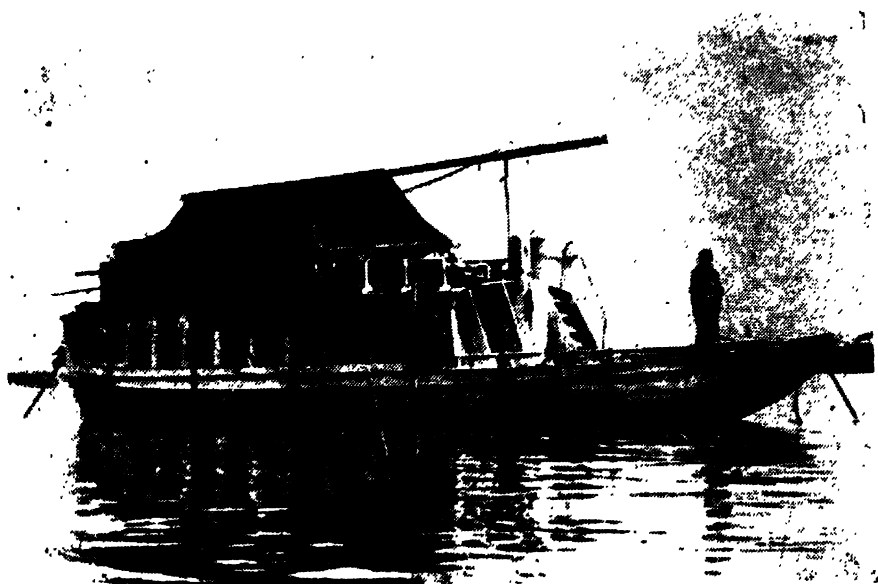
শিলাইদহ কুঠিবাড়ি প্রায় তের বিঘা জমির উপরে অবস্থিত। মধ্যস্থলে বাগানের মধ্যে প্রায় ছয় বিঘা জমির উপর প্রাচীরবেষ্টিত আড়াইতলা ভবন। একপার্শ্বে রথীন্দ্রনাথের বাল্যশিক্ষক লরেন্স সাহেবের বাংলোর বাঁধানো চাতাল এখনও দেখতে পাওয়া যাবে। এই বাঁধানো চাতাল বহুবার বহু সভাসমিতির মঞ্চ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচীরের পূর্বদিকে আম, কাঁঠাল, লিচু, নারকেল প্রভৃতি ফলবান বৃক্ষের বৃহৎ বাগান ও পূর্ব-পশ্চিম লম্বা দীঘি। ভবনের পশ্চিমে আর একটি বড় পুকুর, এই পুকুরটির সান বাঁধানো ঘাটের প্রবেশ পথের দুধারে কবি স্বহস্তে দুটি বকুলবৃক্ষ রোপন করেন। পরে ঐ গাছ দুটির মৃদু গন্ধবিস্তারী নিবিড় ছায়ায় বসে কবি আপনমনে গান গাইতেন। তাঁর 'বোষ্টমী' গল্পের (গল্পগুচ্ছ, ৩য় খণ্ড) প্রারম্ভে কবি তাঁর শিলাইদহ জীবনের ও কুঠি-বাড়ির যে অপূর্ব মরমি বর্ণনা দিয়েছেন এবং শিলাইদহ গ্রামবাসীদের সম্পর্কে যে বেদনাময় চিত্র এঁকেছেন তা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'বোষ্টমী' গল্পের নায়িকা

সর্ব-ক্ষেপির (রবীন্দ্রনাথের আনন্দ বোষ্টমী) পরিচয় এ গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। পুকুরের পাশেই মালী ও চাকরদের গৃহ এবং বৃহৎ তরকারি বাগান। কুঠিবাড়ি থেকে বর্তমান পদ্মার ব্যবধান সিকি মাইলেরও কম। ভবনের তিনপাশে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র—একপাশে শিলাইদহ (খোরসেদপুর) পল্লী। গোপীনাথদেবের মন্দির ও বিগ্রহের স্নানযাত্রার মেলার জন্য এই পল্লীটি সুবিখ্যাত। শিলাইদহ কুঠিবাড়ির চিত্রটি কবির পত্রেই অপরূপভাবে চিত্রিত হয়েছে—

বোলপুরের সঙ্গে এখানকার চেহারার কিছুমাত্র মিল নেই। সেখানকার রৌদ্র বিরহীর মতো, মাঠের মধ্যে একা বসে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলচে, সেই তপ্ত নিঃশ্বাসে সেখানকার ঘাসগুলো শুকিয়ে হলদে হয়ে উঠেছে। এখানে সেই রৌদ্র তার সহচরী ছায়ার সঙ্গে মিশেচে ; তাই চারিদিকে এত সরসতা। আমার বাড়ির সামনে শিশু-বীথিকায় তাই দিনরাত মর্মর ধ্বনি শুনচি,আর কনকচাঁপার গন্ধে বাতাস বিহ্বল, কয়েৎবেলের শাখায়-প্রশাখায় নতুন চিকণ পাতাগুলি ঝিল্‌মিল্ করচে, আর ঐ বেণুবনের মধ্যে চঞ্চলতার বিরাম নেই। ···এখন চৈত্র-মাসের ফসল সমস্ত উঠে গিয়েচে, ছাদ থেকে দেখতে পাচ্ছি, চষামাঠ দিকপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে কিছু বৃষ্টির জন্যে। মাঠের যে-অংশে বাবলাবনের নীচে চাষ পড়েনি, সেখানে ঘাসে ঘাসে একটু স্নিগ্ধ প্রলেপ, আর সেইখানে গ্রামের গরুগুলো চরচে। ···আগে পদ্মা কাছে ছিল,—এখন নদী বহু দূরে সরে গেছে। ···একদিন এই নদীর সঙ্গে আমার কত ভাব ছিল। শিলাইদহে যখন আসতুম, তখন দিন-রাত্রির ঐ নদীর সঙ্গেই আমার আলাপ চলতো। ···ছাদের উপর দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে তাকিয়ে দেখি,— মাঝখানে কত মাঠ, কত গ্রামের আড়াল, সবশেষে উত্তর দিগন্তে আকাশের নীলাঞ্চলের নীলতর পাড়ের মতো ঐ যে একটি ঝাপসা বাষ্পরেখাটির মত দেখতে পাচ্ছি, জানি ঐ আমার সেই পদ্মা।

ভানুসিংহের পত্রাবলী, ২২শে চৈত্র,১৩২৮

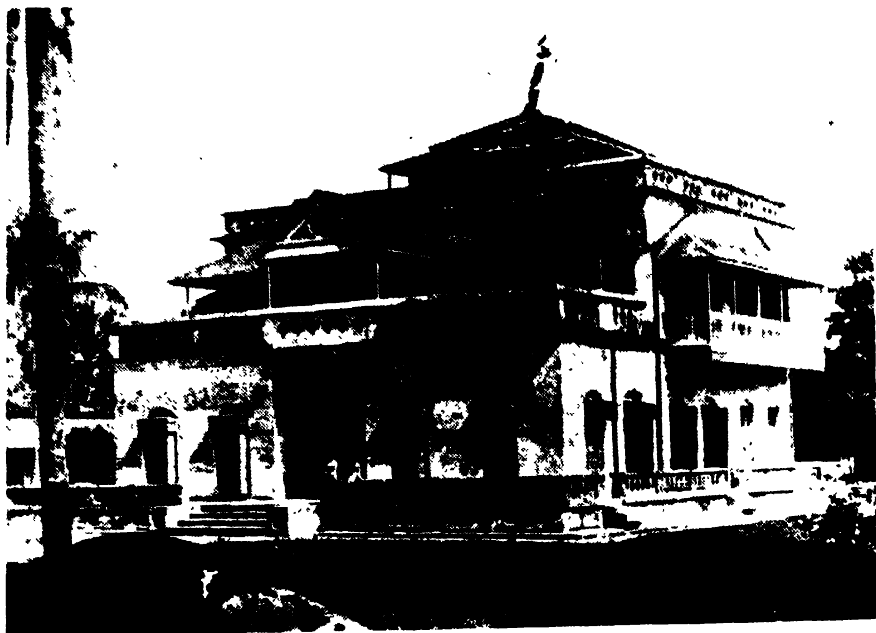
শিলাইদহ কুঠিবাড়ির দুইরকমের রূপ আমরা দেখেছি। প্রথম যুগের কুঠি-বাড়ি ছিল দোতলা, প্রাচীরবেষ্টিত একটি বৃহৎ পুষ্পবাটিকা সমন্বিত। প্রাচীরের মধ্যে প্রকাণ্ড গোলাপ বাগান, অন্যান্য বহুপ্রকার ফুলে পাতায় সুসজ্জিত অপরূপ কুঞ্জকানন। প্রাচীরের পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ শিশুগাছগুলি পূর্ব ও উত্তর দিকে রবীন্দ্র রোডে মিশেছে। এর মধ্যে গুটিপোকা পালনের লতাবিতান আঙুর ও তুঁতপোকার কুঞ্জঘেরা সরু পথ। এইখানে লরেন্স সাহেব 'গুটিপোকার' চাষ



পদ্মা বক্ষে 'পদ্মা বোট'



হে পদ্মা আমার
তোমায় আমায় দেখা শত শত বার



শিলাইদহ কুঠিবাড়ি



রবীন্দ্রনাথ-ব্যবহৃত আরামকেদারা (ভগ্নাবস্থা)



শিলাইদহ কুঠিবাড়ির তেতলার ঘর



শিলাইদহ কুঠিবাড়ির পুষ্করিণীর বকুলতলা ঘাট



শিলাইদহ কাছারি ও ক



শলাইদহে প্রজ ... রবী



শিলাইদহে পদ্মাবোটে চিত্রাঙ্কনরত নন্দলাল বসু ও মুকুল দে



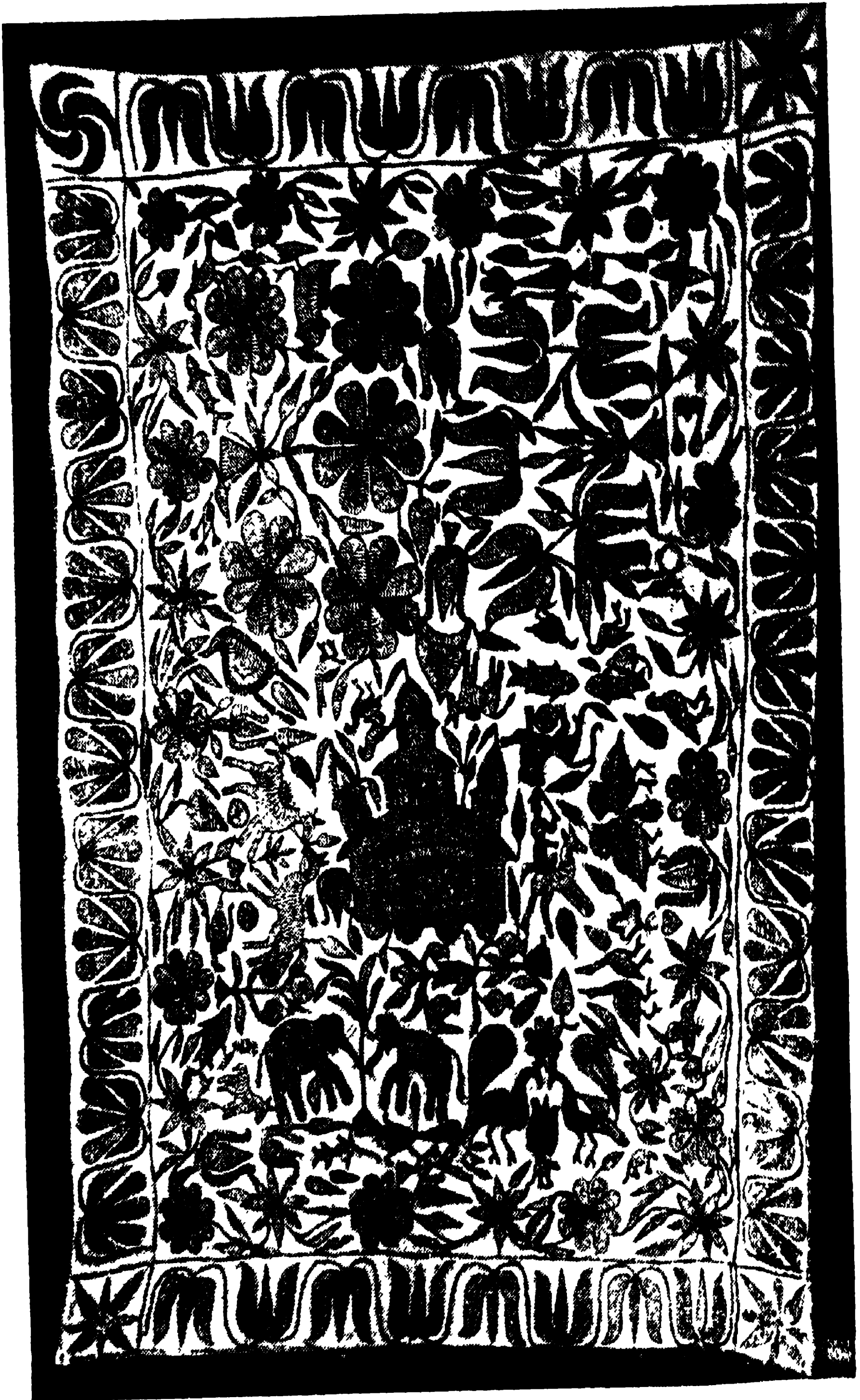
শিলাইদহে খোরসেদ ফকিরের দরগা



শিলাইদহ গোপীনাথ মন্দিরের তোরণদ্বার



শিলাইদহের গোপীনাথদেব



কবিকে প্রদত্ত উপহারঃ শিলাইদহের মহিলাদের তৈরি নকশি কাঁথা

করতেন। রথীন্দ্রনাথ তখন পড়তেন গৃহশিক্ষক ছিলেন তিনজন—লরেন্স সাহেব, শিবধন বিদ্যার্ণব আর জগদানন্দ রায়। এর পরে রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে কৃষিবিদ্যা শিখে এলে কুঠিবাড়ির উত্তরে ও পশ্চিমে ৮০ বিঘা জমি খাস খামারে এনে সেই জমিতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি-গবেষণা, চাষ, সার উৎপাদন, নূতন ফসলের ফলন ইত্যাদির পরীক্ষা হত। দুটি পুকুর থেকে পাম্পের সাহায্যে জমিতে জলনিকাশের ব্যবস্থা ছিল; নানাপ্রকারের লাঙ্গল ও কৃষিযন্ত্রপাতিও আনা হয়েছিল। একটি বালিকা বিদ্যালয় কবির পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী চালাতেন। পল্লীসংগঠনের দপ্তরখানাও এই ভবনের একতলায় ছিল। প্রজাদের আনাগোনাও চলত প্রচুর। এই ভবনে কিছুকাল সপরিবারে বাস করবার ফলে রবীন্দ্রনাথের নিজের গৃহস্থালি গুছিয়ে উঠেছিল। কবির সহধর্মিণীর তৈরি সব্জিবাগান, ফলের বাগান, সংসারধর্মের নানা অনুষ্ঠানের স্মৃতিভারে আজও এই কুঠিবাড়ি ভারাক্রান্ত।

এর কিছু পরে যখন স্ত্রীবিয়োগের পর রবীন্দ্রনাথ কুঠিবাড়ি পরিত্যাগ করে তাঁর প্রিয় বজরায় বাসা বাঁধলেন, তখন কুঠিবাড়ির রূপ বদলে গেল। পুত্র রথীন্দ্রনাথ ফুলের বাগান একেবারে তুলে দিয়ে অনেকখানি জমিতে সান বাঁধিয়ে ময়দানে পরিণত করলেন, কিছু কলকব্জাও প্রাঙ্গণে সন্নিবেশিত হল; বাইরের রাস্তা বড় ও চওড়া করে মাঠে নেওয়া হল।

কুঠিবাড়ির একতলার হলঘরটিতে আমলাবর্গ ও প্রজাদের দরবার বসত। সম্মুখের পূর্বদ্বারী ঘরটিতে কবি-জমিদার নিজে আফিস করতেন, পশ্চিমের ঘরটিতে অতিথিবর্গের থাকবার ব্যবস্থা ছিল। অন্যান্য প্রকোষ্ঠ-গুলিতে খাবার ঘর, পল্লীসংগঠনের দপ্তরখানা, ভাঁড়ার ঘর ইত্যাদি ছিল। একখানা ঘরে এণ্ড্রুজ সাহেব থাকতেন। দোতলায় পূর্বদিকের বড় কামরায় রবীন্দ্রনাথ নিজে শয়ন করতেন। স্ত্রীবিয়োগের পর তেতলায় একখানা প্রকোষ্ঠ ও স্নানের ঘর তৈরি হল। রবীন্দ্রনাথ ঐ ঘরটিতেই পরবর্তী কালে সাহিত্যসাধনা করতেন এবং ঐখানেই ইংরাজি গীতাঞ্জলির জন্ম হয়। এই নিভৃত তেতলার ঘরখানি থেকে তরঙ্গভঙ্গময়ী পদ্মা, দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্র, পল্লীর কুটিরশ্রেণী, পদ্মার চর, ঝাউবীথিকার অপরূপ শোভা দেখা যেত। কবি এই ছাদের উপর সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রকৃতির শোভায় মুগ্ধ হতেন। এইখানে কবির চক্ষু যে সমস্ত দৃশ্যে তন্ময় হত তা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন—

দিগন্তের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত সাদা বালির চর ধূ ধূ করছে ; তাতে না আছে ঘাস, না আছে বাড়িঘর, না আছে কিছু— …পাশ দিয়ে পদ্মানদী চলে যাচ্ছে, ও পারে ঘাট, বাঁধা নৌকো, স্নানরত লোকজন, নারকেল এবং আমের বাগান— সন্ধ্যা বেলায় নদীর ধারের হাট থেকে কলধ্বনি শোনা যায়, বহুদূরে পাবনার পারের তরুশ্রেণী ঘন নীল রেখার মতো দেখা যায়— কোথাও গাঢ়নীল, কোথাও পাণ্ডুনীল, কোথাও সবুজ, আর মাঝখানে এই রক্তহীন মৃত্যুর মতো ফ্যাকাশে শাদা।

রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্যসৃষ্টির সম্ভবত অর্ধাংশেরও বেশি জন্ম লাভ করে শিলাইদহের বোটে পদ্মাবক্ষে, এই কুঠিবাড়িতে, গোরাইয়ের বক্ষে ও পদ্মার চরে। তাঁর প্রথম যৌবনের ছোটগল্পের জন্মস্থান শিলাইদহে। তাঁর প্রৌঢ়কাল পর্যন্ত প্রকাশিত অধিকাংশ রচনাই শিলাইদহের প্রাকৃতিক পটভূমিকায় রচিত। তাঁর কর্মযজ্ঞের নানা পরীক্ষার উৎপত্তিস্থানও শিলাইদহে। শিলাইদহের মত নিভৃত পল্লীনিকেতন কবি আরও পেয়েছিলেন তাঁর অপর জমিদারি সাজাদপুরে ও পতিসরে। কিন্তু রীতিমত সুরুচিপূর্ণ ঘর বেঁধে একজন অভিজাত ভদ্র গৃহস্থের বাস করবার মত উপযুক্ত করেই শিলাইদহ কুঠিবাড়ি, বাগান পুকুর ইত্যাদি চমৎকার প্রাচীরবেষ্টিত করে তৈরি করা হয়েছিল। এইরকম সুরম্য সুন্দর বাসভবন কবির আর কোন জমিদারিতে ছিল না। কারণ রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ কুঠিবাড়িতেই সেকালে সপরিবারে নিজ গৃহস্থালি গড়ে তুলবার আয়োজন করেছিলেন। এবিষয়ে 'চিঠিপত্র' প্রথম খণ্ডে কবির ইচ্ছা চমৎকার-ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

রবীন্দ্রজীবনী পাঠ করলেই কবির বিশাল বিচিত্র সাহিত্যসৃষ্টিতে 'পদ্মা-প্রবাহচুম্বিত শিলাইদহের' স্থান কত উচ্চে তা বোঝা যাবে। ১৩১১ সালে শান্তিনিকেতনে কবি সতীশচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর মাঘ মাস থেকে গ্রীষ্মাবকাশ পর্যন্ত শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় শিলাইদহে স্থানান্তরিত হয়। অনেকেম ধারণা শান্তিনিকেতনের একটি বিশিষ্ট অংশ শিলাইদহে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য কবির পরিকল্পনা ছিল।

রবীন্দ্রনাথের জন্মনগরী কলিকাতা ও কর্মক্ষেত্র শান্তিনিকেতনের পরেই তাঁর সাহিত্য-সাধনপীঠ শিলাইদহের স্থান। শিলাইদহ ও পদ্মানদী তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির উৎস— বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবের অন্তরের মণিকোঠায় তিনি প্রবেশ পথ পেয়েছিলেন এই স্থানেই। 'ছিন্নপত্র' ও অন্যান্য পত্র-সাহিত্য রবীন্দ্রমানসের

বিভিন্ন গতি-প্রকৃতির যে সাক্ষ্য দিচ্ছে তার প্রধানতম পটভূমিকা শিলাইদহ। এই শিলাইদহেই তিনি বাংলার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাউলদের সঙ্গে ও বৈষ্ণব সাধকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার এবং যৌবনের প্রারম্ভে প্রাচীন গ্রামীণ বাংলার মর্মকথা গভীরভাবে অনুধাবনের সুযোগ পেয়েছিলেন।

এই শিলাইদহের স্মৃতি, কবি পরিণত বয়সে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে যখন রাশিয়ায় বসে চিরক্রন্দিতের ঊর্মিচাঞ্চল্য প্রত্যক্ষ করছেন তখনও তাঁর মনকে আলোড়িত করেছিল— 'কেবলি ভাবছি, আমাদের দেশজোড়া চাষীদের দুঃখের কথা। আমার যৌবনের আরম্ভকাল থেকেই বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের সঙ্গে আমার নিকট পরিচয় হয়েছে। তখন চাষীদের সঙ্গে আমার প্রত্যহ ছিল দেখাশুনা— ওদের সব নালিশ উঠেছে আমার কানে।'

ঠাকুর পরিবারের বাংলাদেশে তিনটি জমিদারি— শিলাইদহ, পতিসর ও সাজাদপুর। তিনটি গ্রামেই কবির যৌবনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করবার প্রাণপণ চেষ্টা হয়েছিল। কোথাও কবি নীড় বাঁধতে পারেন নি, শিলাইদহের পল্লীকুঞ্জেই বাসযোগ্য সুরম্য-ভবন নির্মিত হয়েছিল তাঁর 'ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসার' স্থায়ী পটভূমিকারূপে। এমন একটি অনুপম কবিভবন যদি আজও অনাদৃত থাকে, তবে বুঝতে হবে বাঙালি জাতির রবীন্দ্র-অনুরাগ শুধু কথার কথা মাত্র।

শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে একটি জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠান অতি অনায়াসে অল্প ব্যয়েই সংগঠিত করা যেতে পারে। বঙ্গবিভাগ না হলে এই বহু স্মৃতিমণ্ডিত ভবনটির এমন দুর্দশা হয়ত হত না। শেক্‌সপীয়রের পল্লীভবনে ইংরাজ জাতি মহাকবির স্মৃতির প্রতি যে শ্রদ্ধা ও কর্তব্যবোধের পরিচয় দিয়েছে পদ্মাপ্রবাহচুম্বিত শিলাইদহ কুঠিবাড়িও জাতির কর্তব্যবুদ্ধিকে সেইভাবে জাগ্রত করবে। এই পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত কুঠিবাড়ি যাতে ধ্বংস না হয় সে দিকে সকলের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ১৯৪৪ সালে কুঠিবাড়ি কিনে নেওয়ার জন্য আমাকে পাঠিয়েছিলেন ভাগ্যকুলের জমিদারদের কলকাতার বাড়িতে। কিন্তু তাঁরা বিক্রি করতে রাজি হন নি। এর পরই দেশবিভাগের ফলে শিলাইদহ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

পল্লী সংগঠনের প্রথম পর্ব

আজ থেকে সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। তখন আমার বয়স তেরো চৌদ্দর বেশি হবে না। উনিশশ সাত কি আট খ্রীষ্টাব্দে, যখন আমাদের দেশে 'পল্লীসংগঠন' কথাটার স্থান শুধু অভিধানের মধ্যেই ছিল, শিক্ষিত মহলে ঐ বিষয়টা একটা কথার কথামাত্র ছিল, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব সুচিন্তিত প্রণালীতে নিজের জমিদারিতে পল্লীসংগঠনের কাজে হাত দিয়েছিলেন। আমি যতদূর অনুসন্ধান করেছি, তা থেকে মনে হয় শিলাইদহে আমাদের মত কিশোরদের নিয়ে তাঁর প্রথম পল্লীসংগঠনের পরীক্ষার আরম্ভ ১৯০৭ কি ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই প্রচেষ্টার পর ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কালীগ্রাম জমিদারিতে যে বিরাট প্রচেষ্টা সেটা এর দ্বিতীয় পর্ব।* তার পূর্বে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ ও বাঙালির স্বদেশী আন্দোলন সফল করবার জন্য শিলাইদহে বিরাট আকারে একটা সংগঠনের প্রণালীবদ্ধ আয়োজন করেছিলেন। তার প্রধান অঙ্গ ছিল গ্রামে গ্রামে তাঁতের প্রচলন ও কাপড় ইত্যাদি বোনা, শরীর-চর্চা, স্বদেশী মেলায় পল্লীশিল্পের বিরাট আয়োজন ইত্যাদি। এইভাবে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা দানা বেঁধে উঠল কয়েক বছর পরে সুচিন্তিত প্রণালীবদ্ধভাবে শ্রীনিকেতনে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে। তাঁর এই প্রচেষ্টার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস তৈরি করা যেতে পারে। যাই হক— তাঁর এই কর্ম-যজ্ঞের অঙ্কুর তিনি রোপণ করেন শিলাইদহে ১৯০৭ কি ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মহর্ষিদেবের আদেশ ও উপদেশে পৈতৃক জমিদারি পরিদর্শনের ভার গ্রহণ করেন। তাই সেই সময় থেকে তাঁকে বাংলার বহু পল্লীতে ভ্রমণ করতে হয়েছিল, পল্লীবাসীদের সত্যিকার সুখদুঃখের সঙ্গে মিশতে হয়েছিল। তখন তাঁর বয়স প্রায় ত্রিশ। তাঁর কবিসুলভ কল্পনা ও প্রতিভা সেই সময় থেকেই বাংলার মৃতপ্রায় পল্লীগুলিকে নতুন করে গড়ে তোলবার জন্যে নানা পথের সন্ধান করছিল; নিজের জমিদারির মধ্যে পল্লীস্বরাজ প্রতিষ্ঠার

* এ সম্বন্ধে যাঁরা আগ্রহশীল তাঁরা ১৩৪৮ সালের আশ্বিন সংখ্যায় এবং পরবর্তী কয়েক সংখ্যায় 'শনিবারের চিঠিতে' (রবীন্দ্রজীবনীর নূতন উপকরণ) খানিকটা বিবরণ পাবেন। এই কর্মযজ্ঞের নেতা ছিলেন শ্রীঅতুল সেন আর তাঁর সহকারী শ্রীউপেন্দ্র ভদ্র ও শ্রীবিশ্বেশ্বর বসু প্রভৃতি। পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতির ভাষণ (১৯০৮) ও 'স্বদেশী-সমাজ' বক্তৃতার বাস্তব রূপায়ণের এইগুলিই প্রথম প্রচেষ্টা মনে হয়। ক্রমশ তাঁর কলমের সঙ্গে কাজ প্রসার লাভ করে এবং শ্রীনিকেতনের জন্ম হয়। পল্লী ও সমাজ-সংগঠন সম্পর্কে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ পরে প্রকাশিত হয়।

নানা পরীক্ষানিরীক্ষার আয়োজন করেছিলেন। কবিতা ও প্রবন্ধে দেশবাসীদের এ বিষয়ে সজাগ করতে না পেরে নিজের সাধ্যমত গ্রামীণ বাংলার নূতন প্রাণশক্তি জাগ্রত করবার জন্য 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাকে বাস্তব রূপায়ণের এইটিই প্রথম প্রচেষ্টা। রবীন্দ্রনাথের যে জীবনচরিত প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে সেই সমস্ত জ্ঞাতব্য বিবরণ পাওয়া যায় না। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শিলাইদহে আমাদের মত কিশোরদের নিয়ে পল্লীসংগঠনের যে কর্মধারা প্রবর্তনের প্রয়াস করেছিলেন, সেই কথাটাই আজ বলব। শিলাইদহের সেই কিশোর ব্রতীবালকদলে আমি নিজে এই কাজে হাতেখড়ি নিয়েছিলাম।

আমরা তখন শিলাইদহের মাইনর ইস্কুলে পড়তাম। রবীন্দ্রনাথ আমাদের গ্রামের জমিদার। তাঁকে ভয় ও সম্ভ্রমমিশ্রিত দৃষ্টিতে দেখতাম। জমিদার বলে তাঁকে ভয় করতাম খুব, আবার মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে মিশবার সুযোগও খুঁজতাম।

তাঁর বজরা তখন প্রায়ই আমাদের 'হানিফ চাচার' ঘাটে বাঁধা থাকত। আমরা বোটের কাছাকাছি নদীর তীরে ছোট্ট চরে হাডু-ডু খেলতাম, কিন্তু তিনি আমাদের খেলা দেখতে বজরা থেকে নামতেই আমরা ভয়ে পালিয়ে যেতাম। কোনদিন হঠাৎ ধরা পড়ে গেলে তাঁর সামনেই আমাদের হাডু-ডু খেলতে হত। এই সময় একদিন এক অসমসাহসিক ব্যাপারে আমরা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।

পদ্মায় তখন ভীষণ ভাঙন চলছে। আমরা একদিন কয়েকজন মিলে নৌকাভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম। প্রায় মাঝগাঙে এসে পদ্মার ভীষণ স্রোতে নৌকা সামলানো অসম্ভব হল,এদিকে পিছন থেকে একখানা আড়াইতলা স্টীমার আমাদের এই অবস্থা দেখে সিটি দিতে আরম্ভ করলে আমরা প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণপণে চিৎকার শুরু করলাম। হঠাৎ জলের ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে ঘুরতে ঘুরতে ভেঙে-পড়া একটা বাঁশের ঝাড়ে আমাদের নৌকা আটকে গেল, যেন ভগবানের কৃপায় আমরা সে যাত্রায় বেঁচে গেলাম। স্টীমার পদ্মার জলে পাহাড়প্রমাণ ঢেউ তুলে পাশ দিয়ে চলে গেল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বজরার ছাদে দাঁড়িয়ে আমাদের এই অসমসাহসিক কাণ্ড দেখে আমাদের উদ্ধারের জন্যে একখানা 'জালিবোট' বরকন্দাজদের দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। আমরা বরকন্দাজ আসতে দেখে ঐ বিপদে ধরা পড়বার ভয়ে ঘাবড়ে গেলাম। কোনমতে তীরে নেমে নিকটবর্তী

আম বাগানের মধ্যে এসে লুকিয়ে সবাই জঙ্গল ডিঙিয়ে প্রাণপণে পলায়ন করে তাঁর দৃষ্টি এড়ালাম বটে, কিন্তু তিনি আমাদের বেশ চিনে রাখলেন।

আর একদিন ঐখানেই বজরার কাছে তাঁর চোখে ধরা পড়ে গেলাম, পলায়নের সুযোগ পেলাম না। তিনি হাসতে হাসতে আমাদের অনেক উপদেশ দিয়ে বললেন, 'তোমরা তো সোজা ছেলে নও। ঐ মাঝপদ্মায় কী বিপদটা ঘটতো, বল তো। খবরদার, ঐরকম ছেলেখেলা আর কখনো করবে না। বরং আমার সঙ্গে একটা ভালো কাজে মন দাও দেখি। আমি তোমাদের মত একটা সাহসী ছেলের দল চাই— গ্রামের কাজের জন্যে। কাল তোমরা সবাই মিলে সকালে কুঠিবাড়িতে আমার সঙ্গে দেখা করবে। আমি তোমাদের নিয়ে একটা দল গড়বো।'

আমরা এমন নিমন্ত্রণ পেয়ে আনন্দে আটখানা। পরদিন যথাসময়ে বারো-চৌদ্দজন কুঠিবাড়িতে গিয়ে হাজির; আরও কয়েকখানা গ্রামের লোক ছিল সেখানে। একটা সভা হল। তিনি আমাদের নৌকাবিহারের নিন্দা করে আমাদের মনের মত একটা গ্রামোন্নতির কাজের প্রণালী বুঝিয়ে দিলেন। কী চমৎকার বলবার ভাষা, কী অপরূপ ভঙ্গি! আমরা ছেলেমানুষ, কতটুকুই বা বুঝি, আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম, অপূর্ব উৎসাহ উদ্দীপনায় মন নেচে উঠল, নতুন জীবনের সন্ধান পেয়ে গেলাম। আমরা পল্লীসেবার কাজ করব— এ একটা অদ্ভুত উদ্দীপনা!

তার পরের দিন আমাদের কাজ আরম্ভের দিন। সেদিনও আমাদের দলকে তিনি স্বয়ং আমাদের পল্লীসেবার কার্যপ্রণালী বুঝিয়ে দিলেন আর আমাদের অধ্যক্ষ করে দিলেন শ্রীভূপেশচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন চক্রবর্তীকে। তাঁরা দুজনেই ঠাকুরজমিদারির কর্মচারী ছিলেন, গতানুগতিক জমিদারি-সেরেস্তার কূটনীতিজ্ঞ আমলা নন, প্রজাসাধারণের কল্যাণকর অনেক কাজই তাঁদের কর্তব্যের অঙ্গ ছিল।

আমরা সে-বয়সে রবীন্দ্রনাথের কর্মপ্রণালী ভাল রকম বুঝতে না পারলেও তাঁর কথাগুলোর মধ্যে এমন উৎসাহ উদ্যম ও নবজীবনের সন্ধান পেলাম যে আমরা বেশ স্বাভাবিকভাবে নতুন স্ফূর্তি নিয়ে এই কাজে মেতে উঠলাম। পল্লীর সেবা বললেই আজকাল ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর একটা বিকট দায়িত্বের কল্পনায় মনটা মুষড়ে পড়ে। আমাদের আদৌ সে রকম হল না। আমাদের ইস্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার ছিলেন শ্রীরাজেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনিও পূর্বে শান্তিনিকেতনের কর্মী ছিলেন। এঁর পুত্র বিখ্যাত শিল্পী সত্যেন্দ্র আমার সহকর্মী। এঁর নাতি শ্রীমান সৌম্যেন বিশ্বভারতীর একজন অধ্যাপক। রাজেন বাবুকে ডেকেও রবীন্দ্রনাথ ইস্কুলের ছেলেদের এই কাজে উৎসাহিত করবার জন্যে উপদেশ দিতেন।

আমাদের কর্মধারা ছিল প্রধানত তিনটি— (১) হাতেকলমে কৃষি শিক্ষা (২) আদর্শ গ্রাম তৈরি, (৩) ব্রতীবালকদল গঠন।

প্রত্যহ ইস্কুল ছুটির পর আমাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে একঘণ্টা করে কাজ করতে হত। শনি ও রবিবারের কাজ ছিল অবশ্যকরণীয়, বেলা ২টা থেকে ৬টা পর্যন্ত। খেলা শেষ হতে অনেকদিন সাতটা বেজে যেত।

আমাদের প্রথম কাজ ছিল শিলাইদহ কুঠিবাড়ির ফুলের বাগানে। গাছের যত্ন করা, গাছ পুততে শেখা, জল দেওয়া, নিড়ানো, সার দেওয়া ইত্যাদি। আমাদের নাম লিখে প্রত্যেককে পাঁচটি করে গোলাপ গাছের ভার দেওয়া হয়েছিল। ফুলের গাছ বাদেও কুঠিবাড়ির পাশের জমিতে চিনেবাদাম, আলু, মটরশুঁটি, পেঁয়াজ, কপি ইত্যাদির যে বাগান ছিল তার পরিচর্যাও আমাদের হাতেকলমে করতে হত। আমরা সেখানে এবং আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে নানারকম তরিতরকারি উৎপন্ন করেছিলাম এবং এসব কাজে বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছিলাম। বেশ মনে আছে, পুকুর থেকে বাঁকে করে গাছের জন্য জল তুলতে তুলতে ঘাড়ে ব্যথা হত, কোদালে ক্ষেত কুপিয়ে হাতে ফোস্কা পড়ে যেত; কিন্তু আমরা মোটেই দুঃখিত হতাম না, বরং হাত ও ঘাড় শক্ত হবে বলে গর্ব প্রকাশ করতাম। গোবর, খইল আর পাতা পচিয়ে সার তৈরি করতে আমাদের প্রতিযোগিতা চলত। শুকনো গোবর কুড়িয়ে কে কত বেশি গুঁড়ো করেছে তাই নিয়ে রীতিমত প্রতিযোগিতা চলত এবং পুরস্কারও পেতাম।

আমাদের দ্বিতীয় কাজ ছিল কুঠিবাড়ির পাশেই ছোট্ট একখানা গ্রামের (কোমরকাঁদি গ্রাম) সংস্কার করা। এর নাম ছিল 'আদর্শ গ্রাম তৈরি'। আমরা কর্মী ছিলাম প্রায় চব্বিশজন, তার মধ্যে নিয়মিত কাজ করতাম ষোল জন। গ্রামখানিতে ছিল নিরক্ষর চাষিদের বাস। আমাদের প্রত্যেকের ভাগে পাঁচখানা করে গৃহস্থের বাড়ি দেওয়া হয়েছিল। আমাদের কাজ ছিল, (১) ঐ বাড়িগুলোর বুড়োগুঁড়ো সবাইকে অ আ ক খ শেখানো আর কুঠিবাড়িতে স্থাপিত প্রাইমারি ইস্কুলে ঐসব বাড়ির ছেলেদের পাঠানো, এবং (২) তাদের জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য উপদেশ দেওয়া। তারা আমাদের উপদেশ না

শুনলে নিজেরাই দা কোদাল কুড়ুল নিয়ে তাদের বাড়ির আগাছা জঙ্গল সাফ করতাম, সে জায়গা কুপিয়ে লঙ্কা বেগুন ইত্যাদি বোনার ব্যবস্থা করতাম। এতে তাদের কর্মপ্রবণতা ও উৎসাহ বাড়ত। রবীন্দ্রনাথের উপদেশ ছিল—গ্রামের বুড়োরা হয়তো তোমাদের কথা শুনতে চাইবে না; তখন তোমরা নিজেরাই দা কোদাল নিয়ে তাদের কাজ করে দেবে। তাদের বাড়ির রোগীদের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার জন্য কুঠিবাড়িতে নিয়ে আসবে, আর কঠিন রোগীদের সরকারি ডাক্তারখানায় পাঠাবার ব্যবস্থা করবে। খবরদার, ঝাড়-ফুঁক করাতে দেবে না। তাহলেই দেখবে, বুড়োরা তোমাদের মত শিশুকর্মীদের কথা নিশ্চয়ই শুনবে। তোমাদের কাছে তারা সত্যিকার ভালবাসা পাবে, আর তোমাদের মানবে না— এও কি কখনো হয়?

সত্যিই তাই, আমাদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট চাকলার বাড়ির মালিকেরা প্রথমে আমাদের ছেলেমানুষ বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করত, কিন্তু আমাদের সারল্য ও নিষ্ঠা দেখে তারা সত্যিসত্যিই আমাদের বেশ মান্য করত। শুধু তাই নয়, তারা সময়ে সময়ে যত্ন করে দুধচিড়ে দিয়ে সরের গুড় (টাটকা ফেনাওয়ালা গরম আখের গুড়) খাওয়াত। ওই জিনিসটা আমরা বাড়িতে পেতাম না।

সে সময়ে শিলাইদহে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুণ্য নামে 'মহর্ষি দাতব্য চিকিৎসালয়' রবীন্দ্রনাথই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বহু অর্থব্যয়ে ঐ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত এত বড় ডাক্তারখানা আর ছিল না। তা ছাড়া শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে হোমিওপ্যাথি ঔষধ রেখে রবীন্দ্রনাথ নিজে বহু রোগীর চিকিৎসা করতেন। তাঁর হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক চিকিৎসায় বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। আমাদের আদর্শ পল্লীর রোগীদের জন্য রবীন্দ্রনাথ নিজেই ঔষধ দিতেন। কুইনিন্ না দিয়েও ম্যালেরিয়া সারে কিনা তা পরীক্ষা করবার জন্য তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। আমাদের মধ্যে যেদিন যাদের 'ডিউটি' থাকত, তাদের রোগীদের শিশি পরিষ্কার করে তাতে ফিল্টার-করা জল পুরে সারি সারি তাঁর সামনে রাখতে হত। তিনি রোগী পরীক্ষা করে নিজের হাতে ঔষধ দিতেন।

আমাদের তৃতীয় কাজ ছিল শরীর চর্চা। প্রত্যেক শনি রবিবারে আমরা নতুন ধরনের একটা খেলা খেলতাম—এটা শিখিয়েছিলেন ভূপেশবাবু। খেলাটা জাপানি যুযুৎসুর মত, খানিকটা যুদ্ধের কায়দায়, আবার খানিকটা হাডু-ডু খেলার মত। দুদলের একদল হত রাশিয়া, আর একদল জাপান। সেনাপতি,

জেলখানা, বন্দী ইত্যাদি এবং আক্রমণের নিয়মকানুন, জয়পরাজয় ইত্যাদি ব্যাপার ভারি চমৎকার ও অভিনব। গ্রামের লোকেরা হাঁ করে এই নতুন খেলা দেখত আর আনন্দ পেত। খেলাটা খুব আমোদের আর এর আকর্ষণও ছিল প্রচণ্ড। যেসব ছেলে নিয়মিত আসত না, তারাও এই খেলার লোভে আসতে লাগল। ক্রমে আমাদের ব্রতীবালকের দল বেশ পুষ্ট হয়ে উঠল।

আমরা আমাদের ইস্কুলে আমাদের সেকেণ্ড মাস্টার শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও অনেক জিনিস শিখতাম, তার মধ্যে কবিতা আবৃত্তি ও অভিনয় প্রধান। রাজেনবাবুর ঋষির মত চেহারা, উন্নত শিক্ষাপ্রণালী, সস্নেহ ব্যবহার ও নিষ্ঠা আমাদের চরিত্রের উপর গভীর রেখাপাত করেছিল।

আমাদের ঐ তিনটি কাজের সঙ্গে অন্যান্য আয়োজনও ছিল, সেগুলো করতেন আমাদের অধ্যক্ষেরা, অনেকটা আমাদেরই সাহায্যে। সে কাজটা হচ্ছে গ্রামের বাসিন্দাদের একটা বিবরণ সংগ্রহ করা, প্রত্যেক বাড়ির মালিকের নাম, পরিবারসংখ্যা, জাতি, বয়স, স্ত্রীপুরুষ, বালকবালিকাদের সংখ্যা, চাষের জমি, আয়ের উপায় ও পরিমাণ, গরু বাছুর মহিষের সংখ্যা, রোগের বিবরণ, জন্মমৃত্যু ইত্যাদি বিবরণ আমরা সংগ্রহ করতাম ; অধ্যক্ষেরা তাই লিখে নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে দেখাতেন। পরবর্তীকালে পল্লীসংগঠনের কাজে শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যে বিধিবদ্ধ কর্মপ্রণালী অনুসরণ করতেন তার সঙ্গে আমাদের এই পল্লীতথ্য সংগ্রহের আয়োজনের অনেকখানি মিল আছে।

প্রতি রবিবারে আমাদের ফলার হত কুঠিবাড়িতে। কলার পাতায় চিড়ে-মুড়ি, নারকেলকোরা, কলা, পেঁপে, গুড়—কোনদিন আবার দই আসত তারণ ঘোষের বাড়ি থেকে। আমরা পুরস্কারও পেতাম—দা কোদাল, নিড়ানি, ছুরি-কাঁচি। এগুলো বানিয়ে দিত আমাদের গাঁয়ের শ্যামা কামার।

মাঝে মাঝে সভা হত আমাদের। গ্রামের ও পাড়ার মানচিত্র, বাংলা দেশের মানচিত্র, নদীনালার নক্সা—এই সবের সাহায্যে অধ্যক্ষেরা আমাদের দেশের অনেক তথ্য শেখাতেন। রবীন্দ্রনাথ নানা কাজে নানা স্থানে ঘুরতে খুব ব্যস্ত থাকতেন, তবু সময় পেলেই নানা কথা, নানা বিচিত্র কাহিনীতে আমাদের উৎসাহিত করতেন। আমরা তাঁকে পেলেই নিজ নিজ ভাগের গোলাপ গাছের সেরা ফুলটি উপহার দিতাম, তিনি সেগুলো হাতে নিয়ে আবার আমাদেরই ফিরিয়ে দিতেন, সকলের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বলতেন, 'এই ছেলেরা দুষ্টুমিও করতে জানে, আবার কাজও করতে পারে কেমন সুন্দর—দেখ অনঙ্গ'।

কী যে আমোদ, আনন্দ, উৎসাহ নিয়ে আমরা নেমেছিলাম গ্রামের কাজে তা মনে হলে ভাবি, আমাদের ছেলেরা এখন কি শিখছে? তোতাপাখির মত গতানুগতিক বই পড়া! আর তাই কি আনন্দহীন কিশোরজীবন, কৌতূহলহীন ও নিষ্ঠাহীন এদের চরিত্র। এরা মানুষ হবে কেমন করে?

আমাদের বাড়িতে তরিতরকারির বাগান করতে হত। এত গঠনমূলক কাজ করেও আমরা লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়তাম না। সবাই দল বেঁধে কাজ করবার মধ্যে যে কী একটা মহৎ প্রেরণা, অপার আনন্দ, নিষ্ঠা ও উৎসাহ ছিল, তাই ভাবি, আর সেই হারিয়ে-যাওয়া সোনার দিনের অরুণ প্রভাতে যাঁর অদ্ভুত প্রেরণা পেয়েছিলাম, তাঁর সেই ভাস্বর আনন্দময় চেহারাখানা চোখের উপর ভেসে ওঠে। তখন রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, সারা বিশ্বের সম্মানের মুকুটে বিশ্বজয়ী হন নি, তিনি ছিলেন পল্লীর দরদী, পল্লীবাসী, মানুষের কবি। এই অনগ্রসর দেশে আনলেন নবজীবনের প্রভাত। আমাদের কাছে তিনি সেদিনকার কবি-জমিদার মাত্র। আমরাও মুখস্থ করতাম 'পঞ্চনদীর তীরে,— বেণী পাকাইয়া শিরে', 'কোশল নৃপতির তুলনা নাই' কবিতাগুলি।

আমাদের এই কর্মব্রত প্রায় একবৎসরের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। কোন একটা পরিকল্পনা দীর্ঘকাল চালাবার মত অবস্থা তখন রবীন্দ্রনাথের ছিল না। তাই এইসব মহৎ প্রচেষ্টার শুভ পরিণতি লক্ষ্য করা যেত না। এইসব দেশ ও সমাজ-সংগঠনমূলক নিষ্ঠাপূর্ণ কর্মযজ্ঞের পুরোধা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের অবদান কতখানি গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে আজও আমাদের শিক্ষিত সমাজ অজ্ঞ। তাঁর বিশাল বিচিত্র সাহিত্যসৃষ্টির উৎসসন্ধানে কারও আগ্রহ দেখতে পাই না। মানুষ রবীন্দ্রনাথকে আজও আমরা চিনতে পারি নি। সস্তা 'রবিয়ানার' উৎকট আভিজাত্য আর পাণ্ডিত্যপূর্ণ রবীন্দ্র-কাব্যবিলাসিতার হেঁয়ালি আজও জনসাধারণের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তাঁকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ না করে বুর্জোয়া শৌখিন ভাববিলাসী কবি বলে দূরে সরিয়ে রেখেছে। বড়লোকের রংমহলে নৃত্যগীতের জলসায় শহরের কোলাহলেই আজ তাঁর দর্শন মেলে।

আমাদের আদর্শ ছিল পল্লীর সর্বাঙ্গীন সংগঠন। মনে করতাম কোমরকাঁদি গ্রামকে একটা 'আদর্শ গ্রামে' পরিণত করব; আমরাই পল্লীস্বরাজ আনব। কুঠিবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীর চেষ্টা, যত্নে ও পরিশ্রমে 'প্রতিমা বালিকা বিদ্যালয়' নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। বিদ্যালয়টি এখনও বেঁচে আছে। কোমরকাঁদির কালীবাড়ির খড়ের চালায়

একটা বয়স্ক-শিক্ষা বিদ্যালয়ও বসতে থাকে, চাষিরা সেখানে রাত্রে পড়তে আসত। আমাদের গ্রামের মাইনর ইস্কুলও ঠাকুরজমিদারদের কাছ থেকে বহু বৎসর মাসিক সাহায্য পেয়ে এসেছে।

আমরা এই ব্রতীবালক সংগঠনের অনেক বিষয়ে উপদেশ পেতাম কিন্তু অভিনয় করবার সুযোগ পেতাম না। যাত্রা আর গ্রামের থিয়েটারের অভিনয় দেখে আমরা বড় ছুটির দিনে কোন পোড়ো বাড়িতে অভিনয় করতাম। গায়ে রঙিন জামা, মাথায় লাল সালু বেঁধে হাতে বাখারির তৈরি তলোয়ার নিয়ে সদর্পে আবৃত্তি করতাম—'মারাঠা দস্যু আসিছে রে ঐ, কর কর সবে সাজ', তীর ধনুক, গদা ইত্যাদি বানিয়ে 'কর্ণবধ' পালায় গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা করতাম। যুদ্ধে কর্ণ মরে যাবে আর অর্জুন জিতবে, শেখানো ছিল, কিন্তু কর্ণ যুদ্ধ করতে করতে কিছুতেই হারতে চাইবে না; মাটিতে শুয়ে পড়বে না, এই নিয়ে মহা ঝগড়া বেধে যেত। সে যে কী আনন্দ, এখন মনে হলে হাসি পায়।

আনন্দের, সংগঠনের, বলিষ্ঠ চিন্তার এই প্রেরণা আমরা পেয়েছিলাম সেই সোনার শৈশবে আমাদের কবি, আমাদের জমিদার, আমাদের বাবুমশাই রবীন্দ্রনাথের কাছেই।

জমিদারি পরিচালনা

রবীন্দ্রনাথ সহস্রচিত্ত মানুষ। সমালোচকগণ তাঁকে কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, সমালোচক, সংস্কারক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, সঙ্গীতবিদ, নাট্যকার, নট, চিত্রশিল্পী, বক্তা, ঋষি ইত্যাদি বহু বিশিষ্ট বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের পর্যায়ে তাঁর স্থান কত উচ্চে তার পরিচয় কেউ দেন নি। সাধারণ মানুষ থেকেই তিনি অসাধারণত্বে উপনীত হয়েছিলেন। জীবনব্যাপী কঠোর তপস্যা-বলেই তিনি অসাধারণ হতে পেরেছিলেন তাই সাধারণ জনচিত্তকে উদ্বোধিত করে নানা কণ্ঠে নানা ইতিহাসে তাঁর অভয়বাণী শুনতে পাই—

ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোলো তোলো শির,
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির।

রবীন্দ্রনাথ দেশের জন্য এত অধিক অবদান রেখে গেলেও আজও পর্যন্ত

তিনি জনচিত্তের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে আছেন কেন, তা ভাববার বিষয়। তিনি অলোকসামান্য হলেও এই বাঙলা দেশের মাটির সঙ্গে, বাঙালির রক্তমাংসের সঙ্গে, নাড়ির সঙ্গে তাঁর অবিচ্ছেদ্য যোগ ছিল। তাঁর সাহিত্যে জীবনের গান বেজে উঠেছে নানা সুরে। তিনি যে মানুষের কবি, জগতের কবি, তার সত্য পরিচয়, গভীর রহস্য যে কত দুঃখমন্থনের ফল, তা আজও জনচিত্তে উদ্ঘাটিত হল না। তাঁর সাহিত্যের মধ্যে দুঃখজয়ের এই যে বাণী এর পরিচয়টি বড় সহজ নয়।

রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সাধনার অনেক বাস্তব তথ্য তাঁর জীবনীরচয়িতারা প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে পান নি। এসব বিবরণের পাথুরে প্রমাণ পাওয়া দুর্ঘট; যা ছিল কাগজপত্রের মধ্যে তার অধিকাংশই আমাদেরই অবহেলায় কৈবল্যপ্রাপ্ত হয়েছে। লুপ্তপ্রায় কোন কোন কাগজপত্র ও স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীর বিশ্বাসযোগ্য তথ্য থেকে সংগৃহীত তাঁর জীবন-কাহিনীর অজ্ঞাত পর্বের কয়েকটি অধ্যায় বিবৃত করবার চেষ্টা করব।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে কথা, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন পঞ্চান্ন বৎসর। সে বয়সেও তাঁর প্রৌঢ়ত্ব আসে নি, তখনও ছিল তাঁর উৎসাহ-উদ্যমপূর্ণ যৌবন ও সৃষ্টিধর্মী মন। তখন থেকেই তাঁর 'ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ।'

একটা আদর্শ পল্লী সৃষ্টি তাঁর বহুকালের সাধ, এসব সাধ সেকালে কোনো জমিদারের মগজে আসতই না। এই সময়েরও কিছুদিন পূর্বে শিলাইদহ জমিদারির দক্ষিণে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে (তখন এই নাম ছিল) কুষ্টিয়ার নিকট গোরাই নদীর উপরে রেলওয়ে পুল তৈরির ব্যবস্থা করেন। সেই সময়ে গোরাই নদীর শাখা কালীগঙ্গা (বা কালী নদী) ও তার পার্শ্ববর্তী মৌজা লাহিনী রবীন্দ্রনাথের জমিদারিভুক্ত। রেল কর্তৃপক্ষ কালীগঙ্গার বুকের উপর দিয়েই রাস্তা বেঁধে গোরাই নদীর প্রস্তাবিত পুল পর্যন্ত রেলপথ চালাতে মতলব করলেন। রেল কোম্পানির এই কার্যে রবীন্দ্রনাথ তীব্র প্রতিবাদ জানালেন দীর্ঘকাল লেখনী চালনার মাধ্যমে।

কালীগঙ্গা গোরাই নদীর শাখা হিসাবে বহু গ্রামের, বহু কৃষকের মনের আনন্দ ও ক্ষুধার খাদ্যের উৎস। রবীন্দ্রনাথ এই নদীর উপরে বাঁধ তৈরি না করে রেলপথ অন্যদিক দিয়ে গোরাই নদীর কাছে নেবার জন্য পরামর্শ দিলেন। সে কাজে কিছু অর্থব্যয় হলেও একটি স্রোতস্বিনীর অপমৃত্যু হত না। কিন্তু রেল কোম্পানি তাতেও রাজি হল না। শেষে রবীন্দ্রনাথ গোরাই পুলের

মত কালীগঙ্গাতেও আর একটি পুল তৈরি করে রেল চালানোর জন্য পরামর্শ দিলেন। রেল কোম্পানি খরচবৃদ্ধির অজুহাতে রবীন্দ্রনাথের এই পরামর্শ গ্রহণ করলেন না। এ বিষয় নিয়ে শিলাইদহ কাছারিতে প্রকাণ্ড একটা নথি আমি দেখেছি; তার নাম ছিল 'গোরাই সেতু—কালীগঙ্গা' নথি। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ও রেল কোম্পানির বহু ইংরাজি চিঠিপত্র, নক্সা ইত্যাদি ছিল। সে নথিটা অনেকদিন হল নষ্ট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ রেল কোম্পানির এই ব্যবহারে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন কিন্তু কল্পনাপ্রবণ সৃষ্টিধর্মী মন বাধা পেল না। তিনি নূতন পথের সন্ধান করতে লাগলেন।

যেখানে লাহিনী গ্রামে কালীগঙ্গাকে শৃঙ্খলিত করে রেল কোম্পানি বাঁধ বেঁধে ফেলল সেইখানে ৪০।৫০ বিঘা জমির উপরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিকল্পিত আদর্শ পল্লী রচনায় মনোযোগ দিলেন। শুধু তাই নয়, প্রস্তাবিত উপনিবেশের সঙ্গেই রেলপথ ও নদীর ধারেই একটা বাজার বসিয়ে বিভিন্ন পল্লীর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের একটা ছক তৈরি করলেন এবং সে উদ্দেশ্যে পুনরায় রেল কোম্পানির সঙ্গে বহু লেখালেখি করলেন যে, লাহিনীর ঐ জায়গায় একটি ছোট রেল স্টেশন তৈরি করা হক। বাজারের উন্নতির সঙ্গে স্টেশনেরও ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা কতখানি তাও লিখলেন। এদিকে রেল কর্তৃপক্ষ ব্রীজ অ্যাপ্রোচ স্টেশন হিসাবে গোরাইয়ের অপর পারে চড়ুইখোল মাঠের মধ্যে স্টেশন তৈরি করবার মতলব করে ফেলেছে। বহু পত্রবিনিময়ের পর রবীন্দ্রনাথের এই পরিকল্পনা এবং প্রস্তাবও রেল কোম্পানি অগ্রাহ্য করে বসল। রবীন্দ্রনাথ বারবার তিনবার বিফল মনোরথ হলেন; কিন্তু নিজ সঙ্কল্পচ্যুত হলেন না। তাঁর শুভ সঙ্কল্পকে দৃঢ়ভাবে রূপায়িত করতে লাগলেন।

কালীগঙ্গা তীরবর্তী আদর্শ পল্লীর (লাহিনী) জরিপ করে নক্সা তৈরি করা হল। ইস্কুল, সমবায় ডাক্তারখানা, রাস্তাঘাট, পাড়া বিভাগ ইত্যাদি এবং বাজার নিয়ে একটা চমৎকার পরিকল্পনা তৈরি হল এবং কিছু কাজও আরম্ভ হয়ে গেল। বসতি স্থাপনের জন্য গৃহস্থ, চাকুরে, চাষি, তাঁতি, কুমোর, কর্মকার, জেলে প্রভৃতির জন্য প্লট তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন পল্লীর জন্য বাজার তৈরির কাজই প্রথমে ধরা হল পরীক্ষামূলকভাবে।

এইবার তাঁকে আবার এক যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হল নলডাঙ্গার রাজার সঙ্গে। কুষ্টিয়া মোহিনী মিলের পশ্চিমে নলডাঙ্গা রাজার বহুদিনের সুবিখ্যাত 'রাজারহাট' রবীন্দ্রনাথের সংকল্পিত লাহিনীর বাজারের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে,

এই আশঙ্কায় নলডাঙ্গারাজ রবীন্দ্রনাথকে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলেন। আইনের বিধানে লাহিনীতে নূতন বাজার স্থাপনে কোন বাধা নাই এবং লাহিনীর সংকল্পিত বাজার সুবিখ্যাত 'রাজারহাটের' কোন ক্ষতিই করবে না—এই কথা রবীন্দ্রনাথ জানালেন। কিন্তু নলডাঙ্গারাজ সে কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না; তাঁরা কুষ্টিয়ার তদানীন্তন ইউরোপীয়ান ম্যাজিস্ট্রেটের শরণাপন্ন হলেন। কুষ্টিয়ার ম্যাজিস্ট্রেট অপ্রকাশ্যভাবে নলডাঙ্গারাজের পক্ষাবলম্বন করলেন। এর ফলে ছোটখাট গুটিকতক মামলাও হয়ে গেল। ঠাকুর-জমিদার লাহিনীর বাজার বসাবার জন্য কয়েকখানা ঘরও তৈরি করে ফেললেন। রবীন্দ্রনাথ এই নব-সংগঠনের ব্যাপারে পদে পদে সমস্ত দেখাশুনা করছেন।

বাধাবিঘ্ন উদ্বেগ যতই বাড়ছে রবীন্দ্রনাথ ততই তাঁর সঙ্কল্প দৃঢ়তর করছেন। হঠাৎ এক গভীর রাতে ঠাকুর-জমিদারের লাহিনীর বাজারে অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেল। দুই প্রবল জমিদারের মধ্যে প্রবল রেষারেষি প্রবলতর হয়ে উঠল। এই সংবাদ টেলিগ্রামে রবীন্দ্রনাথকে জানান হল। প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রামে ম্যানেজারকে জানালেন তিনি ঐ দিনই আসছেন, রাণাঘাট স্টেশনে যেন ম্যানেজার তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। স্টেশনেই ম্যানেজার উত্তেজিত রবীন্দ্রনাথের আদেশ পেলেন ঐ অগ্নিদগ্ধ বাজারের ফটোগ্রাফ আনতে। রবীন্দ্রনাথ রাণাঘাটে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ঐ রাত্রিতে বাজারের ফটোসহ তিনি কৃষ্ণনগরে চলে এলেন। তখন রবীন্দ্রনাথের আবাল্যবন্ধু লোকেন্দ্র পালিত মহাশয় কৃষ্ণনগরে ম্যাজিস্ট্রেট। রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাপারে কৃষ্ণনগরে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃ-পক্ষকে জানালেন। কথিত আছে, এই ব্যাপারে কুষ্টিয়ার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বদলির হুকুম টেলিগ্রামে জানান হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ পরদিনই লাহিনীতে এসে অগ্নিদগ্ধ বাজার দেখে খুব মর্মাহত হলেন। বাজারের সঙ্কল্প তাঁকে পরিত্যাগ করতে হল। কিন্তু অন্য ব্যাপার নিয়ে নলডাঙ্গার রাজার সঙ্গে ঠাকুর-জমিদারের দীর্ঘকালব্যাপী মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। প্রায় দুবছর পরে এই মোকদ্দমায় ঠাকুর-জমিদার জয়লাভ করলেন এবং লাহিনী গ্রামে দীনু ঘোষের মুদাফতি প্রায় ৪০ বিঘা জমিতে ঠাকুর জমিদার পক্ষ দখল পেলেন। প্রায় তিন চার বৎসর রবীন্দ্রনাথ তাঁর দৃঢ় সংকল্প সাধনের জন্য লড়ে বিরক্ত হয়ে পড়লেন। ঐ আদর্শ পল্লীর ইতিহাস এখন সকলেরই অজ্ঞাত, কারণ কোন প্রামাণিক কাগজপত্রের অস্তিত্ব নাই। তৎসংক্রান্ত আসল দরখাস্তখানা বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে আছে। শিলাইদহ সদর

কাছারির চিঠিপত্রের বহু ফাইল ও নক্সা নষ্ট করে ফেলার জন্য সেগুলির নকল দেওয়া সম্ভব হল না। সেগুলি থাকলে পল্লী-সংগঠক রবীন্দ্রনাথকে জানা আরও সুবিধা হত। দীনু ঘোষের ঐ জমি পরে স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মোহিনী মিলের কর্তৃপক্ষ স্বর্গত রমাপ্রসন্ন চক্রবর্তী মহাশয়দের কাছে বিক্রি করেন। রমাবাবু এই জমির ইতিহাস জানতেন। তিনি এই জমির উপরে কুষ্টিয়া মোহিনী মিলের উপনিবেশ তৈরি করেন ; এই পল্লীর প্রধান রাস্তার নাম দেন 'ঠাকুর এভিনিউ।'

প্রায় পয়তাল্লিশ বছর পূর্বে শিলাইদহ কাছারি ও কুঠিবাড়ি থেকে শিলাইদহ ভদ্রপল্লীতে যাতায়াতের বিশেষ রাস্তা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ এজন্য দুটি রাস্তা এবং গোপীনাথদীঘির পশ্চিমে বাজার, ইস্কুল ও পূজা মন্দিরের জন্য গ্রামবাসী-দিগকে জমি দান করতে উৎসাহিত করেন ; কিন্তু গোঁড়া গ্রামপ্রধানগণ জমি দিতে স্বীকৃত হলেন না। দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তিনি কাজে নামলেন। তাঁর উপদেশে ম্যানেজার স্বর্গত বিপিনবিহারী বিশ্বাস বলে এবং কৌশলে যে দুটি সুন্দর রাস্তা ও বাজার তৈরি করলেন তার জন্য গ্রামের পরবর্তী বংশধরগণ আজও কৃতজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথ কর্তব্যে কঠোর, তাই তাঁর দুর্নাম রটনা করা সহজ ছিল।

জমিদারির মধ্যে মণ্ডলী প্রথা প্রবর্তনের ব্যাপারেও তাঁর সুদৃঢ় কর্তব্য-নিষ্ঠা ও অবিচল অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। এই নূতন ব্যবস্থা যখন তিনি জমিদারিতে প্রবর্তন করলেন, তখন কর্মচারীদের মধ্যে অপ্রকাশ্য বিদ্রোহ দেখা দিল ; প্রধান কর্মচারী ম্যানেজার জানালেন এই নূতন প্রথা কার্যকরী হবে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্কল্পে অটল ; পরিকল্পনায় তাঁর অসীম বিশ্বাস। অনেকবার ম্যানেজার তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অনুধাবন করবার যথেষ্ট সময় দিলেও ম্যানেজার তাঁর মত পুরোপুরি গ্রহণ না করায় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বরখাস্ত করেন। এ ব্যাপারেও তিনি কঠোর সমালো-চনার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

জমিদারি প্রথা ও ব্যবস্থার বহুদিনের দুর্নাম ও কলঙ্ক মোচনের জন্য তিনি অবিচলিতভাবে কঠোরহস্তে যে সংস্কার ও সংগঠনের আয়োজন করেন, সে বিষয়ে কোন জমিদার বিন্দুমাত্র চিন্তা করতেন না। আমাদের দেশের মত অনগ্রসর দেশে এই সমস্ত অভাবনীয় ব্যবস্থার জন্য রবীন্দ্রনাথকে বহুলোকের নিন্দা ও কঠোর সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছিল। আজ আমরা বুঝতে পারি, এইসব নিন্দা ও সমালোচনা কোনও মতেই রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্য ছিল না।

ম্যানেজারের প্রতিকূল আচরণের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ জমিদারিতে মণ্ডলী-গঠন ও তার কার্যপদ্ধতির সংস্কার ও প্রচলন বিষয়ে নিম্নস্থ কর্মচারীদের কিভাবে উপদেশ দিচ্ছেন তা নিম্নোদ্ধৃত চিঠি ক'খানা থেকে জানা যাবে—

সে সময়কার মণ্ডলী (বিভাগের) ম্যানেজার সতীশচন্দ্র ঘোষকে লিখছেন—

আশিসঃ সন্তু,

ডাক নজর অনুসারে জলির নজর খাজনা আদায়ের বৎসর এ নহে। প্রজাদের অবস্থা ও উৎপন্ন ফসলের পরিমাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই আদায়-তহশীল করা শ্রেয়। এ সম্বন্ধে ম্যানেজারকে পত্র লিখিয়াছি। তুমি তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কিরূপ ব্যবস্থা করা কর্তব্য আমাকে জানাইবে।

সর্বতোভাবে প্রজাদের সহিত ধর্মসম্বন্ধ রক্ষা করিয়া তাহাদের পূর্ণ বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে হইবে। আমরা যে সর্বপ্রকারে প্রজাদের হিত ইচ্ছা করি, তোমাদের ব্যবহারে তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে। তোমার অধীনস্থ মণ্ডলের অন্তর্গত পল্লীগুলির যাহাতে সর্বপ্রকারে উন্নতিসাধন হয় প্রজাদিগকে সেজন্য সর্বদাই সচেষ্ট করিয়া দিবে। নূতন ফসলের প্রবর্তনের জন্যও বিশেষ চেষ্টা করিবে। ইতিপূর্বে তোমাদের প্রতি যে মুদ্রিত উপদেশ বিতরণ হইয়াছে তদনুসারে কাজ করিতে থাকিবে।

প্রজাদের প্রতি যেমন ন্যায় ধর্ম ও দয়া রক্ষা করিবে, তেমনি অধীনস্থ কর্মচারীদিগকে বিশেষভাবে কর্মের শাসনে সংযত করিয়া রাখিবে। কর্মচারী-দের কোন প্রকার শৈথিল্য বা নিয়মভঙ্গ আমি কখনই মার্জনা করিব না। যাহাতে তোমার অধীনস্থ তোমার আমলাগণ প্রশ্রয় পাইতে না পায় এ সম্বন্ধে তোমাকে অত্যন্ত কঠিন হইতে হইবে। তুমি স্বয়ং যেরূপ অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত কাজ করিবে, তাহাদের নিকট হইতেও তেমনি করিয়া বিনা ওজরে কাজ পুরাপুরি আদায় করিয়া লইবে। কর্মচারিগণ সম্পূর্ণ মনে প্রাণপণ পরিশ্রমে কাজ করিতেছে জানিতে পারিলে তাহারা পুরস্কৃত হইবে। ইতি—

২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ম্যানেজারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে এই কর্মচারী আরও গুরুতর কিছু অভিযোগ করায় দশদিন পরেই কর্মচারীকে উৎসাহিত করবার জন্য পুনরায় লিখছেন—

আশিসঃ সন্তু,

তুমি তোমার কর্তব্য পালন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিবে না। যাহাতে

প্রজাদের হিতকার্য করা হয় এই দিকে একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিবে। আদায় তহশীলের কার্যে যদি অতিরিক্ত লোকের আবশ্যক হয় তবে রিপোর্টের দ্বারা আমাকে জানাইলেই তাহার প্রতিকার হইবে।

তোমার বেতনের যে অংশ কাটা গিয়াছে এবারকার মত তাহা মাপ করিয়া দেওয়া হইবে।

শরৎ সরকারকে মণ্ডলীর সেরেস্তা গঠনের জন্য পাঠানো গিয়াছে। যেভাবে কাজ করিতে হইবে শরৎ তাহার উপদেশ দিবে এবং কার্যনির্বাহের জন্য যেরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্যক সে সম্বন্ধে সে রিপোর্ট করিবে। যাহাতে জমা, স্মুমার ব্যবস্থা প্রভৃতি সকল কর্মই মফঃস্বল সেরেস্তায় সম্পন্ন হইতে পারে সেই রকম বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ইতি— ২রা আষাঢ়, ১৩১৫।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুনরায় বাধাপ্রাপ্ত কর্মচারীকে কঠোরভাবে উপদেশ দিচ্ছেন—

আশিসঃ সন্তু,

তোমার সাধ্যমত এবং উচিতমত কাজ করিবে। শৈথিল্যও করিবে না, অন্যায়ও হইতে দিবে না। ইহাতে অসন্তোষের কোনো আশঙ্কা করিও না। উজির ও ছাবের বরকন্দাজদিগকে যেরূপ শাস্তি দিয়াছ, এবার তাহাদের শিক্ষার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। ভবিষ্যতে এরূপ ঘটিলে তাহাদিগকে বরখাস্ত করা কর্তব্য হইবে।

যদি খয়রাতুল্যাকে কালীগ্রামে আনিয়া কালোয়া মণ্ডলীকে অন্যান্য মণ্ডলীর মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয়, তবে তোমার অংশে কালোয়া ও রঘুনাথপুর লইতে পারিবে কিনা লিখিবে। এ প্রস্তাব সম্বন্ধে কেহ যেন কিছু না জানিতে পারে। ইতি— ১৯শে শ্রাবণ, ১৩১৫।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিজ জমিদারির মামুলি পুরনো প্রথার আমূল সংস্কার করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কঠোর হস্তে এই মণ্ডলী-প্রথার প্রবর্তন করেন। এ প্রথা অনেকটা পঞ্চায়েৎ প্রথার মত, জমিদারির প্রধান কর্মকেন্দ্রের কাজ পল্লীগুলির মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। এর দ্বারা প্রজা ও জমিদারের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হতে পারে, জমিদারির কাছারি শুধু খাজনা আদায়ের যন্ত্রবিশেষ না হয়। এই নূতন প্রথা প্রচলন করতে রবীন্দ্রনাথকে অবিচলিত নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের সঙ্গে আমলা কর্মচারীদের বহু জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করতে হয়েছিল এবং দৃঢ়হস্তে এই

নূতন সংস্কারকে বহুদিন পর্যন্ত পরিচালিত করতে হয়েছিল। কিন্তু এর শুভ ফল পাবার আগেই এই নতুন প্রথা বন্ধ করতে হয়েছিল ব্যয়বাহুল্যের জন্য। এর পর রবীন্দ্রনাথ জমিদারির কাজ ছেড়ে দেন। এ সম্বন্ধে তাঁর মনের ভাবটি 'রায়তের কথা'-র (প্রমথ চৌধুরীর প্রণীত) ভূমিকায় সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন।

সৃষ্টি ও সংস্কারকার্যে রবীন্দ্রনাথের দুর্দান্ত সাহস, সুদৃঢ় নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় রবীন্দ্রচরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য।

স্বদেশী মেলা

১৩১১ সালে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা করলেন 'স্বদেশী সমাজ' তখনকার মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে। বাঙালিকে আত্মস্থ হতে আহ্বান করলেন, সমাজকে পুনর্গঠন করতে পরামর্শ দিলেন, পরানুবাদ পরানুকরণ ছাড়তে বললেন; দেশের নাড়ির সঙ্গে সবাইকে মিলতে বললেন। বক্তৃতা করেই কর্তব্য শেষ করলেন না। 'স্বদেশী সমাজের' নিয়মাবলি ছাপালেন, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে প্রচার করলেন, সভা করলেন, সভ্য জোটালেন প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়ে। বক্তৃতায় হাততালি পেয়েই খুসি হয়ে আত্মতৃপ্তি পেলেন না, যেমন আজকাল হয়েছে। লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়ে প্রচার করলেন, দেশ সংগঠনের পথের সন্ধান করে দিলেন। তথাকথিত বড় লোকেরা শুধু বাহবাই দিলেন, কাজে এগোলেন না। পরিশ্রান্ত কবি তবু বিরক্ত হলেন না, গাইলেন—

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে একলা চলরে।

দেশের বড় বড় সমস্যা নিয়ে যুবক রবীন্দ্রনাথ কথায় ও কাজে কী বিরাট আন্দোলন তুলেছিলেন তা অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' বইতে পাওয়া যাবে। কবি ও কর্মবীর একসঙ্গে একদেহে রবীন্দ্রনাথ চিরকালই—তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। পাবনা সম্মেলনে আহ্বান জানালেন—আবেদন-নিবেদন ছেড়ে কাজে লেগে যাও, গ্রামে যাও, জাতির ভিত পাকা করে গাঁথো। হিন্দু-মুসলমান এক হও। মাতৃভাষায় সভাসমিতি করো, নইলে কোটি কোটি নিরক্ষর লোকের প্রাণে

তোমার উপদেশ পৌঁছুবে কেন? শুধু তাই নয়; নাটক লিখলেন 'প্রায়শ্চিত্ত'। নিজে 'ধনঞ্জয় বৈরাগী'র ভূমিকা অভিনয় করে প্রজার শক্তি কোথায়, কিসে সে শক্তি জাগবে তার সন্ধান দিয়ে 'সত্যাগ্রহ' মন্ত্রের প্রথম আহ্বান জানালেন। এ সমস্ত অগ্নিমন্ত্রের কল্পনাও তখন কেউ করেন নি।

'স্বদেশী সমাজের' রূপ দিতে তিনি কী রকম মেতে উঠেছিলেন, তা আমি জানি। নিজের প্রত্যক্ষ জানা গল্প বলছি।

কবি-জমিদার মাথা ঘামাচ্ছেন শিলাইদহে খুব প্রকাণ্ড একটা মেলা করতে হবে। পল্লীর আমোদ-প্রমোদ, কুটির শিল্প, শরীরচর্চা, আনন্দ আর শিক্ষা হবে তার অঙ্গ। আমার বাবা (শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী) কুঠিবাড়িতে কিছুকাল শমীন্দ্রনাথকে পড়িয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে কারো কাছে বিশেষ সাড়া পান নি। তিনি বাবাকে বললেন, 'গাঁগুলো মরে গেছে, জাগাতে হলে বেশ বড় একটা মেলা করা দরকার'। বাবা অপ্রত্যাশিতভাবে একথা শুনে লাফিয়ে উঠলেন। তিনিও তরুণ। রবীন্দ্রনাথ সব প্ল্যান বুঝিয়ে দিলেন; বাবা একেবারে উৎসাহে মেতে উঠলেন। তখন তিনি গ্রামের ইস্কুলের হেড মাস্টার, গ্রামের পঞ্চায়েতের প্রেসিডেণ্ট ও অধিকারী পরিবারের কর্তা। রবীন্দ্রনাথ ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছেন।

পাঁজিপুঁথি শাস্ত্রপুরাণ ঘেঁটে কিছু হল না। দারুণ উৎসাহ, দেরি হলে হয়ত জুড়িয়ে যাবে। ভেবে চিন্তে ঠিক হল 'কাত্যায়নীর' মেলা হবে। মা দুর্গাই কাত্যায়নী। শীত পড়েছে, কিন্তু মা দুর্গার মতই প্রতিমা তৈরি হল কাত্যায়নীর। সে যে কী বিরাট বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা, কি বলব! গোপীনাথ মন্দিরের সামনে 'খোলাটে' প্রকাণ্ড মণ্ডপ তৈরি হল, প্রতিমা তৈরি হল। সময়ের অভাব, তাই রাত্রে গ্যাসের আলো জ্বালিয়ে গাঁয়ের মুরুব্বি, ছেলেবুড়ো সবাই খাটছেন। আহারনিদ্রা ভুলে গেছেন। যাত্রা, থিয়েটার, পাঁচালি, কবি, তরজা, কীর্তন, বাউল ইত্যাদির বিরাট আয়োজন সাতদিন ধরে। মেলা দীর্ঘদিন চালাবার জন্যে কেউ বললেন মেলার নাম হোক 'করোনেশন মেলা'।* রবীন্দ্রনাথের ঘোর আপত্তিতে নাম হল 'কাত্যায়নীর মেলা'। কামার, কুমোর, ছুতোর মিস্ত্রি, জোলা সবাইকে ডাকা হল তাদের শিল্পসম্ভারে মেলা সাজাতে। লেঠেল, কুস্তিগিরদের আনা হল তাদের কসরৎ

---

* সম্ভবত ১৯০১ কি ১৯০২ সালে তৎকালীন ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের করোনেশন উৎসব স্মরণীয় করবার জন্যই গ্রামবাসীরা এই নামকরণের প্রস্তাব করেছিলেন।

দেখাবার জন্যে। এইভাবে বিরাট মেলা হল পর পর তিন বছর। শেষ বছরে আমার বাবা মারা গেলেন ঠিক সেই সময়ে, যখন প্রতিমায় রং দেওয়া হচ্ছে।

'কাত্যায়নীর মেলা' গেল উঠে; রবীন্দ্রনাথের মাথার মধ্যে ঐ স্বদেশী মেলার নানা কল্পনা তখনও জাল বুনছে। দুতিন বছর যেতেই আবার তাঁর প্রস্তাব, আবার অন্যখানে অন্য নামে মেলা হবে; এবার হল 'রাজরাজেশ্বরীর মেলা'। তখন ম্যানেজার ছিলেন বিপিন বিশ্বাস, অদ্ভুত মানসিক শক্তিতে শক্তিমান পুরুষ। তিনি একাই একশো। দশমহাবিদ্যার 'ষোড়শী' মূর্তি তৈরি হল। নূতন করে প্রকাণ্ড পাকা মণ্ডপ তৈরি হল। জমিদারির মধ্যে যত প্রকার পল্লীসুলভ আমোদ-প্রমোদের দল ছিল তাদের সকলকে আনা হল, পল্লী-শিল্পীদের আনা হল, তারা ভারে ভারে তাদের পণ্যসম্ভার নিয়ে মেলা সাজাল, এবারে কলকাতা থেকে ত্রৈলোক্যতারিণী আর প্রসন্ন নিয়োগীর যাত্রার দল আনা হল। লেঠেল, কুস্তিগিরদের আনা হল।

মেলা হল পনেরদিন ব্যাপী। নিয়োগীর যাত্রাদলের 'দেবযানী' অভিনয় এখন আমার চোখের উপর ভাসছে; আমি ঐ দলের ম্যানেজারের সঙ্গে খুব ভাব করে নিয়েছিলাম। কাত্যায়নীর মেলা ও রাজরাজেশ্বরীর মেলা উপলক্ষে রবীন্দ্র-বন্ধু আচার্য জগদীশচন্দ্র ও নাটোররাজ জগদিন্দ্রনাথ এসেছিলেন; এঁরা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন অনেকে এসেছিলেন; কৃষ্ণনগর কুষ্টিয়া থেকেও হোমরাচোমরা হাকিমরা এসেছিলেন।

একটা মজা এই যে, এই সব বিরাট অনুষ্ঠানের কর্তা ও উৎসাহদাতা রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নেপথ্যে থাকতেন। এ সমস্ত অনুষ্ঠানের কর্তৃত্ব ছিল গ্রামের লোকদের হাতে। উদ্দেশ্য, গ্রামের লোক আত্মবিশ্বাসে, আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠুক। ঐ দুই মেলায় বিখ্যাত শিবু সাহার কীর্তন হয়েছিল একাদিক্রমে পাঁচ ছয় দিন ধরে। লালন ফকিরের শিষ্যদের বাউল গানও হয়েছিল কয়েক-দিন। লাঠিখেলা নিয়ে লেঠেলদের মধ্যে বিবাদ হওয়ায় রাজরাজেশ্বরীর মেলায় খুব গোলমাল হয়, সেজন্য রবীন্দ্রনাথ খুব বিরক্ত হয়েছিলেন। সেদিনের কথা মনে হলে ভাবি—

কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ।

এই রকম সুপরিচালিত স্বদেশী মেলা গ্রামে গ্রামে, এমনকি শহরেও প্রচলিত হলে এই নিরানন্দ অবজ্ঞাত দেশ গ্রামীণ সংস্কৃতির পথে কতখানি

সঞ্জীবিত ও উৎসাহিত হতে পারে সে বিষয়ে তিনি বহু কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এমনকি প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষদের স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁদের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা, ইস্কুল, কলেজ, সভাসমিতি বা লাইব্রেরির চেয়েও তাঁদের স্মরণার্থ বার্ষিক মেলার প্রচলনকে শ্রেষ্ঠ ও স্বাভাবিক উপায় বলে পরামর্শ দিয়েছেন তাঁর 'স্মৃতিরক্ষা' প্রবন্ধে—

মেলায় যে স্মৃতি প্রচারিত হয়, তাহা চিরদিন নবীন, চিরদিন সজীব, এককাল হইতে অন্যকাল পর্যন্ত ধনীদরিদ্রে, পণ্ডিতে মূর্খে মিলিয়া তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যায়। তাহাকে কেহ ভাঙিতে পারে না— ভুলিতে পারে না। তাহার জন্য কাহাকেও চাঁদার খাতা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না, সে আপনাকে আপনি অতি সহজে রক্ষা করে।

দেশের শিক্ষিত-সমাজ এই কথাটা একটু ভাবিয়া দেখিবেন কি ? রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিকে বিদেশী উপায়ে খর্ব না করিয়া, ব্যর্থ না করিয়া, কেবল নগরে কয়েকজন শিক্ষিত লোকের মধ্যে বদ্ধ না করিয়া দেশ-প্রচলিত সহজ উপায়ে সর্বকালে এবং সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করিবার চেষ্টা করিবেন কি ?

রবীন্দ্রস্মৃতিরক্ষার জন্য যাঁরা আজ বিশাল বিরাট আয়োজনে মাথা ঘামাচ্ছেন, তাঁদের কাছেও আমি এই প্রশ্ন তুলছি।

ম্যানেজার এডওয়ার্ড সাহেব

নামটি ছিল তাঁর এডওয়ার্ড সাহেব, পুরো নামটি কি তা জানতে পারা যায় নাই। তিনি শিলাইদহে এসেছিলেন যখন আমাদের বয়স নয় দশ বছর অর্থাৎ আন্দাজ তেরশো দশ কি এগার সালে। লরেন্স সাহেবের মত রথীন্দ্রনাথের ইংরেজিশিক্ষক হিসাবে নয়, রবীন্দ্রনাথের জমিদারির ম্যানেজররূপে।*

এডওয়ার্ড সাহেব তাঁর মেম ও ছেলে নিয়ে শিলাইদহের কুঠিবাড়িরই একতলাতে বাসা বাঁধলেন। আমরা তখন যেতাম কুঠিবাড়িতে ফুলের বাগান

* এমন এক সময় ছিল যখন ধনী অভিজাত জমিদারদের মধ্যে কেউ কেউ সাহেব ম্যানেজার রাখবার পক্ষপাতী ছিলেন। বিখ্যাত মেদিনীপুর জমিদারি কোম্পানি লিমিটেড-এর মালিক ও পরিচালকবর্গ ছিলেন ইউরোপীয়। তাঁদের শাসন-সংরক্ষণের খুব খ্যাতি ছিল।

দেখতে, ফুলের রানি নানান রূপের নানান রংয়ের গোলাপ-সুন্দরীদের দেখতে। কোন ফুলটি কুঁড়ি, কোনটি আধফুটন্ত, কোনটি ফুটে রূপের গরবে হেসে বাতাসে ডালের উপর ঢলে পড়ে রংয়ের জৌলুসে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে; কোনটি গোলাপি, কোনটি গাঢ় লাল, কোনটি ফিকে লাল, কোনটি হলদে, কোনটি ধবধবে সাদা, কোনটির থোপায় থোপায় কতটি কুঁড়ি, কোনটি ঝরে পড়ে কাঁদছে, পাপড়িগুলো মাহারা ছেলের মত কেয়ারির উপর পড়ে করুণ নয়নে চেয়ে আছে! এইসব সোনার ছবি মনের মধ্যে এঁকে রাখতাম। দিনরাত ঐ ফুলপরিদের লীলা দেখে বিহ্বল হয়ে স্বপ্ন দেখতাম। সাহেব বাগানে এলে পালিয়ে যেতাম। সুযোগ পেলে দু একটা ফুল চুরিও করতাম তা বলাই বাহুল্য।

সাহেব জমিদারির ম্যানেজারি করতেন কিনা জানি না। আমরা দেখতাম প্রায়ই তাঁর হাতে থাকত বন্দুক। হাফ্‌প্যান্ট পরা, রোদের সময় মাথায় টুপি, সেকালের পাড়াগেঁয়ে অদ্ভুত গৌরাঙ্গ অবতার। তিনি যে সাহেব ম্যানেজার তা তাঁর কাজকর্মে আদৌ বোঝা যেত না। যেন তিনি শিকারি সাহেব।

প্রায়ই সাহেব শিকারে যেতেন। সঙ্গে থাকত শিকারি বরকন্দাজেরা আর বুনো প্রজাদের কেউ কেউ। তখন শিলাইদহের বিখ্যাত শিকারি বিশ্বনাথ পরলোকে। চামরু খুব বুড়ো। চামরুর ভাইপো সাধু বুনো তখন বুনোপাড়ার বন্দুকধারী শিকারি এবং সাহেবের সঙ্গী।

শিলাইদহে তখন বাঘ ছিল না। জঙ্গল অবশ্য ছিল। তবে রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা'য় যে জঙ্গুলে শিলাইদহের বর্ণনা পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক সভ্যভব্য। সাহেবের শিকারের ঠেলায় অনেক শুয়োর ভবলীলা সম্বরণ করেছিল। শুয়োর বাদেও বাঘডাঁসা, বনবিড়াল, খাটাস্, কোন কোন বছরে নবাগত দুচারটি গোবাঘা সাহেবের বন্দুকের গুলিতে দমাদ্দম্ প্রাণ হারাত। আমরা বলতাম, 'শুয়োর-মারা সাহেব' কারণ সাহেব প্রায়ই দলবল নিয়ে বন্দুক হাতে বনে জঙ্গলে ঘুরতেন। লোকে বলত সাহেব নাকি হাঁসের ডিম, মুরগির ডিম আর কচ্ছপের ডিম খেতেন রাক্ষসের মত। তাঁর চাকরবাকর হরেক রকম ডিম যোগাড় করে হয়রান হয়ে যেত।

তিন চার মাস পরে কুঠিবাড়িতে গিয়ে দেখি, সেখানে সাহেব নেই, মেমও নেই, বন্দুকও নেই, শিকারির দলও নেই, তাঁর ঘোড়াও নেই। শূন্য কুঠিবাড়ি। আমরা নির্ভয়ে বাগানে বাগানে বেড়াতে লাগলাম। জলজ্যান্ত সাহেবটা সত্যিই সপরিবারে কোথায় উধাও হলেন? শুয়োররা বাঁচল?

এর অনেক পরে সাহেবের ম্যানেজারির গল্প শুনেছিলাম। কি ভেবে যেন সাহেব ঠাকুরবাবুদের জমিদারির ম্যানেজার হয়ে আসেন! অবশ্য রবীন্দ্রনাথই তখন জমিদারি দেখাশুনা করতেন।

রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে এসে বোটেই থাকতেন। তিনি সাহেব ম্যানেজারকে জমিদারির কাজকর্ম সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন করতেন। সাহেব নাকি জমিদারির অবস্থা দেখে হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, 'আপনার জমিদারির অর্ধেকের বেশি প্রজা গরিব। অথচ জমিদারির এত কাগজ যে সেগুলো কোথাও সরাতে হলে রীতিমত মালগাড়ি ভাড়া করতে হয়। আর এত খরচ করে জমিদারির মুনাফা পাবেন কি করে?'

রবীন্দ্রনাথ সাহেবের কথা শুনে প্রথমে অবাক হলেন, তারপর হাসলেন।

ম্যানেজারের নিম্নস্থ আমলাদের অর্থাৎ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার, পেশকার, সার্ভেয়ার, ইনস্পেক্টর ইত্যাদির কাছে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কি? ম্যানেজার কাজ করতে পারবে তো?' তাঁরা সবাই বললেন 'সাহেবের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল জমাওয়াশীল-ভীতি। তিনি 'জমাওয়াশীল বাকি'র কাগজ কিছুতেই বুঝতে পারেন না। বলেন, 'এই ঝামাওশীল্ হামাকে পাগল করবে!'

শুধু তাই নয়। জমিদারি সেরেস্তায় সেকালের অতি প্রয়োজনীয় বড় বড় নিকাশি কাগজ সাহেব একেবারেই পছন্দ করতেন না; শুধু বুঝতেন, প্রজাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করবার নানা রকমের উপায়। সেই জন্য মহালে মহালে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরতেন, তাতে প্রজারা খুব ভয় পেত, ভাবত সাহেব বুঝি রেগে বন্দুক দিয়ে তাদের গুলি করবেন। বড় বড় জমিদারি কাগজ দেখলেই সাহেব 'মাই গড্' বলে মাথায় হাত দিতেন। 'জমাওয়াশীল বাকির' কাগজকে তিনি ভয় করতেন বাঘের চেয়েও বেশি। বলতেন এক এক মহালের 'জমাওয়াশীল' কাগজ এক গাড়ি। এই রকম করে যদি বছরের পর বছর ঐ সাংঘাতিক বাঘা কাগজ জন্মলাভ করে তবে আদায়-ওয়াশীল কাজ বন্ধ করতে হবে আর ঐ দুশমন কাগজ রাখবার জন্য একটা বড় বাড়ি বানাতে হবে।

সেকেলে জমিদারি সেরেস্তার 'জমাওয়াশীল বাকির' যে ফরম ছিল তা সত্যিই খুব জটিল আর বহু-ব্যাপক একটা বিশিষ্ট নিকাশি কাগজ। ফরমটাও একটা তক্তপোষ-জোড়া বিরাট। প্রত্যেক প্রজার জমিজমার বিস্তারিত পরিচয়, তার খাজনার পরিমাণ, কমবেশির বিবরণ, আদায়ের বিবরণ ও বাকির রকমারি পরিচয়ে প্রায় দুশো কলম-সম্বলিত বিরাট নিকাশি কাগজ। তা

দেখলেই সাধারণ লোকের মাথা ঘুরে যায়। এতে বিদেশী সাহেবের চক্ষু চড়কগাছ হবে তাতে আর বিচিত্র কি!

রবীন্দ্রনাথ সাহেবকে একা কাছে ডেকে নিয়ে ঐ মারাত্মক কাগজ আর জমিদারিসংক্রান্ত অনেক বিষয় আলোচনা করে হতাশ হয়ে পড়লেন। তিনি দেখলেন, সাহেব খাজনা সেলামি আর বাকি বকেয়া টাকা কড়ায় গণ্ডায় কষে আদায় করাটাই বেশি বোঝেন। তিনি চান শুধু আয়, তা ভিন্ন আর যে কোন কাজ আছে তা তিনি বড় একটা বোঝেন না।

তারপরে তিনি অন্যান্য আমলাদের সামনে সাহেবকে নিয়ে জমিদারির কাজকর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলেন। সাহেব কলম কামড়াতে কামড়াতে উত্তর দিতে লাগলেন। এমন সময়ে একজন আমলা জমিদারির একটি স্বত্বের মামলার একগাদা দলিল দস্তাবেজ বস্তাবন্দী করে এসে হাজির। কাগজের বহর দেখেই সাহেবের মুখচোখ রাঙা হয়ে উঠল। তিনি মাথায় হাত দিয়ে হতাশভাবে বললেন, 'এই কাগজগুলো পড়তেই একজন লোক বুড়ো হয়ে যাবে, মামলা করবে কখন?'

রবীন্দ্রনাথ হো হো করে হেসে বললেন, 'সাহেব, এটা বাংলা দেশের জমিদারি, এটা ইউরোপের কোন ফার্ম নয়। এখানে প্রজা আছে, তাও গরিব প্রজা, আমরা নানা উপায়ে গরিব করেই রেখেছি। তাদের জমিজমা, খাজনার হিসাবপত্র, আদায় উসুল জরিপ জমাবন্দী, তাদের সুবিধা অসুবিধার মীমাংসা, মামলামোকদ্দমা, এই সব নিয়েই তো আমার জমিদারি। গরিব প্রজাও চাই, আবার তার হিসেবকিতেবের কাগজপত্রও চাই। আমরা তো আর প্রিন্স নই, আমাদের ইনকাম্ যা আছে, তাতেই আমরা খুশি। আয় বাড়াবার যেসব উপায় হতে পারে তা আমাদের দেশে কল্পনার অতীত। এই সব নিয়েই আমার জমিদারি। তোমাকে তারই ম্যানেজমেণ্ট করতে হবে প্রজাকে আর জমিদারকে বাঁচিয়ে।'

সাহেব মাথা চুলকিয়ে খানিক ভেবে বললেন, 'এ জমিদারির ম্যানেজমেণ্ট করা আমার কর্ম নয়। এ বড় কঠিন কাজ, আমার ধাতে সইবে না।'

সাহেব তার পরে ম্যানেজারি ছেড়ে দিয়ে তলপিতলপা গুটিয়ে চলে গেলেন শিলাইদহ থেকে। আবার কুঠিবাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে রইল। রবীন্দ্রনাথ একজন বিচক্ষণ বুদ্ধিমান পুরনো কর্মচারীকে ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করলেন।

সাহেব শিলাইদহ ছেড়ে যাবার সময় আমলাবাবুদের করমর্দন করে বিদায়

অভিবাদন জানিয়ে বলেছিলেন, 'পোয়েট টেগোরের জমিদারিটা মোটেই তাঁর কবিতার মত নয়। এ বড় বিষম ঠাঁই, এখানে কবিকে খুব ভুগতে হবে। তাঁর আইডিয়া, তিনি জমিদারিকেও কবিতা বানিয়ে ফেলবেন; কিন্তু তা পারবেন না; তাঁকে অনেক ঠকতে হবে। আমি তাঁর কাজ করতে পারলাম না; খুব দুঃখের সঙ্গে কাজে ইস্তাফা দিয়ে চলে যাচ্ছি। থাকতাম আরও কিছুদিন তাঁর আইডিয়া বুঝবার জন্যে, কিন্তু তোমাদের ঐ ঝামা-ওশীল আমায় তাড়ালে।* সাহেব নিজে হেসে সবাইকে হাসিয়ে শিলাইদহ ত্যাগ করলেন।

তাঁতের কারখানা

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর, ১৩১২ বঙ্গাব্দের ৩০শে আশ্বিন তারিখে ব্রিটিশ শাসনের কার্জনি আমলে বঙ্গব্যবচ্ছেদের আদেশ ঘোষিত হল। বাঙালি সদম্ভে সে দেশবিভাগ অস্বীকার করে বসল। বাংলার তথা ভারতের ইতিহাসে স্বাধীনতা সংগ্রামের নবযুগ, নতুন প্রভাতের উদয় হল। সেই গৌরবদীপ্ত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

বঙ্গব্যবচ্ছেদের ফলে পদ্মার ঢেউয়ের মত সারাদেশে আন্দোলনের পর আন্দোলনের তরঙ্গ বয়ে চলল। কিন্তু আন্দোলনের সাফল্যের জন্য এই মৃতপ্রায় দেশ, জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সংগঠনের কোন চেষ্টা দেখা গেল না। এর জন্যে রবীন্দ্রনাথের মনে একটা প্রস্তুতির ক্রিয়া চলছিল অনেকদিন ধরে। রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথই জাতির সামগ্রিক সংস্কার ও সংগঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন; ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত কবিতা 'এবার ফিরাও মোরে' রচনার পর দেশ ও জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে আরও প্রবন্ধ, কবিতা রচনা করলেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে 'স্বদেশী মেলা' প্রবন্ধ পাঠ ও তার জন্য সক্রিয় আন্দোলনও তিনি কম করেন নি। বিলাতি বর্জন আন্দোলনে বিলাতি বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব হয়ে গেল।

* কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ আমেরিকায় শিক্ষা শেষ করে শিলাইদহে এসে ইংরেজি কায়দায় কার্ড পদ্ধতি চালু করতে খুব পরিশ্রম করেছিলেন। জমিদারি সেরেস্তায় এ এক অভিনব ব্যাপার। আমি স্বচক্ষে তাঁর প্রচলিত পদ্ধতির ভাঙাচোরা ইনডেক্স বক্স দেখেছি। তিনি চর মহালের জরিপ জমাবন্দীর জটিল নক্সা-আদি তৈরির নতুন পদ্ধতি চালু করতে চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড় না হলে আমাদের স্বদেশের লজ্জা নিবারণের কি ও কতটুকু ব্যবস্থা আছে, সে বাস্তব অবস্থাটা দেশনেতারা কতটুকু চিন্তা করেছেন? এইরকম সংগঠনমূলক বহু সমস্যা তাঁর চিন্তারাজ্যে আলোড়ন তুলেছিল। কাগজেকলমে বক্তৃতায় এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের সন্ধান না পেয়ে দেশ-জোড়া আন্দোলনের উপর আস্থা হারিয়েছিলেন এবং দেশনেতাদেরও বাস্তব অবস্থায় সংগঠনের কোন চেষ্টা না দেখে নিজের একক সাধ্য ও শক্তির উপর নির্ভর করে যে সমস্ত সংগঠনের কাজে সক্রিয়ভাবে নেমেছিলেন তার একটি হচ্ছে নিজ জমিদারিতে বয়ন বিদ্যালয় বা তাঁতের-কারখানা প্রতিষ্ঠা ও কলিকাতায় স্বদেশী শিল্পের দোকান প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রজীবনীতে এই সমস্ত বিষয়ের সামান্য উল্লেখ আছে, কারণ এবিষয়ের কোন প্রামাণিক তথ্যের অভাব।

এই তাঁতের কারখানা আমি দেখেছি। তখন আমার বয়স আট বৎসর। বাল্যের সেই স্মৃতি আজও ভুলি নি। তাঁতের কারখানার কয়েকজন তাঁতি শিক্ষক পূর্ববঙ্গবাসী যুবক আমাদের বাড়িতে খেতেন ও থাকতেন। তাঁদের একজন ছিলেন যদুবাবু বা যদুমাস্টার, আমাদের বাড়িতে পড়াতেন আর আমার ভাগ্নে নরেন্দ্র মজুমদারকে 'নলিভরা' শেখাতেন। আমরাও বাড়িতে চরকায় নানা রংয়ের সুতোর 'ছিকলি' গুছিয়ে দিতাম। এই বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বিবরণ দিচ্ছি।

ঢাকা বিক্রমপুরনিবাসী শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অতি শৈশবেই মামলা-মোকদ্দমায় পৈতৃক সম্পত্তি হারিয়ে পিতার যাজন ব্যবসায়ে সাহায্য করতেন ও গ্রাম্য পাঠশালায় পড়তেন। তাঁর পিতা ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ, যজমানের দান ও দক্ষিণায় অতিকষ্টে সংসার চালাতেন। সেজন্য যোগেশবাবু প্রতিকূল ঘটনায় লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে পিতার সাহায্যকারী হিসাবে যজমান-বৃত্তি গ্রহণ করলেন। তবুও বাংলা বই পেলেই পড়ে নিতেন। ইস্কুলকলেজের বিদ্যালাভের দুরাশা ত্যাগ করে প্রকৃতির পাঠশালাতেই তাঁর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা বাড়তে লাগল। এর মধ্যে দুই বৎসরের মধ্যেই পিতার মৃত্যুর পর দারুণ অভাবের মধ্যে সংসার প্রতিপালনের জন্য নানাস্থানে কাজের সন্ধান করতে করতে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনে পড়লেন যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জমিদারি শিলাইদহে তাঁতের কারখানা খুলেছেন। সেখানে কাজের জন্য কারিকর ও শিক্ষার্থী প্রয়োজন। তিনি রবি ঠাকুরের কবিতা পেলেই পড়ে মুগ্ধ হয়ে অনেক কবিতা ও গান মুখস্থ করে ফেলতেন। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে

তবে একলা চল রে' গানটিতে ঐ দুর্দিনে উদ্দীপনার আলোকশিখার সন্ধান পেলেন।

এই অবস্থায় পূর্ববঙ্গে কয়েকটি বন্দরে পাটের আড়তে কাজ করবার পর বিরক্ত হয়ে তিনি তাঁতের কাজ শিখবার জন্য রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহের তাঁতের ইস্কুলে ভর্তি হবার আশায় দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন।

সতের বছরের অসহায় বালক। ট্রেনে কুমারখালি স্টেশনে নামলেন শেষরাত্রে। বিদেশ বিভুঁই—কিছুই চেনেন না—ছেলেমানুষ! অগ্রহায়ণ মাসের শীত পড়েছে। কুমারখালি থেকে লোকের মুখে শুনতে শুনতে শিলাইদহ অভিমুখে রওনা হলেন।

বেলা ক্রমশ বেড়ে গেল। অপরিচিত পরিবেশ। শিলাইদহ গ্রামে পৌঁছে শ্রান্তক্লান্ত দেহে শুনতে পেলেন পাশেই গোপীনাথদেবের মন্দির থেকে কাঁসর ঘণ্টা বাজছে। কয়েকজন প্রসাদপ্রার্থীর কাছে শুনলেন—এখনই গোপীনাথের প্রসাদ বিলি হবে; অতিথিরাও প্রসাদ পেয়ে থাকেন। ক্ষুধার্ত বালক গোপীনাথের প্রসাদ পেলেন। মন্দিরের ছায়াস্নিগ্ধ শান্ত প্রাঙ্গণে বসে তৃপ্তির নিশ্বাস ছেড়ে খানিক বিশ্রাম করে শিলাইদহ কাছারির দিকে রওনা হলেন।

শিলাইদহ কাছারির মাঠে ঢেউতোলা টিনের প্রকাণ্ড দোচালা তাঁতের ইস্কুল। বেলা ১২টা। প্রাঙ্গণে 'টানাপোড়েনের' সুতো খাটানো রয়েছে; তিন চার জন তাঁতিও কাজ করছে। ইস্কুল খুলবে আবার বেলা তিনটায়। তাঁতিদের সঙ্গে আলাপে জানতে পারলেন রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে নেই, বেলা তিনটায় ম্যানেজার বামাচরণ বসুর সঙ্গে কথাবার্তা বললে তাঁতের ইস্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা হবে। যথাসময়ে যোগেশবাবু ম্যানেজার বামাচরণবাবুর নিকট তাঁর আবেদন পেশ করলেন। অনেক দূর থেকে শিক্ষার্থী বিজ্ঞাপন পড়ে শিলাইদহে এসেছে। তিনি কাজ শিখবার ব্যবস্থা করে দিলেন। 'পেটখোরাকি' পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা ঠিক হল। প্রথমে শিখতে হবে সুতোর কাজ।

তাঁতের ইস্কুলের অধ্যক্ষ তাঁতির নাম ভগবান তাঁতি, বেশ অভিজ্ঞ কারিকর। তাঁর অধীনে তিনজন শিক্ষক তাঁতি রয়েছেন। যোগেশবাবুর মত শিক্ষার্থীও কুড়ি পঁচিশজন। তার মধ্যে দশ বারো জন বিদেশী, বাকি কজন স্থানীয় যুবক। অনেকেই বেশ কাজ শিখে ফেলেছেন। যোগেশবাবুও খুব মন দিয়ে সুতোর কাজ শিখতে লাগলেন। আটদশদিন পরে তাঁকে 'নাটাই গুটানো' আর 'টানাহাঁটার' পরীক্ষা দিতে হল। পরীক্ষায় প্রধান তাঁতি ভগবান

বেশ সন্তুষ্ট হলেন। সেই থেকে যোগেশবাবুর একটা পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা হয়ে গেল। কিন্তু শিলাইদহ কাছারির বা কুঠিবাড়ির তাঁতিদের মেসে আহারের ব্যয় তাঁর এই পারিশ্রমিক থেকে কুলোবার কোন সম্ভাবনা দেখলেন না। তিনি রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে এইজন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থার আবেদন জানালেন। সমস্ত ব্যাপার শুনে রবীন্দ্রনাথের আদেশে ম্যানেজার বামাচরণবাবু গোপীনাথ-বাড়িতে যোগেশবাবুর দুবেলা প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। এইভাবে দুমাস অতীত হতে চলল।

এদিকে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে, তাঁতের সংখ্যাও বাড়ছে, কাজও পুরোদমে চলছে। যোগেশবাবু গামছা বোনার তাঁতে কাজ পেলেন প্রাথমিকভাবে, কাজে বেশ আনন্দও পেলেন। ভগবান তাঁতির কাছে তাঁতের 'কায়দা-কলম' শেখার কালে ভগবান বললেন, 'ভদ্দরলোকের ছেলে, এ কাজ শিখে কি করবে বল তো ? নিজের তাঁত চালাতে পারবে কি ?' কথায় কথায় ভগবান বললেন তিনি প্রধান তাঁতি, মাইনে পান মাসে পঁচিশ টাকা আর একবেলার খোরাকি। ওস্তাদ প্রধান তাঁতির এই উপার্জন শুনে তরুণ যোগেশবাবু ঘাবড়ে গেলেন এবং একটু ভাবনায় পড়লেন।

ঠিক এইসময় যোগেশবাবু তাঁর বিশিষ্ট পিতৃবন্ধু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মশায়ের এক পত্র পেলেন। তিনি লিখেছেন—তাঁর পাটের কারবারের জন্য সিরাজগঞ্জে বিশ্বাসী লোকের বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে। তিনি যোগেশবাবুকে পেলে কাজ দিতে পারেন। যোগেশবাবু চিন্তায় পড়লেন। তখন শিলাইদহের অনুরূপ আর একটি তাঁতের কারখানা ঠাকুরবাবুদের কুষ্টিয়ার কুঠিবাড়িতে খোলা হবে ঠিক হয়েছে। শিলাইদহ অধিকারী বাড়িতেও দুখানা তাঁত বসবে। কিন্তু এই তাঁতের কারখানা কতদিনে স্বাবলম্বী হবে তার কোন পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না; ঠাকুরবাবুদের খরচ বাড়ছে এবং লোকসানের পরিমাণই বেশি হচ্ছে। যোগেশবাবু অনেক চিন্তার পর পিতৃবন্ধু শরৎবাবুর উপদেশমত তাঁর পাটের কারবারে সিরাজগঞ্জে যোগদান করলেন।

প্রায় পাঁচ ছয় বছর পাটের কারবারে অভিজ্ঞতার ফলে তিনি সিরাজগঞ্জের আড়তের চার্জ পেয়ে দেখলেন ব্যবসাটা আগাগোড়া অসাধু উপায়ে চলছে; আদর্শভ্রষ্ট না হলে একাজ করে উন্নতির আশা নেই; কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্যপাঠে এতই অনুপ্রাণিত হয়েছেন যে অসাধু পথে অর্থোপার্জন তাঁর আদর্শের প্রতিকূল। পাটের ব্যবসা ছেড়ে কলিকাতায় চলে এলেন নূতন

কাজের ও নূতন উপায়ে অর্থোপার্জনের সন্ধানে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একবার দেখা করবার প্রবল ইচ্ছাও তাঁর মনে ছিল। কিন্তু তিনি তাঁর বাসনা চরিতার্থ করবার উপায় পেলেন না। এদিকে একজন কাষ্ঠব্যবসায়ী তাঁকে চাকরি দেওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

কাঠের কারবারে নামলেন যোগেশবাবু; কাঠের মিস্ত্রির কাজ শিখতে এক বৎসর লেগে গেল; নানারকম কাঠের আসবাবপত্র তৈরি, কাঠ চেনা, দরদস্তুর ইত্যাদি কাজে আশাতীত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন। নিজে কাঠের আসবাবের এক কারখানা খুললেন। হঠাৎ এক শুভ মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। এদিকে যোগেশবাবু রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও সাহিত্য ও অন্যান্য লেখকের বহু গ্রন্থ অবসর সময়ে পড়ে ফেলেছেন। মাঝে মাঝে কবির সঙ্গে দেখা হয়; তাঁর শিলাইদহের তাঁতের কারখানার স্মৃতি মনে করিয়ে দেন যোগেশবাবু, কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক আশীর্বাদ পেলেন নিজের ব্যবসায় কৃতিত্বের জন্যে। যোগেশবাবুর একমাত্র মন্ত্র—

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল রে।

এরপর অসাধারণ অধ্যবসায়, সততা ও পরিশ্রমে যোগেশবাবুর কাঠের কারবারে উত্তরোত্তর উন্নতি হতে লাগল। কলিকাতার অনেক বিশিষ্ট নেতা ও কর্মীর সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল। শেষে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে এপ্রিল তিনি বর্তমান চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে নিজস্ব ভবন নির্মাণ করলেন ব্যবসায়ের প্রসারের জন্য। এই ভবনের উদ্বোধনের জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করতে শান্তিনিকেতনে গেলেন এবং কবির অসুস্থতা সত্ত্বেও এই শুভানুষ্ঠানের উদ্বোধনে তাঁর সম্মতি পেলেন। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর যৌবনকালের দেশের সংগঠন ব্রতের একজন কর্মী হিসাবে যোগেশবাবুকে আশীর্বাদ করেন ও তাঁর নূতন ট্রাস্ট হাউস, কলিকাতা ল্যাণ্ড ট্রাস্ট লিঃ ভবনের উদ্বোধন করেন বিশেষ সমারোহে। মহাকবির আশীর্বাদে ও পবিত্র করস্পর্শে যোগেশবাবুর এই প্রতিষ্ঠানটি কলিকাতা মহানগরীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। ট্রাস্ট হাউসের উদ্বোধন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের আশীবাণী সম্বল করে যোগেশবাবু আজ দেশের মধ্যে ব্যবসায়ে অন্যতম কৃতী সন্তানরূপে সুপরিচিত।*

---

*শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৌখিক বিবরণ অনুসারে লিখিত

যোগেশবাবুর বিবরণ থেকে বোঝা যায়, শিলাইদহে তাঁতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের স্বদেশী আন্দোলন বিলিতি বর্জন আন্দোলনের দুই তিন বছর আগে। ঠাকুরবংশেই স্বাদেশিকতার প্রথম সূচনা লক্ষ্য করা যায় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলায়। পরবর্তী কয়েক বছরে গণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবংশের সন্তানগণের চেষ্টায় স্বদেশী আন্দোলনের বীজ নানাভাবে অঙ্কুরিত হতে থাকে। ঐ অঙ্কুর জাতীয়তাবোধের সার পেয়ে পুষ্ট হতে লাগল। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অদম্য উৎসাহ ও আত্মত্যাগে পাটের কারবার, নীলের চাষ, ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জাহাজ চালান (ফ্লোটিলা কোং), দেশলাই ও তাঁতের কারখানা, স্বদেশী শিল্পের দোকান প্রভৃতি হাতেকলমে স্বদেশী প্রচলনের ধারাবাহিক চেষ্টাও চলছিল। পরে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের মুষ্টিমেয় কয়েকটি কাপড়ের কলের উপর নূতন নূতন করভার চাপিয়ে ভারতের শিশু বস্ত্রশিল্পকে গলা টিপে মারবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এজন্য দেশের তাঁতিদের সংঘবদ্ধ ও শিক্ষার্থী-সংগ্রহ করে উন্নত কুটিরশিল্প হিসাবে তাঁতশালা প্রতিষ্ঠা করলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে। তখনও মোহিনীমোহন চক্রবর্তী কুষ্টিয়ায় মোহিনী মিল প্রতিষ্ঠা করেন নাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংগঠনী আদর্শে তাঁর হাতে গড়া রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সুযোগ্য উত্তরসাধক।

যোগেশবাবুর কর্মজীবন সম্বন্ধে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও ১৩৪৫ সালের ভাদ্র সংখ্যা প্রবাসীতে (পৃঃ ৬৯৬-৭০০) 'শিল্প ও ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব— শ্রী:যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়' নামে এক মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন।

বর্তমানে যোগেশবাবু আর ইহলোকে নাই।

....

নিমাই ঠ্যাটা

স্বভাবের দোষে আর সচ্ছলতার দেমাকে নিমাই প্রামাণিক গ্রামে সবারই বিশেষ অপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তার উপর দিয়ে বিপদ-আপদের ঝড়ও খুব এক চোট বয়ে গেছে। সুখে থাকতে যে ভূতে কিলায়, তার অবস্থা দেখেই লোকে বেশ বুঝেছে।

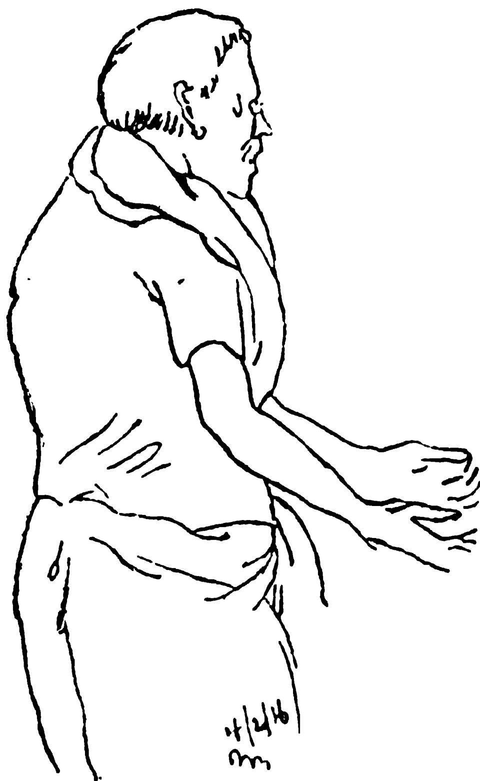
দু তিনটি দোহাল গরু, লাঙল, বলদ, ত্রিশ-বত্রিশ বিঘে ভাল চাষের জমি, চতুঃশালা ভিটের বাঁধা বাড়ি। লোকটা বেশ সুখেই ছিল। ক্রমে সে গাঁয়ের 'পেরধানের' পদেও পাকা হয়ে বসত, কিন্তু তার মাথায় মামলাবাজের দুর্বুদ্ধি গজাল, চাষবাসে অবহেলা করে সে হঠাৎ বড়মানুষ হবার দুরাশায় বাঁধাই কারবারে বেশি মাত্রায় মনোযোগ দিল।

জমিদার ঠাকুরবাবুর সেরেস্তায় সে বছরে প্রায় পঞ্চাশ টাকা মালগুজারি করত। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুঁটিনাটি নিয়ে নানা রকমের মামলা, তার তদ্বিরাদি, পাটের দালালদের সঙ্গে অনবরত ঝগড়া, বাড়িঘরের কাজ ফেলে থানায় মহকুমায় ঘোরাঘুরি করে তার আর্থিক অবস্থা চার পাঁচ বছরের মধ্যে হয়ে পড়ল অত্যন্ত শোচনীয়। গ্রামের লোকের সে হয়ে উঠল মহাশত্রু। কিসে সে জব্দ হবে তার উপায় সবাই ভাবতে লাগল। গ্রামময় তার দুর্নাম রটল 'নিমাই ঠ্যাটা' বা 'ব্যাটা কালনিমে'। কিন্তু মানুষের চেষ্টায় সে জব্দ হল না। ভগবানই তাকে জব্দ করলেন এবং ভগবানেরই কোন প্রিয়পাত্র তাকে পুড়িয়ে যে খাঁটি করে নিয়েছিলেন সে কথাটাই বলব।

নিমাইয়ের অবস্থা ক্রমে এমনই হয়ে দাঁড়াল যে, ঠাকুর-জমিদারের প্রাপ্য খাজনা তামাদি হবার উপক্রম হলেও সে জমিদার সরকারে একটি পয়সাও 'উপুড়হস্ত' করতে পারল না. আবার কি কারণে যেন ঠাকুর-জমিদারের কৃষিব্যাঙ্ক থেকেও তাকে তিনশো টাকা কর্জ করতে হয়েছিল পৈতৃক বাড়িখানা বাঁধা দিয়ে। কালনিমের ঘটে দুষ্টবুদ্ধি গজ্‌গজ করত। বাড়িখানা তার কিছু আগেই নবীন মহাজনের কাছে বাঁধা রেখে দুশো

টাকা সে কর্জ করেছিল, কিন্তু ঠাকুরবাবুর কৃষিব্যাঙ্ক সেরেস্তায় কৌশলে সে বিষয়টা গোপন করে বেশি টাকা ধার নিল। সেই তিনশো টাকাও সে এক ফৌজদারি মোকদ্দমায় উড়িয়ে দিয়ে খালি হাতে বাড়ি এসে বসল।

বুড়ো নবীন মহাজন তার কৃষিব্যাঙ্কের দেনার কথা জানতে পেরে নালিশ করে বসল এবং ডিক্রিজারিতে নিমাইয়ের বাড়ি ক্রোকের পরোয়ানা বের করে



নিমাই ঠ্যাঁটা

আনল। সেয়ানে সেয়ানে লড়াই! নবীন মহাজন তাকে সমুচিত শিক্ষা দেবেই। গ্রামের সব লোক মহাজনদার পক্ষে। নিমাইয়ের প্রতি কারও সহানুভূতি নেই।

এদিকে ঠাকুরজমিদার পক্ষও তার নামে চার বছরের খাজনার নালিশ এবং কৃষিব্যাঙ্কের খতের নালিশ করে ডিক্রি করেছেন, কিন্তু ফিকিরফন্দি করে নিমাই নানান রকমের জবাব দিয়ে আদালতে জমিদারকেও হয়রান করতে ছাড়ে নাই। ঠাকুরবাবুর ম্যানেজার নিমাইয়ের দেখা পেলে তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবেন, এইরকম সঙ্গিন অবস্থা দাঁড়াল। নবীন মহাজনের ক্রোকি পরোয়ানার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুরবাবুর ক্রোকি পরোয়ানা নিয়ে

আদালতের পেয়াদা এসে হাজির। অস্থাবর ক্রোকের জন্যও তার উপর জমিদারের জুলুম কয়েকবার হয়েছে, কিন্তু সেই কয়েকটা ব্যাপারে নিমাই নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও ঠাকুর জমিদারের আমলাদের হয়রান করেছে খুব।

নিমাইয়ের তখনকার অবস্থাটা খুবই দুর্দশাপূর্ণ। জগতের মহাশত্রু নিমাই বুঝতে পারল যে তাকে রক্ষা করবার শক্তি মানুষের আর নেই, একমাত্র ভগবান যদি তাকে বাঁচান। সে হল কিছুদিনের জন্য নিরুদ্দেশ।

নিমাই নানাস্থানে ঘুরে জানল, রবিবাবু শিলাইদহে আছেন, আর রাত্রে তাঁর বোট শিলাইদহের অপর পারে চরে নোঙর করা থাকে। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে এসে বাড়িতে না থেকে প্রায়ই বজরায় বাস করতেন। পদ্মা তাঁর ছিল বিরাট সংসার, আর বজরাখানা ছিল তাঁর নিরালা কুটির।

অমাবস্যার রাত্রি। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আকাশে অসংখ্য তারার ফুল ফুটেছে। পদ্মার তেজও কম নয়। সবেমাত্র তিনি বর্ষার আগমনী গাইতে সুরু করেছেন। নিমাই পদ্মাতীরে স্টীমারঘাটের কাছে সেই সন্ধ্যা থেকে ঠায় বসে আছে। সে জানে, গভীর রাত্রি ভিন্ন সে রবিবাবুর কাছে তার প্রাণের দুঃখের কথা উজাড় করতে পারবে না। দিনের আলোয় কাছারির আমলা-পেয়াদা দেখা পেলে নির্ঘাত তাকে প্রহার করবে। তাই নিমাই আজ গভীর অমাবস্যার রাত্রে মরিয়া হয়ে দুরন্ত পদ্মায় ঝাঁপ দিল। মৃত্যুকে সে ভয় করে না আজ।

অত গভীর রাত্রেও বোটের জানালা দিয়ে আলো পদ্মার বুকে চিক্‌চিক্ করে শিশুর মত খেলা করছিল। নিমাইয়ের দেহে আজ মত্ত হস্তীর বল। সে সাঁতরে বোটের পাশে এসে দেখল বাবুমশাই যেন ধ্যানে নিমগ্ন। তাঁকে সচকিত করবার জন্যে সে বোটের গায়ে পিঠ লাগিয়ে ঠেলে বোটখানাকে বেশি জলে নেবার জন্যে প্রাণপণে ধাক্কা দিল। তার পরিশ্রমের ফল ফলল, কিন্তু সে হাঁপিয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সচকিত হয়ে কামরার বাইরে এসে দেখেন, এতো ঝড় নয়! কে যেন সিংহবিক্রমে অতবড় বজরাখানাকে অনেক জলে ঠেলে দিচ্ছে। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'তুমি কে? এ কী করছ? উঠে এস।'

নিমাই বহুকষ্টে আধমরার মত বোট আঁকড়ে কোন রকমে উপরে উঠে এল। কথা বলার শক্তি তার নেই।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'তোমার কি প্রাণের ভয় নেই? ভিতরে এস।'

নিমাই বলল, 'আমি মরব হুজুর। হুজুরের সামনেই প্রাণ দেব, নইলে মরেও আমি শান্তি পাব না।'

বাবুমশাই খুব ব্যথিত হলেন তাকে ঐ অবস্থায় দেখে। তার চেহারাখানা হয়েছে প্রেতের মত। বললেন, 'তোমার এত দুঃখ! এস, ভিতরে এস। সব খুলে বল, আমি শুনব।'

বোটের কামরায় গিয়ে নিমাই খুব খানিক কেঁদে বাবুমশায়ের পা জড়িয়ে ধরে বলল, 'হুজুরের দয়া চাইবার মত মুখও রাখি নি, মৃত্যুই আমার বন্ধু, কিন্তু আমি মরলে আমার অনাথা স্ত্রী আর চার-পাঁচটি অপোগণ্ড মরে যাবে হুজুর। শুধু সেই হতভাগাদের জন্যে—'

বাবুমশাই এতে খুবই ব্যথিত হলেন; বললেন, 'তুমি নির্ভয়ে বল, কেন তোমার এ অবস্থা! আমি এখনই সব শুনব।'

সব শুনে বাবুমশাই একটু চিন্তিত হয়েই বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি কি করা যাবে? তোর অবস্থা খুব সঙ্গিন, আমি বুঝেছি। আজ তুই বাড়ি যা, আমি তোকে বাঁচাব, তোকে আমি নিজে কথা দিচ্ছি। তুই একবার দোষ করেছিস্ বলে তোকে মেরে ফেলব না, তোর ভয় নেই।'

নিমাই তবু কাঁদে দেখে বেশ দৃঢ়স্বরে বললেন, 'এই আমি বরকন্দাজকে এক্ষুণি বলে রাখছি, সে কাল ভোরেই ম্যানেজারবাবুকে এখানে নিয়ে আসবে। তুইও ঠিক তখন আসিস্।'

বাবুমশাই তখন নিমাইকে একখানা কাপড় পরতে দিয়ে রামগতি মাঝিকে হুকুম দিলেন ম্যানেজারবাবুর নামে লেখা চিঠিখানা সেই রাত্রেই দিয়ে আসতে এবং ডিঙি নৌকা করে তখনই নিমাইকে ওপারে পৌঁছিয়ে দিতে। ম্যানেজারবাবু রাত দুটোয় হঠাৎ বাবুমশায়ের সেই চিঠি পেয়ে অবাক!

পরদিন ভোরে নিমাই পদ্মাতীরে গিয়ে দেখে শিলাইদহের তীরে বোট বাঁধা এবং ম্যানেজারবাবু আগে এসে বাবুমশাইকে নিমাই-সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখাচ্ছেন। নিমাই বোটের মধ্যে গিয়ে শুনল ম্যানেজারবাবু একেবারে আগুন ছড়াচ্ছেন—'নিমাইয়ের অপরাধ অমার্জনীয়—ইত্যাদি, কৃষিব্যাঙ্কের দেনা আর বাকি খাজনার দেনা সুদে-আসলে ছ'শো টাকারও উপর তার কাছে পাওনা, হয়রানির তো কথাই নেই, দেশসুদ্ধ লোক নিমাইয়ের জ্বালায় অস্থির।'

বাবুমশাই মনোযোগ দিয়ে ম্যানেজারবাবুর কথা শুনলেন। সব শুনে তিনি বললেন, 'এ মানুষটা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। এর এমন পয়সা নেই যে

দু'বেলা খায়। চাষের জমিটা খাসদখলে আনলে একে সপরিবারে মেরে ফেলা হবে। এই ভাবেই পল্লীর অশিক্ষিত লোক সব উচ্ছন্ন গেল! এ টাকা আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। এ বেচারা পাপের ফল খুব ভুগেছে।'

ম্যানেজারবাবু একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললেন, 'জমিটা খাসে না আনলে সরকারের ক্ষতি। বন্দোবস্ত করলেই তা থেকে অনেক টাকা আসবে। টাকা মাপ দিতে তো আমার অমত নেই!' এই সব বলে তিনি ঘোরতর আপত্তি জানালেন।

রবীন্দ্রনাথের সেই এক কথা, 'এ বেচারি পাপের ফল হাড়ে হাড়ে ভুগছে—আমি বেশ জানি। সব টাকা মাপ করে দাও—জমিটাও দাও।' নিমাইকে ডেকে বললেন, 'শোন্, তোর সব টাকা মাপ করে দিলাম, জমিও ফিরিয়ে দিলাম; কিন্তু বাপু, খাঁটি লক্ষ্মীমন্ত চাষি হতে হবে। আমি আর একবার এসে যেন দেখতে পাই, নিমাইয়ের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু। চাষে মন দিলেই সব দুষ্টুমি চলে যাবে। নইলে আবার সব কেড়ে নেব কিন্তু।'

নিমাই বাবুমশায়ের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। সে প্রায়ই বলত, সে গুষ্টিসুদ্ধ মরে কবে ভূত হয়ে যেত; কিন্তু আকাশ থেকে দেবতা এসে তাকে বাঁচিয়েছেন।

ত্রিবেণী মাঝি

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে এসে পরিণত বয়সে পদ্মার উপর বজরায় বাস করতেন। সেই বজরাই ছিল তাঁর বাড়িঘর, সব। পদ্মার মত প্রবল নদীর মধ্যে বাস করা খুবই কবিত্বপূর্ণ, কিন্তু সর্বদা বড় নিরাপদ নয়। তাই কয়েকবার তিনি পদ্মা ও মেঘনা নদীতে খুব ঝড়-তুফানের মধ্যে পড়েছিলেন, একবার কুষ্টিয়ার নিকটে গোরাই নদীতেও বোটে আসবার কালে বিষম বিপদে পড়েন।

সাল আর তারিখটা ঠিক করে বলতে পারব না; একবার তিনি পুত্রকন্যা-সহ ঝড়ে বৃষ্টিতে পদ্মার মধ্যে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন, তার কাহিনী অনেকেই বলে থাকেন। সেবারে তিনি পদ্মায় তুফানে জল-ঝড়ে খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন, কিন্তু একটি মানুষ পেয়েছিলেন এবং সেই মানুষটিকে আজীবন প্রতিপালন করেছিলেন। সেই মানুষটি হচ্ছে ত্রিবেণী।

সময়টা, নানা জনের নানা বর্ণনার মধ্যে যতদূর জানা যায়, বোধ হয় জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাস হবে। তিনি সন্ধ্যা থেকে আরম্ভ করে প্রায় সমস্ত রাত্রি পুত্র-কন্যাদিসহ বোটে শিলাইদহ থেকে অনেক দূরে পদ্মার মধ্য দিয়ে আসতে আসতে প্রবল ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। প্রায় সমস্ত রাত্রি ভিজে পদ্মার তুফানে বোটে ভাসতে ভাসতে কোন একটি চরে পৌঁছে যেন আশ্রয় পেয়েছিলেন। প্রজারা তাঁর বোটখানাকে তাদের বাড়ির কাছে বেঁধে রেখে দেয়। পরের দিন অতি প্রত্যুষে তিনি শিলাইদহে আসবার জন্য রওনা হন।

অতি প্রত্যুষেই বোট ছেড়ে খানিক দূর আসবার পরেই আবার চারদিক ঘনঘটাচ্ছন্ন হয়ে এল। ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে পদ্মাও দুরন্ত উদ্দাম নৃত্য সুরু করল। ব্যাপার দেখে মাঝিমাল্লারা অনেক কষ্টে একটা কাঁচি-চরের কাছে বোট লাগিয়ে আকাশ ফর্সা হবার আশায় অপেক্ষা করছে। ঝড়ের বেগ অনেকটা কমে আসছে, বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বোটের ছাদে এসে বসে চারদিকে চেয়ে দেখছিলেন। এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল, যেন একটা মরা মানুষ কতকগুলো ধানগাছের সঙ্গে আটকে আছে। আর একটু মনোযোগ দেবার পর দেখা গেল, সে লোকটা যেন মাঝে মাঝে হাত-পা নাড়বার চেষ্টা করছে। তিনি তাড়াতাড়ি মাঝিদের বললেন ঐ লোকটাকে তাঁর বোটের উপর তুলে আনতে।

তখন ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে। রবীন্দ্রনাথের ছেলেমেয়েরা কৌতূহলী হয়ে বোটের পাটাতনে এসেছেন। লোকটাকে বজরায় তোলা হলে দেখা গেল তখনও তার প্রাণ আছে।

রবীন্দ্রনাথ পাকা চিকিৎসক ছিলেন; বিশেষত হোমিওপ্যাথিতে তাঁর খুবই হাতযশ ছিল, তা অনেকেই জানেন। তিনি লোকটার প্রাথমিক শুশ্রূষা করলেন, কাপড় ছাড়ালেন, শরীর গরম করালেন, খানিকটা গরম দুধও খাওয়ালেন। লোকটি সুস্থ হয়ে বসলে দেখা গেল তার মাথায় টিকি, কালো পাথরের মত গায়ের রং, বলিষ্ঠ দেহ, বয়সে বালক, জাতিতে পশ্চিমা। সে তার পরিচয় দিল যে, সে পশ্চিমা চৌধুরীদের এক নৌকায় চাকরি করত। মেঘনা নদীতে তাদের নৌকা ঝড়ে ডুবে যাবার মত হয়ে পড়ে। তার পরে তার নাকি কলেরা হয়। অবস্থা খুবই সঙ্গিন দেখে তার মনিবেরা তাকে কোন চরে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে চলে যায়। সে আর কিছুই জানে না।

রবীন্দ্রনাথ তাকে পরীক্ষা করে দেখলেন যে, সে এখন আর কলেরার রোগী

নয়, সম্পূর্ণ সুস্থ, তবে খুব দুর্বল। তাকে তিনি ঔষধ দিলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সংসারে তোর কে আছে? বাড়ি যাবি, না আমার কাছে থাকবি?'

সে এই কথা শুনে যেন হাতে চাঁদ পেয়ে গেল; বলল যে, তার ত্রিসংসারে কেউ নেই। সে বাবুর কাছেই থাকবে, চাকরি করবে।

বাবুমশায়ের বোটের বড়মাঝি তপসি তখনও খুব কার্যক্ষম; বাবুমশায়ের বোট কখানা ছিল যেন তার বুকের হাড় দিয়ে গড়া। সে বলল, 'হুজুর আমি একে কাজ শেখাব। এ আমার জাত-ভাই, আমারই সঙ্গে থাকবে। আমি আর কদিনই বা বাঁচব! আমার লেড়্‌কাও অতি বাচ্চা। একে আমি কাজ শিখিয়ে পাকা মাঝি করে দেব।'

ত্রিবেণী মাঝি কী শ্রদ্ধা, কী ভালবাসার চোখেই না বাবুমশাইকে দেখেছিল, কী অসাধারণ প্রভুবৎসলই না ছিল সে! সে রকম এখন আর দেখা যায় না। সে বলত, 'বাবুমশাই আমার জান্। হামি তাঁর পায়েই মরব।'

ত্রিবেণী মাঝি রবীন্দ্রনাথের কোন একটা কার্জ, কোন একটা ফরমাইশ না খাটতে পেলে বলত, 'আজ আমার অসুখ হবে'। বাবুমশাইও কোন মাঝিকে ডাকতে হলেই, ডাকতেন 'ত্রিবেণী'। বুড়ো তপসি বুঝত যে, বাবুমশাই এ বেটার মায়ায় পড়েছেন; সে তাতে খুব খুশিই হত। ত্রিবেণীকে সে ছেলের মত ভালবাসত। ত্রিবেণী নিজের নির্দিষ্ট কাজ করেও নিজের হাতে বোট ঝাড়-পোছ না করলে তৃপ্ত হত না। বাবুমশাই অমুক তারিখে 'কল্‌কেতা' ছাড়বেন বা অমুক তারিখে ট্রেনে কুষ্টিয়ায় পৌছবেন—এই রকমের টেলিগ্রাম এলেই সবার আগে সে খবর নিত, আর হলুদ রঙের ছোপানো পাগড়ি, ফতুয়া, কাপড় পরে ফিটফাট হয়ে কাজকর্মে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ত।

তপসি মরে গেলে ত্রিবেণী হল বড় মাঝি; তবু তপসির ছেলে-বৌ শিলাইদহেই বাস করত, অনেকদিন মাসহারা পেত কাছারি থেকে।

বোটের মাঝি ফুলচাঁদ, তপসি, রামগতি, ত্রিবেণী—এরা ছিল রবীন্দ্রনাথের বেতনভোগী চাকর; কিন্তু এদের কাছে রবীন্দ্রনাথের কোন কথা জানতে গেলে এরা এমন সব কথা বলত যাতে মনে হত এরা যেন রবীন্দ্রনাথের সন্তান। রবীন্দ্রনাথের 'পদ্মা,' 'চিত্রা,' 'দুর্গা,' আত্রাই' বোটগুলো যেন এরা এদের মহামূল্য পৈতৃক সম্পত্তি বলে জ্ঞান করত। রূপকথার সেই ময়ূরপঙ্খি নাও'য়ের রাজপুত্রকে নিয়ে এই সব কাণ্ডারীরা জলে জলে কত অচিন্ দেশে বেড়িয়েছে, কত অপরূপ রাজকন্যার সন্ধান পেয়েছে কে জানে!

তারাও বোধ হয় অবাক্ হয়ে ভাবত—বল, কোন্ ঘাটে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী !



রামগতি মাঝি

মাধু বিশ্বাস

মাধু বিশ্বাসের চেহারাটা ছিল বৃকোদর ভীমসেনের মত। লোকটা প্রায় একশ বছর বেঁচে ছিল। তার মরবার কয়েক বছর আগে সে বড় তৃপ্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা আশীর্বাদের কাহিনী বলেছিল।



মাধু বিশ্বাস

মাধু বিশ্বাস ছিল যৌবনে রোস্তমের মত বীর। বিবাহ করেছিল দুই-তিনটি এবং ছেলেপিলেও হয়েছিল অনেক। জীবন ধারণের জন্য জমিজমার অভাব তার ছিল খুব, কিন্তু সে আর তার দুই-তিনটি ছেলে ছিল ভয়ানক পরিশ্রমী আর শক্তিমান। প্রথম জীবনে মা-লক্ষ্মীর কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়ে মাধু বিশ্বাসের দিন বড়ই কষ্টে কাটছিল।

একদিন একটা লোক মলিন মুখে শুধু হাত দিয়ে চরের বালি খুঁড়ে কাঁকুড় লাগাচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই দিনই এই দরিদ্র উৎসাহী বলিষ্ঠ লোকটিকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ঐ লোকটিই মাধু বিশ্বাস।

প্রথম যেদিন সে রবীন্দ্রনাথের কাছে জমির দরবারে এসেছিল সেই দিনই রবীন্দ্রনাথ তার বীরের মত চেহারা দেখে আর অভাব-অভিযোগের বর্ণনা শুনে বড়ই মুগ্ধ ও ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'মাধু, তোমার যখন টাকা নেই অথচ কম করে পনের-কুড়ি বিঘে জমি না হলে তোমার চলতে পারে না, তখন তুমি অসম্ভব আশা না করে কিছু 'চরচা' জমি নাও।'

চরচা জমি বালি-মিশ্রিত জমি এবং তার খাজনা কম; নজর দিতে হয় না। এ জমি প্রজারা এক বছরের বেশি ভোগ করতে পারে না।

মাধু বলেছিল, 'হুজুর, হাড়ভাঙা খাটনি খেটেও মরব, আবার ঐ বালির মধ্যে কিছু পাব না!'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'চরচা জমিতে কেউ কেউ ফসল মন্দ পাচ্ছে না তো! তোমরা পরিশ্রমী চাষি, বেশ পরিশ্রম করে চাষ করে প্রথমবারে কাঁকুড়-তরমুজ লাগাও, পরের ছমাসে কলাই দিও। তুমি খুব গরিব। আমি তোমায় আশীর্বাদ করছি, এই চরচা জমি থেকেই তুমি দুবারই খুব ভাল ফসল পাবে।'

অভাবগ্রস্ত মাধুর মনে বাবুমশায়ের আশীর্বাদ বিচিত্র সুরে বেজে উঠল। সে বলল, 'হুজুর, আপনার আশীবাদে আমি বালি থেকেই সোনা ফলাব।'

বাবুমশাইকে সেলাম করে মাধু আমিনবাবুর কাছে গিয়ে কপাল ঠুকে পঁচিশ বিঘা জমি নিল। বাপবেটায় মিলে পরের লাঙল ধার নিয়ে চাষ দিয়ে ঐ সব জমিতে কাঁকুড়-তরমুজ লাগাল।

মাস তিনেক পরে মাধু প্রকাণ্ড একটা তরমুজ মাথায় করে বাবুমশায়ের বোটে হাজির। তরমুজটা এত বড় যে মাধু বিশ্বাসের মত জোয়ানকে সেটা মাথায় করে আনতে হয়েছে।

প্রসন্নহাস্যে বাবুমশায় বললেন, 'কি মাধু, এই কি তোমার চরচা জমির ফসল?'

'আজ্ঞে হুজুর! হুজুরেরই আশীর্বাদ।' এই বলে সে ঐ বিরাট তরমুজটি বোটের উপর তুলে দিল।

বাবুমশাই বললেন, 'ভাল ফসল জন্মিয়েছিস মাধু, এটা একজিবিসনে পাঠিয়ে দে।'

মাধু বলল, 'না হুজুর, এটা হুজুরকে সেবা করতেই হবে। হুজুরের আশীর্বাদে আমার ক্ষেতে এমন সুন্দর তরমুজ আর কাঁকুড় এত প্রচুর হয়েছে যে, গোয়ালন্দের চরেও অমন হয় না। কেবল বেচা সুরু করেই পঁচিশ টাকা পেয়েছি। বহু খদ্দের নৌকা নিয়ে আসতে লেগেছে।'

রবীন্দ্রনাথ দশটি টাকা মাধুকে পুরস্কার দিলেন। মাধু টাকা সরিয়ে রেখে বাবুমশায়ের পায়ে মাথা ঠেকাল; বলল, 'হুজুর সাক্ষাৎ ভগবান, ঐ বালিতে এই রকম ফসল পাব তা কেউ ভাবতেও পারে না। এ টাকা আমি নেব না হুজুর।'

রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে মাধু পুরস্কার গ্রহণ করল। তিনি বললেন, 'দেখ, এবারে জল সরতে সরতে কলাই ছিটাবি। আমি বলছি—খুব ভাল কলাই জন্মাবে। এই টাকায় আসছে বারে কিছু জ্যৈষ্ঠকরের জমি* নিবি, আর পারিস তো ছেলেপেলের জন্য চরে কিছু জমি কায়েমি বন্দোবস্ত নিয়ে রাখিস।'

মাধু বিশ্বাসের অগাধ বিশ্বাস জন্মে গেল বাবুমশায়ের আশীর্বাদের উপর। বছরের পর বছর মাধু বিশ্বাসের এমন উন্নতি হল যে, মাধু বিশ্বাস চর অঞ্চলের একজন বিখ্যাত লোক হয়ে উঠল। মাধু বলত, 'বাবুমশায়ের আশীর্বাদ আমি পেয়েছি, আমি মাটিতে লাঙল ছোঁয়ালেই টাকা উঠবে।'

বাবুমশাই জমিদারিতে এলেই মাধু একদিন না একদিন তাঁকে দর্শন করে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে আসত। বাবুমশাই তাকে ঠাট্টা করে বলতেন, 'হাঁরে মাধু, আরও বালি চষবি? তুই আমার চরের সব বালি খুঁড়ে মাটি তুলে ফেলেছিস!' সে বলত, 'হুজুরের আশীর্বাদ কোরানের হুকুম, তা কি কখনো ভুল হতে পারে, হুজুর?'

একদিন বাবুমশাই নিজে হেঁটে গিয়ে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারপরিবৃত মাধু বিশ্বাসের বাড়ি দেখে এলেন। মাধু কি করে যেন টের পেয়েছিল যে বাবুমশাই একদিন তার বাড়িতে নিজে যাবেন। তাই সে পাবনা থেকে একখানা ভাল পালিশকরা চেয়ার কিনে বাড়িতে রেখেছিল। বাবুমশাই তার বাড়িতে এলে ঐ চেয়ারখানিতে তাঁকে বসতে দিয়েছিল। বাবুমশাই হাসতে হাসতে ঐ চেয়ারে বসেছিলেন; মাধুর কটা গাই, কটা বলদ, কটা মোষ, কখানা লাঙল সেসব জিজ্ঞেস করেছিলেন। মাধু বলত, 'মাধু বিশ্বাসের জন্ম সার্থক।'

পরে মাধু আরও অবস্থাপন্ন হয়েছিল। তার ছেলেরাও এখন বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। থুনথুনে বুড়ো মাধু আমাকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করত, 'বাবুমশাই এখন কোথায় থাকেন?' আমি বলেছিলাম, 'শান্তিনিকেতনে—বোলপুরে।' মাধু চিন্তিত মনে বলত, 'কোন্ দেশে? সে বুঝি অ-নে—ক দূরে?' বুড়ো যেন আরও বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ত। মাথা নাড়তে নাড়তে খড়ম পায়ে ধীরে ধীরে খট্‌খট্ শব্দ করে বাড়ি ফিরত।

---

* শিলাইদহের জমিদারির চর-অঞ্চলের খুব ভাল পলিমাটিযুক্ত জমি।

দ্বারি বিশ্বাসের ছেলে

কী কুক্ষণে ঠাকুরবাবুরা শিলাইদহ জমিদারির লাগোয়া বোয়ালদহ মহাল খরিদ করেছিলেন! গোড়া থেকে শেষ অবধি দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদিতে বোয়ালদহ একটা দুষ্ট গ্রহের মত জমিদারিটাকে আঁকড়ে ধরে রইল। এই মহালের দখল নিয়ে যে অশান্তি দাবানলের মত জ্বলেছিল তা নেবাতে জলের মত অর্থবৃষ্টি করতে হয়েছিল। দ্বারি বিশ্বাস (দ্বারকানাথ বিশ্বাস) এই মহালের একজন পত্তনি স্বত্বের মালিক। স্বার্থ তাঁর সামান্যই, কিন্তু তিনি বেঁচে থাকতেই এমন মামলামোকদ্দমা জুড়ে দিলেন যে, জিদের বশে প্রবল প্রতাপ ঠাকুর-জমিদারেরাও ঐ সামান্য স্বার্থের জন্য দীর্ঘকাল আইনের যুদ্ধ চালাতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু দ্বারি বিশ্বাসের পক্ষের জয়লাভের আশা ক্রমেই কমে যাচ্ছিল।

ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডের মত জিদের মামলা চলছে। এমন সময়ে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে এসেছেন। বজরায় বাস করছেন। তখন দ্বারি বিশ্বাস পরলোকে।

বৈষয়িক প্যাঁচ বড় শক্ত প্যাঁচ। দ্বারি বিশ্বাসের একটা বড় জোত ছিল ঠাকুরবাবুদেরই বোয়ালদহ মৌজায়। মামলারত দ্বারি বিশ্বাসকে জব্দ করবার জন্য কি একটা ছুতোনাতায় আইনের ফাঁকে ঐ জোতটা খাস করে নিয়ে ম্যানেজারবাবু অন্য প্রজাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ফেললেন। এইবার সত্যিই দ্বারি বিশ্বাসের নাবালক ছেলেদের বাড়া ভাতে ছাই পড়ল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রজা দ্বারি বিশ্বাসকে বেশ ভাল রকম চিনতেন। তিনি নিজে ও তাঁর ছেলেরা যে সর্বস্বপণ করে মামলা করছেন তাও জানতেন। নিজ ন্যায্য স্বার্থ বজায় রাখতে সম্ভ্রান্ত প্রজা দ্বারি বিশ্বাস মামলা করছেন—এইজন্তে দ্বারি বিশ্বাসের উপর তাঁর উচ্চ ধারণা একটুও খাট হয় নি। তারা যে তাঁর সঙ্গে শত্রুতার শোচনীয় ফল ভোগ করবার জন্য বোয়ালদহের অমন সুন্দর বড় জোতটা হারিয়েছে তা কিন্তু তিনি জানতেন না।

একদিন দ্বারি বিশ্বাসের বড় ছেলে মন্মথ বিশ্বাস বোটের কাছে এসে রবীন্দ্রনাথের দর্শনপ্রার্থী হলেন। মন্মথ বিশ্বাস তখন তরুণ যুবক। বোটের খাস বরকন্দাজ বাবুমশাইকে জানাল যে, দ্বারি বিশ্বাসের ছেলে মন্মথ বিশ্বাস দরবারের জন্য অনেকক্ষণ বোটের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন।

'দ্বারি বিশ্বাসের ছেলে? ডাক তাকে।' রবীন্দ্রনাথ হুকুম দিলেন।

মন্মথ বিশ্বাস এসে কেঁদেকেটে রবীন্দ্রনাথের পা জড়িয়ে ধরে বললেন,

'হুজুর, ধনে প্রাণে মারা গেছি। আমাদের বাঁচান।'

তরুণ যুবক মন্মথের চোখের জল, বেদনাতুর মুখখানা আর অপরাধীর মত ভীত চোখ দুটি রবীন্দ্রনাথকে বড়ই ব্যথিত করল। তিনি স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, 'তুমি দ্বারি বিশ্বাসের ছেলে? জান, দ্বারি বিশ্বাস আমাদের কে ছিল? তার ছেলে হয়ে তুমি আত্মসমর্পণ করে বাপের নাম ডুবোবে?'

মন্মথ বিশ্বাস চোখের জলে নেয়ে তাঁদের বর্তমান অবস্থার কথা, বোয়াল-দহের মামলার কথা, সব অকপটে বললেন।

বাবুমশাই বললেন, 'মামলা যখন তোমাদের বাড়িতে ঢুকেছে, তখন তোমরা পথে না বসা পর্যন্ত সে তো এক পাও নড়বে না বাপু। বুঝতে পারছি তোমার বাবাও ভুল করেছিল। সে ভুলের জের এতদূর এসে দাঁড়িয়েছে? বোয়ালের হাঁ,—তার মধ্যে ঢুকলে কি আর পুঁটি-খলসে বাঁচে?'

'সে মামলায়ই তো আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে বসেছি; কিন্তু আমাদের বোয়াল-দহের পৈতৃক জোতটা খাস করে নিয়ে আমাদের মুখের ভাতও কেড়ে নিয়েছেন হুজুর।'—এই বলে মন্মথ বিশ্বাস কেঁদে ফেললেন।

ব্যথিত রবীন্দ্রনাথ চমকে উঠলেন। তিনি অনেক প্রজার জমিজমার অবস্থা জানতেন। তিনি বললেন, 'বৈষয়িক শত্রুতা চরম অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, বুঝতে পেরেছি। তোমাদের বোয়ালদহের জোতটা কি করে গেল?'

মন্মথ বিশ্বাস তাঁর স্বপক্ষে অনেক কথা বললেন, ম্যানেজারবাবুর উপরও দোষারোপ করলেন এবং জানালেন যে, এ অবস্থায় হুজুরের দয়া ভিন্ন বোয়াল-দহের জোত রক্ষা করার কোনই উপায় নেই। তবে দয়া চাইবারও মুখ নেই, বোয়ালদহের মামলায় রাজার সঙ্গে লড়ে যে অপরাধ হয়েছে তার শাস্তিও চূড়ান্তভাবেই দেওয়া হচ্ছে।

বাবুমশাই ম্যানেজারবাবুকে ডেকে পাঠালেন। ম্যানেজারবাবু এসে কাগজপত্রের সাহায্যে সমস্ত বিষয় এমনভাবে সবিস্তারে বুঝিয়ে দিলেন যে, তাঁর একাজ আইনত একটুও অন্যায় হয় নি, বিশেষত এমন প্রবল শত্রুকে দমন না করলে জমিদারি চলতে পারে না।

বাবুমশাই একটু করুণ মিনতির স্বরেই ম্যানেজারবাবুকে বললেন, 'তুমি কি দ্বারি বিশ্বাসকে জান? দ্বারি বিশ্বাস কেমন খাসা লোক ছিল তা তো দেখ নি! তার ছেলেরা কি না খেয়ে মরবে? আমার বনেদি প্রজাদের ঘর ভেঙে দেবে? তাদের অপরাধগুলোও সম্ভবমত ক্ষমার চোখে না দেখলে কি চলে?'

ম্যানেজারবাবু বললেন, 'এদের ক্ষমা করলে আদর্শ খারাপ হয়ে যায়।' তাঁর মুখের কথা শেষ না হতেই বাবুমশাই বললেন, 'তুমি দ্বারি বিশ্বাসকে দেখ নি, তাই অমন নির্দয় হয়ে তার ছেলেদের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়েছ। না—না—না, বোয়ালদহের জোতটা ঐ ছোকরাকে ফিরিয়ে দাও, নইলে আমাদের পাপ হবে।'

ম্যানেজারবাবু বললেন, 'আমি সে জোতটা আট-দশজন প্রজার সাথে বন্দোবস্ত করে অনেকগুলো টাকা নিয়েছি। তাদের এখন কি বলব? তারা সেসব জমিতে ধান বুনেছে, তারা কি ছাড়বে?'

বাবুমশাই বললেন, 'সেই সব প্রজাদের ডাক। আমি তাদের বুঝিয়ে বলব। মন্মথ, তা হলে বোয়ালদহের মামলা কি আরও চলবে?'

মন্মথ হাত জোড় করে বললেন, 'না হুজুর, কালই আমি সে সর্বনেশে মামলা তুলে নেব। এ মামলা চললে আমাদের বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না।'

বাবুমশায়ের বোট তখন কালোয়ার চরেই বাঁধা ছিল। সেই সব নূতন বন্দোবস্তি প্রজাদের ডেকে আনা হল। রবীন্দ্রনাথ তাদের ডেকে বললেন, 'ওরে, একটা ধার্মিক লোকের নাবালক ছেলেদের এতকালের জমিগুলো তোরা আইনের ফাঁকে চষে ফেললি? এই চেয়ে দেখ, দ্বারি বিশ্বাসের ছেলের মুখের দিকে। তোরা নজর দিয়ে জমি নিয়েছিস তো? বেশ তোদের সে টাকা আমি ফিরিয়ে দেব। আমি হুকুম দিচ্ছি। এই ছেলেটার জমিগুলো ফিরিয়ে দিবি না তোরা? এদের মুখের ভাত কেড়ে খাবি?'

তারা তৎক্ষণাৎ সমস্বরে বলল, 'হাঁ হুজুর, হুজুরের হুকুম আমরা নিশ্চয়ই মাথা পেতে নেব। তবে বড় কষ্ট করে ধান বুনে ফেলেছি। আমরাই বিশ্বাস-মশায়ের বর্গাৎ হতে চাই। এই হুকুমটা দিন হুজুর।'

রবীন্দ্রনাথ মন্মথ বিশ্বাসের মুখের দিকে চাইতেই তিনি বলে উঠলেন, 'আমি তাতেই রাজি। বাবুমশায়ের হুকুম আমি মানব না! তাঁর হুকুম আমার কাছে ভগবানের হুকুম।'

রবীন্দ্রনাথের মুখখানা এতক্ষণে আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'দেখ মন্মথ, মা-লক্ষ্মীকে তাড়াহুড়ো করো না—তিনি বড় চঞ্চলা। বাপ-ঠাকুরদার বিষয় ধর্মপথে থেকে দেখেশুনে ভোগ কর। তা হলেই দ্বারি বিশ্বাসের নাবালকেরা সত্যি সত্যি সাবালক হয়ে উঠবে।'

সমস্ত গোল মিটে গেল। প্রজারা নজরের টাকা ফেরত পেল। মন্মথ বিশ্বাসদের বোয়ালদহ মৌজার বহুকালের মামলামোকদ্দমারও অবসান হয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথের ফটো

রবীন্দ্রভক্ত ও অনুরাগীরা জানেন, বিশ্বভারতীর কল্যাণে কবিগুরুর এত অসংখ্য রকমের ফটোগ্রাফ প্রকাশিত হয়েছে যে, তার সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ। এখনও তাঁর বহু অপ্রকাশিত ফটো কৌতুহলী অনুরাগী সংগ্রাহকদের ঝুলি থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। এই সমস্ত আলোকচিত্রের ভাল প্রদর্শনী দু-এক জায়গায় হয়েছে এবং গত জন্মশতবার্ষিকীতেও হয়েছে। সুযোগ পেলে আমি নিজেও এইরকম একটা প্রদর্শনী দেখাব, কারণ আমার সংগ্রহে এই রকমের প্রায় তিন শত আলোকচিত্রের ছাপা ছবি আছে।

রবীন্দ্রনাথের ফটো তোলার একটি স্বচক্ষে দেখা কাহিনী এখানে বলব। ঘটনাটি ছোট বলে এতদিন বলি নি। কিন্তু ঘটনাটা রবীন্দ্র-চরিত্রের একটা বিশেষ অনুধাবনের বিষয় বলেই আজ প্রকাশ করছি। ১৩২৮ সালের মাঘ মাসে রবীন্দ্রনাথ শেষবার তাঁর প্রিয় সাহিত্য-সাধনার তীর্থ শিলাইদহে যান। সঙ্গে আমিও ছিলাম। সে সময়ে শিলাইদহ জমিদারি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধিকারে।

সেবারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন রবীন্দ্রবন্ধু এণ্ড্রুজ সাহেব ও ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শিলাইদহে ঐ সময়ে আমরা ছিলাম রবীন্দ্র-অভ্যর্থনার পাণ্ডা। ইচ্ছা ছিল রবীন্দ্রনাথের শেষ শিলাইদহ-পরিদর্শন বিষয়টি ফটোচিত্র দিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশ করব। কারণ, সে সময়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের যেকোন সামান্য সংবাদও সংবাদপত্রাদির মাধ্যমে প্রকাশের রেওয়াজ ছিল প্রবল।

আমরা ঐ উদ্দেশ্যে সবন্ধু রবীন্দ্রনাথের ফটো তুলবার জন্য একজন অভিজ্ঞ ফটোগ্রাফার আনিয়েছিলাম পাবনা শহর থেকে। পাবনা কুষ্টিয়ার অনেক ফটোগ্রাফারের মধ্যে বাছাই করে যে প্রবীণ ফটোগ্রাফারকে পাবনা থেকে

আনিয়েছিলাম, তাঁর নামটি আর প্রকাশ করলাম না। প্রজাদের সঙ্গে ফটো তোলার ব্যাপারে কবির বেশ উৎসাহ ছিল।

সবন্ধু রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা শেষ হলে শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে ফটো তোলবার আয়োজন করা হল। কুঠিবাড়ির সামনের মাঠে রবীন্দ্রনাথ, এণ্ড্রুজ সাহেব ও সুরেন্দ্রনাথকে চেয়ারে বসতে দেওয়া হল, আর মাটিতে সতরঞ্চ পেতে কর্মচারিবৃন্দ, গ্রামবাসিগণ ও প্রজারা বসলেন, পেছনেও অনেকে দাঁড়ালেন।

আয়োজন দেখে রবীন্দ্রনাথ খুব খুশি। ক্যামেরা নিয়ে ফটোগ্রাফার তৈরি হলেন। উদ্যোগপর্বে প্রায় দুঘণ্টা কেটে গেল। রোদ উঠল, বেশ চড়া ফাগুনে রোদ। বেলা প্রায় এগারটার বেশি হয়ে গেল।

ফটোগ্রাফার তাঁর ক্যামেরাটি কোথায় রেখে ছবি তুলবেন তাই স্থির করবার জন্য একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে, নানা দিকে নানাভাবে এগুতে-পেছুতে লাগলেন। তাঁর পরামর্শে বসার ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হল দুতিনবার। সবাই বিরক্ত, গোলমাল শুরু হল।

মফস্বলের সেকেলে ফটোগ্রাফার। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কি মশাই!' তিনি বললেন যে, লাইট অর্থাৎ রোদের জন্য তিনি ক্যামেরা ঠিক করে নিতে পারছেন না। ভদ্রলোক রীতিমত ঘেমে উঠলেন। বললেন, 'ঠিক হয়ে যাবে, আপনারা ঘাবড়াবেন না।'

এদিকে রবীন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ বসে থেকে বিরক্ত হয়ে পড়েছেন। শিলাইদহে এত প্রজার মধ্যে এণ্ড্রুজ সাহেবকে নিয়ে ফটো তোলা হবে এই ব্যবস্থায় তিনি নিজে উৎসাহিত হয়েছিলেন এবং এতক্ষণ গল্পগুজবেই মত্ত ছিলেন। কিন্তু দুঘণ্টার উপর ফটোগ্রাফারের কাণ্ড দেখে বুঝলেন—বেচারি ভয়ানক বিপন্ন এবং তাঁর ক্যামেরাটি নিতান্ত সেকেলে।

রবীন্দ্রনাথ বিরক্ত হয়ে এণ্ড্রুজের হাত ধরে দোতলায় উঠতে যাবেন, এমন সময় ফটোগ্রাফার ম্যানেজারবাবুকে বললেন, 'দয়া করে বাবুমশাইদের জন্য তিনখানা চেয়ার কুঠিবাড়ির বারান্দায় পেতে দিন। আমি ফটো নেবই, ছাড়ব না। মশাই, লাইট আমার মাথা খেয়েছে। রোদের কী অন্যায় অত্যাচার দেখুন তো!'

আমরা অগত্যা সেই ব্যবস্থাই করলাম। ফটোগ্রাফার দৌড়ে গিয়ে বাবু-মশায়ের সামনে হাতজোড় করে বললেন, 'হুজুর, আপনারা এই তিনখানা চেয়ারে বসুন, ফটো আমি নেবই। আর বিরক্ত করব না।'

রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, 'তোমায় যন্তরটা বড্ড সেকেলে। তুমি বাপু পারবে না বুঝতে পেরেছি। এখানেও তো রোদ কম নেই। যাদের নিয়ে ছবি তুলব, তাদেরই দিলে তাড়িয়ে। তা হলে আর ছবির দরকার কী রইল? তুমি বিশ্রাম করগে। আমাদের ফটোর দরকার নেই।'

ফটোগ্রাফার নাছোড়বান্দা, বললেন, 'হুজুর, অত লোকের ফটো এত রোদ্দুরে কি করে তুলব! বাপরে, একহাট মানুষ! কেউ নড়ে না!'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'ওদের ছবি পেলেই খুব খুশি হতুম। সেজন্যই তোমাকে আনিয়েছি। আমাদের ফটোর কোনই দরকার নেই। তুমি বড্ড ঘেমে গেছ বাপু, যাও, বিশ্রাম করগে।'

সবন্ধু রবীন্দ্রনাথ দোতলায় উঠে গেলেন।

হতাশ ফটোগ্রাফার বসে পড়লেন। দুদিন পরে একখানা ফটো দেখালেন। দেখা গেল, বহু প্রজার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে গ্রুপফটো তিনি তুলেছিলেন সেটি দেখতে পলিপড়া নদীর মত। আমরাও হতাশ হলাম। ফটোগ্রাফার রীতিমত মুষড়ে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে শিলাইদহ ছেড়েছেন। সেদিন রাত্রি প্রভাত হবার পূর্বেই আশাহত ফটোগ্রাফার পাবনা প্রস্থান করলেন।

অজ্ঞাতবাসের সঙ্গী

খুব ঘনিষ্ঠভাবে বাস্তব অনুভূতির সাক্ষাৎ না পেলে সাহিত্যশিল্পীরা সার্থক কথাসাহিত্য রচনা করতে পারেন না, একথা সর্বজনস্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও এরকম বাস্তব চরিত্রের ছবি বড় কম নেই। 'কথা ও কাহিনী'র পুরাতন ভৃত্য, দুই বিঘা জমি, বিসর্জন, দেবতার গ্রাস প্রভৃতিতে ও 'পলাতকা,' 'খাপছাড়া' এবং 'ছড়ার ছবি'র অনেক কবিতায় তাঁর সংবেদনশীল বাস্তব চরিত্র অধ্যয়নের অনেক নমুনা মেলে। তাঁর 'গল্পগুচ্ছ'-এর অনেক গল্পের নায়ক-নায়িকার বাস্তব পরিচয় বিশেষ অনুসন্ধান করলেই পাওয়া যায়। কবির জীবনেতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের অধিকাংশ কেটেছে তাঁর অজ্ঞাতবাসের নিভৃত পল্লীগুলিতে, সেখানকার স্নিগ্ধ-শান্ত আবেষ্টনের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনেতিহাসে শহরবাসের সংবাদই বেশি মেলে; পল্লীবাসের বিবরণ বেশি না

হলেও তাঁর পল্লীবাসের অভিজ্ঞতার ছাপ সুদূরপ্রসারী ও অনেক কাহিনী ও গল্পে সুস্পষ্ট।

গ্রামে-গাঁথা বাংলার নিভৃত পল্লীপ্রকৃতির ক্রোড়ে পদ্মা, গোরাই, আত্রাই, ইছামতী, নাগর নদী ও চলনবিলের উপরে তিনি দীর্ঘকাল বজরায় বাস করেছেন। পদ্মাকে তিনি 'সাক্ষী করি পশ্চিমের সূর্য অস্তমান, তোমারে সঁপিয়াছিনু আমার পরাণ' বলে সম্ভাষণ করেছেন। সে যেন তাঁর মানস-সুন্দরীর কাছে গোপন অভিসারের পালা; 'কোলাহলমুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণ' ছেড়ে, শহরবাসের উত্তাপ-উত্তেজনা থেকে আত্মরক্ষার জন্য একটা অজ্ঞাতবাসের জীবন। প্রকৃতির স্নিগ্ধ ক্রোড়ে নিভৃত মানসলোকে বিজন সাধনা চলছিল। সেটা তাঁর বিশাল সাহিত্যসৃষ্টির প্রস্তুতি। 'ছিন্নপত্রে' কবিমানসের ও মানবাদর্শের এই সঙ্গীহীন নিভৃত তপস্যার বিচিত্র অভিব্যক্তিগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। গুরুগোবিন্দের বাণীর মধ্যেই নিজের এই দীর্ঘ অজ্ঞাতবাসের পরিচয় প্রচ্ছন্ন রেখেছেন,—যেন 'দিবানিশি শুধু ব'সে ব'সে শোনা আপন মর্মবাণী'। সেখানকার 'নীরব ভাবনা আর কর্মবিহীন বিজন সাধনা'য় তাঁর অনেক কাল কেটেছে—দেশের নাড়ীর গভীর পরিচয়টি প্রাণ ভরে নেবার জন্য। সাধনার এই দিব্য উপলব্ধির সম্ভাবনা নগরীতে ছিল না। তাই অন্তরের রহস্যটি প্রকাশ করেছেন—

এমনি কেটেছে দ্বাদশ বরষ
আরো কতদিন হবে—
চারি দিক হ'তে অমর জীবন
বিন্দু বিন্দু করি আহরণ
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে!

কবে এই নিভৃত অজ্ঞাতবাস ছেড়ে সিদ্ধতাপস তাঁর স্বদেশকে ডেকে বলবেন—

কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব—
'পেয়েছি আমার শেষ'।

* * * *

আমার জীবনে লভিয়া জীবন,
জাগো রে সকল দেশ।

সেই দীর্ঘ নিভৃত অজ্ঞাতবাসে বসে তাঁর হৃদয়ের গোপন মর্মবাণীটি

শুনবার সময়ে যাঁরা তাঁর সঙ্গী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গে তাঁকে উঠতে বসতে হয়েছে, তাঁরা আদৌ সর্বজনমান্য কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, রাজনীতিক ছিলেন না; তাঁরা ছিলেন নিরক্ষর সহজ সরল অতিসাধারণ গ্রাম্য নরনারী। তাঁদের মনোরাজ্যের খবর রবীন্দ্রনাথ রাখতেন তাঁদের অজ্ঞাতসারেই। তাঁরা শুধু পেতেন তাঁর সংবেদনশীল মনের খবরটি মাত্র। এইখানেই কবি অনুভব করেছেন—'জীবনে জীবন যোগ করা / না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।' সেইখানেই কবি এই মহাসত্য আবিষ্কার করেছেন—

সে অন্তরময়

অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।

এই সব পল্লীবাসী নরনারীর কাছ থেকে বিন্দু বিন্দু আহরণ করে কবি অমর জীবনের অধিকারী হয়েছেন। এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কবির জীবনে কত বড় অমূল্য ধন তা বুঝবেন অনুভবী মানুষমাত্রই। এঁদের অখ্যাত পরিচয় কেউ জানবে না, এঁরা রবীন্দ্রমানসকে কতখানি ফুটিয়েছিলেন কোন রবীন্দ্র-জীবনী-রচয়িতা তার উল্লেখ করবেন না; কারণ রাজার যুদ্ধজয়ের কাহিনী ছাড়া প্রজার বেদনা ও আত্মাহুতির কথা ইতিহাসের পাতায় স্থান পায় না। পল্লীর এই সমস্ত অখ্যাত বৈষ্ণব, বাউল, কবিয়াল, চাষি, গৃহস্থ, শিক্ষক—এঁদের নিভৃত সাহচর্য নব নব সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলার অজস্র সৃষ্টিতে ও মানবতার সাধনায় রবীন্দ্রনাথের অবদানের মধ্যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তা না জানলে রবীন্দ্রপ্রতিভার পূর্ণ দর্শন লাভ হতে পারে না। প্রকৃতির গোপন অন্তঃপুরের নানা ঐশ্বর্যে যাঁরা কবির সৃষ্টিকে মাধুর্যমণ্ডিত করেছিলেন তাঁদেরই স্মরণ করে বিশ্ব ভ্রমণ করে বিশ্বকবি গেয়েছিলেন—

বহুদিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু।

—স্ফুলিঙ্গ

যে মাটির গাছে গাছে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে অজস্র ফুল ফুটিয়ে গেছেন, সেই মাটি এঁরাই তৈরি করেছিলেন। হৃদয়ের আনন্দবেদনার রসে সেই মাটির সৃষ্টিশক্তি এঁরাই এনে দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকে রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যেই আত্মগোপন করে আছেন। যে কয়জন এইরকম পল্লীর নরনারীর কথা বলব, তাঁদের নিবিড় সান্নিধ্য কবির অন্তরের কত গভীরে প্রবেশ করেছিল তা এঁদের কাহিনী থেকেই বোঝা যাবে। পল্লবগ্রাহী মানুষ হয়ত এঁদের আমলই দিত না, কিন্তু স্রষ্টার মন এঁদের নিভৃত অন্তরের পরিচয়ে অপূর্ব প্রেরণায় ভরে উঠেছিল। আমার স্মৃতিলোক থেকে টেনে এনে এই কয়জন অখ্যাত মানব-মানবীকে বিশাল রবীন্দ্র-সাহিত্যের দরবারের এককোণে বসিয়ে দিলাম সসঙ্কোচে; আশা করি অনুভবী পাঠক এঁদের প্রতিও একটু শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন :

সর্বখেপি

এক রহস্যময়ী নারীচরিত্রের সৃষ্টি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'-এ, বোষ্টমী গল্পে। গেরুয়া শাড়ি পরে এক আঁচল ফুল নিয়ে এই বৈষ্ণবী দুপুরবেলা খঞ্জনি বাজিয়ে যখন মাঠের আল দিয়ে 'গৌর গৌর' গান গেয়ে যেতেন, তখন প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা হত। এই পরিচয়হীনা বৈষ্ণবীটির সঙ্গে অভিজাত জমিদার রবীন্দ্রনাথের যে ঘনিষ্ঠতা দেখেছি, তাতে আশ্চর্য হবারই কথা। আমরা এর নাম সর্বখেপি বলেই জানতাম; রবীন্দ্রনাথ গল্পে এঁর নাম দিয়েছেন 'আনন্দী'। এঁর প্রকৃত জীবনকাহিনী হয়ত রবীন্দ্রনাথই জানতেন, আমরা জানতাম না। এঁর যৌবনের অপূর্ব কাহিনী যা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তা হয়ত কবির কল্পনাপ্রসূত। কারণ সে-বিষয়ে সবখেপি কাউকেই কিছু বলতেন না। আমরা তাঁর প্রৌঢ় জীবনের সঙ্গেই পরিচিত। সে কাহিনীটুকুও অপূর্ব ও অদ্ভুত। গ্রামের ভদ্রপাড়ায় ইনি কারও সঙ্গে মিশতে পারতেন না, কারণ এঁর সহজিয়া ধর্মমত ও ক্রিয়াকাণ্ড আমাদের গ্রামের ভদ্রসমাজের অসহ্য ছিল। এঁর গুরু কে ছিলেন তাও জানতাম না; তবে ঐ অঞ্চলে এঁর বারো-চৌদ্দজন শিষ্য ছিল তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে। ইনি হঠাৎ কবে যেন শিলাইদহে এসে বসাকদের এঁদো পুকুরের ধারে জঙ্গলের মধ্যে এক বিশাল তমালগাছের তলায় কুটির বাঁধলেন, সকাল-বিকাল নামগান করতেন খঞ্জনি বাজিয়ে, শিষ্যদের সঙ্গে আলাপ করতেন। কিছুদিন পরে

তাঁর বাড়ির সামনে জঙ্গল পরিষ্কার করে অষ্টপ্রহর মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন, পার্শ্ববর্তী কয়েকখানা গ্রামের অনেক বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী দলবল নিয়ে ঐ মহোৎসবে কীর্তন গেয়েছিলেন ; মহোৎসবের ভূরিভোজনও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রামের ভদ্রসমাজ এ নিয়ে খুব জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ করেন,—'খ্যাপাখেপির কাণ্ড, ভিক্ষে করে খায়, এত টাকা পায় কোথায়?' তাঁরা একেবারে খেপিকে গ্রামছাড়া করে তবে ছাড়লেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁর গভীর অন্তরঙ্গতায় এঁরা খুব মাথা ঘামান। খেপি তখন জাহেদপুর গ্রামে তাঁর এক শিষ্যের জমিতে নিজ আশ্রম নির্মাণ করেন, সেখানেও দিবারাত্রি কীর্তনানন্দ। শিষ্যসংখ্যাও ক্রমে বেড়ে যেতে থাকে। জনসাধারণের বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ এঁর জীবিকানির্বাহের জন্যে নাকি কুড়ি-বাইশ বিঘা জমি দিয়েছিলেন বিনা নজরে। জাহেদপুরে এঁর আশ্রমের উপরেও আমাদের গ্রামের সমাজপতিদের খরদৃষ্টি পড়ে। তাঁদের অনেক কৌশলে খেপি তাঁর জাহেদপুরের কুটিরও তুলে দিয়ে জানিপুর গ্রামে চলে যান। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে থাকাকালে ইনি দুবেলা শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে যেতেন এবং তাঁর পাতের প্রসাদ পেতেন। এইসব বর্ণনা 'বোষ্টমী' গল্পের সঙ্গে হুবহু মেলে। ইনি ফুল ভালবাসতেন, সব সময়েই এঁর গেরুয়া আঁচলে দেখতাম একরাশ গন্ধরাজ ফুল ; এঁর আশ্রমেও চমৎকার ফুলের বাগান ছিল। কারও বাগানে ফোটা ফুল দেখলেই সেই ফুল তুলে নিয়ে আঁচল ভরতেন। ফুলের মালা গেঁথে নিয়ে যেতেন কুঠিবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের জন্য। রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ উঠলেই ইনি ভক্তিতে 'গৌর গৌর' বলে মাথায় হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করতেন. আবার গুন্‌গুনিয়ে গাইতেন—'গৌরসুন্দর মোর'। আমাকে ইনি খুব ভালবাসতেন ; আমি তখন এগার-বারো বছরের বালক। আমায় কোলে করতেন, খাওয়াতেন। আমার টো টো করে ঘোরা অভ্যাস ছিল ; এঁর সস্নেহ ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যেতাম ; বাড়ির অভিভাবকদের শাসনের মধ্যেও সুযোগ পেলেই এঁর সেই তমালতলার কুটিরে চলে যেতাম। সকলে বলত—'খেপি জাদু জানে, খবরদার ওর কাছে যাসনে।' আমি খেপিকে বাবুমশায়ের কাছে আমায় নিয়ে যাবার জন্য খুব ধরতাম। বলতেন 'নিয়ে যাব একদিন, কিন্তু টের পেলে বিহারীবাবু আমাকে লাঠিপেটা করবে।' আমার সঙ্গেও কথা বলতেন স্নেহগদ্‌গদভাবে গানে—'ওরে ও কালসোনা'। জাহেদপুর থেকে চলে যাবার পর আমরা কেউ তাঁর কোনো সন্ধান পাই নি। সেসময় এঁর বয়স ছিল আন্দাজ পঞ্চান্ন।

শিবনাথ সাহা

এঁর বাড়ি ঠাকুর-জমিদারির কমলাপুর গ্রামে, বিখ্যাত গঞ্জ জানিপুরের (খোক্‌সা স্টেশন) পূর্বে, গোরাই নদীর তীরে। এককালে মনোহরসাঁই কীর্তনগানে ইনি ঐ অঞ্চল মাতিয়ে তুলেছিলেন। যৌবনে রবীন্দ্রনাথ জানিপুর মহাল পরিদর্শনে গেলে স্থানীয় জনসাধারণ মহাসমারোহে তাঁর অভ্যর্থনা করেন। ঐ সভায় প্রশস্তিপাঠ, বক্তৃতাদি ছাড়াও শিবু সা'র কীর্তন হয়। তখনই রবীন্দ্রনাথ শিবু সা'র কীর্তনের প্রতি আকৃষ্ট হন। সে সময়ে বামাচরণ বসু ঠাকুর-জমিদারির ম্যানেজার ছিলেন; তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত, পরম বৈষ্ণব ও বিচক্ষণ ম্যানেজার। ঐদিন রাত্রে বামাচরণ-বাবু ও শিবু সা'র সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ও ভক্তিশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা হয়। জানিপুরে গেলেই রবীন্দ্রনাথ শিবু সা'কে ডাকিয়ে এনে কীর্তন শুনতেন। শিলাইদহ কাছারিতে প্রতি বছর পুণ্যাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে শিবু সা'র কীর্তন গান হত। রবীন্দ্রনাথ এঁকে বিনা নজরে অনেক জমি বন্দোবস্ত দেন। শিবু সা'র কীর্তন সেসময় হিন্দুদের যাবতীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ হয়ে দেশময় কীর্তনানন্দ বিতরণ করে। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র-বিয়োগের পর রবীন্দ্রনাথ সদলবলে শিবু সাহাকে কলিকাতা ঠাকুরভবনে নিয়ে আসেন। গগনেন্দ্রনাথ ও ঠাকুরপরিবারের সকলেই শিবু সা'র কীর্তনগানে মুগ্ধ হন। স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে শিবু সাহা বহুবার কীর্তন গান করেন। তার পরে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর গৃহে, নাটোর ও পাইকপাড়ার রাজবাড়িতে কীর্তন গেয়ে শিবু সাহা কলিকাতাবাসী অভিজাতবর্গকে মুগ্ধ করেন। সমস্ত বঙ্গদেশে এঁর খ্যাতি রটে যায়। স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন আনন্দবাজার পত্রিকায় 'কলিকাতায় কীর্তনের আদর,' নামে এক প্রবন্ধে এঁর বিস্তারিত পরিচয় দিয়ে-ছিলেন। তাঁর রচিত 'মুক্তাচুরি' গ্রন্থেও এঁর উল্লেখ আছে। এমন একদিন ছিল যেদিন শিবু সা'র অপূর্ব কীর্তনানন্দে বাঙলার আকাশবাতাস মুখরিত হত। এঁর ফুলমালাশোভিত সুঠাম দেহে কীর্তনানন্দের যে সুমধুর অভিব্যক্তি প্রকাশিত হত তা এখনও আমাদের স্মৃতির রাজ্যে রসপ্রবাহের সৃষ্টি করে।

বামাচরণ বসু

ইনি যখন রবীন্দ্রনাথের জমিদারির ম্যানেজার ছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ পুরাদস্তুর জমিদার। ক্ষুরধার বৈষয়িক বুদ্ধি ও প্রবীণতার সঙ্গে আধুনিক

শিক্ষা ও বৈষ্ণবশাস্ত্রজ্ঞানের অসাধারণ মিলন এঁকে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় সান্নিধ্যে এনে দেয়। শিলাইদহ কাছারিতে একবার পদকীর্তনের আসরে ইনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র ও নাটোররাজ জগদিন্দ্রনাথকে কীর্তন শোনান। শ্রীরাধার বিরহের বিশেষ বিশেষ অবস্থা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এঁকে অনেক কঠিন প্রশ্ন করেন; ইনি বহু বৈষ্ণব গ্রন্থের সহায়তায় তাঁর সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর দেন। সেই সময়কার অধিকাংশ রবীন্দ্র-কবিতা ছিল এঁর কণ্ঠস্থ। ইনি 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর' অনেক গান নিজে গাইতেন। এঁর আমলে শিলাইদহ সদর কাছারিতে প্রতি সপ্তাহে পদকীর্তনের আলাপ হত এবং শিবু সাহা ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়াদের ইনি আমন্ত্রণ করে আনতেন। বৈষ্ণবসাহিত্যের কয়েকখানা গ্রন্থও ইনি লিখেছিলেন। গ্রামে নগরসংকীর্তন বের হলে ইনি ম্যানেজারের পদমর্যাদা ভুলে দলের পুরোভাগে থেকে নৃত্যগীতে মেতে উঠতেন। এঁর আমলে জমিদারির অনেক বিষয়ে উন্নতি হয়। সেই সময়ে ঠাকুর-জমিদারিতে খাজনাবৃদ্ধির (নিরিখবৃদ্ধি) কঠিন সমস্যাকে কার্যে পরিণত করে ইনি রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে সোনার ঘড়ির চেন উপহার পান; কিন্তু কিছুদিন পরে প্রজাসাধারণের কাছে অপ্রিয় হয়ে পড়েন। পরে ইনি মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর জমিদারির ম্যানেজার হয়ে সুবিখ্যাত বৈষ্ণব জমিদারের সান্নিধ্যলাভ করে বহুদিন যশের সঙ্গে কাজ করেন। এঁর এক পুত্র (নলিনীমোহন বসু) দীর্ঘকাল অবিভক্ত বাংলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। বৈষ্ণবশাস্ত্র অনুশীলনের জন্য ইনি কয়েকটি আশ্রমও স্থাপন করেছিলেন।

সন্তোষকুমার রায়

ইনি শিলাইদহ (খোরসেদপুরে) মধ্য ইংরেজি স্কুলের পণ্ডিত ছিলেন। অল্পবিদ্যাসম্পন্ন গ্রাম্য পাঠশালার পণ্ডিত হলেও সন্তোষ পণ্ডিত বাঙলা গদ্য-পদ্য রচনায় ক্ষিপ্র ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বিবাহের প্রীতি-উপহার ও বিদায়-অভিনন্দনাদি ইনি যে কত লিখেছেন তার ইয়ত্তা নেই। আশপাশের বহু গ্রামের লোক এঁর কাছে 'বিয়ের পদ্য', শোকোচ্ছ্বাসাদি লেখাতে আসতেন। ইনি রবীন্দ্রনাথের জমিদারিতে 'অভিষেক' উৎসবের সময়ে স্বরচিত চমৎকার একটি কবিতা পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঐ অখ্যাত পল্লীকবির কবিত্বশক্তিতে মুগ্ধ হন। সেই থেকে ইনি প্রায়ই স্বরচিত লেখা

রবীন্দ্রনাথকে দেখাতেন এবং সংশোধিত করে নিতেন আর সেই সংশোধিত খাতা বন্ধুবান্ধবদের গর্বের সহিত দেখাতেন। শিলাইদহে ইনি একটি ক্ষুদ্র সাহিত্যগোষ্ঠী সৃষ্টি করেন। শিলাইদহ কাছারির কর্মচারী হরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়* ও খোরসেদপুর স্কুলের হেডমাস্টার সতীশচন্দ্র অধিকারী (আমার দাদা) ঐ গোষ্ঠীর অন্যতম ছিলেন। এই সাহিত্যগোষ্ঠীর সভ্যেরা সন্তোষবাবু ও হরেন্দ্রবাবুকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দিয়ে এই উপাধি অনুমোদনের জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন। আমি সন্তোষ পণ্ডিতমশাইয়ের ছাত্র ছিলাম। সে সময়কার বাঙলা গদ্য-পদ্য রচনার সূচনাপর্বেও এঁর রচনাশক্তির খ্যাতি ছিল খুব। ইনি প্রথম হেডমাস্টারের যে বিদায়-অভিনন্দনের কবিতা রচনা করেন তার প্রথম ক'টি লাইনের নমুনা দিচ্ছি—

অকস্মাৎ একি শুনি ভীষণ বারতা
পশিল শ্রবণ-পথে অশনি সমান,
নাশিল কায়িক বল প্রাণের ধীরতা
দহিল আশার বাসা অঙ্গার প্রমাণ।

এঁরই চেষ্টায় ঐ অঞ্চলের কয়েকজন মরমি কবির (গোঁসাই গোপাল জোয়ারদার-প্রমুখ) তত্ত্বসঙ্গীত ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়। ইনি ক্লাসে এসে বাঙলা রচনার দিকে খুব বেশি মনোযোগ দিতেন। বলতেন, যে কোনও বিষয়ে রচনা লিখতে হলেই আগে ভগবান স্মরণ করা প্রয়োজন। তার নমুনা—'পরমপিতা পরমেশ্বরসৃষ্ট এই বিশাল জগতীতলে মানুষকে তিনি যতগুলি গুণে বিভূষিত করেছেন, তাহার মধ্যে ক্ষমাগুণই শ্রেষ্ঠ'। এটা হল 'ক্ষমা'র উপরে রচনা। আমরা তাই যে কোন রচনাতেই পরমপিতা পরমেশ্বরের প্রশস্তি দিয়ে আরম্ভ করতাম, তা না হলে রচনা জাতে উঠত না। ইনি যেমন স্নেহময় ছাত্রহিতার্থী ছিলেন তেমনি বেত-মারায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে ইনি দাড়ি রেখেছিলেন,—রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছিল এঁর মুখস্থ। এঁর বাড়ি ছিল জানিপুরের নিকট গোরাই নদীর পরপারে আজইল গ্রামে।

রামগতি জোয়ারদার

শিলাইদহের একজন বর্ধিষ্ণু ধনী ব্রাহ্মণ। ইনি প্রায়ই থাকতেন কলিকাতায়, একটা পাটের আপিসের বড়বাবু ছিলেন। বহু আত্মীয়স্বজন

* এঁর পুত্র শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সুলেখক ও গ্রন্থকার।

ইনি প্রতিপালন করতেন। ইনি ছিলেন কবির লড়াইয়ের একজন নিষ্ঠাবান ভক্ত। এঁর পরিচালিত শিলাইদহের তখনকার কবির দলের খুব নাম ছিল; এর জন্য তিনি অজস্র ব্যয়ও করতেন। কুমারখালি দলের কবিয়াল ছিলেন 'দধি মাস্টার' নামে একজন বিখ্যাত সঙ্গীতরচয়িতা। একবার এঁরই বাড়িতে এই দুই দলে কবির লড়াইয়ের বিরাট আয়োজন হয় এবং রবীন্দ্রনাথ বিশেষ শ্রোতা হিসাবে আমন্ত্রিত হন, কিন্তু বিশেষ কাজে কলিকাতা চলে আসতে হয় বলে তিনি ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন নি। শুনেছি, ঐ কবির লড়াইয়ে নামজাদা কবিয়াল দধি মাস্টার পরাজিত হন। শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে একবার রামগতিকে কেন্দ্র করে এক সঙ্গীতোৎসব হয় রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে। জয়গৌরবে সন্তোষ পণ্ডিত, হরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ম্যানেজার বামাচরণবাবু, আমার পিতা সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের 'সখীসংবাদের' দলও প্রসিদ্ধি লাভ করে। পরে এঁদের চেষ্টায় একটা যাত্রার দল গড়ে ওঠে।

গগনচন্দ্র দাম

আমার মনের মানুষ যে রে, আমি কোথায় পাব তারে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে দেশবিদেশে বেড়াই ঘুরে।
কোথায় পাব তারে।

এই বিখ্যাত মরমি গানের রচয়িতা গগন দাম ছিলেন জাতিতে কায়স্থ। এঁর রচিত আরও বহু তত্ত্বসঙ্গীত আছে; কিন্তু সেগুলি অনেকেরই অজ্ঞাত। রবীন্দ্রনাথ প্রবাসী পত্রিকার 'হারামণিতে' এঁর কয়েকটা গান সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছিলেন। ইনি ছিলেন শিলাইদহ পোস্টাপিসের পিওন। তাই 'গগন হরকরা' নামেই ইনি বেশি পরিচিত ছিলেন। পোস্টাপিসের চিঠি বিলির কাজে গাঁয়ে গাঁয়ে এঁকে ঘুরতে হত। সেসময় মাঠের মধ্যে, নদীতীরে ইনি প্রাণের আনন্দে মরমি সঙ্গীত গেয়ে শান্ত প্রকৃতিকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দিতেন, পল্লীর কুটিরে কুটিরে রসতরঙ্গ জেগে উঠত। চিঠি বিলি করবার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রায় প্রত্যহই এঁকে যেতে হত, সেখানে চলত রসালাপ, গানের পর গান, সুরতরঙ্গ। অনেকদিন সন্ধ্যার পর নির্জনে বোটের ছাদে বসে রবীন্দ্রনাথ এঁর গীতসুধা পান করতেন। ইনি আমার পিতার (সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী) অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। পিতা যখন যাত্রার দল ভেঙে থিয়েটারের দল করলেন,

তখন তাঁরই অনুরোধে গগনকে ঐ সম্প্রদায়ের সঙ্গীতাচার্য হতে হয়। গগন গান নিয়েই মশগুল থাকতেন। পিতা ধরে বসলেন, 'গগন শুধু গান নিয়ে থাকলে চলবে না, তোমায় একটা পার্ট করতে হবে।' গগন কিছুতেই রাজি নন, শেষে অনেক অনুরোধে 'প্রহ্লাদচরিত্রে' নরসিংহের পার্ট গ্রহণ করলেন। পিতা বললেন, 'তোমায় কথাবার্তা কিছু বলতে হবে না, তোমাকে ভীষণাকার নরসিংহ সাজিয়ে দেব। হিরণ্যকশিপু বেশে আমি যখন পিস্‌বোর্ডের স্তম্ভে ঘা মারব, তখন তুমি বিকট শব্দ করে অট্টহাস্যে আমাকে কোলের উপর ফেলে, পেটের উপরকার পোষাক ছিঁড়ে রং-লাগানো ন্যাকড়াগুলো টেনে বের করে মুখে পুরবে।' গগন রাজি হয়েছিলেন এবং তাঁর অভিনয়ও নাকি খুব হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। এঁর বাড়ির আমবাগান ছিল বিখ্যাত। এঁর মৃত্যুর পর এঁর বংশধরগণ অত্যন্ত দরিদ্র হয়ে পড়েন। ইনি মুখে-মুখে গান বাঁধতেন, আমার পিতা সেগুলি লিখে রাখতেন। সে লেখার কোন সন্ধান পাই নাই।

অছিমদ্দি সর্দার

এ লোকটি রবীন্দ্রনাথের চর-অঞ্চলের (রাধাকান্তপুরের) একজন মুসলমান প্রজা। লোকটি অশিক্ষিত, কবির দলের সর্দার। এর গানের কোনই বিশেষত্ব ছিল না; উতোর চাপান সবই নিম্নস্তরের, কিন্তু লোকটা ছিল চমৎকার গাল্পিক। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রবীন্দ্রনাথ হাঁ করে অছিমদ্দির গল্প শুনতেন। এর গল্পের নিষ্ঠাবান শ্রোতা একমাত্র রবীন্দ্রনাথ। এইটেই ছিল আশ্চর্য। রবীন্দ্রনাথ যখন কিছুদিন ধরে চরের উপর বোট লাগিয়ে সাহিত্যসাধনায় নিমগ্ন থাকতেন, তখনই প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় অছিমদ্দি এসে জুটত বোটে, আর বিনা বাধায় অবিরাম বকে যেত। এর গল্পের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কী পেয়েছিলেন, তিনিই জানতেন; অশিক্ষিত চরের চাষি কি মন্ত্রবলে যে কবিকে এতক্ষণ ধরে মুগ্ধ করে রাখত, সে একটা প্রহেলিকা বটে। রবীন্দ্রনাথ তাকে প্রশ্নও করতেন অনেক, আর অছিমদ্দি জবাবের পর জবাব দিয়ে তার গল্পের ভাণ্ডার খুলে দিত। নমুনাটা এইরকম—'দেখুন হুজুর, ম্যানেজারবাবু আমার পর 'অনুরাগ' করে আমার এতদিনের চষা জমিটার জন্যে নালিশ করে বসলেন, ব্যাটাপুৎ না খেয়ে মরে, তাই কি হুজুরের এলাকা ছেড়ে যাব? করলাম হুজুরে দরখাস্ত; তাইতো, হুজুর 'এনছাপ্' করে দিলেন। আল্লার কুদরতে অছিমদ্দি সর্দার কাউকে ডরায় না।' শুনতে পাই অছিমদ্দি আমলাবাবুদের গুহ্য কথা

বাবুমশাইকে প্রকাশ করে দিত। অথচ বাবুমশাই অছিমদ্দির গল্পের ভক্ত। অছিমদ্দির ভাই আফাজদ্দি মাঝে মাঝে বোটে এসে কবিকে গান শোনাত। সে পরে জারি গানের দল গড়ে এবং অছিমদ্দি চর-মহালের বরকন্দাজের পদ পায়। আমলারা কিন্তু অছিমদ্দিকে খুব সমীহ্ করে চলতেন।

মৌলবি কামালউদ্দিন

এঁর সম্বন্ধে একটা কৌতুকপ্রদ গল্প আমি লিখেছি। ইনি সেকালের শিলাইদহ জমিদারিতে 'মৌলবি সাহেব' নামেই সুবিখ্যাত। ইনি বাঙালি নন, পাঞ্জাবী মুসলমান; সুদর্শন, সুবক্তা ও ফার্সিতে সুপণ্ডিত, প্রায়ই ফার্সি বয়েৎ ঝাড়তেন। বাঙলাদেশে কি জন্য যে তিনি সপরিবারে বাস করতেন তার কারণ অজ্ঞাত। রবীন্দ্রনাথ এঁর খুব গুণগ্রাহী ছিলেন। অনেক কাজে এঁকে ডাকতেন, পরামর্শ নিতেন, ফার্সি-কবিদের বাণী শুনতেন। কালক্রমে ইনি নানা কাজে রবীন্দ্রনাথের অপ্রীতিভাজন হয়ে পড়েন, কারণ এঁর ক্ষমতাপ্রিয়তা জনসাধারণের অসন্তোষের ব্যাপার হয় এবং রবীন্দ্রনাথও এঁকে শূন্যগর্ভ মৌলবি বলে জানতে পারেন। অনেক কাজেই ইনি অন্যায় হস্তক্ষেপ করতেন রবীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহিতার খাতিরে। কিছুদিন পরে শিলাইদহেই এঁর স্ত্রীবিয়োগ হয় এবং তিনি স্বদেশে চলে যান। সে সময়টা ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ। এঁর উপরে কবি অনেকবার বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। এসব জানার জন্য 'ছিন্নপত্র' দ্রষ্টব্য।

মেছের সর্দার

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যখন শক্তিচর্চা ও আত্মরক্ষার জন্য দেশময় সাড়া জেগেছিল, সেই সময় এই অদ্ভুত-চরিত্র মুসলমান লাঠিয়ালকে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেন তাঁর জমিদারি কুমারখালির অন্তর্গত খয়েরচারা গ্রাম থেকে।

মেছের সর্দারের কাহিনী পৃথকভাবে পরে বলা হয়েছে।

সধরচাঁদ সন্ন্যাসী

ইনি প্রথমে ছিলেন বৈষ্ণব। পরে হয়ে যান সহজিয়া ভাবের ভাবুক। এঁর গৃহস্থাশ্রমের নাম সতীশচন্দ্র সরকার। বিভিন্ন মত নিয়ে ইনি রবীন্দ্রনাথের

সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং শেষে রবীন্দ্রনাথের ধর্মমতে আকৃষ্ট হয়ে বহুবার তাঁর উপদেশ গ্রহণ করেন। 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়'— রবীন্দ্রনাথের এই অপূর্ব কবিতায় এঁর ধর্মবিশ্বাস এক নূতন খাতে বইতে থাকে। ইনি পল্লীতে এবং কলিকাতাতেও আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং জনসাধারণের মধ্যে কীর্তন শিক্ষার নানা আয়োজন করেন। 'রসরাজ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকাও ইনি বহুদিন পরিচালনা করেন। ইনি বহু দেশ পর্যটন করে ধর্মমত সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। শেষে এঁর ধর্মমতের কোন স্থিরতা ছিল না। আশ্রম চালাবার জন্য অর্থভিক্ষায় ইনি বাঙলার নেতাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ান। এঁর শেষ জীবনের কোন সংবাদই আমাদের জানা নাই।

সাধনচন্দ্র সন্ন্যাসী

এঁর বাড়ি রবীন্দ্রনাথের জমিদারিভুক্ত জানিপুরের মধ্যে দশকাহনিয়া গ্রামে। ইনি অনেক সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন ও দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন। ইনি জাতিতে কাপালি এবং সমৃদ্ধ গৃহস্থ ছিলেন। ইনি সুরসিক ও সুপণ্ডিত বলে সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। এঁকে কখনও দেখি নাই, এবং এঁর অন্য কোন বিবরণও আমার জানা নাই।

লালন সাঁই

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে
আমার বাড়ীর কাছে আরসিনগর
তাতে এক পড়শী বসত করে।

—এইরকম বহু মরমি সঙ্গীতের মূর্ছনায় যিনি একদিন বাঙলার আকাশ-বাতাস মুখরিত করে রেখেছিলেন সেই লালন ফকিরের আস্তানা (আশ্রম) ছিল রবীন্দ্রনাথের জমিদারির সীমানায় কুষ্টিয়ার উপকণ্ঠে গোরাই নদীতীরে ছেঁউড়িয়া গ্রামে। লালন প্রথম জীবনে হিন্দুকায়স্থ ছিলেন, তাঁর নাম ছিল লালনচন্দ্র কর। বাড়ি কুষ্টিয়ার নিকটেই ভাঁড়ারা গ্রামে। ইনি ১১৬ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন (১১৮১-১২৯৭?)। এঁর জীবনকাহিনী উপন্যাসের মত। সেসময়ে রেল হয় নি। প্রথম যৌবনে ইনি বেরোন তীর্থভ্রমণে শ্রীক্ষেত্রে।

পথে বসন্তরোগে আক্রান্ত হলে এঁর সঙ্গীরা এঁকে পরিত্যাগ করে চলে যান। সিরাজ সাঁই নামে একজন বিখ্যাত বাউল ফকির এঁকে কুড়িয়ে পান এবং পালন করেন। ইনি সেখানে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে মুসলমান ধর্মের মর্মকথা শিক্ষা করেন। কিছুকাল পরে স্বগ্রামে ফিরে এলে ইনি হিন্দুসমাজ ও আত্মীয়স্বজন দ্বারা পরিত্যক্ত হন। ইনি লেখাপড়া না জানলেও এঁর রচিত অসংখ্য মরমি, তত্ত্ব ও বাউল সঙ্গীতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মর্মকথা ধ্বনিত হয়েছে এবং জাতিভেদের ঊর্ধ্বে বিশ্বমানবতার মহিমা ও মানবধর্মের শ্রেষ্ঠ বিভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁর পরিচয় ছিল কিনা তার বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রাচীনেরা বলেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁর আলাপ হয়েছিল, কিন্তু সেকথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে রবীন্দ্রনাথ এঁর রচিত অনেকগুলি সঙ্গীত সংগ্রহ করে তার কিছু কিছু মাসিক পত্রিকাদিতে প্রকাশ করেন। তাঁর কাব্যরচনা ও রসসাধনায় বিখ্যাত লালন ফকিরের প্রভাব অনেক স্থানে সুস্পষ্ট। ছেঁউড়িয়াতে এঁর আস্তানায় কবি-জমিদার একটি সমাধিমন্দির তৈরি করে দেন।

দ্বারিকানাথ মজুমদার

ইনি রবীন্দ্রনাথের জমিদারির কয়াগ্রামের একজন শিক্ষিত বর্ধিষ্ণু জোতদার। ইনি ঠাকুর-জমিদারিতে বহুকাল থেকে অনেক জমির মালিক ছিলেন, সেজন্য এঁকে জমিদার-সরকারে অনেক টাকা মালগুজারি করতে হত। এঁর পুত্র-পৌত্রাদিরা আছেন। মজুমদার মশাইকে দেখি নাই। রবীন্দ্রনাথ 'ছিন্নপত্রা-বলী'তে এঁর এক সরস কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা দিয়েছেন। সেইটি পড়লেই সকলে এঁর পরিচয় পাবেন। সেই পত্রেই মৌলবি সাহেব ও 'একটি গেরুয়াবসন ও তিলকধারী দীর্ঘশ্মশ্রু বিরলকেশ উচ্চললাট প্রসন্ন-প্রশান্ত-মূর্তি ব্রাহ্মণের' চমৎকার বর্ণনা আছে, যা পড়ে হাস্য সংবরণ করা কঠিন। এইরকম অদ্ভুতচরিত্র বহু প্রজার পাল্লায় তাঁকে পড়তে হত। সেই পত্রেই দ্বারিক মজুমদারের যে বর্ণনা আছে সেটি হুবহু তুলে দিলাম—

…সে বোটের বার হতে না হতে দ্বারী মজুমদার ব'লে এই বিরাহিমপুরের একটি সুবিখ্যাত বক্তা এসে উপস্থিত। আমি বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করে চৌকিতে হেলান দিয়ে কঠিন প্রস্তরমূর্তির মত আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলুম। সে প্রথমে আরম্ভ করে দিলে—'মহারাজ, পুরাকালে যুধিষ্ঠিরের হিষ্টিরিয়া

(হিষ্ট্রি) পাঠ করে অনেকেই অবিশ্বাস করে থাকেন; তাঁরা বলেন এতদূর কি কখনও সম্ভব হতে পারে, কিন্তু এতকাল পরে আপনাকে চাক্ষুষ দেখে যুধিষ্ঠিরের কীর্তিকলাপের প্রতি তাঁদের সন্দেহভঞ্জন হয়েছে?—এই রকম ভাবে চলল। আমি যখন তাঁকে বললুম 'এইবার তুমি কাছারীতে বিশ্রাম করো গে' সে বললে, 'আজ আর আমার বিশ্রাম কিসের! আজ কতদিন পরে হুজুরের দর্শন পেয়েছি, আজ প্রায় সাত আট ন মাস অপেক্ষা করে অবশেষে শ্রীচরণ দেখতে পেলুম—দেখতে যে পাব সে আশা কি আর ছিল? বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর কম্পিত এবং রুদ্ধ হয়ে এল, বার বার শুষ্ক চক্ষু চাদরে মুছতে লাগল; ক্রমে, তার প্রতি তার পূর্বপ্রভু জ্যোতিদাদার যে অসীম স্নেহ এবং বিশ্বাস ছিল তাই মনে পড়ে তার চিত্ত উত্তরোত্তর অধিকতর উদ্বেলিত হয়ে উঠতে লাগল।... সে কী কাজ করেছিল, কী কী ঘটনা ঘটেছিল, তার মনিবরা কী কী কথা বলেছিল এবং সে তার কী কী উত্তর দিয়েছিল তার কোনোটাই বাদ না দিয়ে সমস্তই আনুপূর্বিক বলে যেতে লাগলো। সূর্য অস্ত গেল, সন্ধ্যা হল, পাখিরা নীড়ে, গাভীরা গোষ্ঠে, চাষারা কুটীরে ফিরে গেল—দ্বারী মজুমদার বোট থেকে নড়ে না। এমন সময় কুষ্টিয়া থেকে আর একটি দর্শন-প্রার্থী যখন এল তখন সে 'কাল প্রাতঃকালে' বাকি কথাগুলো বলতে আসবে ব'লে আমাকে সান্ত্বনা করে চলে গেল। এখনো সে আসে নি, কিন্তু তারই সমান বক্তা একজন এসে আমার পার্শ্ববর্তী বেঞ্চিতে ব'সে বক্তৃতার অবসর-প্রতীক্ষায় আছেন।' —(শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীকে শিলাইদহ থেকে লিখিত—৬ই জুলাই, ১৮৯৪ সালের চিঠি।)

এইরকম অনেক অদ্ভুত প্রজার সরস বর্ণনা আছে তাঁর 'ছিন্নপত্রে' ও 'ছিন্নপত্রাবলী'তে। 'দেবীযুদ্ধ'-প্রণেতা শরৎচন্দ্র চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। হিন্দুর শাস্ত্র ও দেবদেবী সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গেও কবির আলোচনা চলত। জানিপুরের ডাক্তার শ্রীশরৎচন্দ্র চৌধুরীও রবীন্দ্রনাথকে স্বরচিত কবিতা শুনিয়েছেন এবং তাঁর জমিদারির আমলাদের অন্যায় আচরণের জন্য অভিযোগও উপস্থিত করেছেন। কবি-জমিদার যথাসাধ্য তার প্রতিকার করেছেন। মনুষ্যচরিত্রের ভালমন্দ, আনন্দবেদনা ও বিচিত্র সম্ভাবনার প্রত্যক্ষ অনুভূতি পাবার জন্য এই সমস্ত গ্রাম্য চরিত্রের সংস্পর্শে আসবার তাঁর বিশেষ প্রয়োজন ছিল। অখ্যাত ব্যক্তিরা খ্যাতিমানদের দর্শনসৌভাগ্য থেকে চিরদিনই বঞ্চিত। কিন্তু জমিদারির প্রজা সব সময়েই রবীন্দ্রনাথের দর্শন ও আলাপের

সুযোগ পেয়েছে। সমাজের উপরতলা ও নিচতলার সমস্ত শ্রেণীর লোকের সঙ্গে তিনি মিশেছেন; নিচতলার লোকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় জমিদারির পল্লী-পরিবেশের মধ্যেই ঘটেছে। তাদের মধ্যেকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কয়েক জনের কথা যতটুকু জানি তাই বললাম। সমাজের স্তরে স্তরে অতি গভীরে যারা শিকড় গেড়েছে, সারা জীবন ধরে তাদের সুখ-দুঃখ, ভালমন্দ, আনন্দ-বেদনা, আশা-নিরাশা, জয়-পরাজয়, হাসি-কান্নার প্রতিটি মর্মকথা তাঁর সাহিত্যে ধ্বনিত হয়েছে। তিনি শুধু আনন্দলোকের কল্পনাবিহারী কবি নন। তাই পরম বিশ্বাসে বলেছেন—

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত ওঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি—।

যিনি পৃথিবীর কবি, তাঁর কাছে পৃথিবীর ধূলিও মধুময়। এই ধূলির স্পর্শ তিনি সর্বাঙ্গে নিয়েছেন। সার্থক সফল জীবনের শেষপ্রান্তে এসে বলেছেন—'তোমার ধূলির তিলক পরেছি ভালে'—এ সুগন্ধ চন্দনের তিলক নয়, উপেক্ষিত ধরণীর ধূলির তিলক। জীবনের সন্ধ্যাবেলায় শ্রান্ত-ক্লান্তদেহে জীবন-প্রত্যুষের বহুদূরে ফেলে-আসা ঘণ্টাধ্বনি শুনে 'শহরের অভ্রভেদী আত্মঘোষণার মুখরতা লুপ্ত হয়ে গেল, ফুটে উঠল—

এই সব উপেক্ষিত ছবি
জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদবেদনা
দূরের ঘণ্টার রবে এনে দেয় মনে।'

পাষাণ মণ্ডল

নমশূদ্র-জাতীয় এই লোকটি সপরিবারে পূর্ববঙ্গ থেকে ম্যানেজার জানকী-বাবুর ব্যবস্থায় শিলাইদহ চর অঞ্চলে সদিরাজপুরে বসবাস করতে থাকে এবং তার আরও স্বজাতিদের এনে চরে ঐ গ্রামে একটি নমশূদ্র পাড়ার সৃষ্টি করে। মুসলমান-প্রভাবিত ঐ অঞ্চলে এর আগে কোন হিন্দু পরিবার বাস করতে সাহস পেত না। কিন্তু পাষাণ মণ্ডল ঐ অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধভাব দূর করে। এলাকাটির আসল নাম মনে নাই। পাষাণ সামান্য লেখাপড়া জানত, কীর্তন গাইতে পারত আর গো-মহিষের চিকিৎসায় সুদক্ষ ছিল। লোকটি প্রায়ই রবীন্দ্রনাথের বোটে রাত্রে নানা বিষয় আলাপ-আলোচনা করত এবং তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে সে নিজের

পাড়ায় একমাসব্যাপী মহোৎসব অনুষ্ঠান করত। ঐ মহোৎসবে মুসলমান প্রতিবেশীরাও খুব উৎসাহভরে যোগদান করত। এই সদালাপী বৃদ্ধলোকটির সঙ্গে আমিও আলাপ করেছি। এর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি বাউল ও স্বদেশী গান শুনেছি।

কালী চক্রবর্তী

গ্রামের প্রায় প্রান্তে এই অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে এলে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার একটা উজ্জ্বল ছবি মনের মধ্যে জেগে উঠে। মনে হয়, নন্দনকানন আজ শ্মশান হয়েছে। বাংলার আসল চেহারাখানিই তো এই। চোখে জল আসে, কবির সোনার বাংলার বন্দনা আজও কল্পনাতেই রয়ে গেছে, সেই সুন্দর—

অবারিত মাঠ, গগন ললাট চুমে তব পদধূলি
ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।

ঐ যে ক'টা ফোত ভিটে, বড় বড় শ্যাওড়া গাছের ছায়ায় দুর্ভেদ্য কাঁটার জঙ্গলে পালিয়ে আধুনিক সভ্যতা-রাক্ষসীর ভয়ে লুকিয়ে আছে, ঐখানেই দেখেছি আনন্দের হাট, কত লোকজন; মণ্ডপে দীপান্বিতা কালীপূজার সমারোহ, হৈ-চৈ, সত্যনারায়ণের পূজা, নিমন্ত্রণের ঘটা, হরিসংকীর্তনের 'প্রেমানন্দে হরি বলরে ভাই', সেই নর্তনকুর্দন, আধ মণ বাতাসার হরির লুট, সকাল থেকে সারা রাত তামাকের ধোঁয়া। আর সবার উপরে বাড়ির কর্তা কালীকুমার চক্রবর্তীর চেহারাখানা যেন জ্যান্ত মানুষের মত চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কালী চক্রবর্তী মশাইয়ের চেহারার হুবহু বর্ণনা দিচ্ছি। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লর্ড ক্লাইভের ছবি সবাই দেখেছেন। লর্ড ক্লাইভ কালো বাঙালির ঘরে জন্মালে তাঁকেই অবিকল কালী চক্রবর্তী বলা যেত।

লক্ষ্মীমন্ত গ্রাম্য জোতদার কালী চক্রবর্তী মশাই। অনেক খামার, জমির মালিক, বাড়িতে চার-পাঁচখানা বড় বড় খড়ের আটচালা ঘর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, নিকানো ধব্‌ধব করছে। প্রকাণ্ড গোলাঘর আর গোয়ালঘর; প্রায় ডজনখানেক গরুবাছুর। আউশধানের খড়ের দুই-তিনটি পর্বতপ্রমাণ

পালা। বাড়ির চারধারে আম, কাঁঠাল, লিচু, সুপারি, নারিকেল, পেয়ারা ইত্যাদি ফলের বাগান। পাশেই প্রকাণ্ড বাঁশের ঝাড় আর পুষ্করিণী। শান্ত সুখী পল্লীদুলাল। বাড়ির বৈঠকখানায় আর অন্দরমহলে দিবারাত্রি কলগুঞ্জন, যেন মা লক্ষ্মী নূপুর পায়ে সারা বাড়ি নেচে বেড়াচ্ছেন। প্রজাবর্গাৎ, যজমান, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব হরদম আসছে যাচ্ছে, হরদম পানতামাক চলছে। মাত্র ত্রিশ বছর আগেকার সেই স্বর্গের ছবি আজ শ্মশান।

চক্রবর্তী মশাই খুব বড় জোতদার; আর তাঁর অসংখ্য যজমান। তিনি নিজে নিরক্ষর ছিলেন, সংস্কৃত মন্ত্র ভালভাবে উচ্চারণ না করতে পারলেও পুজো-পার্বণ তিনি সবই জানতেন। অর্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত যজমানকুল তাঁর মুখের দাপটে, হাবভাবে পাকা পুরোহিত বলে তাঁকে ভক্তিও করত খুব। শিক্ষিত মহলে তিনি বড় একটা মিশতেন না, মিশলেও তাঁর সঙ্গে শিক্ষিতদের ঝগড়া বেধে যেত। তাহলেও অশিক্ষিত চক্রবর্তী মশাই কোন অন্যায় কথা বলে নিজের আদর্শের বা ধর্মের অপমান করতেন না।

ছেলেদের সঙ্গে ছিল তাঁর খুব ভাব। তাঁর নিজের কোন ছেলেমেয়ে ছিল না, তাই স্নেহের ক্ষুধা ছিল তাঁর প্রবল। আমরা আমাদের সমবয়সীর মতই তাঁর সঙ্গে গল্প করতাম। ভূতের গল্প, দৈত্যদানার কাণ্ডকারখানা ইত্যাদি অসম্ভব আজগুবি গল্প তিনি যে কত জানতেন তার ইয়ত্তা নেই। আবার নিজের পুরোহিতগিরির গল্প বলে হাসাতেনও খুব। তাঁর গল্প শোনবার জন্য আমাদের পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল প্রচুর। চিঁড়ে, মুড়কি, মুড়ি, ঘনদুধ, কলা, নাড়ু, আমসত্ত, আচার, সন্দেশ, বাতাসা প্রচুরভাবে খেতাম—এই ছিল আমাদের বকশিস্। তিনি পুরুষোচিত মোটা গলায় কথা বলতেন না। কেমন একটা অদ্ভুত মিহিস্বরে ক্যান্ ক্যান্ করে কথা কইতেন। তাই তাঁর হাসির গল্প শুনলে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যেত।

একবার চক্রবর্তী মশাই পুজোর জন্যে খুব বড় মণ্ডপ তৈরি করবেন, বড় চৌ-চালাঘর হবে এইটি তাঁর ইচ্ছা। ঘরখানা তৈরি করার খরচ তিনি তাঁর যজমানদের কাছ থেকেই আদায় করবেন এই মতলব তাঁর। কারণ পুরুতঠাকুরের পুজোর মণ্ডপঘর তৈরির খরচ দিতে তো যজমানেরা ধর্মত বাধ্য। ঠিক এই সময়ে দ্বারিগ্রামের একজন নামজাদা ধনী যজমান কুরি প্রামাণিক পুকুর তৈরি করে জলাশয় প্রতিষ্ঠার পূজার্চনার ব্যবস্থার জন্য চক্রবর্তী মশাইর কাছে হাজির। চক্রবর্তী এ সুযোগ ছাড়লেন না। বাড়ির ভেতর থেকে

দুই-চারখানা পুঁথি এনে তার পাতাগুলো কয়েকবার উলটিয়ে খুব গম্ভীরভাবে অল্প একটু হেসে গাম্ভীর্যটাকে মোলায়েম করে নিয়ে বললেন, 'বাবা, জলদান অতি পুণ্যকার্য, এর চেয়ে পুণ্য আর নেই ; পরকালে সপরিবারে স্বর্গবাস, শাস্ত্রে লিখেছে। এত বড পুণ্য সঞ্চয় সবাই করতে পারে না। তবে কি জান, মা বসুমতী কিন্তু এতে খুব রেগে যাবেন, কারণ তুমি তাঁর বুক থাবলে থানিক মাংস তুলে নিয়েছ। তবে এতে বরুণ দেবতা, ইন্দির দেবতা আর মা গঙ্গা খুব খুশি হয়ে থাকেন। মা বসুমতীকে তুষ্ট করতেই হবে, কারণ তিনিই আমাদের আসল মা, তিনি ধানপান দিয়ে আমাদের বাঁচাচ্ছেন। এক কাজ কর গে, সমস্ত পুকুরটা জুড়ে একটা সামিয়ানা খাটাতে হবে, তাতে একশ দেড়শ খুব ভাল মোটা হিঁড়পাকা বড় বাঁশ লাগবে। আর মা গঙ্গাকে আনতে হলে খুব বড় দড়ির জাল লাগবে। কলিযুগে তিনি মাছেরই সামিল হয়েছেন কিনা। এর ব্যবস্থা কর গে, আর ষোড়শোপচারে পুজো আর ভোগের জন্য খুব ভাল রকম আয়োজন কর গে। আমি তার ফর্দ আজ বিকেলে পাঠিয়ে দেব। মা বসুমতীকে পুজো ও আবাহন করতে হবে ; ইন্দির আর বরুণ দেবতাকেও আবাহন করতে হবে। সূর্যঠাকুর এই পুজো না পেয়ে রেগে যাতে অনিষ্ট না করতে পারেন, তাইতে মস্তবড় সামিয়ানা খাটানোর ব্যবস্থা করতেই হবে।'

যজমান বাড়ি গিয়ে আয়োজন করতে লাগল। পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার শুভদিনের একদিন আগে চক্রবর্তী মশাই পুকুরে ধারে গিয়ে দেখেন গাড়ি গাড়ি বাঁশ কাটা হয়েছে, কাজকর্মের হৈ চৈ পড়ে গিয়েছে। যজমান এসে গলবস্ত্র হয়ে বলল, ঠাকুরদা, পুকুর-জোড়া অত বড় সামিয়ানা তো কোথাও জোটাতে পাচ্ছিনে। এখন উপায় কি ?'

চক্রবর্তী-মশাই বললেন, 'মধু অভাবে গুড়ং দদ্যাৎ—এরও তো ব্যবস্থা আছে শাস্ত্রে। তুমি এক কাজ কর। ফর্দে যা আছে, তার উপরেও তুমি পুরো দশ-গজা পাঁচ জোড়া ভাল চওড়া লালপেড়ে শাড়ি কিনে আন, তাই দিয়েই মা বসুমতীকে খুশি করে দেব। কাল আমি ঠিক সময়ে আসব।'

তাই হল। ঠাকুরমশাই জলাশয় প্রতিষ্ঠা করে কয়েক গাড়ি বাঁশ, দশ সের তেঁতে আর এক গাড়িবোঝাই কাপড়চোপড়, থালা-বাসন, চালডাল, নারকেল ইত্যাদি নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। শীগ্‌গিরই তাঁর মনের মত থাসা একখানা পূজামণ্ডপ ঐ বাঁশ আর তেঁতে দিয়ে বানিয়ে ফেললেন।

চক্রবর্তী মশাই গরুবাছুর খুব ভালবাসতেন। গরুদের ভগবতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কাত্যায়নী ইত্যাদি নাম ছিল। তাদের পরিচর্যা নিজের হাতে করতেন, আবার তামাক খেতে খেতে তাদের সঙ্গে গল্পও করতেন—'বুঝলি মা সরস্বতী, তুই বাছুরকালে কত যে দড়ি ছিঁড়তিস, তোর ঠেলায় অস্থির হয়ে যেতাম।' সরস্বতী তার খুশিভরা গল্‌গলে চোখ দুটো স্থির করে সে সব বুঝতে পেরে উত্তর দিত—'হাম্‌'।

তাঁর একটা গরু ছিল ভারি দুরন্ত, কোনমতে ছাড়া পেলেই লেজ তুলে নাচত আর দৌড়াত, তাই তার নাম ছিল 'নাচুনি'। একবার হল কি, এই নাচুনি কোথায় যেন উধাও হল। তাকে আর কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যায় না। চক্রবর্তী মশাই ভেবে-চিন্তে অস্থির। তাঁর কে একজন বর্গাৎ বলল—'আপনার নাচুনি গরু কালোয়ার দিকে গিয়েছে—খোঁয়াড়েও যেতে পারে।' 'কি আমার নাচুনি কালোয়ার খোঁয়াড়ে? দেখব, খোঁয়াড়ওয়ালার ঘাড়ে ক'টা মাথা, কালী চক্রবর্তীর গরু খোঁয়াড়ে দেওয়ার মজা দেখাচ্ছি বেটাকে।' চক্রবর্তীমশাই খালিগায়ে মালকোঁচা মেরে মাথায় গামছা জড়িয়ে প্রকাণ্ড এক তেলকুচকুচে লাঠি হাতে ছুটলেন কালোয়ার দিকে। তাঁর পালোয়ানের মত নিটোল কালো দেহখানা আর হাতের লাঠি দেখে সবাই বলল, 'ঠাকুর-দা, কি হল?' তাঁর মুখ দিয়ে রাগে কথা বের হল না, শুধু 'বেটাদের মাথা ফাটাব' বলে চক্রবর্তী হন্‌হন্‌ করে চললেন।

কালোয়ার খোঁয়াড়ের কাছে গিয়ে দেখেন তাঁর নাচুনি খোঁয়াড়ের বেড়ার মধ্যে হা-পিত্তেসে তাকিয়ে আছে। খোঁয়াড়ওয়ালা গরুটা যে কালী চক্রবর্তীর তা জানত না। সে তাঁর ঐ ভয়ংকর রুদ্রমূর্তি দেখে খোঁয়াড় ছেড়ে বাড়ি পালিয়েছে। চক্রবর্তী নাচুনির দিকে চেয়ে খানিক হাউমাউ করে কেঁদে নিয়ে খোঁয়াড়ের বেড়ার উপর হরদম লাথি আর লাঠি ঝাড়তে লাগলেন। বেড়া ভেঙে গেল। নাচুনিকে খালাস করে নিয়ে তিনি কাঁধের উপর লাঠি তুলে চেঁচাতে লাগলেন—'আয় বেটা খোঁয়াড়ওয়ালা, এগিয়ে আয়, তোর মাথা ফাটাই।'

আমাদের কাছে কালী চক্রবর্তী মশাইয়ের প্রধান আকর্ষণ ছিল তাঁর গল্প শোনা। তাঁর গল্পে রহস্য ও বীভৎস রস বেশি থাকত আর ঐ গল্প শোনার বকশিস্‌ এতই উপাদেয় ছিল যে, ছুটির দিনে বা সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে যেতেই হত। খানিক গল্প বলে তিনি 'নিদ্দম রাজার গল্প'

বলতেন। এ গল্প শুনতে হলে নিদ্দম মেরে বসে থাকতে হবে, কথাটি বললেই গল্প একেবারে মাটি। 'এক ছিল নিদ্দম রাজা, তাঁর ছিল আমার চেয়েও মস্তবড় ভুঁড়ি, আর তার ছিল সাতটি রানি, সব ক'টি পাচি পাগলির মত— এইটুকু বলে তিনি চুপ করতেন। যদি কেউ বলত, 'তারপরে?' অমনি বলতেন, 'যাঃ, গল্প নষ্ট হয়ে গেল; নিদ্দম রাজা একটু ঘুমুচ্ছে, অমনি তোরা কথা বললি? আচ্ছা, দাঁড়া, আগে তাঁর ঘুম ভাঙুক। তারপরে তিনি কি করবেন জানা যাবে; সবুর কর।' আবার চুপ করতেন। যদি আমরা আবার বলতাম, 'তারপরে?'—'আরে দাঁড়া, রাজার কী ঘুম, যেন কুম্ভকর্ণ—নাক ডাকছে—ঘড়াৎ-ঘড়াৎ।' এইভাবে তিনি নিদ্দম রাজার গল্প বলে বকুনির শ্রান্তি দূর করতেন।

চক্রবর্তী মশাইয়ের বাড়িতে দিনরাত একটা চাকর থাকত, তার নাম ছিল ঈশ্বর ভুত। ভুতমশাই জাতিতে নমশূদ্র বোধ হয়। কিন্তু কেউ কেউ বলেন ঈশ্বর ভুতরা কায়স্থ; ভুতের ভয়টয় কোন একটা আজগবি ব্যাপারে তাদের পদবী হয়ে যায় 'ভুত'। এই ভুত-বংশ এখন নির্বংশ, তাই তার এই বিভীষিকাময়ী পদবী নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। ঈশ্বরের কি কাজ ছিল জানি না। বুড়ো মানুষ, সারাদিন হরদম তামাক টানত আর কাশত। কাশতে কাশতে যখন এলিয়ে পড়ার মত হত তখন কলকে রাখত, আর অনেক রাত্রে লালন সাঁই বা ফিকির চাঁদের (মহাত্মা কাঙাল হরিনাথ) গান গাইত তার বেসুরা মোটা গলায়—'বাকির কাগজ গেল হুজুরে'।

এই ভুতের একটু ইতিহাস আছে। একদিন চক্রবর্তী মশাই অন্ধকার রাতে হাট থেকে বাড়ি ফিরছেন। তাঁর হাতে কোঁৎকা অর্থাৎ বাঁশের মোটা লাঠি। আঁধারে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু রাস্তার পাশেই শুকনো পাতাগুলোর মধ্যে কি যেন একটা গোঁ-গোঁ শব্দ করছে আর নড়ছে। ভাবলেন, এ তো শুয়োর না হয়ে যায় না। আর যায় কোথায়! হাতের ঐ কোঁৎকায় ঝাড়লেন এক ঘা। আর অমনি 'ওরে ও ঠাকুদ্দা, মেরো না, আমি ঈশ্বর'। 'তাই তো, আর এক ঘা খেলে ঈশ্বর ভুতের যে এখানেই ভবলীলা সাঙ্গ হত! আরে বেটা ভুত, তুই এখানে?' কালী চক্রবর্তী মশাই তার মাথায় ও মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে সুস্থ করে বাড়ি নিয়ে গেলেন। বেচারাকে খাইয়েদাইয়ে যত্ন করে নিজের বাড়িতে রেখে দিলেন। ঈশ্বর ভুতের ছিল মৃগী রোগ। এই রকম তার মাঝে মাঝে হত। অনেকে বলেন, কালী

চক্রবর্তী মশাইয়ের কোঁৎকার ঘা খেয়ে তার ঐ শিবের অসাধ্য ব্যাধি নাকি সেরে গিয়েছিল।

শিলাইদহে যখন কালী চক্রবর্তী বেঁচে ছিলেন তখন গ্রামের একটা দিক দিয়ে বেশ এক গৌরবময় যুগ ছিল। জমাজমি ও অর্থ-প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণ কায়স্থে গ্রামখানা সরগরম ছিল। দীপান্বিতা শ্যামা পূজা তিন চার ঘর ব্রাহ্মণ খুব ধুমধাম করে করতেন। চক্রবর্তী মশাইয়ের বাড়ির পুজোর খাওয়ার বহর সবাইকে টেক্কা দিত।

গ্রামের এই গৌরবময় যুগে রবীন্দ্রনাথ পল্লীসংগঠনের একটা আয়োজন করেন। একটা বৈঠকে গ্রামের ভদ্রলোকদের তিনি আহ্বান করেন, কালী চক্রবর্তীও আহূত হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ভদ্রলোকদের সহানুভূতি পান নি, ভদ্রলোকেরা বেশ বুঝে নিলেন, শিলাইদহ জমিদারির সংস্কার রবীন্দ্রনাথের একটা রাজনীতি। কবি রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক ছিলেন একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু তাঁর রাজনীতি আজ এই অভিশপ্ত পল্লী শিলাইদহের চেহারা বদলে দিত কিনা সেকথা বিশেষজ্ঞগণই বলতে পারেন। যাক্ সে কথা, কালী চক্রবর্তী মশাই কিন্তু রবিবাবুর কথায় ও ব্যবহারে একেবারে এমন মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি তাঁকে একেবারে দেবতা বানিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু তিনি অশিক্ষিত অমার্জিত-রুচি, গ্রাম্য যাজক ব্রাহ্মণ। ভদ্রসমাজের মুখের তোড়ে তিনি কতক্ষণ দাঁড়াবেন? তিনি ভিতরে ভিতরে রাগে ফুলতেন। একদিন বাজারের মধ্যে কি একটা বিষয় নিয়ে গ্রামের মাথা কয়েকজন ভদ্রলোকের মধ্যে (বোধ হয় স্থানীয় ইস্কুল নিয়ে) তর্ক উঠল। চক্রবর্তী মশাইও ঐ তর্কের মধ্যে পড়েছিলেন। আমরা শুনেছি, তিনি অতিমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে হাতের কোঁৎকা (এ জিনিসটা চক্রবর্তী মশাইয়ের সঙ্গের সাথি) মাটিতে বার-বার ঠুকে চেঁচিয়ে বলেছিলেন,—'হাম্ সক্‌রিতার্ (সেক্রেটারী) হ্যায়।' এই নিয়ে অনেকেই হাসাহাসি করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের ছেলে রথীন্দ্রনাথ ও জামাতা নগেনবাবু কলের লাঙল এনে ফেললেন, নানাদিকে নানা আয়োজন আরম্ভ করলেন; তখন কালী চক্রবর্তী বলেছিলেন—'যাই বল বাপু, আমি গণ্ডমুখ্যু, বলছি বাবুমশাই এদের চিনতে পারলেন না। তিনি ছাইয়ের মধ্যে ঘি ঢালছেন।'

এরই কিছু আগে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনে একেবারে মেতে ওঠেন।

শিলাইদহ কাছারিতে, কুঠিবাড়িতে আর কুষ্টিয়া কুঠিবাড়িতে এক একটা প্রকাণ্ড তাঁতশালা খোলেন। সে তাঁতের কারখানা বেশ ভাল ভাবে চলেছিলও বহুদিন। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পরে তা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কালী চক্রবর্তী মশাই ভবিষ্যদ্দর্শী। তিনি একদিন বলেছিলেন, 'তোমরা মনে করেছ,—বাবুমশাইয়ের এই তাঁতের কাপড় বাবুভায়ারা পরবেন? হাঃ, আগেই তো তাঁদের পাছায় ফোস্কা পড়বে। তার ছাড়া বাজারে তো মিহি বিলিতি কাপড়ের অভাব নেই, দামও তার কম। আমাদের মত গোমুখ্যু দু-একজন পরবে—দেশের জিনিস, বাবুমশাইয়ের তৈরি, এই খাতিরে। বাবুমশাই যদি নাকের জলে চোখের জলে এক না হন, তবে আমি কালী চক্কত্তিই না।' এই হল তার মন্তব্য।

এমন একটি সেকেলে বাংলার খাঁটি নিজস্ব সরল আনন্দময় সদাসন্তুষ্ট গৃহস্থ-যোগীর কথা প্রায়ই মনে হয়। চক্রবর্তী মশাই রাজদরবারে চলেছেন—কুষ্টিয়ায় চলেছেন, গায়ে উড়ানির চাদর। পায়ে ভীষণাকার চটি অথবা খড়ম। কিন্তু তাঁর অভাব ছিল কিসের? গোলা-বোঝাই ধান, মটর, মসুর, কলাই, গম, সরষে, যব, তিল, চার-পাচটি দুধেল গাই, পুকুরভর্তি মাছ। বাগানে থম্ থম্ করছে আম, কাঁঠাল, নারিকেল, সুপারি, কলা। ক'জন বড়লোক তাঁর কাছে দাঁড়াতে পারে?

মেছের সর্দার

বাংলাদেশে একসময়ে জমিদারেরা পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করাটাকে জমিদারির 'প্রেষ্টিজ' মনে করতেন। সে উদ্দেশ্যে তাঁরা নিজ নিজ জমিদারিতে লেঠেল রাখতেন নিযুক্ত করে। যে সমস্ত খুদে জমিদারের টাকা বেশি ছিল না, তাঁরা দরকার হলেই লেঠেল ভাড়া করে আনতেন। এইভাবে পার্শ্ববর্তী প্রবল বা খুদে জমিদারেরা জমির সীমানা নিয়ে বা বিলের দখল নিয়ে অবলীলাক্রমে মারামারি বাধাতেন। এইসব মারামারিকে বলত 'কাজিয়া'।

এইসব শৌখিন কাজিয়া নিয়ে তাঁরা বুক ফুলিয়ে গর্ব করতেন, লোককে বুঝাতেন, 'আমি কত বড় লাঠিবাজ জমিদার, দেখে নাও'। এতে তাঁদের

খ্যাতি দেশে দেশে বেড়ে চলত, সাধারণে তাঁদের দেখে বাঘের মত ভয় করত। তার ফলে অনেক নিরীহ অশিক্ষিত লোক তাঁদের খুশি করবার জন্য মাথা গরম করে লাঠি ধরে কাজিয়াতে প্রাণ দিত, কেউ হাত-পা ভেঙে মাথা ফেটে ভুগত, কেউ জেল খাটত। জমিদাররা, সেই সব দুর্ভাগাদের কখন বা কিছু সাহায্য করতেন, কখনও বা শুধু কথায় চিড়ে ভিজিয়ে তাদের ঠাণ্ডা করে রাখতেন। এর ফলে সাধারণের মধ্যে তাঁদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ জেগে উঠত। তবুও ঐ সব জমিদারদের এই শৌখিন লাঠিবাজির কোন প্রতিকার হত না।

কোন কোন কাজিয়ার খুনখারাবির জন্য দস্তরমত ফৌজদারি বেধে যেত। দায়রায় মোকদ্দমা হয়েও অনেক লেঠেল শ্রীঘর বাস করত। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে দ্বীপান্তর বা তার চেয়েও কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হত। আবার পুলিশের কর্তারা এই সব কাজিয়ার ব্যাপারে নানা চক্রান্তজাল ছড়িয়ে গরিবের মুখের অন্ন কাড়তেন, জমিদারবাড়িতে পোলাউ আর খাসির গোস্ত উদরসাৎ করে খুন্‌কে খুন বেমালুম গাপ্ করিয়ে দিয়ে গৃহিণীর গহনা বাড়ানর দাঁও মেরে বসতেন। থানার কর্তাদের সঙ্গে জমিদারদের শয়নে স্বপনে ভাব রাখতে হত। তা না হলে জমিদারির শাসন-সংরক্ষণ চলত না। অশিক্ষিত গ্রাম্য প্রজারা পুলিশকে জুজু মনে করত আর জমিদারের কাছে তারা বনে যেত মুরগির বাচ্চা। সেকালকার গ্রাম্য জমিদারদের এই মসিনিন্দিত চিত্র সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এঁকে গেছেন তাঁর বহুদিনের ডেপুটি-গিরির অভিজ্ঞতা থেকে।

আবার লাঠিয়ালরাও সেকেলে জমিদারদের অবিচারে এই রকমের কাজিয়ার ফলে প্রায়ই শ্রীঘর বাস করত। তারপরে সর্বস্ব খুইয়ে বাধ্য হয়ে ডাকাতের দল গড়ে পল্লী অঞ্চলে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে তুলত। তাদের লাঠি দুর্বলকে রক্ষা করতে পারে নি, দেশের সেবায় উৎসর্গীকৃত হয় নি। তাদের লাঠিবাজি তাদেরই কালস্বরূপ হয়েছিল।

মেছের সর্দার সুবিখ্যাত লাঠিয়াল হলেও ভগবান তাকে গড়েছিলেন অন্য ধাতু দিয়ে। খুনির ব্যবসা নিলেও সে অন্তরের মধ্যে তার খোদাতালার সুন্দর প্রেমময় মূর্তি দেখতে পেত। সে খুনি হতে পারে নাই। খোদার সেরা সৃষ্টি এই দুনিয়ায় সে মরদ হয়ে জন্ম নিয়ে হিংসুক হতে পারে নাই, স্বার্থের জন্য দয়ামায়া মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতে শিখে নাই। মেছের দুই-একজন খুদে

জমিদারের অনুগ্রহভাজন হয়েছিল নিজের অসাধারণ খ্যাতির জোরে, কিন্তু সে নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতায় বুঝেছিল যে, লাঠিয়াল বলে টাকাওয়ালারা তাকে তাদের পা-চাটা কুকুর বানাতে চায়। সে অনেক লাঠিয়াল তৈরি করেছিল, দেশময় ওস্তাদ বলে লোকদের শ্রদ্ধার পাত্র ছিল। সে তার সাকরেদদের কাছে অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের মত পিতৃস্থানীয় ছিল। সাকরেদদের সে ছেলের মত মনে করত।

শিক্ষা শেষ হলে সে সাকরেদদের এই উপদেশ দিয়ে বিদায় করত, 'দেখ বাপজান! ওস্তাদ মেছের সদ্দারের মুখে কালি দিও না, খুনি হবে না আর জীবনে কখনও ডাকাতি করবে না। খবরদার। তাহলে কিন্তু খোদাতালা তোমাদের তাগোৎ কেড়ে নেবেন, তিনি তোমাদের সাতজন্ম দোজোকে চুবোবেন।'

মেছের কোনো জমিদারের তোয়াক্কা করত না। সে বাড়িতে প্রত্যহ পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ত; মিলাদ-শরীফ শুনতে মস্‌জিদে যেত। কোন রকম নেশা করত না। নিজের বাড়িতে বসে ধর্মচর্চা করত আর সাকরেদদের তালিম দিত।

কোন এক শুভক্ষণে সে একদা তার আদর্শের অনুরূপ একজন মানুষের মত মানুষের দর্শন পেয়ে গেল।

যৌবনে রবীন্দ্রনাথ একদিন তাঁর জমিদারির অন্তর্গত পান্টির হাট পরিদর্শন করে বজরায় ফিরছেন শিলাইদহে। গোরাই নদীর উপর কুমারখালির ঘাটে তিনি বজরার উপর বসে রয়েছেন। কাতারে কাতারে প্রজারা তাঁকে দেখছে। মেছের সর্দারও তাঁকে দেখতে নদীর ঘাটে হাজির হল।

মেছের সর্দার রবীন্দ্রনাথের অপরূপ রূপ দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। এমন আকৃষ্ট হয়ে গেল যে, কখন যে প্রজার দল সেখান থেকে বাড়ি ফিরল তা সে টেরও পেল না; সে হাঁ করে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। প্রজাদের ভিড় কম হল যখন তখন তার হুঁস্ হল। সে বাড়ি ফিরবে কিনা ভাবছে, এমন সময় হয়ধর সর্দার নামে ঠাকুরবাবুদের একজন বিখ্যাত লেঠেল বরকন্দাজ এসে তাকে নত হয়ে সেলাম দিয়ে বলেল; 'ওস্তাদজি সেলাম'। হয়ধর মেছেরেরই একজন প্রিয় সাকরেদ ছিল।

হয়ধর বললে, 'ওস্তাদজি, বাবুমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করুন, আমি তাঁর কাছে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি'। মেছের বলল, 'আমার আজ বড় ভাগ্য। চল বাপজান'।

বাবুমশাই তখন বোটের মধ্যে বসে ছিলেন চুপ করে গোরাই নদীর দিকে চেয়ে। হয়ধর বরকন্দাজ তার ওস্তাদ মেছের সর্দারকে নিয়ে তার পরিচয় দিয়ে বলল, 'হুজুর, ইনি আমার ওস্তাদ। শুধু আমার ওস্তাদ নন, এই তল্লাটের প্রায় হাজার লেঠেলের ওস্তাদ। ইনি হুজুরেরই পেরজা। বাড়ি খয়েরচারায়।'

রবীন্দ্রনাথ ঐ লোহা দিয়ে পেটা বলিষ্ঠ মেছের সর্দারের চেহারাখানা অনেকক্ষণ ধরে আগাগোড়া দেখে নিলেন, দেখে খুব আনন্দিত হলেন। বেঁটে



প্রজাদের মধ্যে মেছের সর্দার

মানুষটি; সুগঠিত পেশীবহুল হাত দুখানা, সিংহের মত গর্দান। দুহাত চওড়া বুকের ছাতি, পাথরে-কোঁদা সুপুষ্ট কোমর নিয়ে হাড়েমাসে সুগঠিত পা দুখানা। রবীন্দ্রনাথ হেসে বসলেন, 'বসো মেছের সর্দার'।

মেছের তাঁর সামনে সতরঞ্চিতে বসে একদৃষ্টে হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'তোমাদের মধ্যে সকলেই কিছু কিছু লাঠি চালাতে জানে। আত্মরক্ষার দরকার হলে হাল ছেড়ে দেয় না। আমি গ্রামে গ্রামে ভদ্রলোকের ছেলেদের লাঠিখেলা শেখাতে চাই। তোমাকে তাদের ওস্তাদ বানাতে চাই। যাবে শিলাইদহে?'

মেছেরের কথা ছিল বড় মিষ্টি, আদবকায়দা ছিল খুব ভদ্র। সে বলল, 'হুজুরের মেহেরবানি হলেই বান্দা হাজির হবে গিয়ে। আমি হুজুরের বান্দা হয়েই জীবনটা কাটাতে চাই। এই চোরডাকাতের রাজত্বে আর বাস করতে ইচ্ছা হয় না।'

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করে নিজেই মেছেরকে নিযুক্ত করলেন বরকন্দাজদের সর্দার করে। মেছের হাতজোড় করে বললে, 'আমার নিজের একটা আরজি আছে হুজুর'। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'বেশ বেশ, বলো'।

মেছের বলল, 'হুজুর জমিদারিতে এলে যেখানে যতদিনই থাকুন না কেন এ বান্দা হুজুরের পাহারায় হুজুরের সঙ্গেই থাকবে, বান্দার এই আরজিটা মঞ্জুর করতে হবে', বলে হাত জোড় করল। রবীন্দ্রনাথ তাতে রাজি হলেন, বললেন, 'তোমাকে গ্রামের ছেলেদের লাঠিখেলা শেখাতে হবে। আমি তোমায় একদল শিক্ষার্থী দেবো। আমার সদর ও মফস্বল কাছারিতে যত বরকন্দাজ হালসানা আছে সবাইকে ভাল করে তুমি লাঠি চালানো শিখিয়ে দেবে। আমি চাই একদল শক্তিমান সেবক আর সাহসী গ্রামবাসী। যারা এই বিদ্যা শিখে ভুল পথে গিয়ে ডাকাতি করে শক্তি নষ্ট করছে, তাদেরও আমি এই কাজে ফিরিয়ে আনতে চাই। তোমরা সবাই গ্রামগুলোকে সাহসী শক্তিমান করে তোলো।'

রবীন্দ্রনাথ আরও অনেক কথা বললেন। সে সময়ে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে বাঙালির জীবনে নবজাগরণের জোয়ার এসেছিল। যিনি সেই মাতৃপূজার মন্ত্র বাঙালির কানে ও প্রাণে ঢেলে দিয়েছিলেন তাঁর মুখের কথা কত উদ্দীপনা-ময়ী হতে পারে, পাঠক তা অনায়াসেই বুঝতে পারেন।

মেছের সর্দার মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের পায়ে হাত দিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করল। তার চোখ দুটো জলে উঠল, গলার স্বর কেঁপে উঠল, বুকখানা ভরে উঠল। সে পলকহীন চোখে রবীন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে তাঁর মুখের অগ্নিবাণী শুনতে লাগল।

সপ্তাহ পরেই মেছের সর্দার শিলাইদহে এসে রবীন্দ্রনাথকে সেলাম করল। তখন রবীন্দ্রনাথের জাতীয়সঙ্গীত শিলাইদহের আকাশবাতাস মাতিয়ে তুলেছে! 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে···মোদের ততই বাঁধন টুটবে', 'আগে চল্ ভাই', 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি', 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক'—তাঁর এই সব আগুন-ছড়ানো গানে মরা গ্রামগুলি জেগে উঠেছে। গ্রামের ফণী চৌধুরী, ভবানী আচার্য, অনাদি অধিকারী, সতীশ সরকার প্রভৃতি একদল শিক্ষিত যুবকদের নিয়ে মেছের সর্দার লাঠি খেলা শেখাতে লাগল। কুস্তির আখড়া বসাল। কাছারির মাঠে মেছের সর্দার, হয়ধর, মাণিক, আহাদালি, কেতু ঢালি প্রভৃতি নামকরা লেঠেল বরকন্দাজেরা ওস্তাদ মেছের সর্দারের নেতৃত্বে লাঠিখেলা আরম্ভ করল। আশেপাশের বহু গ্রাম থেকে লেঠেলরা এসে ঐ লাঠি খেলায় যোগদান করল। কালোয়ার তমিজ সর্দার, মধু মাল, নাচন সর্দার, বেণী বুনো প্রভৃতি নামকরা লেঠেলরা এসে ওস্তাদ মেছের সর্দারের সাকরেদি করতে লাগল। এইসব বাছা বাছা সুশিক্ষিত লেঠেলদের রবীন্দ্রনাথ উপযুক্ত মাইনে ও জমি দিয়ে জমিদারির বরকন্দাজ নিযুক্ত করলেন।*

মেছের সর্দারের একমাত্র ছেলে এসে কাছারির কুশলী বরকন্দাজদলে ভর্তি হল। মেছের আজীবন ঠাকুরবাবুদের কাজ করবে বলে প্রতিশ্রুত হল এবং সে বিশেষ দান হিসাবে কুমারখালির চরে কিছু জমি বিনা সেলামিতে পেয়ে গেল। মেছেরের আর তিলমাত্র অবসর নেই। সে বরকন্দাজদের শেখায়, ভদ্র ঘরের যুবকদের ক্লাবে দৈনিক লাঠি আর সড়কি খেলা শেখায়, রবীন্দ্রনাথের খাস বরকন্দাজ হয়ে তাঁর বোট পাহারায় হাজির থাকে। এত কাজের মধ্যেও দৈনিক পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ে, রাত্রে কোরানের বয়েৎ গান করে। হিন্দু-মুসলমান সমস্ত বরকন্দাজ তাকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসে, ভক্তি করে, আজ্ঞা পালন করে। ফার্সি কেতাব পড়ে সে প্রায় রাত্রে মুসলমান বরকন্দাজদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করত, আবার দরকার পড়লে সাধারণ বরকন্দাজদের মত কুষ্টিয়া কুমারখালি যেত, মফস্বল কাছারিতে মোতায়েন হয়ে খাজনাও আদায় করত। সে বলত, 'বাবু, নিয়মমত না খাটলে শরীরটা ব্যারামের আড্ডা হয়ে উঠবে. চাষার খাটুনির শরীরে বাত ধরে যাবে।'

* এই রকম লেঠেলের দল জমিদারির এবং গ্রামের কাজে নিযুক্ত করবার জন্য রবীন্দ্রনাথের উপর গভর্নমেন্টের শ্যেনদৃষ্টি পড়ে, কিন্তু তাতেও তিনি সংকল্পচ্যুত হন নাই।

আচার্য জগদীশচন্দ্র, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথের অন্য বিশিষ্ট বন্ধুরা এলে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের দেখাবার জন্য মেছের সর্দারের সাকরেদদের লাঠিখেলার আয়োজন করতেন। সে খেলার নানা রকম কৌশল ও শক্তি-চর্চার প্রদর্শনী হত।

আমার বেশ মনে আছে, একবার সে কাছারির মাঠে দশ-বারো হাত দূরে দূরে বাঁশ পুঁতে চাদর বেঁধে তিন-চারটি দরজা বানিয়ে এক-এক দরজায় পাঁচজন করে অস্ত্রধারী লেঠেল রেখে মাঠের এক পাশে এসে বক্তৃতা শুরু করল— 'দেখুন হুজুরেরা, দেখুন বাবুরা, মনে করুন আমাদের মনিবের বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। মনিব একা স্ত্রীপুত্র নিয়ে বিপন্ন। আমি আর আমার ছেলে ভিন্ন আর কেউ নাই যে এই বিপদে মনিবকে বাঁচাতে পারে। ডাকাতরা বাড়ি লুট করছে, প্রত্যেক দরজায় চার-পাচ জন করে অস্ত্রহাতে পাহারা দিচ্ছে। এই দেখুন, আমি আমার ছেলে আহাদালি মনিবকে উদ্ধার করতে ছুটলুম, মনিবকে বাঁচাব, ডাকাতদের সব হটিয়ে দেব। এই দেখুন। আয়, আয় বাপজান। আল্লা-আল্লাহো—' এই বলে মেছের প্রকাণ্ড আড়লাঠি আর তার ছেলে সড়কি আর ঢাল নিয়ে বাড়ি আক্রমণ করল। তিনটি দরজার তিনদল লেঠেলকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে তিনটি দরজার ছোট্ট ফোকরের মধ্য দিয়ে লাফিয়ে দরজা পার হয়ে বাপে-বেটায় দু'জন লোককে ঘাড়ে করে ঐ ফোকর-গুলো পুনরায় কৌশলে লাফিয়ে পার হয়ে এসে সঙ্গী লেঠেল ছেলের পিঠ চাপড়িয়ে বলল, সাবাস, সাবাস বাপজান।'

জনতা মেছেরের জয়ধ্বনি করে উঠল।

এই রকম বক্তৃতা করে সে আরও অনেক কৌশলের ও বীরত্বের খেলা দেখাত। মেছের সর্দার তার দলবল নিয়ে লাঠি খেলবে এই সংবাদ পেলে দশ-বিশখানা গাঁয়ের লোক খেলার মাঠে জমায়েৎ হত। লাঠি খেলতে খেলতে কোনও লাঠিয়াল রেগে অসংযত হয়ে মারামারি করতে উদ্যত হলে মেছের চেঁচিয়ে বলত, 'মেজাজ হাবাস নে বেটা, হুঁসিয়ার, বসে পড়। ওস্তাদের হুকুম, বসে পড়্ লেড়কা ; তবিয়ৎ ঠাণ্ডা কর', বলে তার পিঠ চাপড়াত।

রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় একা একা সুবিস্তীর্ণ নির্জন চরে বেড়াতেন, অনেক সময় তিনি নিঃসঙ্গ অবস্থায় মাঠের মধ্যে অনেক দূরে তাঁর অচেনা কোন গ্রামে গিয়ে পড়তেন। তিনি সঙ্গে কোন দেহরক্ষী বরকন্দাজের প্রয়োজন মনে করতেন না বা পছন্দও করতেন না ; কিন্তু মেছের সর্দার মনিবের অজ্ঞাতে

সর্বদা তাঁর অনুসরণ করত সব জায়গায়।*

মেছের সর্দার খুব বুড়ো হয়ে গেলে তার ছেলে তার জায়গায় বহাল হল। মেছের মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঠাকুর-জমিদারি থেকে পেনসন পেয়েছে। তার মৃত্যুকালে জমিদারি বিভাগ হয়ে যাওয়াতে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ পরিত্যাগ করেন। মৃত্যুশয্যায় মেছের বার বার বিকারের ঘোরে 'ঐ যে হুজুর এসেছেন' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল এবং শেষ নিশ্বাস ত্যাগের সময় শান্ত সমাহিত চিত্তে বলেছিল—'হুজুর, চরণের ধূলা দিন'।

মুন্‌শিবাবু

সেকালের জমিদারি সেরেস্তার কর্মচারীদের পদের নাম ইংরাজি ভাষায় ছিল না। সবগুলিই প্রায় ফার্সি ভাষায়। যেমন—সুমারনবিস, একজাইনবিস, জমানবিস বা তৌজিনবিস, তদারগনবিস, নিকাশনবিস, কারকুন্, মহাফেজ, মুন্‌শি, পেশকার, নাজির, জমাদার, দপ্তরি, বরকন্দাজ, হালসানা ইত্যাদি। কেরানিকে বলে মোহরার। একটি পদ হচ্ছে মুন্‌শি। এর ইংরাজি প্রতিশব্দ হচ্ছে হেড ক্লার্ক বা করেসপণ্ডেণ্ট ক্লার্ক।

বাংলা দেশে হতভাগ্য কেরানিরা আজীবন অসহায়ভাবে ভাগ্যের সঙ্গে যুঝে কিভাবে যে শোচনীয় জীবন অবসান করে তা কারও অজানা নেই। তাদের জন্য মৌখিক সহানুভূতি অনেকেই দেখান। কিন্তু তাঁদের সত্যিকারের দুঃখটা কোথায়, বেদনা কোন্‌খানে, তা রবীন্দ্রনাথ কতখানি দরদ দিয়ে বুঝতেন তা জানা যাবে 'মুন্‌শিবাবু' অথবা আমাদের মহিমচন্দ্র সরকারের জীবন-কাহিনীতে।

বেকার কেরানি মহিমবাবুর অবস্থার কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ এতখানি অভিভূত হয়েছিলেন যে তিনি তাঁকে কালীগ্রাম পরগণার সদর কাছারির মুন্‌শিপদে নিযুক্ত করেছিলেন (১৩০২)। তার জন্যে মহিমবাবুকে আজকালকার মত তদ্বির বা অনুরোধ বেশি করতে হয় নি। মহিমবাবুর জীবনে সব চেয়ে বড় অভিজ্ঞতা এই যে, তিনি সারাজীবন একজন অসাধারণ দয়ালু রবীন্দ্রনাথকে

* জমিদার বাহাদুর দ্রষ্টব্য

দেখেছেন। এই নিরীহ কেরানিটির নানা অশান্তিময় জীবনে আবার মাঝে মাঝে মোক্ষপ্রাপ্তির বাসনা জেগে উঠত। অসার সংসারে সেই পরমপদ লাভের আশায় বিশ বছর ঐ পদে চাকরি করে তিনি দু মাসের ছুটি নিয়ে তীর্থে বেরুলেন। সুদীর্ঘ দুই বছর কাশী বাস করে দেখলেন, 'কম্‌লিতো নেহি ছোড়েগা'। সংসারের মায়াজালে যিনি আবদ্ধ তাঁর বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তির কোন আশা নেই, এ কথাটা হাড়ে হাড়ে বুঝে তিনি আবার চাকরির উমেদারিতে পুরো একটি বছর নানাস্থানে ঘুরে হতাশ হয়ে পড়লেন।

ঘুরতে ঘুরতে কলিকাতায় এসে শুনলেন রবীন্দ্রনাথ বিলাতে। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তখন জমিদারির ম্যানেজিং এজেণ্ট। ঠাকুরজমিদারিতে কোনও চাকরি তখন খালি না থাকায় শ্রীযুক্ত চৌধুরী সাহেব দয়া করে তাঁকে স্বর্গীয় গোপাললাল শীলের রিসিভার এস্টেটে একটি চাকরি দেন। তিন বছর পরেই আবার মহিমবাবু বেকার হয়ে পড়লেন। আবার চাকরির জন্যে ঘুরতে লাগলেন।

খবরের কাগজে রবীন্দ্রনাথের বিলাত থেকে কলিকাতা ফেরবার সংবাদ পড়ে আবার তিনি 'অনাথনাথ তিনি দীনের গতি' রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলেন। কলিকাতা জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অসংখ্য দর্শনপ্রার্থীর ভিড়ে রবীন্দ্রনাথের তখন একটুও বিশ্রাম নাই। তবু নিরুপায় হয়ে মহিমবাবু দোতলায় দরোয়ান দিয়ে স্লিপ পাঠালেন 'চাকরিপ্রার্থী হতভাগ্য মহিমচন্দ্র সরকার'। স্লিপ নিরর্থক পাঠিয়েছেন মনে করে মহিমবাবু ক্লান্তিতে বসে ঝিমুতে লাগলেন।

আশ্চর্যের বিষয়, মহিমবাবুর ডাক পড়ল দোতলায় পনের মিনিটের মধ্যে এবং তিনি গিয়ে আবার নিবেদন করলেন তাঁর দুঃখদুর্দশার কাহিনী। শুনলেন আবার সেই রকম সহানুভূতির বাণী, 'দিনদশেক পরে শিলাইদহে যাচ্ছি, সেখানে আমার সঙ্গে দেখা করো'।

যথাসময়ে মহিমবাবু শিলাইদহে এসে তাঁর সামনে হাজির হলেন। শিলাইদহ কাছারিতে কোন কাজই খালি নাই। মহিমবাবুর সজল চোখ দুটির পানে চেয়ে রবীন্দ্রনাথ ম্যানেজারের সঙ্গে অনেক আলোচনা করলেন, শেষে চরকালোয়ার তহশীলদারের কাজটি মহিমবাবুকে নেবার আদেশ দিলেন। মহিমবাবু তহশীলদারের গুরু দায়িত্বপূর্ণ কাজ কখনও করেন নাই। কেরানি-গিরিতেই তিনি অভ্যস্ত। তবু তিনি বুঝলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর জন্যে অসম্ভবকেও সম্ভব করতে চাইছেন। সব বুঝে তিনি দুদিন অপেক্ষা করে আবার কুঠি-

বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। দেখলেন, অতিরিক্ত পরিশ্রমে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্লান্ত, এমন কি আমাদের মত মানুষের অবস্থায় অসুস্থ বললেও বেশি বলা হয় না। তবু মহিমবাবুর সব কথা ধীরভাবে শুনলেন এবং বেশ বুঝলেন যে খাঁটি কেরানির পক্ষে একটা মহালের আদায়-তহশীলের কাজ করা শক্ত হবে। বললেন, 'আপাতত ঐ কাজ করোগে। তোমায় শীগ্‌গির কলিকাতা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব'। তিনি বেশ জানেন এই নিরীহ অভাব-গ্রস্ত লোকটি একান্তভাবেই তাঁর শরণাগত ও আশ্রিত।

'হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না।' রবীন্দ্রনাথের হুকুম যথাসময়ে শিলাইদহে চলে এল। মহিমবাবু কলিকাতা সদর অফিসে এলেন। এসেই রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করতেই তিনি অনেকক্ষণ মহিমবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার শরীর তো দেখছি খুব খারাপ হয়েছে। কিসে ভুগছো?' মহিমবাবু বললেন, 'হুজুর', হাঁপানি রোগে ভুগছি আজ প্রায় একবছর', বলে তিনি কেঁদে ফেললেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বসতে বলে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে ডেকে বললেন, 'মহিমের নাকি হাঁপানি হয়েছে; বয়স তো ওর খুব বেশি হয় নি। ভাল চিকিৎসায় সেরে যাবে। তুমি ওর চিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা করে দাও।' মহিমবাবুর চোখ দিয়ে অবিরল অশ্রু ঝরে পড়ল, এ কৃতজ্ঞতার অশ্রু। আশ্রিতবৎসলের কাছে তিনি যতবারই শরণ নিয়েছেন ততবারই আশ্রয় ও প্রশ্রয় দুই-ই পেয়েছেন।

রথীন্দ্রনাথ তাঁর চিকিৎসার যথোচিত ব্যবস্থা করেছিলেন; কিন্তু তাতে কোন স্থায়ী ফল হল না। একজন ডাক্তার বললেন, 'ওঁকে আপনাদের জমিদারি পদ্মার চরে কাজ দিয়ে পাঠিয়ে দেন। তাহলে সেরে উঠতে পারবেন।' তখন থেকেই মহিমবাবু শিলাইদহে বদলি হবার সুযোগ অনুসন্ধান করতে লাগলেন। মহিমবাবুর হাঁপানি না সারবার কারণ বোধ হয় তিনি অত্যন্ত তামাক খেতেন। প্রতি পনের মিনিট অন্তর তাঁর তামাক খাবার নেশা জেগে উঠত। তামাকের গন্ধ পেলে শিকারি বিড়ালের মত তাঁর গোঁফদাড়ি ফুলে উঠত। তাঁর কোন বন্ধু বা সহকারী নিজে সেজে তাঁকে তামাক খাওয়ালে তিনি পরম সম্মানিত মনে করতেন। ৺ষ্টুপুরি বালাখানা ইত্যাদি তামাকের বর্ণনা করে আমির-ওমরাহদের ফুরসিতে 'তাওয়ায় সাজা' বহুমূল্য নবাবি তামাক টানার নানারকম সরস গল্প তিনি অনেক সময় মনের আনন্দে বলে যেতেন।

হঠাৎ শিলাইদহ কাছারির মুন্‌শির পদে যিনি ছিলেন তাঁর মৃত্যুর সংবাদ

কলিকাতা আফিসে এল। মহিমবাবু খুব সংকোচের সঙ্গে সেই রিপোর্ট নিয়ে দেখা করলেন। মুখে কিছু বলতে সাহস পেলেন না, কারণ ঐ অত বড় দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করবার মত তাঁর যোগ্যতা আছে কিনা সে বিষয়ে তাঁর ঘোরতর সন্দেহ ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঐ সংবাদ শুনে নিজেই বললেন, 'তুমি পারবে কাজ করতে? সাহস কর? কাজ কিন্তু খুব দায়িত্বপূর্ণ। সেখানকার গোটা সেরেস্তাটা তোমার হাতের মধ্যে থাকবে।'

রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ সহৃদয় ব্যবহারে প্রশ্রয় পেয়ে মহিমবাবুর সাহস যেন ক্রমেই বেড়ে গেছে; তিনি ও কাজ পারবেন বলে তখনই ঐ পদে বদলির জন্য প্রার্থনা জানিয়ে ফেললেন। আশ্চর্যের কথা তাঁর প্রার্থনা তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর হয়ে গেল।

কলিকাতার সদর আফিস ছেড়ে মহিমবাবু এলেন শিলাইদহে মুন্‌শির পদে কাজ করবার জন্য। দুই চার দিনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও এলেন শিলাইদহে।

এখন থেকে তিনি আর মহিমবাবু নন, মুন্‌শিবাবু। ভগবান যেন তাঁকে মুন্‌শিবাবু করেই গড়েছিলেন, কারণ এমন পাকা কেরানি, এমন কষ্টসহিষ্ণু মুহুরি সংসারে দুর্লভ। প্রথমে ঐ কাজে যোগদান করলে ম্যানেজারবাবু তাঁকে নিজের মনের মত করে গ্রহণ করতে পারলেন না; কিন্তু মহিমবাবুর উপরে রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি ও অনুগ্রহের পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথ তখনও শিলাইদহে আছেন। একদিন মহিমবাবু একটু বিমর্ষ-ভাবে তাঁকে প্রণাম করতে গেলেন। খানিকক্ষণ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বাবুমশাই বললেন, 'নূতন এসে তোমার বুঝি কিছু অসুবিধা হচ্ছে।' মুন্‌শিবাবু বাবুমশাইকে প্রায়ই 'ভাবগ্রাহী জনার্দন' বলতেন। তিনি সত্যই বাবুমশাইয়ের ঐ কোমল স্নেহময় স্বরে একেবারে গলে গেলেন। বললেন, 'এখানে এসে মেসে খেতে হয়; বাড়িতে পরিবারবর্গ রয়েছে, কুলোতে পারছি না। এ ভিন্ন আর কোন অসুবিধা নাই।'

তৎক্ষণাৎ রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'আমার নাম করে কোয়ার্টারের জন্য ম্যানেজারবাবুকে বল না কেন। তিনি কি বলেন জানিও, আমি আরো দুচার দিন এখানে আছি।'

দরিদ্র অসহায় একান্ত নির্ভরশীল কর্মচারীর উপর মনিবের সহানুভূতির সীমা কতখানি থাকা সম্ভব তাই ভেবে মুন্‌শিবাবু অবাক হয়ে গেলেন। এত অনুগ্রহ কোন মনিব কোন কর্মচারীকে করেছেন বলে তিনি জানেন না বা শোনেন নি। তিনি কোয়ার্টার পেয়ে গেলেন, স্ত্রীপুত্রকন্যাদের আনলেন।

মাইনেও কিছু বাড়ল। মুন্‌শিবাবু জীবনে শান্তি পেলেন। তিনি বলতেন, 'আমরা সবাই মহাপুরুষের আশ্রিত। আমাদের জীবনে তো কোন দুঃখ নেই।' কোন সহকর্মী চাকরিবাকরি নিয়ে অনুযোগ করলেই তিনি এই কথাটা বলতেন।

মুন্‌শিবাবুকে কেউ মহিমবাবু বলে ডাকতেন না। তিনি ভিতরে বাইরে ছিলেন মুন্‌শি; যেন মুন্‌শি কথাটা তিনি ভিন্ন আর কাউকে মানাত না। চোখে প্রকাণ্ড বেশি পাওয়ারের চশমা; ছোট্ট একহারা অতি সাদাসিধে নিরীহ গোবেচারি কালো মানুষটি, কানে কলম; কখনও হাত-বাক্‌সের উপর ঝুঁকে পড়ে অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে লিখছেনই অনবরত; বিরক্তি নেই, আপত্তি নেই, চলাফেরায় অনুমাত্র অস্থিরতা নেই, দিনরাত্রির পার্থক্য জ্ঞান নেই; কলম পিষছেনই। সাতেও নেই পাঁচেও নেই, কষ্টসহিষ্ণু নির্বিকার চিরানুগত মূর্তিমান বাঙালি কেরানি। অতি ভোরে উঠে স্নান-আহ্নিক সেরে, বাড়ির সবাইকে ডেকে তুলে ভুঁই কোপাতেন, শাক লাউ কুমড়া শশা মুলো বুনতেন; রান্নার জন্য কাঠ ফাড়তেন, নিজ হাতে বাজার করতেন, মাঝে মাঝে অবসর পেলেই চৈতন্য-চরিতামৃত পড়তেন আর গুন্ গুন্ করে গান গাইতেন। কোন তর্ক-বিতর্ক বা পরচর্চায় থাকতেন না, বরকন্দাজদের উপর ফাইফরমাস করতেন না, হুকুম চালাতেন না। যেন নিজের মনের গভীরেই নিজে মগ্ন আছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ উঠলে আত্মহারা হয়ে পড়তেন। বলতেন, 'তিনি ভাব-গ্রাহী জনার্দন'। কেউ কেউ তাঁকে গোঁড়া রবীন্দ্রভক্ত বলতেন।

বৃদ্ধ বয়সে মুন্‌শিবাবু কিছুদিন পেনশন ভোগ করেছিলেন। আজ তিনি পরলোকে। তাঁর অখ্যাত ব্যক্তিগত জীবনে রবীন্দ্রনাথের অনুগ্রহের কাহিনী লেখবার জন্য তিনি মৃত্যুর পূর্বে আমায় অনুরোধ করেছিলেন।

১৩২৪ সালে কাজে যোগদান করে আমি মহিমবাবুর কাছেই মুন্‌শি সেরেস্তার কাজ শিখেছিলাম। রবীন্দ্রনাথের অনেক কাহিনী তিনি আমাকে বলতেন। শিলাইদহ জমিদারিতে অভিনব মণ্ডলীপ্রথা প্রবর্তনের ব্যাপারে কবি-জমিদারকে যে কী ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় পড়তে হয়েছিল, কী তার পরিণতি হয়েছিল, সেসব বিষয় তিনি গল্প করতেন। তিনি ছিলেন ঠাকুর-জমিদারির এক জীবন্ত ইতিহাস, চাকরিও করেছেন পঁচিশ বছরেরও বেশি। রবীন্দ্রনাথের জমিদারি জীবন যে কী বিচিত্র, কী অভিনব, কী কঠোর অথচ কতখানি স্নেহকরুণা প্রবণ, তা তাঁর কাছ থেকেই আমি সঠিক ধারণা করতে পেরেছিলাম।

তবে সেসব তথ্যের কোন পাথুরে প্রমাণ না থাকায় আমি প্রকাশ করতে চাই নি। মনে হয়, জমিদারিটাও ছিল যেন রবীন্দ্রনাথের বিরাট পরিবারভুক্ত।

অজ্ঞাত কবির রচিত শিলাইদহ সদর কাছারির বর্ণনা*

বাবুমশাই যেন কসাই, আসেন খাঁড়া ধরে,
ননীর পুতুল, কথা বলেন মিহি মিষ্টি সুরে।
সাব-ম্যানেজার জানকী রায় পাকা বাঙাল বটে,
সেটেলমেণ্টের কর্তা হয়ে বেড়ান মাঠে মাঠে।
পাকা বুড়ো খাজাঞ্চিবাবু হরমোহন নন্দী,
তাঁর কাছে যাও, বাতলে দেবেন কত রকম ফন্দি।
চশমা চোখে জমানবিশ বাবু বিপিন দে,
এ্যাপ্রেন্‌টিস্‌ বসন্তভুঁয়ে টেন্‌ রুপিস্‌ পে।
মোকদ্দমা-ইনেস্পেক্টার শ্রীদুর্গানাথ গু,
সুমারনবিশ ইন্দুনায়ক কেবল করেন হুঁ।
আমিন বটে হাম্বাচরণ† কপালে সিঁদুর ফোঁটা,
খাসি-পাঁঠার মাংস খেয়ে হলেন মোটাসোটা।
মহাফেজ বামাচরণ মাথায় লম্বা টিকি,
পরচা দেখার ফিস্‌ তিনি নেন একটা করে সিকি।
মুন্‌শিবাবু বেজায় চালাক আশু মজুমদার,
ছোক্‌রা বাবু বিনোদ রায় ঘোরেন চারিধার।
একজাইনবিশ ভুঁড়েল বাবু বসন্ত সরকার,
জমাওয়াশীলের কর্তা তিনি, সদাই খবরদার।

* ছড়াটি কোন অজ্ঞাতনামা মুহুরির রচিত বলে মনে হয়। এতে পেশকার বাবু শরৎ সরকারের বর্ণনা নেই। কারণ দারুণ বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন ধুরন্ধর পেশকার বাবু ছিলেন একরকম সর্বময় কর্তা ও এই মহুরি ছিলেন কবির আত্মীয়। শরৎবাবু তাঁর একুশ বছর থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঠাকুরজমিদারির কর্মচারী ছিলেন। এঁর উল্লেখ আমার কাহিনীগুলিতে ও রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে পাওয়া যাবে।

† অম্বাচরণ মৈত্র।

আনন্দ ব্যাপারি

বাংলাদেশে এমনও কেউ কেউ আছেন যাঁদের ভুল ধারণা আছে যে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত কড়া এবং অত্যাচারী জমিদার ছিলেন। এরকম ধারণার কারণ কারও ব্যক্তিগত স্বার্থে আঘাত লাগবার দরুন তাঁদের দ্বারা অপূর্ণ বা মতলবি কাহিনীর রচনার কৌশলে সৃষ্ট। তাঁর জীবনধারণ-প্রণালী সম্বন্ধে অনেক আজগুবি গল্প শোনা যায়। অনেকের ধারণা, তিনি খেতেন শুতেন



আনন্দ ব্যাপারি

বেড়াতেন রাজকীয় চালে। সাধারণের নাগালের বহু উর্ধ্বে অভ্রভেদী মহিমায় তিনি প্রদীপ্ত। এ জন্য তাঁর সম্বন্ধে অনেক মনগড়া কাহিনী রচিত হয়। যে কাহিনীটি আজ বলছি তার যথার্থ মর্ম উপলব্ধি না করে কেউ হয়ত ভুল ধারণা করে নিতে পারতেন এজন্য কাহিনীটি এতদিন বলি নি। বর্তমানে পরিস্থিতি পালটেছে, তাই এ কাহিনী লিখেছি।

আনন্দ প্রামাণিক, জাতিতে হেলেরই, যাকে বলে হিন্দু সৎচাষি, বাড়ি শিলাইদহে, পদ্মার ধারেই ঘোষপুর গ্রামে। নানা জিনিসের 'ব্যাপার' অর্থাৎ ব্যবসা করে বলে তার নাম হয়ে গেল আনন্দ ব্যাপারি। গুড়, পাট, সুপারি আর কলাই সে সারা বছর ধরে বড় বড় পানসি বোঝাই করে নানান দেশে পাঠাত। এই ব্যবসাতে সে বেশ ধনী হয়ে উঠল।

কিন্তু ধনী হলে হবে কি! সে ছিল অত্যন্ত কৃপণ। ভাল মুখে চাও বা ভাল উদ্দেশ্যে চাও ত সে তোমায় একটি পয়সাও দেবে না। সোজা আঙুলে ঘি উঠত না। কিন্তু টাকা তার খসত চতুর শৌখিন ছেলেদের অপব্যয়ে। সে গোপনে বালিশের তুলোর মধ্যে, তোশকের মধ্যে তার সাধারণ খরচের টাকা লুকিয়ে রাখত। মজুত ধনাগার ছিল তার শোবার ঘরের মেঝের নিচে। সে ঘরে তার অনুপস্থিতিতে কারও যাবার হুকুম ছিল না।

সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঘোষপুর, কোমরকাঁদি প্রভৃতি গ্রামে ছেলেমেয়েদের এবং বয়স্ক গ্রামবাসীদের জন্য কয়েকটা স্কুল খুলতে মনোযোগী হয়েছিলেন। এই সব গ্রামসংস্কার ব্যাপারে এস্টেটের ও তাঁর নিজের খরচে অনেক কাজ হত; কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী খরচ তিনি বা তাঁর এস্টেট কতটাই বা বহন করতে পারেন! স্বদেশী যুগে তিনি শিলাইদহে বড় তাঁতের কারখানা, গুটিপোকার চাষ, নানাবিধ চাষের প্রচলন, ধানপাটের কারবার এবং কুষ্টিয়াতেও তাঁতের কারখানা, পাটের কারবার, আখমাড়াই কলের কারখানা খুলেছিলেন খুব বড় আশা নিয়ে, বহু টাকা ব্যয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজে ঋণগ্রস্ত হয়ে সে সব নিতান্ত অনিচ্ছায় তুলে দিয়েছিলেন। ঠাকুর-এস্টেটের মালিক ত তিনি একা ছিলেন না। ঐ সব দেনা নিজেকে বহন করতে হয়েছিল। এতখানি ত্যাগ স্বীকার ক' জন জমিদার করেছেন জানি না। তাই তিনি বলতেন, 'আমার অর্থভাগ্যে শনি'!

সে সময়ে তাঁর পল্লী-সংগঠনের কাজ যাঁরা করতেন তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন চক্রবর্তী একজন ছিলেন। অনঙ্গবাবুরা দেখলেন, নানা রকমে খরচের চাপে শেষকালে শিশুদের ও বয়স্কদের শিক্ষাব্যবস্থাও হয়ত উঠে যাবে। তাই তাঁরা প্রস্তাব করলেন যে, বয়স্কদের ইস্কুলঘরের টাকা গ্রামের সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থদের কাছ থেকে চাঁদা করে তোলা হক। সেকালে ষাট-সত্তর টাকাতেই একখানা মাঝারি ভাল খড়ের ঘর তৈরি করা যেত। রবীন্দ্রনাথ এ প্রস্তাবে মত দিয়েছিলেন।

এই কাজে অনঙ্গবাবুরা আনন্দ ব্যাপারির বিশ টাকা চাঁদা ধরেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, আনন্দ ব্যাপারি বিনা বাক্যব্যয়ে এই টাকা এনে দেবে, কারণ তার চেয়ে কম অবস্থাপন্ন লোকেরাও পাঁচ-ছয় টাকা করে দিতে সানন্দে রাজি হয়েছিল।

ঝানু কৃপণ আনন্দ ব্যাপারি এই টাকা দেবে এই কথা মৌখিক স্বীকার করে এসে দু'সপ্তাহ গা ঢাকা দিয়ে রইল। সে শুধু কৃপণ নয়, ধড়িবাজ এবং বেপরোয়া। সে জমিদার সরকারে সেসময়ে বিশেষ জমিজমাও রাখত না, যার জন্য জমিদারকে খাতির করার তার কোন দরকার ছিল না। সে কোন্ স্বার্থে খামাখা এই গায়ের রক্ত জল-করা টাকা অকাজে খরচ করতে যাবে ? আর যারা দিচ্ছে, তারা দিচ্ছে খাতিরে। বুড়ো মানুষদের ধরে পড়াশুনা করানো হবে, তার জন্য আবার ঘর চাই, বই চাই, মানচিত্র চাই,—বাবুমশায়ের এসব কী সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড রে বাবা!

নূতন একটা মতলব ঠাউরে নিয়ে আনন্দ ব্যাপারি কুষ্টিয়ায় এল। এসেই স্বর্গীয় শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র* মশাইকে জানাল, 'রবি বাবুমশাই প্রজা পীড়ন করে চাঁদা তুলছেন ইস্কুল করবার জন্য। আমার মতন ছাপোষা দীনহীন প্রজাকে এজন্য বিশ টাকা দেবার আদেশ করেছেন। এর প্রতিকারের জন্য আমি মহামান্য সরকার বাহাদুরের কাছে দরখাস্ত করতে চাই। তার ব্যবস্থা করে দিন।'

উকিলবাবু প্রস্তাব শুনে তো একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি আনন্দ ব্যাপারিকে অনেক বুঝালেন, 'এ কাজটা তোমার পক্ষে ভয়ানক অন্যায় হবে। এই সামান্য কয়টি টাকা ঐ মহৎ কাজে তোমার মত লোকের খুশি মনেই দেওয়া উচিত।'

আনন্দ ব্যাপারি ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে বলল, 'দেখুন, ব্যবসা-বাণিজ্যে বড় লোকসান হচ্ছে। আমাকে একটাকা কি বড়জোর দু'টাকা ধরা উচিত ছিল। কিন্তু এ কী অত্যাচার বলুন তো। জমিদারের কি টাকার অভাব আছে ?'

উকিলবাবু মহা কৃপণ সুদখোর আনন্দ ব্যাপারিকে জানতেন। তিনি বুঝলেন, লোকটা সহজ পাত্তর নয়, সোজা আঙুলে তো ঘি উঠবে না ; কিন্তু কি ভয়ানক দুঃসাহস লোকটার ! তিনি অনেক করে বুঝালেন, কিন্তু ব্যাপারি মশায়ের মাথায় কিছুই ঢোকে না। তখন তিনি একটু ভেবে ওকালতি বুদ্ধি

*ইনি সুবিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের পিতা।

খাটিয়ে বললেন, 'দেখ ব্যাপারি, সরকার বাহাদুরের কাছে তাঁর মতন লোকের নামে দরখাস্ত করে বিশ টাকা চাঁদা রেহাই পেতে হলে তোমাকে উল্টে বিশ টাকার দশগুণ খরচ করতে হবে। তার চেয়ে তোমায় একটা পাকা যুক্তি দিই, শোন। আমি বাবুমশাইকে একখানা উকিলের চিঠি দিচ্ছি। তাতে আইনের কথা লিখে জানাব, যদি আইন না মেনেও তিনি টাকা চান, তাহলে তিনি যেন তোমার মতো গরিবের কাছে দুটাকা মাত্র চাঁদা নেন। এইটাই হচ্ছে সেরা উকিলের যুক্তি। খুব গোপন কথা কিন্তু। তিনি ভিন্ন কাউকে একথা বলো না।'

ব্যাপারি অনেক ভেবে তাতেই রাজি হল। উকিলবাবু ব্যাপারিপুঙ্গবকে ব্যাপারটা ভাল করে সমঝিয়ে দেবার জন্য বাবুমশায়ের কাছে সমস্ত ব্যাপার খুলে একখানা চিঠি লিখে দিলেন। বললেন, 'চিঠিখানা তুমি নিজেই নিয়ে তাঁকে দাও গে। তিনি তোমার চাঁদা দুটাকা করে দেবেন।'

আনন্দ ব্যাপারি খানিক ভেবে তাতেই রাজি হয়ে সেই চিঠি নিজেই নিয়ে এল। সে লেখাপড়া আদৌ জানত না আর, এই কাণ্ডটা গোপন রাখতেই চেয়েছিল। অনেক ভেবে ভয়ে ভয়ে সে বোটের মধ্যে এসে রবীন্দ্রনাথের হাতে ঐ চিঠি দিল। তিনি চিঠি পড়েই প্রচণ্ড হেসে উঠলেন। তাঁর হাসি দেখে ব্যাপারির চক্ষু ছানাবড়া।

রবীন্দ্রনাথ হাসি থামিয়ে বললেন, 'আনন্দ ব্যাপারি, তুমি অতি গরিব মানুষ, তোমার মত গরিবকে অনঙ্গবাবুরা ধরেছে চাঁদা! কী অন্যায় কাণ্ড! কী অত্যাচার। ওহে অনঙ্গ শোন তো—'

আনন্দ ব্যাপারির মুখখানা শুকিয়ে আমচুর। বাবুমশাই অনঙ্গবাবুকে বললেন, 'তোমরাও যেমন। আনন্দ ব্যাপারির মত গরিবের কাছে আবার চেয়েছ চাঁদা।'

অনঙ্গবাবু উকিলের চিঠি পড়ে হাসবেন কি কাঁদবেন ঠাওর পেলেন না। বাবুমশাই বললেন, 'যাও আনন্দ ব্যাপারি, তোমাকে ইস্কুল ঘরের জন্যে এক পয়সাও দিতে হবে না।' তিনি আবার হাসতে লাগলেন।

ব্যাপারি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বাড়ি ফিরছে। পথে অনঙ্গবাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন, 'কিহে ব্যাপারি, তুমি বড্ড গরিব আর জমিদারের কোন তোয়াক্কা রাখ না, কেমন? কিন্তু বলিহারি তোমার সাহস।'

আনন্দ ব্যাপারি বিশ ত্রিশ বিঘা জমি এবারে বন্দোবস্ত নেবে অনঙ্গবাবুকে

ধরে, ভিতরে ভিতরে এই রকম তার মতলব ছিল। সে দেখলে—উকিলবাবু তাকে আচ্ছা শিক্ষা দিয়েছেন। তাকেও শয়তানে ধরেছিল।

সে বললে, 'আমি পঁচিশ টাকা দেব হুজুর। আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন।'

আনন্দ ব্যাপারি সেই রাত্রেই অনঙ্গবাবুর কাছে পঁচিশ টাকা দিয়ে গেল। তার দুই তিন দিন পরে সে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তারই নিজের জমির উপর জনমজুর লাগিয়ে তদ্বির করে খড়ের ঘর তুলে দিল। ঘর শেষ হলে সে অনঙ্গবাবুকে ডেকে এনে ঘর দেখিয়ে বলল, 'ছি ছি! সামান্য পঁচিশ টাকা আমার হাতের ময়লা। তার জন্যে আমার চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ হত। আমায় ভূতে পেয়েছিল ; আমায় পায়ে রাখবেন বাবু!'

এ খবর অনঙ্গবাবু রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছিলেন। শুনে তিনি একটুখানি হেসেছিলেন মাত্র। দিন দশেক পরে আনন্দ ব্যাপারি তাঁর কাছে বোটের উপর এক দরখাস্ত এনে প্রণাম করল—'মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদার মহাশয় প্রজানুরঞ্জকেষু—ধর্মাবতার প্রবল প্রতাপেষু —হুজুরবাহাদুরের চরে কিছু জমি প্রার্থনা। ব্যবসাবাণিজ্যে বড় লোকসান, —গরিবের পেটের ভাতের জন্য কিছু জমি প্রার্থনা করি।'

রবীন্দ্রনাথ জমি দেবার হুকুম দিলেন। সেই থেকে আজ দশ বিঘা, কাল দশ বিঘা করে জমি নিয়ে আনন্দ ব্যাপারি মস্ত জোতদার হয়ে উঠল—ব্যবসা আর মহাজনি ত ছিলই।

ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে যখন বাংলার জমিদারেরা প্রজাশোষণের নানান উপায় উদ্ভাবনে মাথা ঘামাতেন, তখন জমিদার রবীন্দ্রনাথ কি করতেন, ঐ রকম কাহিনীগুলোই তার সাক্ষী দেয়। তিনি বাংলার অসহায় গরিব প্রজাদের জন্য যা করেছেন এবং যা করতে চেয়েছিলেন, সে কাহিনী এখনও পর্যন্ত সুপ্রচারিত হয় নি ; হলে দেশের অনেক উপকার হত। এসব কাজে বহু ক্ষতি স্বীকার করেও রবীন্দ্রনাথ কোন সূত্রেই আত্মগরিমা প্রকাশ করেন নি। তাঁর বহু পত্র (পারিবারিক ও ব্যক্তিগত) ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু সে চিঠির কোন খানিতেও তিনি এই সব কাজে অর্থনাশ ও মনস্তাপের কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেন নি, সে একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার। দেশ যখন অনগ্রসর তখন তিনি নিজের শক্তির বলে তাকে নাড়া দিতে চেয়েছিলেন, কারণ তখনকার দেশনেতারা তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' ও 'পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনের অভিভাষণের' পরামর্শ এবং সে সময়কার বহু বক্তৃতা ও প্রবন্ধে তাঁর

জাতিগঠনমূলক চিন্তাধারার কোন মূল্যই দেন নি।

তাঁর সে সময়কার পরীক্ষামূলক পল্লীসংগঠনের চেষ্টা অনেকাংশে ব্যর্থ হলেও তার মূল্য যে কত সুদূরপ্রসারী আজ তা দেশের মনীষীরা বুঝছেন।

জানকী রায়

আমরা তখন ইস্কুলে পড়ি। একবার শিলাইদহ সদর কাছারিতে পুণ্যাহের নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলাম। শুধু খাওয়া নয়, যাত্রাগান শুনবারও নিমন্ত্রণ ছিল। সদর কাছারির প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে কোন এক বিখ্যাত যাত্রাদলের আসর বসেছে। চাষি-ভদ্দর সকল শ্রেণীর প্রজা-জোতদারেরা দলে দলে এসেছে যাত্রা শুনতে। লোকে লোকারণ্য। আলোয় সমস্ত কাছারিবাড়ি ঝলমল করছে।

সন্ধ্যার পরেই নিমন্ত্রণ। কাছারির পুরানো মেসের বারান্দায় আর সামিয়ানা-খাটানো উঠানে পাতা পড়েছে। আমরা খেতে বসলাম আমাদের বাড়ির কর্তাদের সঙ্গে। একজন নূতন অপরিচিত ভদ্রলোক—সৌম্যমূর্তি, মাথায় টাক, শ্যামবর্ণ একাহারা চেহারা, খালি গায়ে নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়ন করছিলেন, পরিবেশনের ব্যবস্থা করছিলেন আর চাকর-বরকন্দাজদের হুকুম করছিলেন। আমার বড়দাদা স্থানীয় ইস্কুলের হেডমাস্টার। তিনি বললেন, 'ইনি নতুন ম্যানেজার। পরগণার সেটলমেণ্টের ভার নিয়ে এসেছেন। বড় একরোখা ম্যানেজার, নাম জানকীনাথ রায়।'

কড়া ম্যানেজার শুনে একটু ঘাবড়ে গেলাম। যা হক, দক্ষিণ হস্তের কাজ শেষ করে যাত্রার আসরে গিয়ে দেখি, গান আরম্ভ হবার আর দেরি নেই। কিন্তু আসরে লোক গিজগিজ করছে, তিলধারণের জায়গা নেই। বরকন্দাজেরা লোকের ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, যাত্রার ঐকতান বাজছে আর লোকের হট্টগোলও চলছে। বসবার জায়গা পাবার সম্ভাবনা নেই। এমন সময় সেই নূতন ম্যানেজার জানকীবাবু সেখানে এসে দু তিনজন বরকন্দাজকে চোখের ইঙ্গিত করতেই তারা গোলমাল থামিয়ে অনেকের বসবার জায়গা করে দিল। তারপর জানকীবাবু আসরের মধ্যে গিয়ে আমাদের ডাকলেন। আমরা বহুকষ্টে একটু এগিয়ে যেতেই তিনি আমাদের তিন চার জনকে হাত ধরে

কোলে করে তুলে আসরের মধ্যে বেহালাদারদের পাশে দিব্যি জায়গা করে বসিয়ে দিলেন। কড়া ম্যানেজার জানকীবাবুর প্রতি আমাদের মনের মধ্যে একটা শ্রদ্ধা ও ভালবাসার ভাব জেগে উঠল।

পুণ্যাহের কিছুদিন পরেই দেখি কাছারিতে দিনরাত লোকে লোকারণ্য। শুধু প্রজাদের আনাগোনা নয়, অনেক নূতন আমলা-বরকন্দাজ নিযুক্ত হয়েছে। কাছারির দোতলায় নূতন আফিস বসেছে। আমলাফয়লা যেন চারগুণ বেড়ে গিয়েছে। শুনলাম সেটলমেণ্টের সেরেস্তা বসেছে। তার কর্তা জানকী রায়, সেই কড়া ম্যানেজার।

একদিন বাজারের সামনের মাঠে হাডু-ডু খেলবার সময় দেখি, জানকীবাবু অন্যান্য আমলাবাবুদের সঙ্গে বাজারে আসছেন। বাঃ, বেশ তো সাদাসিধে শান্তশিষ্ট মানুষটি! সবার সঙ্গে হাসিঠাট্টা গল্পগুজব করছেন। বাজারের অনেক লোক বলতে লাগল, 'খুব ভালো লোক, কিন্তু সেরেস্তায় বসলে একেবারে বাঘ। জরিপ-জমাবন্দিতে একটুখানি ফাঁকি দেবার জো নেই বাবা। আমিন-মুহুরির একেবারে দফারফা।'

বাস্তবিক সেকালের আমিনদের প্রজারা আদৌ ভাল চোখে দেখত না। তাদের ধারণা, আমিনের জরিপের শিকল যেন তাদের গলায় গাঁথবার জন্যই তৈরি হত। তারা আমিনের শিকলকে বাঘের মত ডরাত।

জানকীবাবু প্রথম জীবনে সরকারের সেটলমেণ্ট বিভাগে কানুনগোর পদে কাজ করতেন। অল্প বেতনভোগী নীচ-প্রকৃতির আমিনদের অত্যাচার ও দুর্নীতি দেখে তিনি ঐ চাকরিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে চাকরি ছেড়ে দেন। সেই সময়ে ১৩০৩ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিজের জমিদারিতে ডেকে এনে চাকরি দেন। তখন তাঁর জমিদারিতে সরকারের সেটলমেণ্টের কাজ শুরু হয়েছে এবং তাঁর শিলাইদহ ও কালীগ্রাম দুই জমিদারিতেই সেটলমেণ্টের কাজ পরিচালনার জন্য একজন সুদক্ষ ও ন্যায়নিষ্ঠ কর্মচারীর বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

যে পদ্ধতিতে সরকারের সেটলমেণ্ট কাজ পরিচালিত হবার নিয়ম আছে তাতে এক-একটা বড় জমিদারির সমস্ত রকম জমিজমার স্বত্বসাব্যস্ত, খাজনা-ধার্য, জমিজমার পরিচয়, শ্রেণীবিভাগ, কমিবেশি, দখল, সীমানা ইত্যাদি সব রকম জটিল ব্যাপারের তদন্ত জরিপ ও কাগজপত্র তৈরি করতে কমপক্ষে এক বৎসরের উপর সময় লাগে এবং অনেক কর্মচারীরও দরকার হয়ে থাকে। সাধারণ জোতদার ও কৃষকদের হাঙ্গামার অন্ত থাকে না, কারণ সবাই সে সময়

যার যতখানি কৌশল জানা আছে তা খাটিয়ে নিজ নিজ স্বার্থ ষোলআনা বজায় রাখবার জন্য প্রাণপণে লড়ে থাকে। জমিদারের পক্ষে যিনি এই বিষম সমস্যাপূর্ণ জটিল কাজের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে থাকেন তাঁর শিক্ষাদীক্ষা, দক্ষতা ও সত্যনিষ্ঠা কত উচ্চমানের হওয়া দরকার তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই কাজে জানকীবাবুকেও অনেকবার অনেক রকম কঠোর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রজাদের অধিকাংশই সরল অশিক্ষিত চাষি, কিন্তু এমন অনেক অর্ধশিক্ষিত পাকা বৈষয়িক প্রজা ও জোতদার আছেন যাঁরা কূটকৌশলে বহু কূটনীতিবিশারদদেরও ঘোল খাইয়ে দিতে পারেন। এই রকমের ঝানু প্রজাদের পাল্লায় পড়তে হয়েছিল জানকীবাবুকে অনেকবার।

একবার খানাপুরির * সময় চাণক্য-মার্কা জোতদারদের চক্রান্তে শিলাইদহ জমিদারির একটা বড় মহালের প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

জানকীবাবু কোনরকম জোরজবরদস্তি না করে তাদের বললেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা জমিদারির কাগজপত্র একটু আধটু বোঝ এমন পাঁচজন প্রজা এস আমার কাছে। যদি জমিদার পক্ষের কোন অন্যায় দেখাতে পার তবে আমি নিজে এসমস্ত জমি তোমাদের খাসখামার রেকর্ড করিয়ে দেব।' জানকীবাবু তাদের কাগজপত্রের সাহায্যে জলের মত পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন। শেষে তারা নিজেরাই নির্বিবাদে খানাপুরির কাজ সেরে খুশি হয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

এই ব্যাপারের পর জানকীবাবুর উপর ভাল মন্দ সমস্ত প্রজার একটা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভাব জেগে উঠল। প্রায় তিন বছরে ঠাকুর-জমিদারের দুই জমিদারির সেটলমেণ্টের কাজ জানকীবাবুর কৃতিত্বে বেশ নির্বিবাদে সুসম্পন্ন হয়ে গেল। তারপরে তিনি প্রথমে কালীগ্রামের ও পরে শিলাইদহের সদর ম্যানেজার হয়ে গেলেন। তিনি প্রকাশ্যে প্রজাদের বলতেন, 'বাপু, আমি ঢাকাই বাঙাল। আমার বাঙালের গোঁ নড়চড় হবে না।' †

একবার কালীগ্রাম পরগণার দুইজন অর্থশালী প্রজার জমির স্বত্বসাব্যস্ত নিয়ে অনেকদিন থেকে ভয়ানক গোলযোগ চলছিল। সেই জটিল গোলযোগ জানকীবাবু এমন সুন্দরভাবে মীমাংসা করে দেন যে, সেই প্রজা দুটি তাঁর নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারে অত্যন্ত খুশি হয়ে তাঁকে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ নগদ টাকা উপহার দিতে চেয়েছিল। জানকীবাবু বলেছিলেন, 'যদি তোমাদের

* সরকারের সেটলমেণ্টের একটি প্রাথমিক অধ্যায়।

† জানকীবাবুর বাড়ি ঢাকার নিকট পূর্বদি গ্রামে।

কৃতজ্ঞতার মূল্য কিছু থাকে তবে তা আমার প্রাপ্য নয়, আমার মনিবের। এ টাকা তাঁকে দাও, আমি কিছুতেই নেব না।' প্রজারা সত্যই এই ব্যাপার রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিল। তা শুনে তিনি বলেছিলেন, 'সত্যধর্ম রক্ষা করে জানকীবাবু জমিদারকে যে অমূল্য পুণ্যফল দিয়েছেন তা জমিদার পেয়েছেন। এর পুরস্কার তাঁরই পাওয়া উচিত, জমিদারের নয়।' এই রকম সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পেয়ে রবীন্দ্রনাথ জানকীবাবুর উপর কতখানি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন, তা তাঁর লিখিত অনেকগুলি পত্রে প্রকাশ করেছেন।

জানকীবাবুর প্রকৃত পরিচয় রবীন্দ্রনাথ নানাদিক দিয়ে পেয়েছিলেন। শুধু তাঁর জমিদারির কর্মচারী বলে নয়, সত্যিকারের মানুষ, কর্তব্যপরায়ণ কর্মী বলেও বটে। তিনি ১৩১৫ সালের ২৯শে চৈত্র একখানি চিঠিতে জানকীবাবুকে যে উপদেশ দিয়েছেন মানুষের কর্মজীবনে সে যে কত বড় অমোঘ আশীর্বাদ তা ভাবলে অবাক হতে হয়—

তোমার এবং ভূপেশ প্রভৃতির সঙ্গে আমার জমিদারীর কাজের সম্বন্ধ ছাড়া আরো একটি বিশেষত্ব আছে। আমি জমিদারীকে কেবল নিজের লাভ-লোকসানের দিক হইতে দেখিতে পারি না। অনেকগুলি লোকের মঙ্গল আমাদের প্রতি নির্ভর করে। ইহাদের প্রতি কর্তব্য পালনের দ্বারা ধর্মরক্ষা করিতে হইবে। এপর্যন্ত যে সকল কর্মচারী ছিলেন তাঁহারা অনেকে কর্মপটু ছিলেন কিন্তু সকলেই আমাদিগকে পাপে লিপ্ত করিয়াছেন। তোমাদিগকে লইয়া আমি যে একটি নূতন ব্যবস্থা করিয়াছি তাহার মূল উদ্দেশ্যই আমাদের যথার্থ কর্তব্যসাধন করা। তোমরা সকলে মিলিয়া সেই উদ্দেশ্যকে রক্ষা করিবে। তোমাদের কর্ম ধর্মকর্ম হইয়া উঠিবে এবং তাহার পুণ্য তোমরা এবং আমরা লাভ করিব। এই জন্যই তোমাদের চিন্তা ও ব্যবহার কেবলমাত্র বৈষয়িক কর্মের উপযুক্ত না হয় এই দিকে আমার দৃষ্টি আছে। তোমাদের মধ্যে ধৈর্য, ক্ষমা, উদারতার লেশমাত্র যেন অভাব না হয়। তোমরা পরস্পরের সমস্ত ত্রুটি একেবারে ভিতর হইতে সংশোধন করিয়া লইবে। সে সংশোধন কেবলমাত্র ধর্মবলেই হইতে পারে। সেজন্য প্রত্যহই ঈশ্বরের প্রসাদ প্রার্থনা করিয়া নিজের শক্তিকে পবিত্র ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে। যখনি দেখিবে মনের মধ্যে কাহারও প্রতি গ্লানি আসিয়াছে তখনি সতর্ক হইয়া সত্যপথে সরল পথে তাহা সংশোধন করিয়া লইবে। আবর্জনা কদাচ মনের মধ্যে লেশ-মাত্র জমিতে দিবে না। তোমাদের চরিত্রে ব্যবহারে ও কর্মপ্রণালীতে

আমাদের জমিদারী যেন সকল দিক হইতে ধর্মরাজ্য হইয়া উঠে। আমাদের লাভই কেবল দেখিবে না, সকলের মঙ্গল দেখিবে। সেই মঙ্গল নিম্নতম কর্মচারীদিগকে উৎসাহিত করিয়া রাখিবে। অধীর হইও না, অসহিষ্ণু হইও না। ঈশ্বরকে আমাদের ধর্মশাস্ত্রে শান্তম্ শিবম্ অর্থাৎ শান্তিময় মঙ্গলময় বলিয়াছে। তাঁহারই আদর্শে মনকে সর্বদা শান্ত ও মঙ্গলময় করিয়া রাখিবে। তাহা হইলে আর্থিক ও পারমার্থিক সকল কাজই ভাল হইবে। ইহাতে সন্দেহ নাই।

ভূপেশ, অক্ষয়, সত্যকুমার প্রভৃতিকে লইয়া তুমি মাঝে মাঝে এমনভাবে একত্রে কর্মের আলোচনা করিবে যাহাতে তোমার মন ও চেষ্টা তোমাদের কর্মের চেয়েও অনেক বড় হইয়া উঠে। তোমরা যে কাজে আছ সে কাজ তোমাদের লক্ষ্য নহে, তাহা তোমাদের পথ। অতএব লক্ষ্যের দিক তাকাইয়া পথকে ঠিক করিয়া লইবে। এই সম্বন্ধে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে একটি যথার্থ ধর্মের যোগ থাকে এই আমার ইচ্ছা। বাধা বিস্তর, বারংবার আঘাত পাইবে, ব্যথাও পাইবে, মাঝে, মাঝে স্খলন হইবে, কিন্তু তাহাতে বিচলিত হইও না। অবসন্ন হইও না। সকলকে ধর্মের নামে এক করিয়া টানিয়া লও। তোমাদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর অবিচলিত হউক। ঈশ্বর তোমাদের সকলকে এক কল্যাণসূত্রে বাঁধিয়া তাঁহার মঙ্গলকর্মে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করুন। কর্ম তোমাদিগকে কোন মতেই ক্ষুদ্র করিতে, মলিন করিতে যেন না পারে। ইতি ২৯শে চৈত্র, ১৩১৫।

জানকীবাবুর অন্তরের পরিচয় পেয়েছিলেন, তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এই অনবদ্য চিঠিতে উপদেশ ও আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলেন যথার্থ কর্মযোগীর মত। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ অপরিমিত উৎসাহ নিয়ে শিলাইদহে অনেক অর্থব্যয়ে যে তাঁতের কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই স্বদেশী যজ্ঞের অনুষ্ঠানে জানকীবাবু তাঁর দক্ষিণহস্ত ছিলেন। হিন্দুসমাজের নমশূদ্র প্রভৃতি অনুন্নত সম্প্রদায়ের উপর নানারকম সামাজিক অত্যাচার তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তিনি তাঁর নিজের গ্রামে এবং জমিদারির কর্মস্থলে এই অস্পৃশ্যতা বর্জনের জন্য আন্দোলন করেছিলেন। তাঁর দেশ থেকে অনেক অত্যাচরিত নমশূদ্র পরিবার আনিয়ে জমি দিয়ে তাদের শিলাইদহের চরে বসিয়েছিলেন এবং তাদের সামাজিক জীবন সংগঠনকল্পে কীর্তন ও মহোৎসব প্রভৃতির জন্য তাদের নানাভাবে উৎসাহিত করেছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর

আগে বাংলার গ্রামগুলিতে হিন্দুধর্মধ্বজীদের কি কঠোর গোঁড়ামি চলত তা সকলেই জানেন। সেই সময়ে এই রকম অস্পৃশ্যতা-বর্জনের আন্দোলন করতে কতখানি বুকের পাটা শক্ত হওয়া দরকার তা সকলেই বুঝতে পারেন।

জানকীবাবু ছিলেন খাঁটি স্বদেশী। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনকে তিনি নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে মনে করতেন; দেশী মোটা তাঁতের কাপড় ছাড়া পরতেন না। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানে তিনি মনে প্রাণে গভীর অনুপ্রেরণা পেতেন। সেসময়ে শিলাইদহের আকাশবাতাস রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানে দিনরাত ভরপুর থাকত। তাঁর স্বদেশী গান গেয়ে নগরকীর্তনের দল যখন গ্রাম পরিভ্রমণ করত, তখন তিনি আফিসের কাজ ছেড়ে গানের দলে মেতে উঠতেন।

জানকীবাবুর সময়ে শিলাইদহ কাছারির বড় আমলাদের মহলে একটা বিরাট অন্তর্বিপ্লব চলছিল; জমিদারের স্বার্থ ছাড়া গ্রামের স্বার্থেরও যোগ ছিল সেই দলাদলিতে গভীরভাবে। তা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথ সে সময়ে জমিদারির কার্যব্যবস্থার আমূল সংস্কারের জন্য একটা নূতন পদ্ধতির প্রচলন করেছিলেন যাতে তাঁর জমিদারিতে বিশেষত শিলাইদহে একটা তুমুল ঝড় উঠেছিল এবং সেই ঝড়ে ম্যানেজার হিসাবে জানকীবাবু এবং তাঁর সহকর্মীরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সেই অন্তর্বিপ্লব নিবারণের জন্য রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। তিনি সেই সময়ে জানকীবাবুকে যে অনন্যসুলভ দীর্ঘ পত্রখানা লিখেছিলেন সে পত্রখানি আশ্চর্য মানুষ রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রতিভার নিদর্শন—

আশিস সন্ত

মধু* বোলপুরে আসিয়াছিল। তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম সত্যকুমারের† বিরুদ্ধে তোমার মনে বিকার দেখা দিয়াছে এবং সেই

* মধুবাবু ছিলেন ঠাকুরবাবুদের সদর দপ্তর কলিকাতা আফিসের বিশিষ্ট কূটনীতিজ্ঞ, সুদক্ষ কর্মচারী।

† সত্যকুমার মজুমদার, ইনি জানকীবাবুর ম্যানেজার থাকাকালে শিলাইদহ সদর কাছারির সেক্রেটারি নামে এক নূতন পদে বহাল হয়ে আসেন। তাঁর সঙ্গে জানকীবাবুর মনান্তর ঘটে এবং সে মনান্তর অনেক দূর গড়ায়। শিলাইদহের বিশিষ্ট প্রজাদের সঙ্গেও সত্যকুমারবাবুর গ্রাম্য মাইনর ইস্কুল ইত্যাদি নিয়ে বিবাদ হয় এবং তদানীন্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বার্লি সাহেব তা গ্রামবাসীদের পক্ষে মীমাংসা করে দেন। এই সমস্ত বিবাদ-বিসম্বাদে দোষী-নির্দোষ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করব না।

বিকার যথোচিত উপায়ে সংশোধনের চেষ্টা না করিয়া মধুকে তুমি তোমার সহায় করিয়াছ।

কর্মক্ষেত্রে কেহই আঘাত বাঁচাইয়া চলিতে পারে না। পূর্বেও তোমাকে অনেকের কাছ হইতে অনেক প্রতিকূলতা সহ্য করিতে হইয়াছে। ঈশ্বরের কৃপায় সে সমস্তই তুমি কাটাইয়া চলিতে পারিয়াছ।

আমি জানি ধর্মে তোমার নিষ্ঠা আছে এবং ভগবানের প্রতি তোমার লক্ষ্য স্থির করিয়াছ। এইজন্য তুমি যখন বিচলিত হইয়া সরল পথ পরিত্যাগ কর, তখন তাহাতে আমি চিন্তিত হই। তুমি মধুকে যে পত্র লিখিয়াছ তাহার মধ্যে তোমার স্বভাবসিদ্ধ ধর্মবুদ্ধি প্রকাশ পায় নাই; তাহার মধ্যে গূঢ় বিদ্বেষের ভাষা আছে। আমার তাহা পড়িয়া মনে হইল মধুও সদর হইতে কোনো অত্যুক্তির দ্বারা তোমার মন কলুষিত করিতে চেষ্টা করিতেছে। সেইজন্য আমি বিশেষ দুঃখিত হইলাম।

সকল অবস্থাতেই তুমি তোমার উদারতা রক্ষা করিবে, ক্ষমা করিবে, বিচলিত হইবে না। তোমার সেই শক্তি আছে, তোমার পদও সেইরূপ। মধুকে তুমি যে পত্র যে ভাবে লিখিয়াছ তাহাতে মধু খুশি হইয়াছে সন্দেহ নাই। তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে তোমার মর্যাদাহানি হইয়াছে। যেখানে তুমি আমাকে পত্র লিখিবার অধিকারী সেখানে মধুকে দলে টানিয়াছ, ইহা তোমার পক্ষে অগৌরবকর। সত্যকুমারকে ডাকিয়া তাহাকে যদি তিরস্কার করিতে, সেও তোমার উপযুক্ত হইত।

সত্যকুমার সম্বন্ধে তোমরা ভুল ধারণা করিতেছ বলিয়া আমার বিশ্বাস। তোমার কোনো কাজের বিরুদ্ধে সত্যকুমার চক্রান্ত করিয়াছে বলিয়া যদি তোমার প্রত্যয় হয় তবে তাহা অমূলক। যদি সমূলকও হয়, তবু নিজের মনে কোনো ক্ষুদ্রতা রাখিও না। সংসারে কোথায়ও কোনো পাপ উঠিতেছে যদি দেখ, তবে বাহির হইতেই তাহা মুছিয়া ফেলিবে, তৎক্ষণাৎ তাহার যাহা উচিত প্রতিকার তাহা সারিয়া একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবে। তাহাকে নিজের মনের মধ্যে কোনোমতেই তুলিয়া রাখিও না। তোমার এই কর্মক্ষেত্রেই কি তোমার চিরজীবনের ক্ষেত্র? এইখানকার বাধা-বিঘ্ন, মান-অপমান, রাগ-দ্বেষ ঈর্ষাই কি তোমার চিরদিনের? প্রতিদিনের আবর্জনা

একদিকে জমিদারির আমূল সংস্কারের চেষ্টা অন্যদিকে কর্মচারীদের অন্তর্বিপ্লব এসময়কার একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

প্রতিদিন ঝাঁট দিয়া ফেল। কোনো ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে তোমার কোনো ক্ষুদ্রতার সহায় করিও না। তাহা হইলে সেই ক্ষুদ্রতা দূর না হইয়া কেবলি প্রশ্রয় পাইবে। তুমি নিশ্চয় জানিবে ক্ষুদ্রতার বন্ধুরা যখনি সুযোগ পাইবে তখনি তোমার শত্রুপক্ষের সহিত যোগ দিতে কুণ্ঠিত হইবে না। ইহাদের সঙ্গে কেবলমাত্র কর্মের সম্বন্ধ রাখিবে, হৃদয়ের সম্বন্ধ রাখিও না।

আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি বলিয়াই এরূপ পত্র লিখিতে পারিলাম। তোমার চিত্ত নির্বিকার থাকে ইহাই দেখিতে আমার আনন্দ। তুমি যে কাজ লইয়া আছ সেই কাজের চেয়েও বড় হইয়া থাকিবে। তুমি তো কেবল জমিদারীর ম্যানেজার নও, তুমি মানুষ, মনুষ্যত্বে ভূষিত। কাহারও প্রতিকূলতাতেও সে কথা কোনোদিন ভুলিও না। নিজের আত্মাভিমানে আঘাত পাইয়া অন্যকে অবিচার করিও না ; কারণ তাহা হইলে নিজের যথার্থ গৌরব হারাইবে। ইতি, ২৪শে ফাল্গুন, ১৩১৫।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুঃ। আমি তোমাকে এই যে পত্র লিখিলাম ইহা তোমার প্রতি রাগ করিয়া লিখি নাই। আমি তোমার কল্যাণ কামনা করিয়াই লিখিয়াছি। তোমার প্রতি আমার স্নেহ আছে এবং আমি তোমাকে বাহিরের শত্রুতা হইতে অনেকবার রক্ষা করিয়াছি। এবার ভিতরের প্রবলতর শত্রুর সম্বন্ধে তোমকে সতর্ক করিয়া দিলাম।—বোলপুর।

জানকীবাবু রবীন্দ্রনাথের জমিদারি ব্যবস্থার সংস্কারপ্রচেষ্টার প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি সাহায্যকারী হিসাবে পেয়েছিলেন শ্রীযুক্ত ভূপেশচন্দ্র রায়কে। ভূপেশবাবু ছিলেন শান্তিনিকেতনের সৃষ্টির যুগের আত্মত্যাগী শিক্ষক ও কবি স্বর্গত সতীশচন্দ্র রায়ের ভাই। রবীন্দ্রনাথের জমিদারি সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামে গ্রামে সুপরিকল্পিত পঞ্চায়েৎ প্রবর্তন। জমিদারির গতানুগতিক দুর্নীতিপরায়ণ শাসনসংরক্ষণের পরিবর্তে জমিদারি শাসনযন্ত্র প্রাচীন বাংলার পঞ্চায়েৎ প্রথার মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া—পল্লীস্বরাজের প্রবর্তন। তাঁর নীতি ও কার্য, ব্যবহার ও পরিচয় বিশ্লেষণ করতে হলে পৃথক প্রবন্ধের প্রয়োজন।

১৩১১ সালে জানকীবাবু পেনসন নিয়ে অবসর গ্রহণ করেন। আবার বছর দুই পরে তাঁকে রবীন্দ্রনাথ ডেকে এনে জমিদারির ম্যানেজারের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। শেষে ১৩১৮ সালের প্রথমে তিনি শেষবার পেনসন সহ

অবসর নিয়ে কিছুদিন স্বগ্রামে কাটান এবং শেষে বৃন্দাবনবাসী হয়েছিলেন। বৃন্দাবনেই তাঁর মৃত্যু হয়। জানকীবাবুর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা আগে বলি নাই। তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে খাঁটি বৈষ্ণব। চৈতন্যদেব চণ্ডালকে ভালবেসে কোল দিয়েছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম ও আচারব্যবহারের মধ্যে এইটিতে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল।

জানকীবাবুর ম্যানেজার থাকাকালে জানিপুরের দ্বারিকানাথ বিশ্বাসের চাকরি ও জমিজমা সম্বন্ধে যে গোলযোগের সৃষ্টি ও মীমাংসা হয়েছিল তার উল্লেখ করাটা দরকার মনে করি। সেই ব্যাপারটা একাধিক কারণে সকলেরই শিক্ষাপ্রদ। সেই ঘটনাতেই প্রমাণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ কেমন আদর্শ ও সহৃদয় জমিদার ছিলেন, বিভিন্ন চরিত্রের পল্লীবাসীকে তিনি কেমন সুস্পষ্ট যথার্থ গভীরভাবে চিনতে পারতেন। সেই ঘটনাটা বিবৃত না করে দ্বারিক বিশ্বাসের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য চিঠিখানা পাঠকপাঠিকাকে উপহার দিলাম—

আশিস সম্ভ

কর্মের নিয়ম অনুসারে দ্বারিক বিশ্বাসকে যে ভাবে চালনা করিতে হইবে তাহা দৃঢ়ভাবেই স্থির করা আবশ্যক; সে সম্বন্ধে আমি কোনো শৈথিল্য করিতে বলি না। আমি কেবলমাত্র বলি তাহার প্রতি রাগ করিয়া কোনো কাজ না করা হয়। স্বার্থরক্ষার জন্য প্রবল ব্যক্তি স্বভাবত চাতুরী অবলম্বন করিয়া থাকে। সে স্থানে দুর্বল পক্ষের বেলায় চাতুরী দেখা গেলে আমরা যে রাগ করি সে চাতুরীর প্রতি রাগ নহে, দুর্বলের প্রতিই রাগ। কারণ এই দ্বারিক বিশ্বাসই চতুরতার দ্বারা আমাদের কোন কাজ উদ্ধার করিলে প্রশংসা ও পুরস্কারের পাত্র হয়। এমন স্থলে নিজের স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে চাতুরী প্রয়োগ দেখিলে আমাদের রাগ করিবার কারণ নাই। আমার প্রজারা নিজের বৈষয়িক স্বার্থরক্ষার জন্য যখন চতুরতা করে আমার মনে তখন রাগ হয় না। তাহাদের বেদনা ও ব্যাকুলতা বুঝিবার আমি চেষ্টা করি।

দ্বারিক বিশ্বাসকে* আমি তোমার কাছেই ফিরাইয়া দিব, নিজে কোনো হুকুম দিব না। তোমরা যেটা কর্তব্য বোধ করিবে, তাহাই করিবে। কেবলমাত্র

*দ্বারিকানাথ বিশ্বাস ঠাকুর-জমিদারেরই একটা জটিল ফৌজদারি মোকদ্দমা পরিচালন সম্পর্কে ঠাকুরবাবুদের কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই মোকদ্দমাটি সুবিখ্যাত তের ছটাকের মামলা নামে স্থানীয় লোকের কাছে সুপরিচিত। ঠাকুরবাবু ও নড়াইলের প্রতাপান্বিত জমিদার উভয়েই জমিদারির সীমানগত ঐ তের ছটাক জমির জন্য বহুদিন ফৌজদারি ও

দণ্ড দিবার জন্য কিছুই করিবে না। দ্বারিক বিশ্বাস যদি প্রবল হইত তবে সে আমাকে দণ্ড দিবার চেষ্টা করিত। আমি দৈবক্রমে প্রবল হইয়াছি বলিয়াই যে ক্রোধ পরিতৃপ্তির জন্য তাহাকে দণ্ড দিব এবং সে তাহা অগত্যা বহন করিবে, এ আমি সঙ্গত মনে করি না। ১৮ই আষাঢ়, ১৩১৩।

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* * *

জমিদারির নিয়ম ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য জানকীবাবু দ্বারিক বিশ্বাসকে কর্মচ্যুত করে তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে কর্তব্য সম্পাদন করলেন, কিন্তু অপরাধী দ্বারিক বিশ্বাসের উপর রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি তখনও অটুট ছিল।

অপরাধী দ্বারিক বিশ্বাসের চরম শাস্তির ব্যবস্থা হয়ে গেলে রবীন্দ্রনাথ ১৩১৫ সালের ৮ই ফাল্গুন ভূপেশবাবুকে যে পত্র লিখেছিলেন, তাতে তিনি কতখানি মনোবেদনা প্রকাশ করেছেন তার অপূর্ব অভিব্যক্তিতে মুগ্ধ হতে হয়—

কল্যানীয়েষু

দ্বারিক বিশ্বাসের জোত পাঁচশত টাকায় অন্যের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছ, ইহাতে আমি বড় দুঃখিত হইয়াছি; কারণ আমি দ্বারিককে নিজের মুখে আশ্বাস দিয়াছিলাম যে তুমি এই জোত ইস্তাফা দিলে জোত হইতেই আমাদের দেনার টাকা বন্দোবস্ত, নজর ইত্যাদি দ্বারা উদ্ধার করিয়া তোমারই সহিত বন্দোবস্ত করিব। তোমার বিনা এতেলায়* স্বেচ্ছামত

দেওয়ানি মোকদ্দমা করেছিলেন; পরে অবশ্য ঠাকুরবাবুই জয়লাভ করেন এবং আপোষে উভয় জমিদারের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল। এই মোকদ্দমায় অনেক টাকা খরচ হয়েছিল এবং জানিপুরবাসী দ্বারিক বিশ্বাসই ঐ মামলা-মোকদ্দমার তদ্বিরকারক ছিলেন। মামলা চালাবার সময় তিনি ন্যায়-অন্যায় অনেক কাজই করেছিলেন এবং নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কৌশল অবলম্বন করে গোপনে অনেক জমিজমা করে নিয়েছিলেন। ঐ মোকদ্দমা শেষ হয়ে গেলে ম্যানেজার জানকীবাবু দ্বারিক বিশ্বাসের কৌশল ও স্বার্থপরতার প্রমাণ পেয়ে তাঁকে শাস্তি দেবার জন্য প্রস্তাব করেন। অসাধারণ মনস্তত্ত্ববিদ্ রবীন্দ্রনাথ তাতে মত দেন নি। তিনি অপরাধী দ্বারিক বিশ্বাসের চাতুরীর পরিচয় পেয়েও তাঁকে ক্ষমা করেছিলেন। অপরাধী চিরকালই শাস্তির যোগ্য এইকথা জানিয়ে জানকীবাবু রবীন্দ্রনাথের এই আদেশের প্রতিবাদ করেছিলেন।

* এতেলা, এর ইংরেজি রিপোর্ট।

কুঞ্জদের* সহিত বন্দোবস্ত করিয়া আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাতে আমার পক্ষে একান্ত লজ্জার কারণ ঘটাইয়াছ। আমি এরূপ আশা করি নাই। দ্বারিক বিশ্বাসের এরূপ আশাভঙ্গ করিয়া এস্টেটের যে বিশেষ লাভ হইল আমি তাহা মনেই করি না। যে সম্পত্তিতে যাহার অধিকার আছে, আমি যথাসম্ভব রক্ষা করিতেই চেষ্টা করি। এই কারণেই চাকরান জমি† আমি অল্প নজরেও পূর্বাধিকারীকে ছাড়িয়া দিয়াছি। তোমরা সামান্য কারণে তাহার অন্যথা করিয়া যে মনোবেদনার সৃষ্টি করিয়াছ তাহা কোনো মতেই মঙ্গলকর হইতে পারে না এবং আমি দ্বারিক বিশ্বাসকে আশ্বাস দিয়াও তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না, ইহাতে আমার গ্লানি রহিয়া গেল। উচ্চ ডাকে নিলাম ডাক করাইলেই বা কি পার্থক্য হইত তাহাও বুঝি না। এ সম্বন্ধে তুমি কি রিপোর্ট করিয়াছ তাহা আমি জানি না, কারণ তাহা কলিকাতার সেরেস্তায় গিয়াছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* * *

রবীন্দ্রনাথের ঐ পত্রের বৈদ্যুতিক ক্রিয়ায় দ্বারিক বিশ্বাসের চাকা ঘুরে গেল। রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতিপূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থায় সমস্ত অবস্থাই পরিবর্তিত হয়ে গেল। জমিটা নিলাম হওয়াতে দ্বারিক বিশ্বাস ঠাকুরবাবুদের দেনা থেকে মুক্ত হয়েও কিছু টাকা পেয়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদ পেয়ে শান্ত হলেন, লিখলেন (১৫ ফাল্গুন, ১৩১৫)—

আশিস সম্ভ

ইতঃপূর্বেই সত্যকুমারের পত্রে দ্বারিক বিশ্বাসের জোত নিলামের সমস্ত বিবরণ বিস্তারিত অবগত হইয়া আশ্বস্ত হইয়াছি। তাহার সম্বন্ধে সমুচিত ব্যবস্থা হইয়াছে সন্দেহ নাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জমিদার রবীন্দ্রনাথ, মানুষ রবীন্দ্রনাথের অলোকসামান্য চরিত্রের উপরে জানকীবাবুর কাছে লিখিত জমিদার রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি অনেকখানি

* জানিপুরের কুঞ্জবিহারী সরকার।

† চাকরান জমি, স্থায়ী কাজের জন্য চাকরদের বা কর্মচারীদের যে জমি দেওয়া হয়।

আলোকপাত করেছে। তিনি উপযুক্ত কর্মচারীও খুঁজে বের করতে পারতেন।

জানকীবাবু পেনসনসহ অবসর গ্রহণ করার পর রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যে পত্র লিখেছিলেন, সে রকমের পত্র কোন মনিব কোন কর্মচারীকে লিখেছেন বলে জানি না। সেই অপূর্ব চিঠিখানা পাঠকপাঠিকাকে উপহার দিয়ে আমরা এ প্রসঙ্গ শেষ করি—

বোলপুর

শুভাশিসাং রাশয় সন্তু,

এক্ষণে যাঁহারা কর্মের ভার লইয়াছেন* তাঁহারা বর্তমান ব্যবস্থায় তোমার পদ অনাবশ্যক বিধায় তোমাকে অবসর দিয়াছেন ইহা আমার পক্ষে বেদনাজনক। তুমি চিরদিন কিরূপ সততার সহিত কাজ করিয়াছ এবং ধর্মের দিকে তাকাইয়া অসংকোচে ও নির্ভয়ে আপনার কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছ তাহা আমার অগোচর নাই। তোমার এই নির্ভীক সততায় অনেক সময় তোমার উপরিতন ও নিম্নতন কর্মচারীরা অসহিষ্ণু হইয়া তোমার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াও এ পর্যন্ত কৃতকার্য হয় নাই। তুমি যেরূপ সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্কভাবে ও সম্মানের সহিত পেনসন্ লইয়া কর্ম হইতে নিষ্কৃতিলাভের সুযোগ পাইয়াছ, জমিদারী সেরেস্তার অল্প লোকের ভাগ্যে এরূপ ঘটে। ইহা তোমার অবিচলিত ধর্মনিষ্ঠার ফল। যে ভগবানের প্রতি তুমি সুখে দুঃখে চিরদিনই নির্ভর করিয়াছ তিনি নিশ্চয় তোমার কর্মজাল হইতে মুক্তিলাভকে তোমার পক্ষে কল্যাণকর করিয়া তুলিবেন। অতএব তুমি তোমার বর্তমান ক্ষতি ও অসুবিধাকে তাঁহারই স্বহস্তের দান বলিয়া নিরুদ্বিগ্নচিত্তে শিরোধার্য করিয়া লইবে। তুমি যে অবস্থায় যেখানে থাক, আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি। ইহা নিশ্চয়ই জানিবে।

সহসা তোমার কর্মস্থান হইতে চলিয়া আসিবার জন্য তোমার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা জানাইয়া আবেদন করিলে নিঃসন্দেহেই তাহা পূরণের ব্যবস্থা হইবে। এসম্বন্ধে এষ্টেট হইতে তোমাকে সাহায্য করা কর্তব্য বলিয়া মনে করি। অতএব সংকোচ না করিয়া এই সংক্রান্ত তোমার ন্যায্য দাবী উত্থাপন করিতে পার।

* এই সময়ে জমিদারির ভার ম্যানেজিং এজেন্ট শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর উপর ছিল। জমিদারির কাজ দেখা এসময়ে রবীন্দ্রনাথ একেবারে ছেড়ে দেন। জানকীবাবুকে অবসর দেওয়ায় তিনি বিশেষ দুঃখিত হন এবং ভবিষ্যতে তাঁর ছেলেদের জন্য কোন অনুগ্রহ প্রদর্শনের দরকার হলেই তা মঞ্জুরীর নির্দেশ দেন।

সরকারী যে জিনিসগুলি তুমি সর্বদা ব্যবহার করিয়া আসিতেছ তাহা তুমি সঙ্গে লইয়া যাইবে ; তাহার কোন মূল্য দিতে হইবে না।

আমাদের সহিত পূর্বাপর যেরূপ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সম্বন্ধ ছিল তাহার লেশমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই, ইহা স্থির জানিবে এবং তোমার মঙ্গল সংবাদ পাইলে সুখী হইব, ইহাও মনে রাখিবে। ইতি—১৬ই বৈশাখ, ১৩১৮।*

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কুঠিবাড়ির গৃহস্থালি

জনতার সামনে খ্যাতিমান পুরুষেরা অনেক আবরণ দিয়ে নিজের আটপৌরে রূপটি ঢাকতে চান। তাঁদের আসল রূপটির প্রকাশ পায় তাঁদের দৈনন্দিন গার্হস্থ্যজীবনে, লৌকিক বৈষয়িক ও পারিবারিক ব্যবহারে। রবীন্দ্রনাথের গার্হস্থ্যজীবনের একটি সত্য কাহিনী আজ বলব। কাহিনীটি বলেছেন কবির পুরাতন কর্মচারী শ্রীঅনঙ্গমোহন চক্রবর্তী।

অনঙ্গবাবু বহুদিন শিলাইদহে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক কর্মচারী হিসাবে। তখন রথীন্দ্রনাথ কবির উপদেশে জমিদারির কাজ শিখছেন শিলাইদহে—গ্রাম্য কৃষিজীবনের উন্নতিকর নানা কর্মের আয়োজনে। কবি বুঝেছিলেন জমিদারির উন্নতির অর্থই হচ্ছে পল্লীজীবনের ও কৃষির উন্নতি। তাই তিনি নিজের পুত্র, জামাতা ও অন্তরঙ্গ বন্ধুর পুত্র সন্তোষকুমার মজুমদারকে আমেরিকায় পাঠিয়ে সেখানকার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিবিদ্যা শিখিয়ে পারদর্শী করে আনেন এবং তাঁদের জমিদারিতে এনে হাতে-কলমে চাষ করিয়ে প্রজাসাধারণের মধ্যে উন্নত বিজ্ঞানসম্মত কৃষিপ্রণালী প্রবর্তনের ব্যবস্থা করেন। অবশ্য নানাকারণে তাঁর চেষ্টা সে সময়ে ফলবতী হতে পারে নি, কিন্তু তাঁর

* রবীন্দ্রনাথের চিঠি ক'খানা ১৩৪৯ সালের শ্রাবণ ও আশ্বিন সংখ্যার প্রবাসীতে সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু দুইটি প্রবন্ধে প্রকাশ করেছিলেন। এই পত্র কয়খানা জানকীবাবুর পুত্র শ্রীমান শচীন্দ্রনাথ রায়ের ও বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের অনুমতি অনুসারে প্রকাশিত হল। এই সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্র বসুর ঐ প্রবন্ধ দুটি পড়লে পাঠক পাঠিকা উপকৃত হবেন।

সুদীর্ঘ অধ্যবসায়, কঠোর নিষ্ঠা ও অবিরত ক্ষতি স্বীকার করেও আদর্শে আত্মনিয়োগ দেখে অবাক হতে হয়।

অনঙ্গবাবু চালাতেন মোটর বোট। রথীন্দ্রনাথকে প্রায়ই পদ্মার চরে নানা গ্রামে প্রজাদের কাছে যেতে হত। তাই অনঙ্গবাবু তখন কিছুদিন স্থায়িভাবে মোটর বোটের ড্রাইভারি করতেন আর নতুন ফসলের চাষ প্রবর্তন তদারক করতেন। একদিন অনঙ্গবাবু পদ্মা পাড়ি দিয়ে বেলা এগারটার পরে শিলাইদহে পৌঁছে কুঠিবাড়িতে বিশ্রাম করছেন, এমন সময় জানতে পারলেন কলিকাতার একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক সেদিনই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে বিশেষ জরুরি কাজে কলিকাতা ফিরে যাবেন। তখন সবে বর্ষার আরম্ভ। রাস্তাঘাট ভাল নয়। সেদিনই বেলা চারটায় কুষ্টিয়া এসে চিটাগাং মেল ধরানর আর কোন যানবাহন নাই। আছে কেবল মোটর বোট।

তখন পদ্মার সঙ্গে গোরাই নদীর যোগ ছিল এবং শিলাইদহ থেকে গোরাই নদী দিয়ে জলপথে স্টীমারও চলত। সেই ভদ্রলোকটির কলিকাতা যাওয়ার ব্যবস্থার ভার কাজেকাজেই অনঙ্গবাবুর উপরেই পড়ল।

বেলা বারটায় শিলাইদহ থেকে না ছাড়লে পদ্মা ও গোরাই নদী দিয়ে মোটর বোট কোন মতেই বেলা চারটেয় কুষ্টিয়া স্টেশনে চিটাগাং মেল ধরাতে পারে না। এ কারণ তাড়াতাড়ি অনঙ্গবাবু কুঠিবাড়িতে স্নানাহার করে নিতে পারলেন না। সামান্য জলযোগ সেরে সেই বিশিষ্ট ভদ্রলোকটিকে নিয়ে ঠিক বেলা সাড়ে বারটায় শিলাইদহ থেকে মোটর বোট ছাড়লেন।

সে সময়ে শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের বিরাট পরিবার বসবাস করছে। তখন কবিগৃহিণী পরলোকে। কুঠিবাড়িতে রথীন্দ্রনাথ, শ্রীমতী মীরা দেবী ও অন্যান্য অনেকে আছেন। দাসদাসীতে বাড়ি পরিপূর্ণ। সকলে কুঠিবাড়িতেই খেত, থাকত। দৈনিক প্রতি বেলা ৩০।৪০ জন লোক খেত। অনঙ্গবাবুও অবশ্য কুঠিবাড়িতেই খেতেন ও থাকতেন।

অনঙ্গবাবু যখন কুষ্টিয়ার কাজ সেরে শিলাইদহ কুঠিবাড়ি পৌঁছলেন তখন বেলা প্রায় শেষ হতে চলেছে। তিনি হাত-পা ধুয়ে খাবার জন্য রান্নাবাড়িতে পৌঁছলেই পাচক ব্রাহ্মণ গালে হাত দিয়ে বসে পড়ল। ভুলক্রমে সে সেদিন অনঙ্গবাবুর খাবার রাখতেই ভুলে গেছে। সর্বনাশ! অনঙ্গবাবু না খেয়ে কুষ্টিয়া গেছেন, এ বিষয়ে তার হুঁস ছিল না। অনঙ্গবাবু 'ঠাকুর ভাত দাও' বলে দু'তিনবার ডেকে বাইরে এসে নিজের ঘরে ঢুকতেই শুনতে পেলেন রবীন্দ্রনাথ

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে কঠোর স্বরে জোরে জোরে নিজের মেয়েকে বলছেন—'মীরা, এই তো তোমাদের সংসার! একটা লোক তেতেপুড়ে এসে না খেয়ে বসে রইলো। আর তোমরা দোতলায় বসে বই পড়ছো। সবই ঠাকুর-চাকর করবে! এতো বেশ গেরস্তালি!' এই বলেই পাচক আর রান্নাঘরের ঝিকে ডাকতে লাগলেন। ব্যাপার দেখে মীরা দেবী নিচে নেমে এসে লুচি বেলতে লাগলেন। চাকর-দাসীদের সাহায্যে মীরা দেবী আধ ঘণ্টার মধ্যেই অনঙ্গবাবুকে লুচি, আলুর তরকারি, বেগুনভাজা ইত্যাদি খাইয়ে দিলেন। সেদিন থেকে কুঠিবাড়ির ব্যবস্থার একেবারে আমূল সংস্কার হয়ে গেল।

গৃহস্থ রবীন্দ্রনাথের অনেক অতিথি শিলাইদহে আসতেন। লোকেন্দ্র পালিত, জগদীশচন্দ্র বসু, যতীন বসু, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ প্রায়ই আসতেন। একবার জগদীশচন্দ্র শিলাইদহে এসে শাকের নানারকম তরকারি খেতে চাইলেন। শাকভাজা, শাকের ঘণ্ট, শাকচচ্চড়ি, ঝোল ইত্যাদি প্রায় বিশ রকমের শাকের তরকারি বিজ্ঞানাচার্যকে খাওয়ান হল। তিনি পদ্মার চরের কচ্ছপের ডিম খেতে খুব ভালবাসতেন। তারও ব্যবস্থা হয়েছিল। পিয়ার্সন সাহেব, লরেন্স সাহেব, এঁরা বাঙালির খাবার খেতে ভালবাসতেন। লরেন্স সাহেব রথীন্দ্রনাথকে ইংরেজি পড়াতেন। তিনি গেঁয়ো বাঙালির মত হুঁকোয় তামাক খাওয়া শিখে ফেলেছিলেন। শান্তিনিকেতনের শিক্ষকেরা ও ছাত্ররাও অনেকেই আসতেন। বহু কবি ও বিশিষ্ট সাহিত্যিককে রবীন্দ্রনাথ শিলাই-দহের শান্ত পল্লীশ্রী উপভোগ করবার জন্য নিমন্ত্রণ করে আনতেন এবং তাঁদের আদর-আপ্যায়নের বিশেষ আয়োজন থাকত। মোট কথা, শিলাইদহে রবীন্দ্র-নাথ একা বা সপরিবারে যখনই থাকতেন তখনই তাঁকে পাকা গেরস্থালি পাততে হত।

রবীন্দ্রনাথ নিজে শিলাইদহের 'বড়োনের ধানের' লাল-রঙের সুগন্ধি আতপ চাউলের ভাত, তারই সরু চিড়ে-ভাজা খেতে ভালবাসতেন। তিনি বহুদিন আতপ চাউলের ভাত এবং আলু, কলা, পটল, ডালবাটা-ভাতে খেতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। নিজে আহারে-বিহারে এত সাদাসিধে ছিলেন যে, জমিদারের পক্ষে সেরকম কখনও দেখা যায় না। তাঁর গৃহস্থজীবনের কিছু কিছু চিত্র আমি অন্যান্য কাহিনীতে দিয়েছি। রবীন্দ্রনাথের ভৃত্যভাগ্য ছিল। তিনি সবসময়েই সত্যিকার প্রভুবৎসল চাকর সঙ্গে আনতেন এবং তাদের খুব ভালবাসতেন।

একবার একজন নিকারি (মৎস্যবিক্রেতা) প্রকাণ্ড এক রুই মাছ এনে তাঁর কাছে দরবার শেষ করে ফিরে যাচ্ছে, এমন সময় রবীন্দ্রনাথ তাকে পাঁচটা টাকা নেবার জন্য বহু অনুরোধ করতেও সে টাকা নিতে কিছুতেই রাজি হল না। তখন তিনি বললেন, 'তা হলে তোমাকে মাছ খেয়ে যেতে হবে, না খেয়ে গেলে তোমার হুকুম নাকচ করে দেবো।' সে রান্নাবান্না শেষ হবার পর মহাস্ফূর্তিতে খেতে বসেছে এমন সময়ে রবীন্দ্রনাথ সামনে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'মাছ কেমন রান্না হয়েছে, রান্নাবান্না কেমন হয়েছে ? ভাল লাগছে তো ?' সে লোকটি তো মহাখুশি হয়ে বলতে লাগল, 'হুজুর, রাজভোগ…রাজভোগ'। রবীন্দ্রনাথ জানতেন গ্রামের লোকেরা সন্দেশ খেতে পায় না। তিনি লোকটিকে প্রচুর সন্দেশ খাইয়ে দিলেন ; সেও খেল খাওয়ার মত খাওয়া।

একবার শিলাইদহে পুণ্যাহের সময়ে প্রজারা যখন সার বেঁধে খাচ্ছে, এমনি সময় এক বরকন্দাজ সঙ্গে নিয়ে হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ এসে পড়লেন, তখন রাত প্রায় নটা। প্রজাদের খাওয়া দেখতে ঐ সময়ে তাঁকে আসতে দেখে সবাই তো আকাশ থেকে পড়ল।

লালন ফকিরের সঙ্গে মোলাকাৎ

বিদ্যাপতি শুনি চণ্ডীদাস-গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ!—সেকালের এই দুজন কবির মধ্যে আলাপ-পরিচয় হয়েছিল কিনা তা নিয়ে ঐতিহাসিকেরা আজও গবেষণা করছেন, কিন্তু একালে বাংলার দুজন মরমি কবি যে পল্লীর নিভৃত কুঞ্জে একত্র মিলিত হয়েছিলেন, কাব্যলক্ষ্মীর তপোবনে বসে পরস্পর রসালাপে মগ্ন হয়েছিলেন, সে কাহিনী গবেষণার বিষয় নয়।

তখন রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে বাস করছেন। কবি-গৃহিণী মৃণালিনী দেবী তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে দীর্ঘকাল প্রায় স্থায়িভাবেই শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে আছেন। রবীন্দ্রনাথ তখন যুবক, পুরাদস্তুর জমিদার। জমিদারির মধ্যে নানা গ্রামে নানা কাজে পালকিতে বা বজরায় করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, প্রজাদের সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে মিশছেন, আমলাদের কাজকর্ম কাগজপত্র দেখছেন, তদারক করছেন, এমনি সময়ে এক শুভদিনে তখনকার

বিখ্যাত সন্ত পল্লীকবি লালন সাঁই ফকিরের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তাঁদের এই প্রথম-মিলনের কাহিনী উপন্যাসের গল্পের মত।



লালন ফকির

সেদিন রবীন্দ্রনাথ ভোরে শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে একতলার আপিসঘরে নিজ টেবিলের সামনে বসে লেখাপড়া করছেন। ঘরের মধ্যে একধারে দু-তিন খানা বেঞ্চ প্রজাদের বসবার জন্য পাশাপাশি সাজানো রয়েছে। এমন সময়ে একদল প্রজা এসে তাঁকে সেলাম দিয়ে সসম্ভ্রমে তাঁর সামনে নজরানা ধরে দাঁড়াল। রবীন্দ্রনাথ তাদের বসতে বললেন। তারা সেই বেঞ্চগুলোর উপর বসল।

এই প্রজারা গোরাই নদীর পরপারে কুষ্টিয়ার নিকটস্থ ছেঁউড়িয়া গ্রামের

অধিবাসী। তারা প্রায় ষোল-সতের জন এসেছে বাবুমশায়ের কাছে জমিজমার দরবার করতে। বাবুমশাই শিলাইদহ সদর কাছারির ম্যানেজার (নায়েব) বাবুকে ডেকে পাঠিয়ে তাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। পরে ম্যানেজারবাবু এলেন তাঁর কাগজপত্র নিয়ে। খুব দরবার হল। দরবার শেষ হতে বেলা প্রায় এগারটা বাজল।

প্রজারা সার বেঁধে ত্রুলাইনে বেঞ্চে বসেছিল। তাদের সবার পেছনে বসেছিল একজন বৃদ্ধ। তার কোনই দরবার ছিল না—এমন কি, তার কোনরকম বক্তব্য বা জিজ্ঞাস্যও ছিল না। সে শুধু নীরবে সেই তিন-চার ঘণ্টা ধরে দুটি চোখ ভরে রবীন্দ্রনাথকে দেখছিল—তাঁর মুখের কথা শুনছিল চুপটি করে। বৃদ্ধের গায়ের রং বেশ ফরসা, গায়ে-মুখে বসন্তের দাগ, মাথায় লম্বা চুল—ঝুঁটি করে বাঁধা। মুখে পাকা লম্বা দাড়ি, নারদ ঋষির মত। চেহারাখানা বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত। রবীন্দ্রনাথ কয়েকবার তার সেই সৌম্য বিহ্বল মুখখানার দিকে চাইলেন, কিছু বলবার বা শুনবার জন্যও যেন উৎসুক হলেন ; কিন্তু প্রজাদের দরবারের গোলমালে সেই অজানা অচেনা মানুষটির কোন পরিচয়ই নেবার সুযোগ পেলেন না। তিন-চার ঘণ্টা দরবার করে তারা যেমন দল বেঁধে এসেছিল, তেমনি দল বেঁধেই চলে গেল।

রবীন্দ্রনাথ স্নানাহারের জন্য দোতলায় চলে গেলেন। এদিকে নিচের তলায় তাঁর ছেলেমেয়েরা মহা কলরবে খেলা করছে। স্নানাহার সেরে এসে তিনি শুনতে পেলেন একতলায় ছেলেমেয়েদের হাস্য-কলরব ক্রমে বেড়েই চলেছে। ব্যাপার কি—আজ ছেলেমেয়েদের এত হাস্য-কলরবের কারণ কি ?

ঠিক এমনি সময়ে তাঁর বড় মেয়ে একটা অদ্ভুত জিনিস হাতে নিয়ে সকৌতুকে হাসতে হাসতে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। রবীন্দ্রনাথ দেখলেন, মেয়ের হাতে একটি লাঠি, কিন্তু কী অদ্ভুত সেই লাঠি! আজকালকার ছড়ি নয়, সেকালের গ্রাম্য লাঠি। তেলে-জলে পেকে লাঠিটা ঘোর কালো কুচকুচে। লাঠিটার হাতল সাপের মুখের মত বাঁকা, নানারকম কারুকাজ করে সেটাকে হুবহু সাপের আকৃতি দেওয়া হয়েছে। ছেলেমেয়েরা সবাই তাঁর চারদিকে দাঁড়িয়ে তাদের কৌতুহল মেটাবার জন্য তাঁকে নানান রকমের প্রশ্ন করতে লাগল।

কী অদ্ভুত লাঠি! ছেলেমেয়েরা এমন জিনিস কখনও দেখে নি। তারা প্রশ্নের পর প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথকে ব্যস্ত করে তুলেছে। মানুষের হাতের লাঠি

এমন অদ্ভুত কেন? কী রহস্যের আবরণে কোথা থেকে এই অদ্ভুত সুন্দর কারুকার্য-খচিত লাঠিটি শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে এসে হাজির হল!

রবীন্দ্রনাথ চাকরদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কার লাঠি?' কিন্তু চাকর-দারোয়ানেরা কেউ ঐ অপরূপ লাঠির হদিশ দিতে পারল না। রবীন্দ্রনাথ নিজেও দস্তুরমত কৌতূহলী হয়ে পড়েছেন, তাঁর হাতে আজ হঠাৎ এ কার অভিজ্ঞান এসে পড়ল, এ কোন্ অচেনা-অজানার স্মরণ-চিহ্ন!

হয়ধর মিঞা নামে ছেঁউড়িয়ার একজন বরকন্দাজ বলল, 'হুজুর, এ লাঠি আমাদেরই গ্রামের লালনসাঁই ফকিরের।'

রবীন্দ্রনাথ সেই বিখ্যাত ফকিরের নাম শুনেছিলেন, কিন্তু কোনদিন চোখে দেখেন নি। হয়ধর বরকন্দাজ বলল, 'আমি জানি হুজুর, ঐ লাঠি লালন ফকিরের। আজ সকালে ছেঁউড়ের প্রজারা দরবার করতে এসেছিল। তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই লালন ফকির ছিল।'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'লালন ফকির এসেছিল? বলিস্ কি? কিন্তু সে আমার সঙ্গে একটা কথা বললে না—আমায় কেউ তাকে চিনিয়েও দিলে না?'

সকালবেলাকার সেই সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধের চেহারাখানা রবীন্দ্রনাথের মনে পড়ে গেল। তিনি ফকিরের ঐ সুন্দর অপরূপ লাঠিখানা নেড়ে-নেড়ে দেখলেন, সাঁইজির এই অভিজ্ঞান যত্ন করে নিজের কাছে রাখলেন। হুকুম দিলেন, 'একজন আমলা গিয়ে কাল সকালেই যেন ছেঁউড়ে থেকে লালনসাঁইকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে।'

হুকুম তামিল হল। তার পরের দিন বিকালে ঐ সাপমুখো লাঠির মালিক বৃদ্ধ লালনসাঁই ফকির এলেন রবিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ মরমি কবি, মুখে লম্বা পাকা দাড়ি, হাতে সুন্দর একটি একতারা, যেন দেবর্ষি নারদ এলেন বীণা-যন্ত্রটি হাতে করে রাজার সভায় নিমন্ত্রিত হয়ে। লালনের সঙ্গে এলেন তাঁর একজন প্রিয় শিষ্য।

পল্লীকবি লালন সাঁইজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপ-পরিচয় জমে উঠল। জমিদার রবীন্দ্রনাথ নিমেষে কবি রবীন্দ্রনাথে পরিবর্তিত হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর সাঁইজি একতারা বাজিয়ে গাইলেন—

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে—
আমার বাড়ির কাছে আরসি নগর,
তাতে এক পড়শি বসত করে।

* * *

সে আর আর লালন একখানেই রয়
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক্ রে!
আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।

রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়ে গেলেন ঐ অখ্যাত অজ্ঞাত অশিক্ষিত পল্লীকবির মরমি গান শুনে। আরও গান চলল, সুরের পর সুর, ভাবের পর ভাব—অমৃতের ঢেউ বয়ে গেল সেদিন দুই কবির নিবিড় পরিচয়ের মধ্যে। সেদিন জমিদারির কাজকর্ম সব বন্ধ রইল। কবি রবীন্দ্রনাথ সেই অজ্ঞাত মরমি পল্লীকবির প্রাণরসের নির্ঝরে ডুবে্ গেলেন। তাঁর বিশ্বজনীন ধর্ম, প্রতি মনুষ্যে ব্রহ্মদর্শনের স্বরূপ, ভগবানের বিচিত্র লীলারসের আস্বাদন নিয়ে তাঁর স্বরচিত গানের মাধ্যমে আলাপ চলল। লালনের কোন্ জাত জিজ্ঞাসা করায় লালনসাঁই গেয়েছিলেন—

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন ভাবে জেতের কিরূপ, দেখলাম না এ নজরে।
যদি সুন্নৎ দিলে হয় মুসলমান,
নারীর তবে কি হয় বিধান,
বামুন চিনি পৈতে প্রমাণ, বাম্‌নি চিনি কিসে রে?
জগৎ বেড়ে জাতের কথা
লোকে গৌরব করেন যথা তথা,
লালন সে জেতের ফাতায়
বিকিয়েছে সাধ বাজারে।

লালনসাঁই জাতিভেদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির বাইরে। তাঁর পরিচয় তিনি 'অমৃতস্য পুত্র'। তিনি সর্বভূতে বিরাজিত সেই ভগবানকে খুঁজছেন। তিনি হিন্দু নন, মুসলমান নন, তিনি মানুষ। পরম সমাদরে পল্লীকবির সেই অপরূপ স্মরণ-চিহ্ন সেই সাপমুখো লাঠিগাছ তাঁর হাতে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সাঁইজিকে আলিঙ্গন করলেন। সবাই বুঝল সেই অপরূপ সাপমুখো লাঠিগাছই কবি-মিলনের দূত।

এর পরে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে এলেই সাঁইজিকে ডাকিয়ে আনতেন। স্বর্গত কালীমোহন ঘোষকে একবার তিনি সাঁইজিকে আহ্বান করে শিলাইদহে আনবার জন্যে পাঠিয়েছিলেন। কত জ্যোৎস্নালোকিত শারদ-রাত্রে পদ্মাবক্ষে তাঁর বজরার ছাদে বসে তিনি নিভৃতে সাঁইজির মরমি তত্ত্বসঙ্গীত বিভোর হয়ে

শুনতেন—'আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে!' তিনি বাউল, ফকির, কীর্তনীয়া, কবিয়ালদের গান শুনতে খুবই ভালবাসতেন। পল্লীর স্নিগ্ধ তপোবনে বসে যে-সকল অখ্যাত অবজ্ঞাত স্বভাবকবি ও মরমি তত্ত্বদর্শী তাঁদের প্রাণের গভীর অনুভূতি সর্বসাধারণের কাছে বিলিয়েছেন, তাঁদের তিনি পরম আদরে কাছে এনে সেই অতীন্দ্রিয়ের রসাস্বাদন করেছেন।

শিলাইদহের কাছারির পুণ্যাহে, মেলায় এবং অন্যান্য অনেক উৎসবে রবীন্দ্রনাথ লালন সাঁইকে দলবলে ডেকে এনে গান শুনতেন। আবার কখনও কখনও সাঁইজিকে নিয়ে বিরলে বসে গান শুনতেন, রসালাপ করতেন। সাঁইজি দলবল ছেড়ে যখন একা রবিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, তখন তিনি ঘোড়ায় চড়ে আসতেন। রবীন্দ্রনাথ একবার নিজে ছেঁউড়িয়া গ্রামে গিয়ে সাঁইজির আশ্রম দেখে আসেন।

সাঁইজি বহুদিন বেঁচে ছিলেন। এ অঞ্চলের সকলে বলে, তিনি ১১৬ বৎসরে দেহরক্ষা করেছেন। তিনি হিন্দুর ছেলে, কিন্তু মুসলমানের হাতে মানুষ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমাধির উপরে একটি ছোট পাকা স্মৃতিমন্দির তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন, সম্ভবত ১৩১১ সালে।

সাঁইজি ছিলেন নিঃসন্তান। কিন্তু তাঁর বহু শিষ্য ছিলেন এবং এখনও আছেন। সাঁইজি ও তাঁর শিষ্যগণ জাতিভেদ মানতেন না, হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাঁর শিষ্য হতে পারত। এজন্য হিন্দু বা মুসলমান সমাজে তাঁরা একঘরে ছিলেন। তাঁর আর তাঁর এতগুলো শিষ্যের ভিক্ষাই একমাত্র উপজীবিকা ছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ সাঁইজিকে কিছু জমি বিনা নজরে দেন এবং আশ্রমের জমির খাজনা মাফ করে দেন। জমিদারিতে এলেই তিনি সাঁইজিকে ডাকিয়ে আনতেন। তাঁর অনেকগুলো গান সংগ্রহ করে তিনি মাসিকপত্রে প্রকাশ করেছিলেন। প্রথম জীবনে সাঁইজির সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ-পরিচয়ের ফলেই রবীন্দ্রনাথ বাউলসঙ্গীত ও সহজ-সাধনের উপর আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাই তাঁর রচিত বাউলসঙ্গীতের সুধাস্রোত বাংলার কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে কী গভীর আকুলতা এনেছে—

তোমায় নতুন করেই পাবো ব'লে হারাই ক্ষণে-ক্ষণ
ও মোর ভালোবাসার ধন।
দেখা দেবে ব'লে তুমি হও যে অদর্শন,
ও মোর ভালোবাসার ধন॥

আজও লালন সাঁই ফকিরের সেই পবিত্র স্মৃতিমন্দির গোরাই নদীর তীরে ছেঁউড়িয়া গ্রামে দাঁড়িয়ে রয়েছে নীরবে গভীর জঙ্গলের মধ্যে। যেখানে এককালে কতদিন কতরাত্রি গোপীযন্ত্র, বেহালা ও একতারার সঙ্গে নানা রসের নানা গানের ঝঙ্কার উঠত, সেখানে সেই সঙ্গীতসুধার ঝরণা থেমে গেছে। একটি জীর্ণমন্দির মহাকালের দিকে চেয়ে নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে, কানন-সভার পাখিরা ঘুমন্ত পল্লীকবিকে তাদের গান শুনাচ্ছে, ঝিঁঝি-পোকাদের একটানা এস্রাজের ধ্বনি সেই গানের সঙ্গে সঙ্গত করছে, আর গোরাই নদী সেই বিলুপ্তপ্রায় সমাধি-মন্দিরের পাশে কলগান গেয়ে চলেছে।*

* এই কাহিনীটির নায়ক রবীন্দ্রনাথ না হতেও পারেন। তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গেই হয়ত সাঁইজির এভাবে আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। —প্রকাশক।

ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালবাসা

গোলাপফুলের লোভ

আশ্বিন মাসে মায়ের পুজোয় আমাদের জোট বেঁধে ফুল তোলা একটা বড় রকমের আমোদ ছিল। আমোদটা বেশি করে উপভোগ করার জন্যই সেবারে আমার ঝোঁক চাপল। আমি সঙ্গীদের কাছে প্রস্তাব করলাম যে, এবারে বাবুমশায়ের কুঠিবাড়ির বাগান থেকে গোলাপফুল আনতে হবে—তা যেমন করেই হক।

ব্যাপারটা কিন্তু বড় সহজ নয়। অমন প্রকাণ্ড সুন্দর শখের বাগান; তাতে মালীদের কড়াক্কড় পাহারা। গোলাপফুল চুরি করেই আনি বা চেয়েই আনি—সে ব্যাপারটা গুরুতর রকমেরই হবে, তাতে আর সন্দেহ নেই কিছুমাত্র।

কিন্তু তবু আমাদের সবারই মত হয়ে গেল। কারণ, অমন সুন্দর বড় বড় গোলাপফুল—গাছ থেকে পট-পট করে তুলে সাজি ভর্তি করা আমাদের কাছে রাজ্যপ্রাপ্তির মতই স্ফূর্তির বিষয় ছিল।

সেই কল্পনায় বিভোর হয়ে আমরা সবাই যুক্তি করলাম যে, অতি প্রত্যূষে সূর্য উঠবার আগেই, মালীরা বাগানে আসতে না আসতে ফুল তুলে সাজি ভরতে হবে। বাগানের লোহার দরজা ও প্রাচীর সম্বন্ধে কি উপায় হবে? ঠিক হল, আমরা অন্দরের দরজা অর্থাৎ পুবদিকের গেট দিয়ে বাগানে ঢুকব। পুবের গেটটা ছোট; বিশেষ, পুজোর ছুটিতে মালীদের মধ্যে বাগান রক্ষার তৎপরতা নিশ্চয়ই কম। আমাদের অসমসাহসিক মতলব আঁটা হয়ে গেল।

তখনকার কুঠিবাড়ির কথাটা একটু বলা দরকার। শিলাইদহের একালের রবীন্দ্র-ভবনের সেকালের নাম কুঠিবাড়ি। তখনকার কুঠিবাড়ির চেহারাটা এখনকার মত ছিল না। তখনকার শিলাইদহ কুঠিবাড়ি একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষবাটিকারই নামান্তর ছিল। কম্পাউণ্ডের প্রকাণ্ড মাঠটি ভর্তি ছিল হরেক রকমের মূল্যবান অসংখ্য গোলাপগাছে; আরো অনেক রকম ফুলের গাছও ছিল অবশ্য। কিন্তু ঐ গোলাপফুলই ছিল বাগানের রানী। আমরা বাল্যকালে

সেই সব গোলাপের স্বপ্ন দেখতাম, আর অনেক তদ্বির করে যদি তার দুটো-একটা সংগ্রহ করতে পারতাম তবে যেন রাজার ধন হাতে পেয়েছি মনে হত। ঠাকুরবাবুরা সর্বপ্রথমে নীলকরদের কুঠি কিনে তাতেই বাস করতেন। পদ্মায় সে কুঠি ভেঙে গেলে তাঁদের নতুন বাড়ির নামও কুঠিবাড়িই রয়ে গেল।

সপ্তমী পুজোর দিন ব্রাহ্মমুহূর্তে আমরা বড় বড় ঝুড়ি হাতে কুঠিবাড়ির দিকে রওনা হলাম। তখনও বেশ অন্ধকার। কুঠিবাড়ি পৌছতেই ফরসা হয়ে গেল। আমরা অতি সন্তর্পণে কুঠিবাড়ির পুবদিকে দীঘির ধারে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম কাছে-কিনারে কেউ নেই, কুঠিবাড়ি নিস্তব্ধ। আমরা দীঘির ধার দিয়ে অর্জুন, মহুয়া, সেগুন, শিশু, মহানিম ইত্যাদি গাছের তলা দিয়ে যে রাস্তাটা কুঠিবাড়ির পুবধারে অন্দরের গেটের কাছে পৌছেছে, সেই রাস্তার ধারে চোরের মত চুপি চুপি ভয়ে ভয়ে একটা চালতা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে বুঝলাম, আমরা এখনও কোন বিপদের মধ্যে পড়ি নি।

আমাদের সাহস বেড়ে গেল, আরও এগিয়ে সফেদাগাছ আর কাশীর পেয়ারাগাছের নিচে গিয়ে দেখি আমাদের সৌভাগ্যক্রমে পুবদিকের গেট খোলা! এখন আর আমাদের পায় কে? কারও কোন সাড়াশব্দ নেই। কিন্তু গেটটা খোলা দেখে একটু সন্দেহও হল যে, মালীরা নিশ্চয়ই জেগেছে, কিন্তু এমন অভাবনীয় কাণ্ড যে হবে তা কে জানে? আমরা প্রায় খোলা গেটের কাছে পৌছেছি, অমনই বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! আমাদের সামনেই বাগানের মালী নয়, কোন আমলা নয়, পেয়াদা নয়, কুঠিবাড়ির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নয়— স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ!

পালাবার পথ নেই; বিশেষ, বাবুমশাই নিজে দেখে ফেলেছেন, পালাবার উপায়ও নেই। বাবুমশায়ের পেছনেই এলেন কুঠিবাড়ির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং একজন মালী আর একজন বরকন্দাজ।

রবীন্দ্রনাথ তখন যে শিলাইদহে, তা আমরা আদৌ জানতাম না, বিশেষত তিনি যে এত ভোরে ঘুম থেকে উঠে বেড়াতে বেরোবেন, তা আমরা কেউ কল্পনাও করি নি।

মালী আমাদের দেখে রেগে আগুন। বাবুমশাই আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছেন, আমরা ভয়ে ভাবনায় কেঁদেই ফেলব, এমন সময় বাবুমশাই হো-হো করে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'কিহে, পুজোর ফুল তুলতে এতদূর এসেছ? গ্রামের মধ্যে কি ফুল নেই?'

আমরা অপরাধীর মত নির্বাক হয়ে তাঁর পায়ের দিকে নতনেত্রে চেয়ে রইলাম। তিনি আমাদের ভীত মুখগুলো খানিক দেখে নিয়ে আবার হেসে বললেন, 'বাগানের মধ্যে গিয়ে ফুল তুলবে?'

অমনি স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অনঙ্গবাবু বললেন, 'তোমরা বাগানে ঢুকো না, খবরদার। এক কাজ কর, প্রাচীরের বাইরে ঐ দেখ কত স্থলপদ্ম, রঙ্গন, জবাফুল ফুটে রয়েছে, গেটটায় অনেক অপরাজিতা ফুটে আছে। ঐগুলো তোমরা তুলে নাও গে, অনেক ফুল হবে তোমাদের।'

আমরা তাঁর উপদেশ শুনলাম বটে, কিন্তু সেখান থেকে এক পা-ও নড়লাম না, কারণ আমরা তো জানিই প্রাচীরের বাইরে যে অপর্যাপ্ত ফুল ফুটে রয়েছে তাতে দুই-তিন ঝুড়ি বোঝাই হয়ে যায়; বিশেষ, প্রাচীরের বাইরের ফুল সংগ্রহে সেই শরতের ব্রাহ্মমুহূর্তে ভয় ভাবনায় ঘেমে উঠব কেন? আমরা একটি কথাও না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে একবার বাবুমশায়ের দিকে একবার বাগানের মধ্যস্থ গোলাপগুলোর দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম, সেখান থেকে নড়বার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করলাম না। তাঁদের পথরোধ করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম।

শিশুপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ আবার উচ্চহাস্য করে উঠলেন; হেসে বললেন, 'ওহে, ওদের গোলাপফুলের লোভ, সে লোভ কি স্থলপদ্মে মেটাতে পারে? তোমরা গোলাপফুল চাও তো? বেশ তো— তোমরা বাগান থেকে তুলে নাও গে, কিন্তু দেখো, যেন গাছটাছ ভেঙো না'। এই বলে পরমস্নেহে আমাদের কারো মাথায় হাত দিয়ে, কারো পিঠ চাপড়ে, অপরূপ হাসিতে মুখখানি ভরিয়ে বললেন, 'যাও, তোমরা ফুল নাও গে'।

রবীন্দ্রনাথ দীঘির ধার দিয়ে চলে গেলেন। মালীর হেফাজতে আমরা সেদিন তো বটেই, পর পর আরও দুই দিন প্রচুর গোলাপফুল তুলে মনের সাধ মিটিয়েছিলাম, নির্ভয়ে নির্বিবাদে।

স্বপ্ন দিয়ে তৈরি মহাকবির বড় সাধের পবিত্র তপোবন সেই কুঠিবাড়ি, কুঠিবাড়ির গোলাপবাগান আর নেই, সেই সুখস্মৃতিময় বাল্যকালও আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

লালা পাগলা

শিলাইদহ থেকে কালোয়া পর্যন্ত যে রাস্তা আছে, সেইবারই সেটা নতুন তৈরি হল। রবিবাবু একদিন বিকালে সেই নূতন রাস্তা দেখতে দেখতে কোমরকাঁদির কালীবাড়ির আর একটা নূতন রাস্তার সংযোগ পর্যন্ত এসেছেন। সঙ্গে কয়েক-জন বিশিষ্ট কর্মচারী আছেন। এমন সময় এক পাগলা এসে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, 'হুজুর, সেলাম'।



লালা পাগলা

বাবুমশাই কথায় কথায় তার দিকে তেমন লক্ষ না করায় সে আর একবার সেইভাবে সেলাম করে বলল, 'হুজুর, পাগল বলে আমার সেলামটা নিলেন না। আমি হুজুরের পেরজা নই ?'

বাবুমশাই চমকিত হলেন, বললেন, 'বেশ বেশ, তোমার সঙ্গে তো আলাপ হয় নি ; চল, তোমার সঙ্গে গল্প করতে করতে যাই।'

লালা পাগলা বাবুমশায়ের সঙ্গে চলতে চলতে খুব গল্প জুড়ে দিল ; ছড়া কেটে বলতে লাগল, 'হুজুর, আমি নাকি পাগল, যারা আমায় পাগল বলে তারা সব ছাগল'। হিঃ-হিঃ করে হেসে আহ্লাদে আটখানা হয়ে লালা আবার ছড়া কাটল—

হুজুর, আমি হচ্ছি পাগল,
আমায় দেখে গাঁয়ের লোকের মাথায় ধরে গোল।

লালা এই রকম ছড়া বলে, আর হো-হো করে হাসে। সঙ্গে সঙ্গে কোমরে জড়ান গামছাখানা বার বার মাথায় বাঁধে আর হাত দুটো কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করে মহাস্ফূর্তিতে গল্প শুরু করে—'হুজুর, আমি অনেক মজাদার ছড়া জানি, নিরিবিলি পেলে হুজুরকে শোনাব। আমায় যদি ওরা ছড়া কাটতে আর নাচতে নিষেধ না করে, তবে আমি দশ ঝুড়ি মাটি কেটে ঐ রাস্তায় ফেলতে পারি।'

বাবুমশাই হেসে বললেন, 'তোমার ছড়া আমি শুনব। আচ্ছা, কাল তুমি আমার সঙ্গে দেখা করো।'

পরদিন প্রাতঃকালেই লালা পাগলা কোথা থেকে প্রকাণ্ড লম্বা একটা বোম্বাই আখ (গাণ্ডরি) ঘাড়ে করে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে বাবু-মশায়ের বোটের কাছে এসে হাজির। রবীন্দ্রনাথ তখন বোটের ছাদে বসে ছিলেন। লেঠেলরা যেমন করে মাথার উপর লাঠি ঘুরোয়, আখখানা তেমনি করে ঘুরিয়ে বাবুমশায়কে লম্বা সেলাম ঠুকে লালা আরম্ভ করল, 'হুজুর বাহা-দুরের সেবার জন্যে কী সুন্দর বোম্বাই কুসুর এনেছি—ভারি মিষ্টি ; হুজুর, সেবা করবেন।' বলেই আখখানা বোটে রেখে তীরে কতকগুলো বালি গাদা করে তার উপর বসে বলল, 'হুজুর, আমার উপর কি হুকুম হয় ?'

যেন কতদিনের পুরানো বন্ধু! বাবুমশাই বোট থেকে নেমে তীরে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে লালার সব পরিচয় জেনে নিলেন। তার পর লালা খুব হেসে নিয়ে নদীতে নেমে হাত-মুখ, দাড়ি-গোঁফ বেশ করে ধুয়ে গামছা দিয়ে মুছে সামনে এসে রবিবাবুকে প্রণাম করে বলল, 'আজ আর আমায় পাগল বলে কে ? আমি লালচাঁদ মালুথে'*।

* চাষিদের বৈষয়িক অবস্থা ভাল হলে তাদের উপাধি হয় মালিথা বা 'মালথে'। ভোজের ব্যবস্থাপককেও মালথে বলে।

রবীন্দ্রনাথ হেসে বল্লেন, 'তোমার পদ্য শোনাও—'

লালা হাতজোড় করে গামছা গলায় জড়িয়ে ছড়া জুড়লো—

সত্যি কথা হুজুর,
আমি আপনার মুজুর।
পাকা-দাড়ি ধরে
মিথ্যে কথা কব কেমন করে ?
দয়াল বিনে সবাই যেতাম মরে।

বাবুমশাই হাসতে হাসতে লালার অনেক ছড়া শুনলেন, গল্প করলেন।

শেষে লালা বলল, 'হুজুর, আমার একটা নালিশ আছে ; এই দুরন্ত শীত—দেখছেন তো বড় কষ্ট। একখানা কাপড় পেলে গায়ে দিয়ে বাঁচি।' এই বলে হি-হি করে হেসে পরিধেয় ময়লা কাপড়খানা দেখাল।

বাবুমশাই তাকে একখানা র‍্যাগ বোট থেকেই দেবার হুকুম দিলেন।

সেখানা পেয়ে লালা আনন্দে আটখানা হয়ে খুব একচোট হেসে নিল। তারপর সেটা একবার গায়ে, মাথায় জড়াল, একবার বগলে করল, তারপর সেটাকে ভাঁজ করে বালির ঢিপির উপর রেখে বারবার বাবুমশায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে লাগল।

বাবুমশাই গল্পে গল্পে লালার সমস্ত অবস্থাটা বেশ করে জেনে নিয়েছেন যে, বাড়ির লোকে ওকে মারে, খেতে দেয় না। তাই তিনি বোটের লোকদের হুকুম দিলেন্ যে, লালা যেদিন বোটের কাছে আসবে সেদিন বোটেই খেতে পাবে।

তারপরে লালা প্রায়ই বাবুমশায়ের বোটে এসে ছড়া কাটত আর পাগলামি করত। বাবুমশাইও খুব গল্প করতেন আর উপভোগ করতেন। তাঁর কাছে লালা দিব্যি করল যে, সে মরে গেলেও আর গাঁজা খাবে না, কিন্তু তামাক খাবে। গাঁজা খাওয়া ছেড়ে দেওয়ায় লালা বছরখানেকের মধ্যে ভাল হয়ে গিয়েছিল।

কি শীত, কি গ্রীষ্ম—সব সময় লালা বাবুমশায়ের দেওয়া সেই র‍্যাগখানা গায়ে জড়িয়ে মহানন্দে গাঁয়ে গাঁয়ে চীৎকার করে বক্তৃতা করে বেড়াত, আর সদর্পে সবাইকে ডেকে বলত, 'হুঁ হুঁ বাবা! আমি রোজ রোজ বাবুমশায়ের বাড়ি নেমন্তন্ন খাই। লালা মিঞা সোজা লোক নয়। আমি আগের জন্মে রুমের বাদশা ছিলাম,—মরে মানুষ হয়েছি ; এবার মরে বাবুমশায়ের ছেলে হয়ে জন্মাব। ফের আমায় পাগল বলে ঘেন্না করলে ঠাস্ করে এক চড়,—হ্যাঁ!'

লালা এইভাবে অনেকদিন উদ্দাম লীলা করে বেড়াল। কিন্তু বাবুমশায়ের কাছে যখন সে থাকত, তখন খুব কম পাগলামি করত। বাবুমশাই তার আখ খেয়েছেন শুনে সে এমনই খুশি হয়েছিল যে, একদিন অনেক দূর থেকে সে প্রকাণ্ড দুটো বাতাবি লেবু কাঁধে নিয়ে নাচতে নাচতে বোটে এসে হাজির। তার বাতাবি লেবু না খেলে বাবুমশায়ের রক্ষা ছিল না। প্রায়ই জিজ্ঞাসা করত, 'হুজুর, লেবু খেয়েছিস্ তো? সত্যি খেয়েছিস্? কেমন? মিষ্টি না?'

সে শেষে 'আপনি' ছেড়ে 'তুই' বলা সুরু করেছিল। বাবুমশাই তাকে বড় ভালবাসতেন।

লালা পরে ভাল হয়ে গিয়েছিল। তার ছড়া সেকালে গ্রামের রাখালেরা গাইত; এখন অনেকেই ভুলে গেছে। একটা মাত্র ছড়া এখনও কারো কারো মুখে শোনা যায়—

আমার দয়াল জমিদার
(হায়) নাই তুলনা তাঁর।
তাঁর মুখখানি হয় চাঁদের নাগাল
হাত দুটি সোনার।

ভগিনী নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছেন তা বাঙালি পাঠক-পাঠিকা, বিশেষত রবীন্দ্র-সাহিত্যানুরাগীরা পড়েছেন।* কি সূত্রে কি ভাবে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল, সে বিষয়ও রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন। প্রাতঃস্মরণীয়া ভগিনীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয়ের একটি কাহিনী আমার সৌভাগ্যক্রমে সংগ্রহ করতে পেরেছি। এই কাহিনীটি নানা দিক থেকে মূল্যবান, আমাদের মত মেরুদণ্ডহীন পরমুখাপেক্ষী জাতির পক্ষে।

ভারতবর্ষকে জানতে চেয়েছিলেন অনেক বিদেশী স্বাধীন জাতির নরনারী।

* রবীন্দ্ররচনাবলীর অষ্টাদশ খণ্ড 'ভগিনী নিবেদিতা।' দ্রঃ ঐ ষড়বিংশ-খণ্ড 'পথের সঞ্চয়', যাত্রার পূর্বপত্র পৃ. ৪৭৫

আধুনিক যুগে তাঁদের মধ্যে সুইডিস্ যুবক হ্যামারগ্রেন্, ইংরেজ এণ্ড্রুজ, পিয়ার্সন, ভগিনী নিবেদিতা, অ্যানি বেশান্ত, মীরা বেন এবং আরও কয়েকজন উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সমস্ত ভেদবুদ্ধির অতীত হয়ে বুঝেছিলেন, 'জগতের মাঝে এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষ জাতি।' তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ভারতীয় হিন্দুর ধর্ম পর্যন্ত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা হলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-শিষ্যা প্রাতঃস্মরণীয়া ভগিনী নিবেদিতা। বাঙালি পাঠক জানেন, শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 'ভারতমাতা' চিত্রের পরিকল্পনায় এই তপস্বিনী সন্ন্যাসিনীর দান কতখানি এবং প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ও শিল্পকলার সঙ্গে এই মহীয়সী মহিলার কি গভীর পরিচয় ছিল!

রবীন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সমসাময়িক হলেও তাঁদের সংশ্রবে বা প্রভাবে বিশেষ প্রভাবান্বিত হন নি নিজের বিশিষ্ট মতবাদের জন্য; কিন্তু তিনি সন্ন্যাসিনী নিবেদিতার অন্তরের প্রজ্ঞা ও ঐশ্বর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গে বিশেষভাবে মিশেছিলেন এবং তাঁকে নিজের জমিদারিতেও নিয়ে গিয়েছিলেন।

১৩০৯ কি ১৩১০ সালে যখন রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসাধনার সঙ্গে পল্লীজীবনের উন্নতির নানা চিন্তায় ও কাজে লিপ্ত ছিলেন, তখন তাঁর আমন্ত্রণে ভগিনী নিবেদিতা এবং আরও একজন আমেরিকান (?) মহিলা (তাঁর নাম জানতে পারি নাই) শিলাইদহে গিয়েছিলেন এবং প্রায় ১৫।২০ দিন শিলাইদহে ছিলেন। প্রত্যক্ষভাবে এই বিষয়টি যিনি জানেন এবং যিনি নিজে ভগিনী নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রাম পরিদর্শনে বেরিয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে নানা আলোচনা করেছিলেন, তাঁর মুখ থেকেই এই সত্য কাহিনীটি সংগ্রহ করেছি।*

তখন শীতকাল। সেদিন ভোরে যখন সবে মাত্র জবাকুসুমসঙ্কাশ সূর্যদেব শীতের কুয়াশা ভেদ করে গ্রামের শান্ত শ্যামল শোভাকে জাগিয়ে তুলছেন, সেই সময়েই গ্রামের মাঠেও যেন একটি জ্যোতির্ময় আবির্ভাব দেখা গিয়েছিল। চাষিরা তাদের বলদ নিয়ে লাঙল কাঁধে মাঠে বের হতেই সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখতে পেল। মাঠের মধ্যে সুপরিচিত হলুদ রংয়ের জোব্বা পরে রবীন্দ্রনাথ বেড়াচ্ছেন, আর তাঁর পাশে গেরুয়া রঙের গাউন পরে তপ্তকাঞ্চনবর্ণা এক সন্ন্যাসিনী, মাথায় তাঁর সোনালী চুল চূড়ার মত খোঁপা করে বাঁধা, বগলে একগোছা ডাল সমেত ধবধবে সাদা গন্ধরাজের গুচ্ছ, সঙ্গে আরও একটি শ্বেতাঙ্গিনী বিদেশিনী ধবধবে সাদা গাউন পরে এক হাতে ছাতা নিয়ে তাঁর

* দক্ষিণারঞ্জন চৌধুরীর নিকট থেকে সংগৃহীত। ইনি কিছুদিন হল পরলোক গমন করেছেন।

পাশে ধীরে ধীরে বেড়াচ্ছেন। চাষিরা সেই ভোরে ঐ অপূর্ব দৃশ্য দেখে আর চোখ ফেরাতে পারল না, ভক্তিতে বিহ্বল হয়ে দূর থেকে প্রণাম করল।

যে চাষিটি লাঙল কাঁধে নিকটেই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাকে রবীন্দ্রনাথ কাছে ডাকলেন। সে বেচারি তখনও ভয়-সম্ভ্রমে অভিভূত; কাছে আসতে সাহস পাচ্ছে না দেখে সন্ন্যাসিনী একটু হাসলেন। রবীন্দ্রনাথও হেসে সঙ্গিনীদের নিয়ে চাষিটির কাছে এগিয়ে গেলেন। চাষিটি যেন হঠাৎ আকাশ থেকে পড়ল। সে কাঁধের লাঙল নামিয়ে সসম্ভ্রমে প্রণাম করল।

সন্ন্যাসিনী হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'টোমার নাম কি? বাড়ি কোন গ্রামে?' স্তম্ভিত চাষিটি আরও অবাক হয়ে গেল। একে মেমসাহেব, তাতে আবার গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসিনী— এই-ই যথেষ্ট অভাবনীয়, তার উপরে আবার বাংলায় কথা কইলেন। বেচারি দিশাহারা হয়ে গেছে। তাই রবীন্দ্রনাথ নিজেই বললেন, 'তোমার বাড়ি বোধ হয় শ্রীকোলে? তোমার নামটি কি বল? উনি জিজ্ঞেস করছেন।'

চাষির ভয় দূর হল এইবার। সে সহজ ভাবে কথার উত্তর দিল। ভগিনী সোজা বাংলায় তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। অন্য যে চাষিরা ঐ সময়ে মাঠে বেরুচ্ছিল তারাও ব্যাপার দেখে এগিয়ে এল তাঁদের কাছে। কথা চলল তাদের সঙ্গে বেশ খোলাখুলি ভাবে। মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথ কোন কোন বিষয় নিবেদিতাকে ভাল করে বুঝিয়ে বলছিলেন। আলোচনা চলল কি চাষ হবে, লাঙল চালানোর কি কায়দা, কি ফসল হবে শীতকালে, রবিশস্য কাকে বলে, মাটির বড় বড় ঢিল কি করে গুঁড়া করা হয়, মই দিয়ে চাষ করায় জমির কি উপকার হয়, ইত্যাদি। শিলাইদহের মাঠে বড় বড় আখের ক্ষেত দেখে ভগিনী নিবেদিতা খুব খুশি হলেন, আখের রস, আখের গুড় ইত্যাদি বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করলেন, এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় চাষিদের সব কথা তিনি বুঝবার চেষ্টা করলেন।

ইতিমধ্যে চাষিদের কয়েক জোড়া বলদ সেইখানে জড় হয়েছিল। ভগিনী হাসতে হাসতে দৌড়ে গিয়ে এক জোড়া সুঠাম বলদের গায়ে মুখে, গলকম্বলে হাত বুলিয়ে তাদের আদর করতে গেলেন। বলদ দুটো তো তাঁদের সাজগোজ দেখে ঘাবড়ে গেল, গোল গোল চোখ দুটো পাকিয়ে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। চাষিটি চুমকুড়ি দিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে তাদের শান্ত করল এবং তারাও ভগিনীর আদর পেয়ে একদৃষ্টে তাঁদের দিকে তাকিয়ে রইল। পাঁচ-

ছয় জন চাষি তখন সেখানে এসেছে। মেম বললেন, 'তোমাদের বাড়িতে বেড়াতে যাব, তোমাদের সঙ্গে আলাপ করব।' চাষিরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল।

খানিক বেলা হল। শীতের রোদ, তাই রোদটা বড় মিষ্টি। রবীন্দ্রনাথ ভগিনীদের নিয়ে একটা আল-পথ ধরলেন, দুধারে চষা ক্ষেত। একটু দূরেই কাঁদাবাড়ির খুব প্রকাণ্ড বট গাছটা দেখা গেল। ভগিনী বারে বারে ঐ বিরাট বনস্পতির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বলতে লাগলেন, 'হাউ ডিভাইন, হাউ ম্যাজেস্টিক!' ইংরেজি বাংলায় মিশিয়ে তাঁদের তিন জনের আলাপ হল অনেক। চাষিরা দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, তাঁরা অনেক দূর পর্যন্ত হেঁটে চললেন।

তার পরের দিন ভোরে রবীন্দ্রনাথের কাছারির জনৈক আমলা দক্ষিণা-রঞ্জন চৌধুরীর ডাক পড়ল রবীন্দ্রনাথের বোটে। দক্ষিণাবাবুকে রবীন্দ্রনাথ ডেকে বললেন, 'কাল থেকে এঁরা দুজনে গ্রাম দেখতে আরম্ভ করবেন; গ্রামে বেড়িয়ে বেড়িয়ে পল্লীর গৃহস্থ চাষি, তাঁতি, কামার, কুমোর, জেলেদের বাড়ি গিয়ে তারা কি ভাবে থাকে, কি করে তারা খায়-পরে, কি তাদের পেশা—এ সব বেশ করে দেখিয়ে দেবে। জান তো, ইনি হলেন ভগিনী নিবেদিতা—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শিষ্যা।'

দক্ষিণাবাবু তার পরদিন থেকেই ভগিনীদের নিয়ে নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে বেড়াতে আরম্ভ করলেন।

রওনা হয়েই ভগিনী নিবেদিতা আর অজ্ঞাতনামা বিদেশিনী শিলাইদহের বুনো আর বিন্দিদের পাড়ার পাশেই কতকগুলো শুয়োর আর ছাগল চরতে দেখে প্রশ্ন করলেন, 'এ পাড়ার লোকেরা কি সাঁওতাল?' বুনো আর বিন্দিদের পরিচয় পেয়ে তাঁরা পাড়ার দিকে এগিয়ে গেলেন। দেখতে না দেখতে বুনো আর বিন্দিদের ঘোর কালো রঙের ছেলেমেয়ে, বুড়ো-বুড়ি, যুবক-যুবতী তাঁদের দেখতে ঘিরে দাঁড়াল। ভগিনী হিন্দি বলতে চেষ্টা করে বুঝলেন তারা বেশ বাংলায় কথা কয়, তবে মাঝে মাঝে হবেক তো, বটেক, খাবেক না কেনে—এই সব বলে।

মেম বললেন, এদের কথা তো খুব মিষ্টি! তাঁরা খুব হাসলেন, যখন এক বুনো যুবতী জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি তুমি যাচ্ছেন কোথা?'

খানিক দূর গিয়েই ছোট্ট একটা গ্রামের সীমানায় পড়ল নবীন প্রামাণিকের

বাড়ি। সেই বাড়ি থেকেই মেয়েদের ঢেঁকি পাড়াবার তালে তালে দুম-দুম শব্দ শোনা যাচ্ছে। দুজনেই সেই শব্দটা মুগ্ধ হয়ে শুনে ওটা কিসের শব্দ প্রশ্ন করলেন। ঢেঁকিতে গৃহস্থবাড়িতে ধান ভানে, চিড়া কোটে ইত্যাদি নানা বিবরণ শুনেই ভগিনীর খুব ইচ্ছা, ঐ বাড়ির ভিতরে যাবেন এবং মেয়েদের গৃহস্থালির সব কাজ স্বচক্ষে দেখবেন।

নবীন সম্পন্ন গৃহস্থ। দক্ষিণাবাবু বাইরে বসে রইলেন, নিবেদিতা ও তাঁর সঙ্গিনী একেবারে নবীনের অন্দরমহলে ঢেঁকিঘরের কাছে গিয়ে উপস্থিত। মেয়েরা তো দেখে হকচকিয়ে উঠল, কেউ বা দেড় হাত-লম্বা ঘোমটা টেনে তাঁদের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। ভগিনী নিবেদিতা পরিষ্কার বাংলায় এমন মধুর স্বরে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন যে, তারা পিঁড়ি পেতে সযত্নে তাঁদের দুজনকে বসতে দিল আর তাঁদের অজস্র প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগল।

মেম দুজনার জলপিপাসা পেয়েছে। দক্ষিণাবাবু ইঙ্গিত করতেই নবীন দুটো ডাব পাড়িয়ে কেটে দিল। ডাবের জল খেয়ে ভগিনী নিজে ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে দেখলেন। ধান থেকে চাল, চিড়ে, মুড়ি কি করে তৈরি হয়, চিড়ে মুড়ি থেকে কি কি দিয়ে কি উপায়ে কি কি খাবার তৈরি করে, তারা এই সব প্রশ্নের উত্তরে তাদের অশিক্ষিত ভাষায় ও ভাবে অনেক কথা বলল। ভগিনী কিছু কিছু লিখে নিলেন। একটি বৌ সাহস করে দুটি চিড়ের মোয়া দেখাল; ভগিনী সে দুটি সাগ্রহে তাঁর ব্যাগে পুরে নিলেন। মেয়েরা নাড়ু ইত্যাদি অনেক কিছু তাঁদের দিতে চায়। ভগিনী অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে যত পারলেন সঙ্গে নিলেন। গ্রাম্য অশিক্ষিতা মেয়েরা তাঁদের দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। তারাও সাহস পেয়ে তাঁকে প্রশ্ন করতে ছাড়ল না। আশেপাশের তিন-চারখানা বাড়ির মেয়েরাও এসে ভগিনীর সহৃদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে প্রণাম করতে লাগল।

অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁরা দুজনে ফিরবেন, এমন সময় নবীনের ছেলে 'রান্নাঘরের দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে খেতে বসল। ভগিনী নবীনের ছেলের সঙ্গেও এক পত্তন আলাপ জমিয়ে নিয়ে উঁকি মেরে যত দূর দেখা যায়—ঐ গৃহস্থ-বাড়ির রান্নাঘর, শোবার ঘর, গোয়ালঘর, ঢেঁকিঘর, গরু-বাছুর সব দেখে নিয়ে হাসিমুখে বাইরে এলেন। সমস্ত পাড়াটা যেন ভক্তিতে বিহ্বল হয়ে গেল।

বোটে ফেরবার সময় ভগিনী বাংলার চাষিমেয়েদের সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ। একবার বলেন, এরা ঋষির মেয়ে, আবার বলেন, আমরাই এদের সুখী করতে

পারি নি। আরও অনেক কথা বললেন যা বুঝবার মত বুদ্ধি জমিদারি সেরেস্তার আমলার ছিল না।

তার পরের দিন দুই বিদেশিনী তাঁদের পথপ্রদর্শকের সঙ্গে এক মুসলমান পাড়ায় গেলেন। সে পাড়ার সবাই তাঁতে কাপড়, গামছা, চাদর ইত্যাদি বোনে। ঐ অঞ্চলে মুসলমান তাঁতিদের জোলা বলা হয়। ভগিনী নিবেদিতা একটি মেয়ের টানাকাড়ার রঙিন সুতো ঘুরিয়ে নেবার কৌশল ও ক্ষিপ্রতা দেখে অবাক হয়ে দাঁড়ালেন। জাত-ব্যবসার কাজে বাড়ির মেয়েরাও যে খুব সাহায্য করে তা স্বচক্ষে দেখে খুব খুশি হলেন। তাঁতের কারিগরের সঙ্গে তাঁর খুব গল্প হল, কাপড়ে বা চাদরে কোন নকশা বানাতে পারে কি না জানতে চাইলেন। তারা অন্য রকম তাঁত হলে নকশা কাটতে পারে, জানাল। ভগিনীর আলোচনায় বোঝা গেল যে, তাঁত তিনি আরও দেখেছেন।

সেই দিনই সন্ধ্যার একটু আগে গ্রাম থেকে ফেরবার পথে বাঁধা সড়কের ধারে একসঙ্গে দুটো একই বয়সের বট আর পাকুড় গাছের সুন্দর শান্তশ্রী দেখে ভগিনী নিবেদিতা মুগ্ধ হয়ে ঐ গাছের ছায়ায় বসলেন। প্রথমেই তো সাবলাইম—ডিভাইন বলে দুটিকে যেন নিজের হৃদয়ের ভক্তি নিবেদন করলেন। সেই দুটি গাছ অমন একসঙ্গে এক বয়সের কেন জিজ্ঞাসা করায় তাঁকে ঐ বট-পাকুড়ের ইতিহাস বলা হল—সেই গাছ দুটির নাম 'ষষ্ঠী ঘোষের বট গাছ'। সেকালের হিন্দুরা পরকালের পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য খুব ধুমধাম করে ঢোল-ডগর বাজিয়ে, পুরোহিত ডাকিয়ে বট এবং পাকুড় গাছের দুটি শিশু চারার বিয়ে দিতেন কোন বড় সড়কের ধারে, যাতে বড় হয়ে ঐ বৃক্ষদম্পতি শ্রান্ত পথিকদের ছায়া দান করতে পারে, পাখিদের আশ্রয় দিতে পারে, বাতাসকে শীতল করতে পারে। যাঁরা খাঁটি পল্লীবাসী বা গ্রামের খবর রাখেন তাঁরাই জানেন এই রকমের প্রবীণ প্রাচীন বিবাহিত বনস্পতি অনেক বড় বড় রাস্তার ধারে দেখা যায়। গ্রাম্য অশিক্ষিত হিন্দুরা সেকালে এই বৃক্ষ-বিবাহকে মহা পুণ্যকর্ম বলে মনে করতেন, এখনকার দিনে অবশ্য কুসংস্কার বা বাজে খরচ বলেই সর্বত্র গণ্য হয়।

ভগিনী নিবেদিতা ঐ গাছের বিবাহের কাহিনী মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে গাছের উদ্দেশ্যে দুটো হাত জোড় করে প্রণাম করলেন। অনেকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইলেন ঐ সুন্দর শ্যামল বলিষ্ঠ বনস্পতির দিকে—যেন ধ্যানে কোন সুমহান দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছেন। অনেকক্ষণ পরে 'বড় সুন্দর, বড়

মধুর!', আরও ইংরেজি কথা উচ্চারণ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তাঁরা বোটের দিকে রওনা হলেন। খুব বড় বড় গাছ দেখলে ভগিনী মুগ্ধ হন—তা বেশ বোঝা গেল। শুধু মানুষে মানুষে নয়, মানুষে আর প্রকৃতিতেও কী গভীর, কী নিবিড় সম্পর্ক, কী মধুর পবিত্র অনুভূতি!—এখানে বাংলার এই প্রাচীন ঐতিহ্যের সন্ধান পেয়ে তিনি মুগ্ধ হলেন।

আর একদিন সকালে ভগিনী নিবেদিতা গেলেন শিলাইদহের বিখ্যাত গোপীনাথ ঠাকুরের মন্দির-ও দেব-দর্শন করতে। আগেভাগেই খবর দেওয়া ছিল বলে বিগ্রহের পূজকেরা মন্দিরের বারান্দায় বিগ্রহদম্পতিকে একটা কাঠের সিংহাসনে সাজিয়ে রেখেছিলেন। দুই বিদেশিনীই বাইরে জুতো খুলে বিগ্রহকে প্রণাম করলেন মাটিতে নুয়ে। দুই হাত পেতে বিগ্রহের চরণামৃতও পান করলেন। গোপীনাথের প্রাচীন মন্দির দুটি রাজা সীতারাম রায়ের তৈরি, নূতন মন্দিরটি রানী ভবানীর তৈরি। মন্দির কটিই ভগিনী তন্নতন্ন করে দেখলেন। সেকালের নানা শিল্পকলার নিদর্শন রয়েছে সেই মন্দিরের পাতলা ইটগুলোতে। কয়েকখানা পুরোনো ভেঙে-পড়া ইটও সযত্নে সংগ্রহ করে সঙ্গে নিলেন।

হিন্দু-মুসলমান সকল সমাজের গ্রামবাসীদের বাড়িতে বেড়িয়ে ভগিনী নিবেদিতা নানা রকমের সেকেলে কাঁথা, ছেলেদের গায়ের দোলাই, কুলো, ডালা, মাটির পুতুল, কাঠের পুতুল, বেতের কাজ-করা ও বাঁশের কাজ-করা পাখা, লাঠি অনেক সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁরা দুজন থাকতেন ছোট 'নাগর' বোটে। রবীন্দ্রনাথের বজরায় আসতেন প্রায়ই, আর আলোচনা ও তর্কও খুব চলত। রবীন্দ্রনাথ তখন অনেক সময়ে বোটে বসে গান গাইতেন। তাঁদের শোনাবার জন্যও তাঁকে প্রায়ই গাইতে হত। একদিন একটি গান তিনি গেয়েছিলেন 'প্রতিদিন আমি, হে জীবন-স্বামী, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে—'। যতক্ষণ গানটা গাওয়া হল, নিবেদিতা চোখ বুঁজে হাত দুখানা জোড় করে কোলের উপর রেখে ধ্যানস্থ হয়ে বসে ছিলেন।

ভগিনী দুজনেই বেশ বাংলা বলতে পারতেন। ভগিনী নিবেদিতার অনুগামিনীটির নাম ও পরিচয় সম্ভবত বেলুড় রামকৃষ্ণ-মঠের সন্ন্যাসীরা বলতে পারবেন। রবীন্দ্রনাথ যখন জানতে পারলেন যে, ভগিনীরা গ্রাম্য খাবারের খুব ভক্ত হয়ে পড়েছেন তখন তিনি আমলাদের বলে তাদের বাড়ি থেকে নানা রকম পিঠা, পরমান্ন, নাড়ু, মোয়া প্রভৃতি ভগিনীদের বোটে পাঠিয়ে দিতেন। নিজেদের বোটে অনেক রাত্রে ভগিনী নির্জনে ধ্যান-ধারণায় মগ্ন থাকতেন,

আবার প্রায়ই জ্যোৎস্না রাত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চরের মধ্যে বেড়াতে যেতেন। সেই সময়ে কয়েকজন জেলের সঙ্গে তাঁদের খুব আলাপ হয়। তারাও তাঁদের কীর্তন গান শোনাত।

যেখানে তাঁদের বোট বাঁধা থাকত তার কাছেই বুনোপাড়া। হামেশাই বুনোপাড়ার মেয়েরা ঐ ঘাটের কাছে স্নান করতে, জল আনতে যেত। তাদের সঙ্গে ভগিনীদের খুব আলাপ জমে গিয়েছিল। তারা বলত, 'সাধু মা'। তারা তাদের ছেলেমেয়েদের জন্যে তাঁদের কাছ থেকে নারকেল, কলা, পেঁপে, ছানা ইত্যাদি প্রায়ই নিয়ে আসত। শীতকালের খেজুরের রস, আখের টাটকা গুড়, সদ্য-দোয়া গরুর দুধ রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বোটে প্রায় প্রত্যহই পাঠাতেন। মাঝে মাঝে বাউল ফকির এসে তাঁদের নানা রকম গান শুনিয়ে যেত। বুনোপাড়ার ছেলেদের 'অষ্ট-সখী' নাচগানও তাঁরা একদিন শুনেছিলেন। পল্লী-অঞ্চলে ছেলেমেয়েদের নাম রাখা হয়—হরি, কালী, দুর্গা, শিব ইত্যাদি। এই সমস্ত নামকরণ দেশের অশিক্ষিতদের ধর্মভাবের প্রকাশক। নিবেদিতা দেশের এই সরল ধর্মভাবের খুব সুখ্যাতি করেন, বলেন, 'দেবজন্ম হক, দেশ বড় হক'।

এই ভাবে প্রায় কুড়ি দিন শিলাইদহে থেকে পল্লীতে পল্লীতে পাড়ায় পাড়ায় ভগিনী বেড়াতেন। পল্লীমায়ের স্নেহাঞ্চলে ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য কতখানি লুকান আছে তা এই নমস্যা সন্ন্যাসিনী বিদেশিনী হয়েও প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করছিলেন। আমরা তথাকথিত বিদ্বান ব্যক্তিরা তার কতখানি খোঁজ রাখি, তা আজ আমাদের জাতীয় জীবনেই প্রকাশ পাচ্ছে।*

* দ্রষ্টব্য : ভগিনী নিবেদিতার শিলাইদহ গমন সম্বন্ধে প্রামাণিক বিবরণ পাওয়া যাবে—

ক. 'দেশ' পত্রিকা ১৩৭৪ সালের ২২ অগ্রহায়ণে শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু-লিখিত 'নিবেদিতার পত্রে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য' প্রবন্ধে. পৃঃ ৫৫-৫৬৮

খ. 'রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা'—লেখিকা শ্রীমতী লীলা সরকার (উদ্বোধন পত্রিকা, কার্তিক ১৩১৯)

গ. পিতৃস্মৃতি (রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর) পৃঃ ২৪৫-২৫৭।

সাজাদপুরের পোস্টমাস্টার

পাবনা জেলার সাজাদপুরে (সাহাজাদপুর) রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে জমিদার হিসাবে দীর্ঘকাল কাটিয়েছিলেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথের জমিদারি ছিল সাজাদপুর। তাঁরা তিন ভাই সে সময় নাবালক ছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ কালীগ্রাম ও হেমেন্দ্রনাথের পুত্রগণের উড়িষ্যার জমিদারির সঙ্গে সাজাদপুরের জমিদারিও তত্ত্বাবধান করতেন, মহর্ষিদেবের নির্দেশে।

সে সময়টা ১৮৯০ থেকে ১৮৯৭ সাল কিংবা তারও কিছু পরে। তখন সাজাদপুর ছিল একটি অখ্যাত পল্লী। ঠাকুরবাবুদের চেষ্টায় এই গ্রামের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। সাবালক হয়ে গগনবাবু ও অবনবাবু অনেকদিন এইস্থানে বাস করেছিলেন এবং স্থানীয় উন্নতির জন্য স্থানীয় ভদ্রলোকদের উৎসাহে ও উদ্যোগে উচ্চবিদ্যালয়, সমবায়-সমিতি, নাট্যসমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সাজাদপুর থেকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানা পত্র তাঁর 'ছিন্নপত্রে' পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর সাজাদপুরের জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য তথ্য জানা যায় না, বা আমি নিজেও সেখানে যাবার সুযোগ পাই নাই। তবে সাজাদপুরের জমিদারির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মোকদ্দমা তাঁর সময়ে হয়েছিল, তারও আভাস ছিন্নপত্রের কয়েকখানা চিঠিতে পাওয়া যায়। (সাজাদপুরের পত্র, জানুয়ারি ১৮৯০, ছিন্নপত্র)।

'হিতবাদী'র তাগিদে কবি যে সমস্ত ছোটগল্প লিখেছিলেন তার মধ্যে একটি গল্পের নায়ক 'পোস্টমাস্টার' যে সাজাদপুরেরই গ্রাম্য পোস্টমাস্টার ভদ্রলোকটি, এরূপ অনুমান করবার যথেষ্ট কারণ আছে। সাজাদপুরের ঠাকুর এস্টেটের অতি পুরাতন প্রবীণ পেশ্‌কার (ম্যানেজার পদবীর পরবর্তী সেকেণ্ড অফিসার পদ) হারাণচন্দ্র সিংহরায় তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে এই পোস্টমাস্টার সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য বলেছিলেন সেই তথ্যাদি অবলম্বনেই এই কাহিনী লিখছি।*

* হারাণচন্দ্র সিংহরায় রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। তিনি বিশ-বৎসরের উপর সাজাদপুর ঠাকুর কাছারিতে চাকরি করে অতি বৃদ্ধকালে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি সেখানে 'হারাণ্‌ পেশ্‌কার' নামে খ্যাত। দেশবিভাগের সময়েই তিনি পরলোক গমন করেন।

সাজাদপুরে দোতলা ঠাকুরভবনের একতলার এক কোণে ছোট্ট এক কুঠরিতে গ্রাম্য পোস্টমাস্টারের আপিস। তিনি সেই কক্ষে শুতেন, থাকতেন আর নিকটবর্তী একখানা ছোট্ট দোচালাঘরে রান্নাবান্না করে খেতেন। রবীন্দ্রনাথ থাকতেন আর আপিস করতেন ঐ বাড়ির দোতলায়। রবীন্দ্রনাথ তখন ত্রিশ বছরের তরুণ, রীতিমত কর্মঠ উৎসাহী জমিদার। পোস্টমাস্টার মশাইও তরুণ, কবির চেয়ে দু একবছরের বড়। ভদ্রলোকটি ছিলেন আত্মভোলা, বাতিকগ্রস্ত ও গল্পবাগীশ। তিনি রবীন্দ্রনাথকে যত রাজ্যের আজগুবি গল্প বলতেন, অদ্ভুত সব প্রশ্ন করতেন, আবার নিজেই সে সব প্রশ্নের সমাধান করে কবি-জমিদারকে চমক লাগিয়ে দিতেন ; যেমন, গঙ্গাজলের ভক্ত গঙ্গাতীরবর্তী কাউকে মৃত আত্মীয়ের হাড়ের গুঁড়ো খাওয়ালে আত্মীয়ের গঙ্গালাভের ফলপ্রাপ্তি হয়ে যায়। তাঁর ভাণ্ডারে এই ধরনের অদ্ভুত তথ্য ছিল বোঝাই। কবি কৌতূহলী হয়ে বিনা তর্কে শুনে যেতেন আর হাসতেন।

সাজাদপুর স্থানটি ছিল সুযিমামার দেশের সামিল। সেকালে একমাত্র নদীপথ ছাড়া সেখানে যাতায়াত ছিল অত্যন্ত কষ্টকর। কবি-জমিদার সেজন্য অবসর-বিনোদনের সঙ্গীসাথী কাউকেই পেতেন না। অগত্যা এই গল্পবাগীশ যুবক পোস্টমাস্টার বেশ অন্তরঙ্গভাবেই কবির সান্নিধ্য পেতেন। কথাবার্তায় ও ব্যবহারে ভদ্রলোকের সারল্য কবিকে মুগ্ধ করত।

সেকালের অল্প বেতনভোগী গ্রাম্য শাখা পোষ্টাপিসের পোস্টমাস্টারের নামটা ঠিক জানা নেই। তিনি ছিলেন অবিবাহিত, কলিকাতার কাছেই ছিল তাঁর নিবাস, অল্প-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কলিকাতাবাসী যুবক। সুদূর পাবনা জেলার সাজাদপুর গ্রামে তিনি যেন নির্বাসনদণ্ড ভোগ করছিলেন। প্রায়ই খুব আক্ষেপ করতেন। কবি তাঁকে পল্লীবাসের উপকারিতা বুঝাতেন। তাঁর সে সমস্ত উপদেশ ভদ্রলোক শিরোধার্য করে নিয়েছিলেন। কবির দেখাদেখি সময় পেলেই তিনি নদীতীরে, মাঠে বেড়াতেন। গ্রামে কেউ আহারের নিমন্ত্রণ করলে খুব খুশি হতেন। কারণ তাঁকে দুবেলা হাত পুড়িয়ে রান্নাবান্না করে খেতে হত। এই অসুবিধাটা তিনি রবীন্দ্রনাথকে প্রায়ই জানাতেন। এর ফলে জমিদারবাবুর উপদেশে আমলাবাবুরা মাস্টারমশায়ের রান্নাবান্নার কাজের জন্য একজন অনাথা বিধবাকে ঠিক করে দেন। বিধবাটি ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে যা হোক কোনরকম একটা আশ্রয় পেয়ে মাস্টারমশাইয়ের যাবতীয় সাংসারিক কাজ করে দিত। দুবেলা খাওয়াথাকা বাদে আর্থিক সাহায্যও পেত। পোস্টমাস্টার

গল্পে 'রতন' চরিত্রটি চিত্রিত হয়েছে এই রাঁধুনি নারীটির সূত্রে এবং তা রূপান্তরিত হয়েছে অপূর্ব মধুর কল্পনা-স্পর্শে। নির্মলচরিত্র খেয়ালি পোস্টমাস্টারকে গ্রাম্য বালিকা রতনের সংস্পর্শে এনে কবি অপূর্ব রসঘন সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন।

রান্নার অসুবিধার অনুযোগের জন্য কবি তাঁকে মাঝে মাঝে খেতে বলতেন। বাবুর্চি গফুরের হাতে খেতে তাঁর আপত্তি ছিল না, তবু জাতিনাশের ভয়ে গোপন রাখতেন এবং নিমন্ত্রিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। রাঁধুনি নিযুক্ত হবার পর তিনি বেশ আয়েসে দিন কাটাতেন এবং কবির সান্নিধ্যলাভের বেশি সুযোগ পেয়েছিলেন।

পোস্টমাস্টার মশাই নানা অভিযোগ এনে কবির কাছে পরামর্শ চাইতেন। তাঁর প্রথম অভিযোগ, সরকার এত কম মাইনে দেয় কেন? ভাগ্যিস তিনি অবিবাহিত, নইলে বাড়িতে এই সামান্য টাকা মনিঅর্ডার করলে বড়দাদার অন্তহীন অভিযোগে তিনি ধরাশায়ী হতেন। দ্বিতীয়ত, সাজাদপুর থেকে বদলি হয়ে কলিকাতার কাছাকাছি চাকরি পাবার জন্য কি তদ্বির করা যায়? কবি-জমিদার এই দুটি বিষয়ে তদ্বিরের পথ বাতলে দিতেন, কর্তৃপক্ষকে দরখাস্ত করতে উপদেশ দিতেন। সংসারের খুঁটিনাটি সবই তিনি কবি-জমিদারকে অকপটে প্রকাশ করতেন। আর বলতেন, তাঁর দাদা মাঝে মাঝে তাঁর বিবাহ স্থির করেন। তিনি আপত্তি করলে দাদা পত্রে উপদেশ দিতেন যে, বিয়ে করলে বধূর কল্যাণে তাঁর চাকরির উন্নতি হবে, কারণ শাস্ত্রে লেখে 'স্ত্রীভাগ্যে ধন'। দাদা ইস্কুলমাস্টারি করেন কিনা তাইতেই ঐরকম পণ্ডিতি বুলি ঝাড়েন। তবে কি জানেন, মুনিঋষির বচন! তা কি কখনও মিথ্যা হয়? তবে কথা হচ্ছে, আমাকে কোন্ ধনী কন্যা দান করবে? ধন উপার্জন তো স্ত্রী করবে না, করব আমি। রবীন্দ্রনাথ এই সমস্ত প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে রসিকতা করতেন।

রবীন্দ্রনাথ একা একা গান লিখতেন, গাইতেন। একটা এস্রাজ ছিল তাঁর। পোস্টমাস্টার তন্ময় হয়ে শুনতেন। সুরবোধ না থাকলেও তিনি গান খুব ভালবাসতেন। এমন বিভোর হয়ে যেতেন যে, চোখ দুটি বন্ধ করে গানটা শেষ পর্যন্ত শুনে পায়ে হাত দিয়ে পরমভক্তের মত তাঁকে প্রণাম করতেন। শেষে তিনি গল্পবাগীশি ছেড়ে প্রায়ই বলতেন আপনি গান করুন, আপনার গান শুনলে আমি জগৎসংসার ভুলে যাই। আমি মূর্খ মানুষ, অনর্থক বকে বকে আপনাকে আর বিরক্ত করব না।

সত্যই কিছুদিনের মধ্যে তিনি হয়ে উঠলেন অত্যন্ত গম্ভীর। কৌতূহলী রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই ডেকে পাঠাতেন তাঁর গল্প শুনবার জন্য। তিনি এতে পরম সম্মানিত মনে করতেন। আমলাবাবুদের বলতেন, 'আপনাদের বাবুমশাই মস্ত লোক। তাঁর সঙ্গে গল্প করতে আমার কিন্তু এতটুকু সঙ্কোচ হয় না। তিনি যেন আমার পেটের কথা টেনে বার করেন, মূর্খ বলে আমায় তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন না, আমিও আবোলতাবোল বকে যাই। তিনি অত বড় বিদ্বান বড়লোক, রাজামানুষ, তিনি আমার ঐ ধানাইপানাই শোনেন। তিনি যেন কী মায়ায় আমায় একেবারে জাদু করে ফেলেন, তাইতে হরদম বকে যাই। অনেক বড়লোক দেখেছি মশাই, কিন্তু এমন মহৎ বড়লোক কোথাও দেখি নি।'

শেষে এমন হল যে, তিনি দোতলায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কক্ষে তাঁকে লেখাপড়ায় ব্যস্ত দেখে খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে নীরবে প্রস্থান করতেন। কবি তাঁর ভাবখানা টের পেয়ে বলতেন, 'মাস্টারমশাই, বসুন, বসুন। আমার লেখা শেষ হয়েছে। এইবার আপনার গল্প শুনি।'

পোস্টমাস্টার বলতেন, 'আপনি গল্প লেখেন, নভেল লেখেন, নাটক, পদ্যটদ্য কত কী লেখেন। আমি আর কি তুচ্ছ গল্প শোনাব আপনাকে। তার চেয়ে যদি দয়া করে একখানা গান করেন তাহলে বড় আনন্দিত হব। এমন গান আমি জীবনে কখন শুনি নি। এত যাত্রা, থিয়েটার, কীর্তন শুনি, কিন্তু আপনার মুখের গানের তুলনা খুঁজে পাই না। আমার কত বড় সৌভাগ্য যে, আপনার মত মহৎ ব্যক্তির দেখা পেলাম। আপনি তো স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা।'

পোস্টমাস্টারের ছুটি মঞ্জুর হয়েছিল। কিন্তু খামখেয়ালি ভদ্রলোকটির বাড়ি যাবার তাড়া দেখা গেল না, খুব আনমনা তাঁর ভাব। সেবারে তাঁর বাড়ি যাওয়াই হল না কাজের কি গোলমালের জন্য।

রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুরের কার্যভার ত্যাগ করে চলে আসবার সময় পোস্টমাস্টার মশাই বোটে তাঁকে প্রণাম করতে এসেছিলেন। আমলা কর্মচারী ও প্রজাদের বিদায়-সম্ভাষণ শেষ হলে রবীন্দ্রনাথ দেখলেন সেই গল্পপ্রিয় মানুষটি অশ্রুসজল চোখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। তখন কবি বলেছিলেন, 'চললুম, মাস্টারমশাই। আপনার কথা আমার মনে থাকবে। যদি কখনও এখানে আসি আর আপনি বদলি না হন, তবে আবার দেখা হবে। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।'

বোট ছাড়লে পোস্টমাস্টার মশাই খালের ধারে বসে পড়লেন, তাঁর দুই

চোখে যেন অশ্রুর ঝরনা। এর পরেও প্রায় বছর খানেক তিনি সাজাদপুরে ছিলেন। পরে অসুস্থ হয়ে বাড়ি চলে যান। গ্রামের সবাই তাঁকে ভালবাসতেন।

এই কাহিনীর মধ্যে রতনের চরিত্রের কোনই আভাস নাই। এটি রবীন্দ্রনাথের কল্পনার সৃষ্টি এবং অপরূপ, অতুলনীয় সৃষ্টি। তিনি জমিদারিতে অনেকের কাছে অনেক গল্প বেশ আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন। এইসব কাহিনী থেকে ইঙ্গিত নিয়ে তিনি যেসব গল্প লিখতেন তাদের প্রত্যেকটিতেই অপূর্ব চরিত্রসৃষ্টির কারুকার্য দেখাতেন।

নূতন সংস্করণ 'রবীন্দ্রজীবনী'তে কবির সাজাদপুরবাসের সামান্য কিছু তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। 'ছিন্নপত্র' পড়লে মনে হয় সেখানে কবির জীবন বেশ উপভোগ্য ছিল। দুঃখের বিষয়, সাজাদপুরে তাঁর জীবনের কোন কাহিনীই জানা যায় না। ছিন্নপত্রে সাজাদপুর থেকে লেখা কবির কয়েকখানা পত্রই খুব কৌতূহলোদ্দীপক, অথচ সেখানকার কোন সত্যকাহিনী আমাদের জানা নাই।

সেখানকার 'জনপদবধূ', ইস্কুলের মাস্টারমশাইদের দরবার, খালের বর্ণনা, যমুনানদীর ঝড়ে মাঝিমাল্লাদের আল্লার দোয়া, খালের ধারে বেদে-দারোগা সংবাদ, মামলা-মোকদ্দমার সূত্রে পুলিশের চর ও সাহেব হাকিমদের সঙ্গে মোলাকাৎ, সেখানকার কুঠিবাড়িতে সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের অভ্যর্থনার সরস বর্ণনা—এগুলি এমন সরস, এমন জীবন্তভাবে পাঠক-পাঠিকাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে যেগুলি অপূর্ব গণসাহিত্য বলে মনে হয়। পল্লীচরিত্রের এমন অপূর্ব জীবন্ত মানবমনের গভীর রহস্যপূর্ণ বর্ণনা আমাদের সাহিত্যে বিরল। সাজাদপুরেই 'বিসর্জন' নাটকের জন্ম হয়। ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উদ্দিষ্ট উৎসর্গপত্রে সেখানকার পল্লীপ্রকৃতির যে প্রাণবন্ত ছবি ফুটে উঠেছে তার তুলনা নেই। 'বর্ণনাটা করি শোন', বলে যে ছবি এঁকেছেন, এমন সহজ, সরল, বর্ণনা কোথাও আজ পর্যন্ত পড়ি নি—

উত্তরে যেতেছে দেখা পড়েছে পথের রেখা
শুষ্ক সেই জনপথ মাঝে,
বহুকষ্টে ডাক ছাড়ি, চলেছে গোরুর-গাড়ি
ঝিনিঝিনি ঘণ্টা তারি বাজে।

চন্দ্রময়বাবুর চাকরি

কুষ্টিয়ার লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল চন্দ্রময়বাবুর চাকরির ইতিহাসটা খুব অভিনব না হলেও বেশ কৌতুকাবহ।

সে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পূর্বেকার কথা। চন্দ্রময়বাবু তখন বি. এ. ও ওকালতি পাশ করে চোগা-চাপকান পরে হাকিমের এজলাস শোভিত করে নিজে বেশ ভাল উপার্জন করতে পারতেন, কারণ সে সময়ে উকিল মহলে এমন করে ভিড় জমে যায় নাই। কিন্তু তিনি অতগুলো পরীক্ষা, বিশেষ, আইনের পরীক্ষায় পাশ করেও ওকালতি ব্যবসা পছন্দ করলেন না। তিনি চাকরির চেষ্টা করতে লাগলেন এবং এমন একজন মনিবের অধীনে চাকরি খুঁজতে লাগলেন যাঁর অধীনে মনুষ্যত্ব ষোল আনা বজায় থাকে, আবার উপার্জন ও অভিজ্ঞতা, সব দিক দিয়েই জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভ হয়। তিনি এদেশের নামকরা রাজা ও জমিদারদের কাছে নিজের শিক্ষা-দীক্ষা ও অভিপ্রায় জানিয়ে চাকরির জন্য দরখাস্ত পাঠালেন। অনেক দরখাস্তের উত্তরই এল না। কেউ বা তাঁর এই অদ্ভুত সঙ্কল্পের জন্য একটু সহানুভূতি প্রকাশ করলেন।

সে সময়ে শিলাইদহ সদর কাছারির পেশকারের পদ খালি ছিল। শিলাইদহ জমিদারির পেশকারের পদগৌরব ম্যানেজারের নিচেই, আদালতের পেশকারের মত মোটেই নয়। ম্যানেজারকে সদর নায়েব বলা হত, তাঁর নিচেই ছিলেন পেশকার বা সেকেণ্ড অফিসার। চন্দ্রময়বাবু এই পদ প্রার্থনা করে কলিকাতার ঠিকানায় জমিদার রবীন্দ্রনাথের কাছে এক দরখাস্ত পাঠালেন। তার পরেই শিলাইদহ ঠাকুরবাবুদের কাছারির ম্যানেজারের পত্রে জানতে পারলেন যে তাঁকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কলিকাতা গিয়ে দেখা করতে হবে এবং এই চাকরির জামিন স্বরূপ এক হাজার টাকা কাছারিতে আমানত করতে হবে।

তিনি কলিকাতা রওনা হলেন; সঙ্গে নিলেন তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর নামের পাচ শত টাকা করে দুখানা পোস্টাপিসের সেভিংস্ ব্যাঙ্কের পাশবই।

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ভবনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চন্দ্রময়বাবুর দেখা হল। কলিকাতার বড়লোক জমিদারদের সম্বন্ধে তাঁর মনে যে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কথাবার্তায়, শিষ্টশান্ত মার্জিত ব্যবহারে তা একেবারে বদলে গেল। জমিদারের অদ্ভুত প্রবলপ্রতাপান্বিত বিলাসী স্বার্থমগ্ন অহঙ্কারী

মূর্তির বদলে তিনি দেখতে পেলেন পরম সুপুরুষ, মার্জিতরুচি, সুশিক্ষিত, হৃদয়বান কবিকে। তিনি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রময়বাবুর চাকরি খোঁজার বিশিষ্ট অভিপ্রায়টা জেনে নিলেন; তাঁকে জমিদারি-সংক্রান্ত দু একটি বিষয়ে পরীক্ষাও করলেন। চন্দ্রময়বাবুর সুগঠিত সুন্দর আকৃতি ও সরল আড়ম্বরহীন কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে বললেন, 'আমি এই রকম লোকই চাই। জমিদারি সেরেস্তার বহু যুগের কলঙ্ক মোচনের জন্য তোমাদের মত সুশিক্ষিত যুবকই আমি খুঁজে বেড়াই। তোমাকে আমি শিলাইদহের পেশকারের পদে আপাতত ৫০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত করলাম, মনোযোগ দিয়ে কাজকর্ম করে প্রজার সঙ্গে ন্যায় ব্যবহারে রাজা-প্রজার সত্য-ধর্ম রক্ষা করে চলবে, ক্রমে তোমার বেতন বাড়বে।'*

এই আদেশ দেবার পরে রবিবাবু বললেন, 'শিলাইদহে শৈলেশ আছে, সে শিক্ষিত, তার সঙ্গে তোমার বেশ মিল হবে। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি, তুমি তাদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজকর্ম করবে; শুধু জমিদার নয়, প্রজার মঙ্গলের জন্যও সর্বদা চেষ্টা করবে। আমি তোমাদের মত সুশিক্ষিত যুবকদেরই জমিদারির কাজে পেতে চাই।' †

তারপর চন্দ্রময়বাবু রবীন্দ্রনাথের টেবিলে পাঁচ শত টাকার দুখানা পোস্টাপিসের পাশবই রাখতেই রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'এ পাশবই কিসের?'

চন্দ্রময়বাবু বললেন, 'আমার চাকরির জামিন বাবদ এক হাজার টাকার পাশবই। এই টাকা জামিন লাগবে, আমি এই রকমই আদেশ পেয়েছি।'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'এর আর দরকার নেই। এ পাশবই তুমি ফেরত নিয়ে যাও। চাকরির আবার জামিন কি!'

এইখানে একটা কথা বলে রাখি, রবীন্দ্রনাথের সময়ে ঠাকুর জমিদারিতে

* 'কুষ্টিয়ার উকীল চন্দ্রময়বাবুর সঙ্গে কি আপনার আলাপ হইয়াছে? লোকটি অত্যন্ত সৎপ্রকৃতি ও শান্ত। তাঁহার প্রতি সেখানকার সকলেরই শ্রদ্ধা আছে। আপনি বোধ হয় তাঁহার পরামর্শ লইয়া চলিলে সুবিধা পাইতে পারিবেন।'

রবীন্দ্রনাথের পত্র, ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০ সাল

† জগদানন্দ রায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেশ মজুমদার, জ্যোতিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র রায়, নেপালচন্দ্র রায়, কালীমোহন ঘোষ, হীরালাল সেন, হরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সুশিক্ষিত যুবকদের রবীন্দ্রনাথ জমিদারি সেরেস্তায় চাকরি দিয়েছিলেন, জমিদারি কার্যের আমূল সংস্কার ও দুর্নাম নষ্ট করার জন্য।

তহশিলদার ব্যতীত অন্য গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্যও কোন জামিন ছিল না। শিলাইদহ সদর কাছারির খাজাঞ্চি বাবুরা পর্যন্ত আজীবন বিনা জামিনে জমিদারির টাকা-পয়সা ঘেঁটেছেন।

চন্দ্রময়বাবু জীবনে একটা মূল্যবান মধুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে মহা-উৎসাহে শিলাইদহে এসে কাজে যোগদান করলেন। যৌবনের স্ফূর্তি; তার সঙ্গে নিজের ইচ্ছামত চাকরি পাওয়ায় আনন্দ, উৎসাহ ও উদ্যম নিয়ে নতুন কর্ম-ক্ষেত্রে কাজ সুরু করলেন, আর পরম বন্ধু পেলেন শৈলেশবাবুকে। কাজ আরম্ভ করেই জমিদারি সেরেস্তা সম্বন্ধে তাঁর মনের ধারণা বদলে গেল। জমিদারির প্রত্যেক কাজের ধরাবাঁধা বিধিবদ্ধ নিয়মকানুন, কোন্ পদ্ধতিতে কাজ চলবে তার ছাপান নিয়মাবলি—যেন একটা যন্ত্রের মত জমিদারির কাজ সমানভাবে চলছে। প্রজার উপর কোনও রকম অন্যায় অবিচার বা অত্যাচার হলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর চাকরির জবাব, আমলাগণের আচার-ব্যবহারের সংস্কার—এক কথায় বলতে গেলে, জমিদারি জিনিসটার এই রকম আমূল সংস্কারের যেন একটা অভিযান সুরু হয়েছে শিলাইদহে। শিলাইদহে তখন হেড আপিস। কালীগ্রাম পরগণার কাজকর্ম শিলাইদহ আপিসের অধীনে চলত।

চন্দ্রময়বাবু প্রথমেই চর-অঞ্চলে এক অত্যাচারী তহশিলদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী প্রজাদের খাজনা আদায়ের জন্য নিযুক্ত হলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে। যৌবনের অফুরন্ত উদ্যম ও অধ্যবসায়ের বলে চন্দ্রময়বাবু এ কার্যে বেশ যোগ্যতার সঙ্গে কৃতকার্য হলেন। এ সংবাদ রবীন্দ্রনাথকে লিখে জানান হল।

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে এলেন শারদীয় পূজার দশ-বার দিন আগে। চন্দ্রময়বাবু এই সময়ে সেরেস্তায় বেশ একটু চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলেন। ব্যাপার-খানা এই যে পূজার পার্বণীর বিল তৈরি হচ্ছে। নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, ছোট-বড় সমস্ত কর্মচারীই প্রত্যেক বছর পূজার সময় এক মাসের বেতন বেশি পাবেন; কিন্তু জমিদারির নিয়মাবলিতে ছিল, 'যে সমস্ত কর্মচারী অন্তত ছয় মাস কাজ করিয়াছেন তাঁহারাও বছরের পার্বণীর অধিকারী হইতে পারিবেন, তবে তাহা সদর নায়েবের সুপারিশসাপেক্ষ'। চন্দ্রময়বাবুর কাজ তখন চার মাসের বেশি হয় নাই। শৈলেশবাবুর কাজও পুরা এক বৎসর হয় নি। তিনি এইজন্য চন্দ্রময়বাবুর সহযোগিতায় সদর নায়েবমশাইকে অনুরোধ করলেন। চন্দ্রময়বাবু একাজটি নিয়মবিরুদ্ধ বলে কোন দরখাস্ত করলেন না, সদর নায়েব-মশায়ের ইচ্ছার উপর নির্ভর করলেন।

পার্বণীর বিল তৈরি করে বাবুমশায়ের কাছে পাঠান হল। বিলে শৈলশ-বাবু আর চন্দ্রময়বাবুর নামের পাশে পার্বণীর অঙ্ক না বসিয়ে ফাঁক রাখা হল। রবীন্দ্রনাথ সেই বিল ফেরত পাঠালেন, ঐ দুই নামের পাশে মন্তব্য লিখে, 'ইঁহাদের প্রাপ্য বিল-ভুক্ত না হইবার কারণ কি?'

সদর নায়েব জমিদারির নিয়ম ঐ মন্তব্যের নিচে লিখে বিল মঞ্জুরির জন্য আবার পাঠালেন; লিখলেন, 'নিয়মানুসারে এঁদের পার্বণী পাওনা হয় না; কারণ পুরা এক বৎসর কাজ হয় নাই। এ বিষয় জমিদারবাবুর অনুগ্রহাধীন।'

পার্বণীর বিল মঞ্জুর হয়ে ফেরত এল। তাতে রবীন্দ্রনাথ হুকুম লিখেছেন, 'কার্যের পারদর্শিতা বিবেচনায় বিশেষ ক্ষেত্রে ইঁহাদের একবৎসরের পুরা পার্বণী মঞ্জুর'।

এর পর চন্দ্রময়বাবুর উপর রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে কয়েকটা বড় মহালের নাম খারিজ তদন্ত ও নামখারিজি নজর আদায়ের ভার পড়ল। সেকালে আইনে জমি হস্তান্তর হলে নামমাত্র ল্যাণ্ডলর্ড ফি আদায়ের নিয়ম ছিল না। তখন বেশ মোটা টাকা নাম খারিজের নজর বলে আদায় হত এবং ঠাকুরবাবুরা জমির খরিদমূল্যের সিকি টাকা 'খারিজি নজর' বলে আদায় করতেন।

চন্দ্রময়বাবু কুষ্টিয়ার নিকট লাহিনির কাছারিতে বসে তদন্তের কাজ করছেন। হস্তান্তরিত জমিজমার নানা রকমের পুরাণো ব্যাপারের তদন্ত কাজটা বড় সহজ নয়। তিনি দেখলেন, দুইজন অর্থশালী প্রজা নানা রকম ফন্দি-ফিকিরে বহু জমা স্বনামে ও বেনামে খরিদ করে জমিদারকে ফাঁকি দিয়ে অনেকদিন থেকে ভোগ করছিল। তারা এবারে দেখল বড় বিপদ। তাদের অতগুলো জমার নাম-খারিজে বহু টাকা লাগবে। তারা চন্দ্রময়বাবুকে জমিদারি সেরেস্তার সাধারণ আমলা মনে করে, তাঁকে কিছু 'উপরহস্ত' করে খুব কম টাকায় তাদের জমিগুলোর নাম খারিজ করার জন্যে গোপনে অনুরোধ করল, মোটা টাকা প্রাপ্তিরও লোভ দেখাল।

ফল হল উল্টো। চন্দ্রময়বাবু তাদের সমস্ত ব্যাপার খোলাখুলি ম্যানেজার-বাবুর গোচরে আনলেন। ঐ প্রজারাও ভয়ানক চালাক, কারণ তারা এসব কাজে সব্যসাচী। তারাও উল্টে স্বয়ং জমিদার রবীন্দ্রনাথের কাছে দরখাস্ত করল। তাদের অভিযোগ, চন্দ্রময়বাবু তাদের কাছ থেকে উপরি টাকা আদায়ের জন্য তাদের উপর ভয়ানক জুলুম করেছেন, আর ম্যানেজারের কাছে মিথ্যা কথা জানিয়ে নিজের দোষ ঢাকছেন। আবার আরও মজা এই যে, এই

দরখাস্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছল এমন সময়ে, যখন তিনি সবেমাত্র শিলাইদহে পা দিয়েছেন।

রবিবাবু ম্যানেজারের কাছ থেকে চন্দ্রময়বাবুর রিপোর্ট চেয়ে নিয়ে ঐ অভিযোগকারী প্রজাদের ডাকালেন চন্দ্রময়বাবুর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে। কাগজপত্র হাতে নিয়ে তিনি বোটের উপর ঐ দুজন প্রজাকে এমন জেরা আরম্ভ করলেন যে, তারা শেষকালে কেঁদে ফেলল। রবীন্দ্রনাথের বিচারশক্তি অসাধারণ, আবার লোকচরিত্রে অভিজ্ঞতাও ছিল অসামান্য। প্রজাদের শেষকালে স্বীকার করতে হল যে, তারা পেশকারবাবুকে ঘুস দিয়ে নাম খারিজ করিয়ে নেবার ফন্দি করেছিল। বাবুমশাই তাদের ভয়ানকভাবে শাসালেন। তারা তাঁর পা জড়িয়ে ধরে কেঁদেকেটে ক্ষমা চাইলে তাদের নাম-খারিজ মঞ্জুর করলেন, সামান্য কিছু টাকা মাফ দিয়ে। এই কাণ্ডের বিন্দুবিসর্গও কিন্তু চন্দ্রময়বাবু জানেন না। তিনি তখন জানিপুর কাছারি পরিদর্শনে গিয়েছেন।

চন্দ্রময়বাবু জানিপুর থেকে শিলাইদহে এসে এই ব্যাপার শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, এই ভয়ানক অভিযোগের ব্যাপারে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য একটি কথাও তাঁকে বলতে হল না। রবীন্দ্রনাথ একদিন তাঁকে বোটে ডেকে এনে জানিপুরের 'তের ছটাকের' মোকদ্দমার বিবরণ শুনতে শুনতে কেবলমাত্র বলেছিলেন, 'চন্দ্রময়, প্রজাদের অভ্যাস এমনি খারাপ হয়ে গেছে যে, জমিদার ও প্রজার সম্বন্ধের কোন সংস্কার বা উন্নতি করা অসম্ভব হয়েছে'। চন্দ্রময়বাবু এ কথাটার অর্থ বুঝে নিলেন এবং বাবুমশাইর মনের ব্যথাটাও টের পেলেন।

এই ভাবে কাজ করে প্রায় ছ'মাস পরে চন্দ্রময়বাবু তাঁর পিতার উপদেশে কুষ্টিয়াতে ওকালতি ব্যবসা করবার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে অনুমতি ও আশীর্বাদ চেয়ে এক পত্র লেখেন ১৩০২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া উত্তরখানা চন্দ্রময়বাবু বহু যত্নে রেখেছিলেন, কিন্তু হারিয়ে ফেলেছেন। সে পত্রের মর্ম এই যে, 'আমি সানন্দে মত দিচ্ছি। তোমার মতন কর্মচারী দুষ্প্রাপ্য, তোমার মতন একজন উকিলও দেশের পক্ষে দরকার। ওকালতিতে তোমার উন্নতি হোক, আমি খুশি হয়ে আশীর্বাদ করছি।'

অনুমতি তো পেলেনই; সেই সঙ্গে চন্দ্রময়বাবু শিলাইদহ জমিদারির কুষ্টিয়ার 'রিটেনার প্লিডার' ও আম্‌মোক্তার নিযুক্ত হয়ে গেলেন। চাকরিজীবনে তো বটেই, তাঁর ওকালতি-জীবনেও রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ তাঁর ভবিষ্যৎ উন্নতির সূচনা করেছিল। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ এর পর হাই-

কোর্টে ওকালতি করবার জন্য তাঁকে কলিকাতায় এসে বসতে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং জমিদারির হাইকোর্টের মোকদ্দমাগুলোও তাঁকে দিতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু চন্দ্রময়বাবু সাহস করেন নি, কারণ ঠাকুরবাবুদের ও সাধারণ ওকালতি কাজে কুষ্টিয়াতেই যথেষ্ট উন্নতি ও সুনাম অর্জন করেছিলেন ।*

রবীন্দ্রনাথের নিজের জমিদারি শিলাইদহ থেকে পৃথক হয়ে গেলেও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমন্ত্রণে তিনি বহুদিন পরে ১৩৩০ সালের ফাল্গুন মাসে মহামতি এণ্ড্রুজের সঙ্গে শেষ বার শিলাইদহে আসেন—কেবল বেড়াতে নয়, অনেকগুলো জটিল কাজের জন্যও বটে। সে সময়ে তিনি শিলাইদহ কুঠি-বাড়িতে পৌঁছেই বলেছিলেন, 'চন্দ্রময়কে একবার দেখব, তাকে আনাও এখানে'।

চন্দ্রময়বাবু শিলাইদহে এলেই রবীন্দ্রনাথ এণ্ড্রুজ সাহেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন আর মুক্তকণ্ঠে চন্দ্রময়বাবুর সুখ্যাতি করে হাসতে হাসতে এণ্ড্রুজ সাহেবকে বলেছিলেন, 'The Zemindars and the pleaders now sail on the same boat. We suck the life-blood of our tenants and the pleaders, their clients. But our Chandramay is an exception.'

পরিণতবয়স্ক জমিদার হয়েও তাঁর মুখের একথা সত্যিকার প্রজা-সহানুভূতির সরল সহজ মর্মবাণী। †

* পরবর্তী জীবনে চন্দ্রময় সান্যাল কুষ্টিয়া সহরের একজন অগ্রণী নাগরিক রূপে হাইস্কুলের সেক্রেটারি, মোহিনী মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইত্যাদি কাজ করে খ্যাতি অর্জন করেন।

† এই মর্মবাণীর পরিচয় কবি তাঁর অন্য লেখাতেও দিয়েছেন—'আমি জানি, জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট্, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না ক'রে উপার্জন না ক'রে, কোনো যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না ক'রে ঐশ্বর্য ভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস করে তুলি। যারা বীর্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে, আমরা সে জাতের মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন জোগায়, আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়, এর মধ্যে পৌরুষও নাই, গৌরবও নাই।'

রায়তের কথা—রবীন্দ্রনাথ
১৩৩৩ আষাঢ়, সবুজপত্র, প্রমথ চৌধুরী

ঘোড়-সওয়ার

বাজিতপুরের (পাবনা) সামনে পদ্মার কোলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বোট বাঁধা। বোটের ছাদে ইজি-চেয়ারে বসে রবীন্দ্রনাথ, নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ গল্প করছেন। সেইদিন শিলাইদহ থেকে সস্ত্রীক স্যার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ও বাজিতপুর চরে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হবেন। 'নাগর' বোট তাঁদের নিয়ে শিলাইদহ ছেড়েছে। তাই সেদিন বাজিতপুরে রবীন্দ্রনাথের 'পদ্মা' বোটের কাছে লালডিঙ্গিতে খুব খাওয়াদাওয়ার উদ্যোগ-আয়োজন চলছে, রবীন্দ্রনাথের অভ্যাগত বন্ধুদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা হচ্ছে।

সে সময় বোট থেকে খানিক দূরে বাজিতপুর ষ্টিমার ঘাটের কাছে একজন অশ্ব-ব্যবসায়ী এক পাল ঘোড়া বেঁধে রেখেছে। অনেকে সেখান থেকে ঘোড়া কিনছে।

বাজিতপুর ছিল সেকেলে পাবনা সহরের বন্দর। সেখানে উজান-ভেটেন ষ্টিমার ভিড়ত, বড় বড় পানসি বাঁধা থাকত, মালপত্র বিকিকিনি হত। পাবনার সেকালের প্রসিদ্ধ উকিল গিরিশচন্দ্র রায় তাঁর গাড়ির জন্য একটা ঘোড়া কিনতে বাজিতপুরে এসেছিলেন। তিনি রবিবাবুর সঙ্গে বোটে বসে খানিক কথাবার্তা বলে ঘোড়ার সওদাগরের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন—একটা পছন্দসই ঘোড়া বেছে পরীক্ষা করে কিনে নেবার জন্যে, কিন্তু কোন বিশ্বাসী ঘোড়সওয়ার খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

একজন বাইশ-তেইশ বছরের যুবক সে সময়ে ঐখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন—বোধ হয় তাঁর কৌতূহল নিবৃত্তি করবার জন্য কিংবা সুবিখ্যাত জগদীশ বসুকে দেখবার জন্য। তাকে দেখেই গিরিশবাবু বললেন, 'আরে দক্ষিণা যে, বেশ ভালই হল। আমি একজন ভাল ঘোড়সওয়ার খুঁজছি। একটা ঘোড়া কিনব আমার গাড়ির জন্য। গাড়ি টানতে পারে এমন একটা ভাল ঘোড়া তুমি নিজে পরীক্ষা করে পছন্দ করে দাও তো।'

যুবকটির নাম দক্ষিণারঞ্জন চৌধুরী। তাঁকে পাকা ঘোড়সওয়ার বলে লোকে জানত। তিনি পাবনায় উকিলের মুহুরিগিরি করতেন; গিরিশবাবু তাঁকে খুবই চিনতেন।

নানা রকমের সুচেহারার ঘোড়া দেখে দক্ষিণাবাবুর ঘোড়ায় চড়ার শখটা চেগে উঠল। দক্ষিণাবাবু সানন্দে রাজি হয়ে একটা পছন্দসই ঘোড়া খুলে নিয়ে

তার পিঠে চেপে বসলেন। অশিক্ষিত তেজি ঘোড়া,—না আছে তার জিন-লাগাম ; আছে শুধু পিঠের উপর কম্বল। একটা দড়ি তার গলায় বেঁধে ঐ কম্বলের উপরেই ঘোড়ায় চেপে বসে দক্ষিণাবাবু চাবুক কসে ঘোড়া ছাড়লেন। দুষ্টু ঘোড়া তার নতুন সওয়ারের কেরামতি বুঝে নেবার জন্য ছুটল তীরবেগে। তারপর চাবুক খেয়ে কখনও লাফাচ্ছে, কখনও পেছু হটছে, কখনও সামনের পা দুটো উঁচু করে লাফিয়ে চিঁহি চিঁহি রবে সওয়ারকে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সওয়ার পাকা ওস্তাদ, ঘোড়া তার কাছে ঢিট বনে গেল। দক্ষিণাবাবু ঐ ঘোড়াটাই কিনবার জন্যে গিরিশবাবুকে সুপারিশ করলেন ; বললেন, 'গাড়িতে জুতবার উপযুক্ত ঘোড়া এইটাই।'

দক্ষিণাবাবুর ঘোড়ায় চড়ার ব্যাপারটা দূরে বোটের ছাদে উপবিষ্ট রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তিনি একজন বরকন্দাজকে বললেন ঐ ঘোড়-সওয়ারকে তাঁর কাছে ডেকে আনবার জন্যে।

শিলাইদহ কাছারির কাজে যাতায়াতের সুবিধার জন্য সে সময়ে কয়েকটি ভাল দেশী ঘোড়া এস্টেট থেকে রাখা হত ; আরও দু-একটি কেনা হবে তার ব্যবস্থাও চলছে।

বরকন্দাজ গিয়ে দক্ষিণাবাবুকে ডাকতেই তিনি অবাক হয়ে গেলেন। বাবু-মশাই তাঁর মত একজন ঘোড়া-রোগগ্রস্ত গ্রাম্য মুহুরিকে ডাকবেন কেন? তিনি সসম্ভ্রমে বাবুমশায়ের সামনে এসে দাঁড়াতেই বাবু-মশাই 'ওহে ঘোড়-সওয়ার, শোন শোন' বলে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।

দক্ষিণাবাবু দেখলেন অভাবনীয় সুযোগ। তিনি মুহুরিগিরির দুঃখের কথা—তাঁর ঘোড়া-রোগের কথা সব শোনালেন। ছেলেবেলা থেকে গ্রাম্য বল্‌দে ঘোড়া সায়েস্তা করে করে তিনি এ কাজে যে বেশ ওস্তাদ হয়েছেন, তাও বললেন।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'তোমার ঘোড়ায় চড়া দেখে খুব খুশি হয়েছি। আমাদের জমিদারিতে আরো দু-একটি ঘোড়া কিনতে হবে। তুমি তো মুহুরিগিরিও জান, উকিল সেরেস্তার কাজকর্মও করেছ। আমাদের এস্টেটে চাকরি করবে?'

দক্ষিণাবাবু হাতে চাঁদ পেয়ে গেলেন ; চাকরিটাও করা হবে আর শিলাইদহ কাছারির ভাল ভাল ঘোড়াগুলোতে মজা করে চড়তেও পারবেন। সানন্দে রাজি হলেন তিনি। বাবুমশাই একটা কাগজে এক হুকুমনামা ম্যানেজারের বরাবরে লিখে দক্ষিণাবাবুর হাতে দিয়ে বললেন, 'শিলাইদহে গিয়ে এই চিঠি ম্যানেজারবাবুর কাছে দিলেই তোমার চাকরি হবে, যাও।'

দক্ষিণাবাবু শিলাইদহে এসে জমা-সেরেস্তার মুহুরির পদে নিযুক্ত হয়ে গেলেন। একটা ভাল দেশী ঘোড়া কিনবার ভারও তাঁর উপর পড়ল।

রবীন্দ্রনাথ নিজে যৌবনে ঘোড়ায় খুব কমই চড়তেন শোনা যায়,—তাঁর প্রিয় বাহন ছিল বজরা, নৌকাপথ নিতান্ত না থাকলে পালকি চেপে মহালে বেড়াতেন। পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথের মহাল পরিদর্শনের কাজের সুবিধার জন্য তিনি দুটো ভাল ঘোড়া কেনবার জন্যও দক্ষিণাবাবুকে উপদেশ দেন। রথীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথের জমিদারি কাজের হাতেখড়ি তিনিই দিয়েছিলেন নানা ভাবে—নানা কাজের ভার চাপিয়ে।

দক্ষিণাবাবু দুবেলা জমা-সেরেস্তার কলম পেষেন। মুহুরিগিরি আর ঘোড়-সওয়ারগিরি ছাড়াও তাঁর আরও কটি গুণ ছিল। তিনি বেশ ভাল খোল বাজাতে পারতেন, যাত্রাগানের দিকেও তাঁর খুব ঝোঁক ছিল। খোলের বাইন আর যাত্রাদলের পাণ্ডাগিরিতে তিনি সবারই খাতির পেতেন। তা ছাড়া, তিনি বামুনের ছেলে; নিজে খেতেও পারতেন বেশ, আবার ব্যাপার-বিধানে কোমরে গামছা বেঁধে খুব ভাল পরিবেশন করতে পারতেন।

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে এলেই দক্ষিণাবাবুর খোঁজ করতেন, প্রায়ই ডেকে পাঠাতেন নিজের কাছে,—নিজের অনেক কাজের ভারও দিতেন তাঁর উপরে। দক্ষিণাবাবুর হাতের লেখা বেশ স্পষ্ট গোটা গোটা, জমিদারি সেরেস্তার মত জড়ান নয়। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে এলেই দক্ষিণাবাবু জমা-সেরেস্তার কলম ছেড়ে স্বয়ং বাবুমশায়ের খাস কর্মচারী হয়ে যেতেন।

এদিকে বাবুমশাই যে দক্ষিণাবাবুর নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখতেন তা দক্ষিণাবাবু জানতেন না; সাধারণ আমলাফয়লার মত ভয়ে ভয়ে দূরে দূরে থাকতে চাইতেন, কিন্তু বাবুমশাই যেন কী করে তাঁর সত্যিকার পরিচয় পেয়ে গেছেন সেইটাই আশ্চর্য। নানান বাতিকগ্রস্ত দেলখোলাসা এই গ্রাম্য লোকটি তখনও পাকা মুহুরি বনে যান নি, তা তিনি অন্যান্য আমলাদের কথায় বেশ বুঝে নিয়েছেন।

একদিন কী কারণে যেন কুঠিবাড়িতে খানাপিনার বিশেষ রকম আয়োজন হচ্ছে। স্বয়ং মৃণালিনী দেবী রান্নাঘরে খুব ব্যস্ত আছেন। দক্ষিণাবাবু নানা রকম ফাইফরমাশ খাটছেন—মাছ, দুধ, মিষ্টি, তরিতরকারির আয়োজনে। ঠিক দুপুরবেলা বাবুমশাই হঠাৎ দক্ষিণাবাবুকে ডেকে বললেন, 'ওহে, তুমি নাকি নিজেকে পেটুক বামুন বলে পরিচয় দাও? আজ দেখব, তুমি কেমন খানেওয়ালা।'

সেখানে মৃণালিনী দেবীও ছিলেন। তিনিও বললেন, 'দক্ষিণা, কেমন খেতে পার তুমি, আমিও দেখব। খেতে বস গে যাও।'

দক্ষিণাবাবু ভোরেই স্নান সেরে কয়েকটা মালদহি আম আর কাঁচাগোল্লা দিয়ে জলযোগ সেরেছিলেন। বেলা হয়েছে, খিদেও পেয়েছে বেশ, নিচের তলায় গিয়ে খেতে বসলেন। আহারের প্রাথমিক পর্ব শেষ হতে না হতেই কবিগৃহিণী দক্ষিণাবাবুর সামনে এসে বসে বললেন, 'তোমাদের দেশের দই খুব ভাল,—দই খাও। দক্ষিণাকে আম দাও।' বলে পাচককে হুকুম করলেন।

এমন সময়ে গুন্-গুন্ করে আপন মনে গাইতে গাইতে বাবুমশাইও সেখানে এসে উপস্থিত। দক্ষিণাবাবুর থালায় তখন দই আম আর মিষ্টি প্রচুর রয়েছে, তবু কবিগৃহিণী 'এটা আন, ওটা খাও, অমুক মিষ্টি আরও কটা খাও' বলছেন দেখে তিনি বলে উঠলেন, 'ও বেচারি খেতে পারে বলে কি ওকে জবরদস্তি করে খাওয়াচ্ছ? অতিরিক্ত খেলে ওর যে কষ্ট হবে, তা কি জান না?' তবু কবিগৃহিণী ছাড়েন না, তিনি তাঁর দেশের অনেক বৃকোদর খানেওয়ালার উদাহরণ দিতে লাগলেন। এদিকে দক্ষিণাবাবুর আর গলাধঃকরণ করার সাধ্য নেই। শেষে রবীন্দ্রনাথ 'ছোট মাকে' বললেন, 'তোমাদের দেশের বামুন আর আমাদের দেশের বামুনে অনেক তফাৎ। এদেশের লোক অত মিষ্টি খেতে পারে না। ওকে আর দিও না। ওর অসুখ করবে।'

একদিন রবীন্দ্রনাথ হেসে বলেছিলেন, 'নিজেকে তুমি পেটুক বামুন বলে জাহির ক'রে থাক। আমাদের আশ্রমের ছাত্র-শিক্ষকদের খাওয়া-দাওয়ার সুব্যবস্থা হতে পারবে এই পেটুক বামুনের দ্বারায়। যারা নিজেরা খেতে পারে তারা পরকেও খাওয়াতে জানে। দক্ষিণা, তোমাকে আমার আশ্রমের সব চেয়ে কঠিন কাজের ভারটা দিলুম। দেখব তুমি পেটুক বামুন বলে যে বড়াই কর তা সত্যি কিনা।'

দক্ষিণাবাবু সেকালের শান্তিনিকেতনের ম্যানেজারিও কিছুকাল করেছিলেন। এই কাজ করবার সময় রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে তাঁকে বলতেন, 'দক্ষিণা, এ কিন্তু জমিদারির কাজ নয়। এতে চাই স্নেহ-ভালবাসা আর সেবার আকাঙ্ক্ষা, এতে আনন্দ পাবে।' এই কাজে তিনি বাবুমশাইকে খুব খুশি করেছিলেন।

দক্ষিণাবাবু বেশ আমুদে লোক ছিলেন। সঙ্কীর্তনে নেচে নেচে খোল বাজাতে, যাত্রার দলে মৃদঙ্গ বাজাতে, কমিক পার্ট করতে, ব্যাপার-বিধানে কোমর বেঁধে পরিবেশনের থালা হাতে সর্দারি করতে তাঁর জুড়ি ছিল না। এতে

জমিদারির কাজে গাফিলতি হয় বলে একবার তাঁর চাকরি যায়, কিন্তু বাবুমশাই নিজে তাঁকে বহাল করে দেন। তিনি ম্যানেজারকে একবার বলেছিলেন, 'সকল লোকই এক রকম হয় না। দক্ষিণা সরল আমুদে লোক,—একটু হুজুগ চায়। তাকে তার উপযুক্ত কাজই দিতে হয়।'

দক্ষিণাবাবু কিছুদিন পরে তদারগ-নবিশ (ইন্সপেক্টর) হয়ে যান। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে এলে তিনি তাঁর খাস কর্মচারী হয়ে যেতেন এবং তাঁর সঙ্গে সময়ে সময়ে কলকাতা, শান্তিনিকেতন, পতিসর যেতেন। নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে অনেক কাজ বেশ তৎপরতার সঙ্গে করতেন বলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে খুব ভালবাসতেন, আবার মাঝে মাঝে বললেন, 'এই কাজটা নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কর দেখি, আমার কাছে আর কিছু জিজ্ঞাসা করো না।'

দক্ষিণাবাবু নিজের মনোমত করে কাজটা হাসিল করে বাবুমশায়ের সুখ্যাতি পেতেন। আগেই বলেছি, দক্ষিণাবাবুর যাত্রাগানের খুব শখ ছিল। সেবারে শিলাইদহে কাত্যায়নী পূজার মেলার সময় আসছে। রবীন্দ্রনাথ এই মেলায় উৎসাহদাতা দিলেন। হিন্দুশাস্ত্রমতে কাত্যায়নী পূজাতেও তাঁর উৎসাহ ছিল। মেলার কিছুদিন আগে তিনি একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন—'এই উপলক্ষে দক্ষিণাদের যাত্রাগানও শোনা যাবে। কেমন দক্ষিণা, তোমার যাত্রাভিনয় হবে তো ?'

দক্ষিণাবাবুর মনের চাপাপড়া শখটা এই কথায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তিনি বাড়ির কাজ উপলক্ষে দেশে গিয়ে নানা রকম যোগাড়যন্ত্র করে তাঁদের নিজেদের যাত্রার দল শিলাইদহে আনালেন। মহাসমারোহে ঐ মেলায় তাঁদের যাত্রাভিনয়ের আয়োজন হল। তাঁদের যাত্রা শোনবার জন্য তিনি ম্যানেজার-বাবুকে দিয়ে বাবুমশাইকে বিশেষ করে নিমন্ত্রণ করলেন।

যাত্রার আসর লোকে লোকারণ্য; স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শ্রোতা, তাঁর সঙ্গে আরও কে কে যেন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত শ্রোতাও ছিলেন। যাত্রা আরম্ভ হল। কমিক পার্টও দুই-এক দৃশ্যে হল; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হাসলেন না, বোধ হয় অভিনয় তাঁর ভাল লাগছিল না।

দক্ষিণাবাবু বাবুমশায়ের গম্ভীর মূর্তি দেখে একবার ভাবলেন, তিনি কমিক পার্ট করে বাবুমশাইকে হাসাবেন, আবার ভয়ও হল—তাঁর ফাজলামি অথবা গ্রাম্য ছ্যাবলামি দেখে বাবুমশাই রাগতেও তো পারেন। কি জানি, মনিব তো বটে! 'যা থাকে বরাতে' বলে দক্ষিণাবাবু একটা বিশিষ্ট কমিক পার্ট নিয়ে অদ্ভুত

কিম্ভূত-কিমাকার বেশে আসরে নেমে ঢাকাই বাঙালের অভিনয় করলেন, কিন্তু অবিকল ঢাকাই কথার সঙ্গে 'হ্যানে আইছ কিয়ের লাগ্যে' এই রকমের পাবনা জেলার বুলিও ঝাড়লেন। শ্রোতারা তো সবাই হেসে কুটপাট। দক্ষিণাবাবু অভিনয় করতে করতে লক্ষ্য করলেন, এতক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে থাকা বাবুমশাইও সত্যি হেসেছেন।

এর পরে দক্ষিণাবাবু বাবুমশাই তাঁর ফাজলামি দেখে কী ভেবেছেন ভেবে, ভয়ে ভয়ে তাঁর সামনে আসা-যাওয়া করেন; কিন্তু একদিন রবীন্দ্রনাথই বলে ফেললেন 'দক্ষিণা, তুমি সেদিন ঢাকাই আর পাবনাই বুলির খিচুড়ি বানিয়েছিলে, কিন্তু বুড়ো সেজেছিলে কি বুড়ি সেজেছিলে, তা ঠিক করতে পারি নি। সাজটা ভাল হয় নি।'

দক্ষিণাবাবুর দুইবার স্ত্রী-বিয়োগ হয়, সংসারে বিপদ-আপদে মুষড়ে পড়েন, মাঝে মাঝে কাজেরও ভুল হয়। একদিন কি যেন একটা কাজে তিনি কিছু অন্যমনা হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হতাশভাবে চেয়ে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি তা এড়ায় নি। তিনি অতি মিষ্টস্বরে সহানুভূতির সঙ্গে বলেছিলেন, 'সত্যিই তো এই বয়সে তোমার দু'দুবার পত্নী-বিয়োগ হল। আচ্ছা দক্ষিণা, এবার তোমার বিয়ের সময় আমি তোমার জন্যে দিব্যি একটা ফুট্‌ফুটে বৌ খুঁজে এনে দেব।' এই কথা মুখের উপর শুনে দক্ষিণাবাবু মরমে মরে গেলেন, তিনি তখন বাবুমশায়ের সমানে থেকে পালাতে পারলে বাঁচেন।

জমিদারির অল্প বেতনভোগী কর্মচারীদের প্রত্যেককেই বিনা নজরে কিছু কিছু চরের জমি দেবার হুকুম দেন রবীন্দ্রনাথ। 'ছাম' করে সেই জমি মাপ করা হচ্ছে। এ জমি মাপার ভার একজন আমিন আর দক্ষিণাবাবুর উপর। কেউ বলতে লাগল,—'আমলাবাবুরা খাসা জমি পেয়ে গেলেন'; আবার কেউ বল্লেন,—'রামঃ, ওসব বালি, নইলে বিনে পয়সায় পায়?' কথাটা রবীন্দ্রনাথের কানে যায়। তিনি একদিন বললেন, 'দক্ষিণা, চলো চরে। আমি নিজে তোমাদের "আমলার ছাম" দেখব।'

দক্ষিণাবাবু ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেও বাবুমশাই কিছুতেই শুনলেন না, জুতো পায়ে দিয়ে চললেন চরে তাঁর সন্দেহ নিরসন করতে। চরের 'নেওয়াল' মাটিতে খুঁটো গেড়ে ছাম ভাগ হচ্ছে। পাশেই 'জ্যৈষ্টকর' জমির ছাম করা হয়েছে, তাতে থক্‌থকে পলিমাটি চিকচিক্ করছে।

রবীন্দ্রনাথ হাঁটতে হাঁটতে আমিনের শিকল ছাড়িয়ে একেবারে সোজা ঐ

ছামের মধ্যে চলে গেছেন। সেখানে ভীষণ কাদা, জুতো কাদার মধ্যেই ঢুকে রইল। হাঁটু-সমান কাদা পায়ে তিনি বহু কষ্টে নিকটস্থ এক ডিঙির উপর বসলেন। কর্মচারীরা বরকন্দাজেরা ভয়ানক ব্যস্তসমস্ত হয়ে তাঁর কাছে ছুটে এল; বলল, 'এ কী করলেন হুজুর, আমাদের আগে আগে না জেনে শুনে এই কাদার মধ্যে এত কষ্ট করে এলেন! আমরাই সব দেখাতুম।'

রবীন্দ্রনাথ এই কথার উত্তরে হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন, 'তোমরা সবাই যাচ্ছেতাই জমি বেছে দিচ্ছ, তাই জমি নিজেই আমাকে চেপে ধরে তার অবস্থাটা আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে।' এই বলে তিনি আবার হো-হো করে হেসে উঠলেন।

জমিদারির আমলা

রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর জমিদারির আমলাদের কিরকম দুর্গতি হত তারই একটা কাহিনী বলব। রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহে জমিদারি দেখাশুনা করতেন সে সময়ে তিনি পদ্মায় বোটে বাস করতেন। বোটখানা শিলাইদহ কাছারির নিকটস্থ কুঠির হাটের কাছে বাঁধা থাকত। শিলাইদহ কাছারির আমলারা সকালে বিকালে জমিদারির কাগজপত্র নিয়ে তাঁর সঙ্গে সেখানে আলোচনা করে আদেশ নিয়ে যেতেন।

শরৎচন্দ্র সরকার নামে একজন অতি বিচক্ষণ চাণক্য-মার্কা আমলা ছিলেন। তাঁর পদ ছিল 'পেশকার'-এর (অর্থাৎ যিনি কাগজপত্র বুঝিয়ে পেশ করেন)। তিনিই অধিকাংশ সময় বোটে গিয়ে বাবুমশায়ের কাছে দরকারি কাগজপত্র পেশ করে আদেশ-উপদেশ আনতেন। শরৎবাবু ছিলেন জমিদারি-সেরেস্তার ঝানু আমলা; ক্ষুরধার বুদ্ধি আর পাকা বৈষয়িক বলে তাঁর খুব নাম ছিল। গানবাজনার শখও তাঁর ছিল।

জমিদারির একঘেয়ে নানা আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে শরৎবাবুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বাঙলা দেশের সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে একটু-আধটু আলোচনা জুড়ে দিতেন। জমিদারির আমলা বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতেন না। একদিন শিবু সা'র কীর্তনের কথা তুলে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবধর্ম ও রসতত্ত্ব নিয়ে একটুখানি

আলোচনা করে শরৎবাবুকে দু-একটা প্রশ্ন করলেন। শরৎবাবু তো ফাঁপরে পড়ে গেলেন; কি করবেন ভেবে চিন্তে তিনি চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের দু'চারটা পদ আউড়িয়ে তাঁর আন্দাজি একটা মতামত দিয়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ একটু হেসে তাঁর কথাগুলো শুনলেন। ঐ রকম আর একদিন হিন্দুসমাজের অস্পৃশ্যতার আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ রামমোহন, কেশব-চন্দ্র প্রভৃতির আলোচনার সূত্র ধরলেন। শরৎবাবু এই মহাবিপদে পড়ে মাথা চুলকিয়ে দুতিনবার কেশে 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ' ইত্যাদি বচন ঝেড়ে অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে তাঁর মতামত বলে রেহাই পেলেন; এই রকমই চলত মাঝে মাঝে। রবীন্দ্রনাথ বেশ বুঝতেন বেচারা অল্প-জলের মাছ; নেহাৎ জমিদারির আমলা মাত্র। আলাপ জমত না, কিন্তু তবু রবীন্দ্রনাথ ছাড়তেন না।

শরৎবাবু বাসায় এসে সহকর্মীদের কাছে বলতেন, 'ভারি মুশকিল বাবু-মশায়ের সঙ্গে কথা কওয়া। মামলা-মোকদ্দমা, ফৌজদারিফাদা, জমাবন্দি, জলিজ্যৈষ্টকর, হিসাব-নিকাশ এইসব নিয়ে যতক্ষণ আলোচনা চলে, ততক্ষণ বাবুমশাই বুঝতে পারেন যে শরৎ সরকার একখানা চীজ। আবার চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, শঙ্করাচার্য রামমোহন এসে পড়লেই আমার বিপদ। আমি কি বলতে কি বলে ফেলি পাগলের মত, চণ্ডীদাসের সেই 'দাও মা আমায় তবিলদারি।' এ এক মহা ফ্যাসাদ, আমার তখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে আসে, ছাড়া পেলে ঘাম দিয়ে আমার জ্বর ছাড়ে। কি করি,, আপনারা তো মশাই আমাকে বোটে পাঠিয়েই খালাস; সেখানে গিয়ে আমার কি দশাটা যে হয়—'

এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য শরৎবাবু এক ফন্দি আঁটলেন। জমিদারির কাজ শেষ হবা মাত্রই যাতে অন্য প্রসঙ্গ না এসে পড়ে সেজন্য আগে থেকেই আলোচনাগুলো হালকা করে নিজ অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ টেনে আনতেন যাতে রামমোহন শঙ্করাচার্য নিয়ে বিপদ ঘনিয়ে না আসে। এইসব গল্প শরৎবাবু সবিস্তারে আমাদের শোনাতেন। তিনি অমনি জিজ্ঞাসা করতেন, 'হুজুর, গরুর দুধটা খেয়ে এখন কেমন আছেন? নিধু ঘোষের বড় কালো গাইয়ের দুধ। খুব ভালো দুধ।' আবার সঙ্গে সঙ্গে মাসকাবারি হিসেবের প্রজার আমানতের জমাখরচ সমস্যা বা বৃষ্টি আদৌ হচ্ছে না, চাষবাসের ক্ষতি হচ্ছে—এইসব প্রসঙ্গ তুলে আলাপ-আলোচনা নিজের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে যেতেন। রবীন্দ্রনাথ তার জবাব দিতেন। ঠাট্টাও করতেন, 'শরৎ, মাছমাংস খাও তো? কোন্ মাছটা খেতে সুস্বাদু বলতো' ইত্যাদি রসিকতাতেও তিনি ছিলেন অসাধারণ।

ঠিক এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ নিজে ছিন্নপত্রে লিখেছেন অতি সুন্দর একটি কথা :

'শিলাইদহ, ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৯৪—* * * সকাল সকাল বেড়াতে বেরোই। যতক্ষণ না শরৎ আসে ততক্ষণ মনটাকে শান্তশীতল করে নিই। তারপর হঠাৎ শরৎ এসে যখন জিজ্ঞাসা করে, 'আজ দুধ খেয়ে কেমন ছিলেন' কিংবা 'আজ কি মাসকাবারি হিসাব দেখা শেষ হয়ে গেছে,' তখন বড় খাপছাড়া শুনতে হয়। আমরা নিত্য এবং অনিত্যের ঠিক এমন মাঝখানে পড়ে দুই দিকের ধাক্কা খেয়ে চলে যেতে থাকি। যখন আধ্যাত্মিক কথা হচ্ছে তখন গায়ের কাপড় এবং পেটের খিদের কথা আনলে ভারি অসংগত শুনতে হয়, অথচ আত্মা এবং পেটের খিদে চিরকাল একত্রেই যাপন করে এল।' ... *

বামাচরণ ভট্টাচার্য বলে আর একজন আমলা ছিলেন, তিনি একটু শিক্ষিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ অনেক বিষয় আলোচনা করে বুঝলেন—এ ব্যক্তি ছড়া, পাঁচালি, লোকপ্রবাদ প্রভৃতির ভক্ত। বামাচরণবাবুকে রবীন্দ্রনাথ ঐরকম ছড়া, পাঁচালি প্রভৃতি সংগ্রহের ভার দেন। আমি বামাচরণবাবুর কাছে মাঝে মাঝে পড়তে যেতাম। দেখতাম তাঁর একখানা প্রকাণ্ড খাতা—তাতে অসংখ্য ছেলেভুলানো ছড়া, পাঁচালির গান বোঝাই। আবার গ্রাম্য

* ছিন্নপত্র, পৃঃ ৩১৩-১৪।

এইখানে একটা ভুল আছে বলে মনে হয়। ছিন্নপত্রাবলীতে (১৩৬৭ সালে ছাপা) 'শ' এর জায়গায় 'শৈ' ছাপা হয়েছে। এতে শরৎ সরকার পেশকারের স্থানে তখনকার অপর কর্মচারী শৈলেশ মজুমদার-এর কথা মনে হতে পারে। আমার এই কাহিনী শরৎ সরকারের নিজের মুখে শোনা, আমার ভুল হতে পারে না। ১৩৪৫ সালে ছাপা 'ছিন্নপত্র' দেখুন। শৈলেশ মজুমদার মশাই কবিবন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের ছোট ভাই। তিনি ছিলেন শিক্ষিত। কলিকাতায় মজুমদার প্রেসের কাজকর্ম পরে তিনিই করতেন। ঐ প্রেসে রবীন্দ্রনাথের কিছু বই ছাপা হয়েছিল। নূতন সংস্করণে ১৮৯৪ সালের ১১ ডিসেম্বরের চিঠিতে (৭ই ডিসেম্বর নয়) আবার 'শৈ' ছাপা হয়েছে। এর সংশোধন আবশ্যক। অনেক জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে কবি একাকী বোট ছেড়ে চরে ভ্রমণ করতেন। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় নামক একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক কর্মচারীও কবির এই সময়কার চরভ্রমণে সঙ্গী হতেন। তাঁর উল্লেখও ছিন্নপত্রাবলীতে আছে। এই ঠাকুরদাসবাবু কবির 'মন্ত্রীঅভিষেক' প্রবন্ধের সমলোচনা লেখেন। শৈলেশবাবু কলিকাতায় ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) পত্রিকার ও মজুমদার লাইব্রেরির পরিচালনার কাজ করতেন। শিলাইদহের ও শান্তিনিকেতনের সুশিক্ষিত কর্মচারী হরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কবির নৌকাডুবি উপন্যাসের উপসংহার রচনা করে কবিকে দেখান। কবি তাঁর লেখা সংশোধন করে যে রূপ দেন তা পুস্তকাকারে ছাপা হয়েছে।

শব্দের একটা সংগ্রহ তাঁকে করতে হয়েছিল বাবুমশায়ের উপদেশে। মরমি পল্লীকবি লালন সাঁই-এর সমস্ত গানের নকলও বামাচরণবাবু করেছেন। তিনি বলতেন, 'বাপু আমার জমিদারি সেরেস্তার এ এক নতুন চাকরি।'

বাঙলার প্রাণের খবর রবীন্দ্রনাথ এমনি করেই নিতেন, তাঁর অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত জমিদারির আমলাদের কাছ থেকেও। আজ আমরা এসব খবর রাখি কি?

লৌকিক ব্যবহার

রবীন্দ্রনাথ যে উচ্চবংশ ও সংস্কৃতির মধ্যে জন্মেছিলেন তাতে অতি সাধারণ গ্রাম্য অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত লোকদের সঙ্গে তাঁর মেলামেশার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল। এটা খুবই স্বাভাবিক, কারণ আমাদের দেশে কাঞ্চনকৌলিন্য ও মার্জিত রুচির সঙ্গে সঙ্গে আভিজাত্যের এমন একটা কঠিন আবরণ দেশের শিক্ষিত সমাজকে আবৃত করে ফেলে যে তথাকথিত বড়লোক ও সাধারণ লোকের মধ্যে একটা স্বাভাবিক দুরূহ পার্থক্য দেশের নাড়ীর সঙ্গে বড়লোকদের সংযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তাই দেশের শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত কৃষক ও গৃহস্থ আজও সমাজে ও রাষ্ট্রে এমন তলিয়ে গেছে যে, তার প্রতিকার অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জমিদার; কিন্তু তথাকথিত সাধারণ জমিদার নন, সত্যিকার প্রজাহিতৈষী জমিদার। তাঁর মত অভিজাত জমিদারকে দেখে তাঁর অপরিচিতেরা তাঁকে সমীহ করে চলতেন কিন্তু প্রজা বা কর্মচারীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে কী আশ্চর্য কৌশলে প্রাণখোলাভাবে মিশতেন তা একটা ভাববার জিনিস। এটা তাঁর কবিচিত্তের লীলা। এসব কথা আজ অতি অল্প লোকেই জানেন। সুসভ্য মার্জিত রুচি ধনীর বা বিখ্যাত মনীষীদের সঙ্গে তাঁর আচার ব্যবহারের কাহিনী অনেকেই জানেন। আজ কয়েকটি বিস্মৃত-প্রায় সত্য কাহিনী বলব যাতে তাঁর লৌকিক ব্যবহার কতখানি মধুর, সরল অন্তরঙ্গ ছিল তা বুঝা যাবে। এমন খোলাখুলি ব্যবহার তাঁর মত লোকের কাছে কেউ আশাও করতে পারত না। সকলেই জানেন, অতি সাধারণ লোকের সঙ্গেও

রবীন্দ্রনাথ নিজে-হাতে লিখে পত্র ব্যবহার করতেন, সেক্রেটারিদের দিয়ে লেখাতেন না। তাই আমাদের মত অতি সাধারণ লোকের ঘরেও সেই অলোকসামান্য মহাপুরুষের স্বহস্তলিখিত চিঠি সযত্নে রক্ষিত দেখা যায়।

আমার এই গ্রন্থে যজ্ঞেশ্বরের সিদ্ধিলাভের কাহিনী আছে। যজ্ঞেশ্বরবাবু যখন রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকো বাড়িতে চাকরির উমেদার ছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ যজ্ঞেশ্বরবাবুকে বড় সুন্দর কথাটা বলেছিলেন, 'ছাখো যজ্ঞেশ্বর, তুমি জমিদারির আমলাগিরি চাইছ, তোমায় আমি তা করে দেবো; যে মাইনে পাবে তাতে তোমার কষ্টেসৃষ্টে চলে যাবে, পরে তোমার কৃতিত্ব অনুসারে তোমার পদ ও মাইনের উন্নতি হবে; কিন্তু সাবধান, গোড়া থেকেই কাঁচা পয়সার লোভ করলে তোমার অনেক টাকা উপার্জন হবে, কিন্তু তাতে লাভের মধ্যে চাকরিটুকু হারাবে। কাঁচা পয়সার লোভ বড় ভয়ঙ্কর লোভ।' এই বলে তিনি পরমাত্মীয়ের মত হো-হো করে হেসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মানুষ চিনবার একটা অসাধারণ ক্ষমতা ছিল—বৈষয়িক অভিজ্ঞতাও ছিল প্রচুর। তিনি জানতেন যজ্ঞেশ্বর পরের গোলামি করতে পারবে না। তার ব্যবসাবুদ্ধি আছে, তাতেই তার উন্নতি হবে। তাই তিনি যজ্ঞেশ্বরবাবুকে ব্যবসা করবার সুবিধা করে দিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়েছে।

আর একবার তিনি তাঁর জনৈক কর্মচারী সতীশচন্দ্র ঘোষকে বেশ মজার অথচ বড় উপদেশপূর্ণ কথা বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বাচনভঙ্গিও ছিল এমন সুন্দর ও সরস যে তা অনেকের মুখস্থ হয়ে যেত। সতীশবাবু তখন এস্টেটের সার্ভেয়ারের পদ থেকে প্রমোশন পান চর-বিভাগের ম্যানেজারিতে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ব্যবস্থাতেই। তিনি সতীশবাবুর কৃতিত্ব ও সততার পরিচয় পেয়েছিলেন—তাই এই পুরস্কার।

সতীশবাবু প্রমোশন পেয়ে নতুন কাজে যাবার সময় রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করতে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মাথায় হস্তস্পর্শ করে আশীর্বাদ করে তাঁকে উৎসাহিত করবার জন্য হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'সতীশ, চরেই তুমি কৃতিত্ব দেখিয়েছ, আবার চরেই তোমায় দিলুম। জানোই তো চরের শুকনো বালি অনুর্বর নয়, এতে টাকা বড় কম জন্মায় না। তোমার বাবা তোমাকে আমার কাছে দিয়ে গিয়েছিলেন, তোমার বাবার সবগুলো গুণই তুমি পেয়েছ, কিন্তু খবরদার, একটা গুণ তাঁর তুমি কিছুতেই পেয়ো না। এই আমার আশীর্বাদ থাকলো।' বলা বাহুল্য, সতীশবাবুর পিতা গিরিশবাবু যথেষ্ট

কার্যক্ষমতা দেখিয়ে ঠাকুর এস্টেট থেকে অবসর নেবার সময়ে পুত্র সতীশ-বাবুকে রবীন্দ্রনাথের কাছে এনে চাকরি করিয়ে দেন। গিরিশবাবু খুব কর্মকুশল ছিলেন, কিন্তু তাঁর একটি মহৎ দোষ ছিল যা তাঁর কর্মকুশলতাকে সময়ে সময়ে মলিন করে তুলত, আর কর্মচারীদের দোষগুণের পরিচয় রবীন্দ্রনাথের কাছে কখনও অজ্ঞাত থাকত না। সামান্য পাইক বরকন্দাজদের কাজের দোষগুণও তিনি ভালভাবে লক্ষ্য রাখতেন। তাই জমিদারি সেরেস্তাকে সংশোধিত করবার ইচ্ছাও তাঁর জেগেছিল এবং সে ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন অনেক শিক্ষিত কর্মী যুবককে জমিদারির কর্মচারী নিয়োগ করে।

রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল। সতীশচন্দ্র ঘোষ পরে ঠাকুর-এস্টেটের ম্যানেজার হয়েছিলেন তাঁরই আদেশে এবং তিনি একাজে সুনামও অর্জন করেছিলেন।

দক্ষিণারঞ্জন চৌধুরীকে রবীন্দ্রনাথ নিজে ডেকে চাকরি দেন—তাঁর খোলা-খুলি গ্রাম্য হালচাল আর অশ্বচালনে কৃতিত্ব দেখে। দক্ষিণাবাবুর প্রসঙ্গ 'ঘোড়সওয়ার'-এ আছে। দক্ষিণাবাবু রবীন্দ্রনাথের পরমাত্মীয়-সুলভ ব্যবহার সম্পর্কিত অনেক সরস কাহিনী বলতেন।

শিলাইদহের পেশকার শরৎচন্দ্র সরকার কন্যাদায়ে বিব্রত হয়ে পড়েন। তাঁর মেয়ে ক'টিই কালো। বড় মেয়ের বিবাহের সময় রবীন্দ্রনাথ শরৎবাবুর অবস্থা শুনে বললেন, 'শরৎ, তোমার তিন-চারটি মেয়ে। ছেলেরা কালো মেয়ে পছন্দ করতে চায় না। মোটা ভাতকাপড় পায় এমন ছেলে খুঁজে মেয়ের বিয়ে দাও গে।' তিনি শরৎবাবুর দু'টি মেয়ের বিবাহে আশাতীত সাহায্য করেছিলেন। সহকর্মীরা ঠাট্টা করে শরৎবাবুকে বলতেন—'রবিবাবু থাকতে শরৎবাবুর কন্যাদায়ের ভবনা নেই।'

ফণিভূষণ চৌধুরী প্রভৃতি শিলাইদহের সেকালের গ্রাম্য যুবকেরা কীর্তনের দল নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত হলেন, তাঁরা ছেলেদের একটা শরীর-চর্চার আখড়া করতে চান আর দলের উৎসাহ সঞ্চারের জন্য বারোয়ারি কালী-পূজা করতে চান। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'বাঃ, এ গাঁয়ে ছেলে নেই কে বলে? আমি ভেবেছিলাম গাঁয়ের সবাই বুঝি বুড়ো' তিনি ছেলেদের খুব উৎসাহ দিলেন, কালীপূজা ধুমধামে সম্পন্ন করার সাহায্যের জন্য ম্যানেজারবাবুকে আদেশ দিলেন, লাঠিখেলা ও কুস্তি শেখাবার জন্য কয়েকজন নামজাদা লেঠেল আনালেন। সেটা স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। সেই বারোয়ারি কালীপূজাই

পরে গ্রাম্য ভদ্রলোকদের উৎসাহে কাত্যায়নী মেলায় পরিণত হয়। পল্লীর কীর্তন, জারি, তরজা, কবি, ভাসানযাত্রার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনতেন ; গ্রাম্য উৎসবাদি তুচ্ছ অসভ্য বা অশ্রাব্য মনে করে দু-পাঁচ মিনিট শুনেই চলে আসতেন না। দক্ষিণাবাবুর গানবাজানার খুব বাতিক ছিল। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে দক্ষিণাবাবু সদলবলে তাঁকে যাত্রাগান শুনিয়ে দেন। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ও আনুকূল্যে শিলাইদহের ছেলেরা মহাসমারোহে 'বিল্বমঙ্গল' অভিনয় করেছিল—অভিনয়ে অঘোরনাথ অধিকারী পার্ট নিয়েছিলেন। জানিপুরে শিবু সাহার কীর্তন, লালন ফকিরের গান তিনি সামাজিক উৎসবের মত কর্মচারী ও প্রজাদের নিয়ে একত্রে বসে উপভোগ করতেন।

শিলাইদহের (খোরসেদপুরের) মৌলবি নুরুদ্দিন আহম্মদ এণ্ট্রান্স পড়বার সময় হুগলি কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হবার উদ্দেশ্যে একটা সুপারিশ নেবার জন্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। রবীন্দ্রনাথ বালক নুরুদ্দিনের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, 'বেশ, এই তো চাই, তোমরা উচ্চশিক্ষা পেলেই তো আমাদের গৌরব।' তিনি উক্ত স্কুলের হেডমাস্টার ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরীর নামে যে সুপারিশ-পত্র দিয়েছিলেন তা থেকে রবীন্দ্রনাথ একজন সম্ভ্রান্ত প্রজার ছেলের উচ্চশিক্ষাবিধানে যে কত আগ্রহশীল ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সুপারিশ চিঠির ফলে মুনশি সাহেব ঐ স্কুলের বোর্ডিং-এ ফ্রি-বোর্ডার হিসাবে লেখাপড়া শিখেছিলেন।

কেরানিগিরি

শান্তিনিকেতনের অতি-শৈশব অবস্থা। তখনকার আশ্রমটি ছিল অনেকটা সেকালের তপোবনের মত, উপকরণের বিরলতার মধ্যে মানুষ গড়বার ঐকান্তিক তপস্যা। আপিস একটা ছিল খানিকটা সেকেলে বৈঠকখানার মত, তার চেয়ার টেবিল, দেরাজ, ডেস্ক, অফিসার, কেরানি ইত্যাদির বিশেষ বালাই ছিল না। কবিই আপিসের সর্বেসর্বা, কেরানি, অফিসার যাই বলুন। কবি সকালে অন্যান্য অধ্যাপকদের মত ছেলেদের পড়িয়ে নিজেই আপিসে বসতেন,

হিসেব-কিতেব, চিঠিপত্র লেখা ইত্যাদি কাজে। সুধাকান্ত রায়চৌধুরী তখন নূতন এসেছেন, তিনি আপিসের টুকিটাকি কাজে কবিকে সাহায্য করতেন। আর একটি পিওন ছিল, তার কাজ ছিল চিঠিপত্র দেওয়া-নেওয়া, পোস্টাপিসে যাওয়া, ঘর ঝাঁট দেওয়া, কিছু ফাইফরমাজ খাটা। তার নাম সতীশ।

সতীশ নূতন নিযুক্ত হয়ে কিছুদিন বেশ কাজকর্ম করল। তরুণ গ্রাম্য যুবক, ক্রমে সব হালচাল দেখেশুনে একটু ধোপদোরস্ত বাবুও বনে গেল। অনেক অধ্যাপক ও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি আপিসে আসতেন যেতেন, তাঁদের সবাইকে বলতে হত অমুকবাবু—অমুকবাবু। সবাই 'বাবু'!

সতীশের মনের দুঃখু, তাকে কেউ বাবু বলে না—সবাই বলে সতীশ। সে দেখল—আপিসে তার যা কাজ সেগুলো পিওনের কাজ, মর্যাদাহানিকর নয়, কিন্তু দৈনিক ঐ ঘর ঝাঁট দেওয়াটা দস্তুরমত চাকরের কাজ। ওটা নিতান্ত নিচ কাজ, বাবুর কাজ নয়। সে আপিসের বাবু না হক পিওন বটে, কিন্তু সে চাকর নয়। ঘর ঝাঁট দেয় চাকরবাকর—সে সেই নিচ কাজটা করে নিজের সম্ভ্রম নষ্ট করবে কেন? তার মন খারাপ হল।

সতীশ ঘর ঝাঁট দেওয়া কাজটা কমিয়ে দিল, শেষকালটা সে আপিস-ঘরটা ঝাঁট দেওয়া বন্ধ করল, দুই-তিন দিন অন্তর কাগজপত্তর ঝাড়পোঁছ করে। রবীন্দ্রনাথ আপিসে যতক্ষণ থাকতেন কাজকর্মে একেবারে মগ্ন হয়ে থাকতেন, অনেক কিছু দেখেও দেখতেন না,—সময়ও পেতেন না।

রবীন্দ্রনাথ একদিন খুব ভোরে আপিসে এসেছেন, সুধাকান্তবাবু নীরবে খামের উপর ঠিকানা লিখে যাচ্ছেন, সতীশ আপিসে নাই। রবীন্দ্রনাথ চারদিকে চেয়ে একটু ঘুরে বললেন, 'কী বিশ্রী নোংরা হয়েছে আপিসটা। যেন কতদিন ঝাঁট দেয় না সতীশ। সতীশ কোথায় সুধাকান্ত, ঘরটার কী বিশ্রী চেহারা দেখছো না'—এই বলেই ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সুধাকান্তবাবু সতীশকে খুঁজতে গেলেন। তাকে কোথাও পেলেন না, আপিসে ফিরে এসে দেখেন—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কোথা থেকে ঝাঁটাগাছ খুঁজে নিয়ে নিপুণ ভাবে ঘর ঝাঁট দিচ্ছেন, পুরোনো কাগজে ধুলোবালি জড়ো করে বাইরে ফেলে দিচ্ছেন।

সুধাকান্তবাবুর তো চক্ষু চড়কগাছ! 'আমায় দিন' বলে ঝাঁটাগাছ হাত থেকে নিতে যাবেন, এমন সময় সতীশ এসে হাজির। তারও চক্ষু চড়কগাছ। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'কি রে সতীশ, ঘরটার কি দশা হয়েছে দেখছিস না? গোয়ালঘরের চেয়েও নোংরা।' ততক্ষণ ঘরদোর বইপত্তর সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন

হয়ে গেছে। সতীশ ভয়ে বিবর্ণমুখে তাঁর সামনে হাতজোড় করে দাঁড়াল, 'হুজুর, আমায় দিন, ভুল হয়ে গেছে আর ভুল হবে না।'

রবীন্দ্রনাথ হাত-পা পরিষ্কার করে বসে হাসতে হাসতে বললেন, 'কী রে সতীশ, এই নোংরা ঘরের মধ্যে তোর ভাল লাগে ?'

সতীশের খুব ভয় হয়েছে, এবার চাকরিটা যাবেই। সুধাকান্তবাবু একটু মজা করবার জন্য ছোট্ট করে বললেন, 'সতীশ তো পিওন। ঘর ঝাঁট দেওয়াটা চাকরের কাজ, সেটা ওর মনের মত নয়।' রবীন্দ্রনাথ হো হো করে হেসে বললেন, 'সত্যিই তো সতীশ ঝাড়ুদার নয়, চাকর নয়, সতীশ তাহলে সতীশ-বাবু। কেমন সতীশ—তাই নাকি ?' এই বলে আবার খুব জোরে হেসে উঠলেন। সতীশ নীরবে রবীন্দ্রনাথের পা জড়িয়ে ধরে বলল, 'হুজুর, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। এখন থেকে দৈনিক—'

ক্ষমা করার কথা আর উঠলই না। কোন কড়া কথা বা বকুনি শুনতে হল না, চাকরিরও ক্ষতি হল না। রবীন্দ্রনাথ আবার হেসে বললেন, 'আপিস ঘরটা পরিষ্কার রাখিস—বুঝিস তো কত লোক আসে-যায়, বসে এখানে।'

মনিবের আদর্শ ও সস্নেহ উপদেশ পেয়ে সতীশের চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল। সে আর 'বাবু' হতে চায় না, কিছুতেই না।

আর একটা কাহিনী—একবার জমিদারি থেকে প্রজাদের একগাদা দরখাস্ত এসেছে সদর আপিসে, রবীন্দ্রনাথের কাছে হুকুমের জন্য। রবীন্দ্রনাথের হাতে তখন অনেক কাজ। নিজের সাহিত্যসাধনা, আর শান্তিনিকেতনের চিঠিপত্র, পড়াশুনা, অধ্যাপনা ইত্যাদি নিয়ে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত। দরখাস্তের প্রকাণ্ড গাদা একবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে তিনি আপিসে কার্যরত সুধাকান্তবাবুকে দিয়ে বললেন, 'সুধাকান্ত, এইগুলো পড়ে মোটামুটি প্রজাদের নামধাম আর প্রার্থনা কি—তারই একটা লিস্ট করে দাও তো।'

সুধাকান্তবাবু সুধাসমুদ্রের বদলে বিপদসমুদ্রে পড়ে গেলেন। সেকেলে দাড়িগোঁফওয়ালা জিলিপির প্যাঁচের মত বাংলা লেখা, অসংখ্য বানান ভুল, পাঠোদ্ধার করতে মাথা ঘুরে যায়। দরখাস্ত শুরু 'মহামহিমমহিমার্ণব শ্রীল-শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশ্রীচরণকমলেষু' আর 'ধর্মাবতার প্রবলপ্রতাপেষু' আর শেষ হয়েছে 'আজ্ঞাধীন সেবক অধম দীন সন্তান—অমুক—সাকিন অমুক।'

পুরো দুই দিন হয়ে গেল। সুধাকান্তবাবু কিছুতেই ব্যাপারটা আয়ত্তে

আনতে পারছেন না—সারাদিন ধরে দরখাস্ত ঘাঁটছেন, পাঠোদ্ধার করছেন। তিন দিনের দিন রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'আমি কাল বিকেলে বাইরে চলে যাব, লিস্টটা আজই শেষ করে দাও সুধাকান্ত। আমার তো আর সময় নেই।'

সুধাকান্তবাবু মাথা চুলকিয়ে বললেন, 'অনেক কেরানিগিরি করেছি, কিন্তু এমন বিপদে তো পড়ি নি। একে তো পড়াই যায় না—সেকেলে হরফের অদ্ভুত বাংলা লেখা, তারপর ইনিয়ে-বিনিয়ে কী সব ধানাই-পানাই লিখেছে—কিছু বুঝতেই পারছি না। আরও সময় লাগবে আমার।'

রবীন্দ্রনাথ হো হো করে হেসে বললেন, 'সে কি হে। এই সামান্য কাজটা করতে এত সময় লাগবে তোমার? জমিদারির আমলারা কেমন চটপট একাজ করে ফেলতো। তবে শোনো—এক কাজ করো—দরখাস্তের গোড়াটা আর শেষটা পড়লেই পাবে প্রজার নাম-ধাম, আর শেষের তিনচার লাইনের উপরেই পাবে তার প্রার্থনাটা কি। আর সব চোখ বুলিয়ে স্রেফ বাদ দিয়ে যাও,—যা শক্ত কথা, তার নিচে লাইন টেনে আণ্ডারলাইন করে দাও, তাহলেই দেখবে, তিন-চার ঘণ্টায় লিস্টি হয়ে যাবে। তারপরে আমি 'সেরেস্তার মন্তব্য'টা পড়েই হুকুম লিখে দেব। নাও, আরম্ভ করে দাও। কালই চাই ওটা।'

কবির জমিদারি ও কেরানিগিরির অভিজ্ঞতা দেখে সুধাকান্তবাবু অবাক হলেন। সুধাকান্তবাবু দেখলেন, সত্যিই কাজটা সহজ হয়ে গেছে। পরের দিনই সন্ধ্যার পর লিস্টি ও দরখাস্তের গাদা তিনি পেশ করলেন।*

কালীগ্রামে শেষবার

১৩৩৭ সালের জুলাই মাসের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে রবীন্দ্রনাথ শেষবার তাঁর জমিদারি কালীগ্রাম পরগণায় বেড়াতে যান। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাশিয়া থেকে তিনি রথীন্দ্রনাথকে যে চিঠিগুলি লেখেন তার মধ্যে কালীগ্রামের প্রজাদের সম্বন্ধে যে কয়েকটি মন্তব্য রয়েছে তাতে প্রমাণিত হয়, নিজ জমিদারির প্রজাদের সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার স্মৃতি রাশিয়ার বিরাট কৃষিউন্নয়ন, যৌথ-

* কাহিনী দুটিই সুধাকান্তবাবুর কাছে শোনা।

খামার প্রভৃতি বিশাল কর্মযজ্ঞের প্রত্যক্ষদর্শী কবির মনে একটা আলোড়ন এনেছিল—

জমিদারীর অবস্থা লিখেছিস। যে রকম দিন আসছে তাতে জমিদারীর উপরে কোনোদিন আর ভরসা রাখা চলবে না। ও জিনিসটার ওপর অনেক-কাল থেকেই আমার মনে মনে ধিক্কার, এবার সেটা আরও পাকা হয়েছে। যেসব কথা বহুকাল ভেবেছি, এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম। তাই জমিদারী ব্যবসায়ে আমার লজ্জা বোধ হয়। আমার মন আজ উপরের তলার গদি ছেড়ে দিয়ে নিচে এসে বসেছে। দুঃখ এই যে, ছেলেবেলা থেকে পরোপজীবী হয়ে মানুষ হয়েছি। ৩১ অক্টোবর, ১৯৩০।

পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লিখেছিলেন—

ধনী পরিবারের ব্যক্তিগত অমিতব্যয়িতার উপরে এবার আমার আন্তরিক বৈরাগ্য হয়েছে। দেনা শোধের ভাবনা ঘুচে গেলেই দেনা বাড়াবার পথ একেবারে বন্ধ করতে হবে। তা ছাড়া নিজেদের ভরণপোষণের দায়িত্ব আমাদের গরীব চাষী প্রজাদের 'পরে যেন আর চাপাতে না হয়। একথা আমার অনেকদিনের পুরনো কথা। বহুকাল থেকেই আশা করেছিলুম, আমাদের জমিদারী যেন আমাদের প্রজাদেরই জমিদারী হয়, আমরা যেন ট্রাষ্টীর মত থাকি। অল্প কিছু খোরাকপোষাক দাবী করতে পারবো, কিন্তু সে ওদেরই অংশিদারের মতো। কিন্তু দিনে দিনে দেখলুম, জমিদারীর রথ সে রাস্তায় গেল না, তারপর যখন দেনার অঙ্ক বেড়ে চলল, তখন মনের থেকেও সংকল্প সরাতে হল। এতে ক'রে দুঃখ বোধ করেছি, কোনো কথা বলি নি। এবারে যদি দেনাশোধ হয়, তাহলে আর একবার আমার বহুদিনের ইচ্ছা পূর্ণ করবার আশা করব।'

স্বদেশে ফিরেই কয়েক বছর পরে কবি নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কালী-গ্রামের প্রজাদের শেষবার দেখবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন। সে সময় কালীগ্রামের (সদর কাছারি—পতিসর) প্রজাদের কাছে থেকেও পুণ্যাহ উপলক্ষে দর্শন দেবার বহু সাগ্রহ আমন্ত্রণ এসেছিল তাঁর কাছে।

কালীগ্রামের প্রজাদের স্মৃতি তাঁর কাছে ছিল চিরদিনই বড়ো আদরের, কারণ সেখানকার প্রজাদের কাছ থেকে জীবনের বড় দুঃসময়ে যে সহানুভূতি ও সাহায্য পেয়েছিলেন, তাঁর মত দরদি মানুষের পক্ষে তা ছিল প্রকৃতই

মূল্যবান। ১৯২০ সালে আপোষ-মীমাংসায় পার্টিসন হয়ে শিলাইদহ জমিদারি (পরগণা বিরাহিমপুর) মেজদাদা স্বর্গত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (পুত্র স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর) এবং কালীগ্রাম পরগণা রবীন্দ্রনাথের ভাগে পড়ে। সেই থেকে কালীগ্রাম পরগণার প্রজাদের জন্য তাঁর হৃদয়ের মধ্যে বিশেষ সহানুভূতি ও স্নেহের টান বেশি ছিল। সে বন্ধনটি তিনি এবং তাঁর পুত্রও স্বেচ্ছায় শেষদিন পর্যন্ত ছিঁড়তে পারেন নি। সেখানে সেদিন পর্যন্তও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় ছিল। এই পরগণার শতকরা ৮০জন প্রজাই মুসলমান ও কৃষিজীবী। কালীগ্রাম উত্তরবঙ্গের একটি সমৃদ্ধ জমিদারি।

কবির সেক্রেটারি সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ও অবসরপ্রাপ্ত ম্যানেজার নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী শেষবার কালীগ্রাম ভ্রমণে কবির সহযাত্রী ছিলেন। রাজসাহির তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ও তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। আত্রাই রেল স্টেশনে নেমে পতিসর পৌঁছুবার জন্যে তাঁরা বিখ্যাত আত্রাই নদী দিয়ে বোটে রওনা হলেন, সঙ্গে ছিল কবির প্রিয়তম পুরাতন ভৃত্য বনমালী। বনমালী জাতিতে উড়িয়া। শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী দেবীর বিখ্যাত 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে কবির এই প্রিয়তম ভৃত্যের সম্বন্ধে অনেক কৌতুকপ্রদ কাহিনী আছে। বনমালী ছিল দরদি কবির উপযুক্ত সহচর। বেলা দ্বিপ্রহর! প্রখর রৌদ্রের মধ্যে বোট ছেড়েছে রেল স্টেশনঘাট থেকে; কবি বহুকাল পরে আত্রাই নদীর সাবেক চেহারা দেখবার জন্য নদীর দুইধারে চেয়ে রয়েছেন। বোটের মাঝিমাল্লারা এবং কয়েকজন চাষি-প্রজা গল্প করতে আরম্ভ করল—এবারে আল্লার কুদরতে এ অঞ্চলে আজ পর্যন্ত একেবারেই বৃষ্টি হল না—আষাঢ় মাস চলে গেল, চাষবাস সব বরবাদ হয়ে গেল। বর্ষার সময়েও একফোঁটা বৃষ্টি নেই, এই দারুণ অনাবৃষ্টিতে দুর্ভিক্ষ না হয়ে যায় না, চাষিরা সব মরে যাবে। বাবুমশাই জমিদারিতে পা দিচ্ছেন, তাই যদি আল্লার 'দোয়ায়' 'দেওয়া' (বর্ষণ) হয়।—এই রকম নানা মন্তব্য রবীন্দ্রনাথের কানে যাচ্ছিল, তিনিও এই আলোচনায় যোগ দিচ্ছিলেন।

সত্যই তাই। আত্রাই পেরিয়ে বোট পড়ল নাগর নদীতে। নদীর দুধারের সোনার খেত হাজার হাজার বিঘা, শ্মশানের দশা পেয়েছে। ধানের আধপোড়া শীষ মধ্যাহ্নসূর্যের উত্তাপে ঝাঁ ঝাঁ করছিল—আগুনের হল্‌কার মত গরম বাতাস বইছিল। ছোট নদীটিও প্রায় বিশুষ্ক। কবি প্রজাদের দু-একটি কথার জবাবও দিচ্ছিলেন। বোট ক্রমে পতিসর কাছারির দিকে অগ্রসর হতেই দুই

তীরে দলে দলে নরনারী দাঁড়িয়ে সম্বর্ধনা জানাচ্ছিল, প্রজারা সেলাম দিচ্ছিল, হিন্দু মেয়েরা হুলুধ্বনি দিচ্ছিল। কবি দু-চোখ ভরে তাদের দেখছিলেন, তাঁর শরীরও তখন ভাল যাচ্ছিল না—তবু বিশ্রামের সময়টা ভ্রমণে কাটাবেন, এই ছিল অভিপ্রায়। কিন্তু প্রজাদের ও চাষ-আবাদের শোচনীয় অবস্থায় যেন অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হয়ে বসেছিলেন, যেন কোন গভীর সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করছেন।

পতিসর কাছারির প্রায় এক মাইল দূরে বোট চলছে। এমন সময় ঘটল অদ্ভুত ব্যাপার! আকাশে কাল মেঘ দেখা দিল, মিনিট কয়েকের মধ্যে মেঘ-গর্জন, শিলাবৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বর্ষণ আরম্ভ হল। চারিদিকে কী আনন্দ! বোটের মধ্যে সবাই ঢুকে আনন্দে কলগুঞ্জন করতে লাগল। সবাই বিস্ময়ে বিমুগ্ধ, কী আশ্চর্য, বাবুমশাই জমিদারিতে পা দিতেই কী সুন্দর বর্ষণ, খোদা-তালার আশীর্বাদ নেমে এল, চাষিরা এবারে বাঁচল,—এদেশটা রক্ষা পেল। মুষলধারে বৃষ্টি, বোট চলতে লাগল, বৃষ্টি যেন অবিরাম জল ঢেলে উত্তপ্ত মাঠকে সজীব শীতল করে তুলল। বাবুমশায়ের পায়ের ছোঁয়া লেগেই সারা দেশটা আজ বেঁচে উঠল—সবাই মহানন্দে এই প্রসঙ্গ নিয়ে কলরব করতে লাগল। প্রজাদের সরল বিশ্বাসে কবি হাসতে লাগলেন।

পতিসর কাছারিতে বোট পৌঁছল, তবু বৃষ্টির বিরাম নাই। নদীতীরে ধারাবর্ষণের মধ্যেও অপেক্ষমাণ জনতার কী আনন্দ! কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি থামল। প্রজাদের জনতা প্রণাম ও সেলাম করবার জন্য বোট ঘিরে দাঁড়াল। বাবুমশাই বোটের পাটাতনে এসে কিছুক্ষণ বসে সবার কুশলবার্তা নিলেন। সবাই বলতে লাগল—খোদার দোয়া বাবুমশায়ের বেশ ধরে নেমে এলেন তাঁর জমিদারিস্তে। জমিদারির ম্যানেজার বীরেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী প্রমাদ গণলেন। যদিও সমারোহ করবার নিষেধ ছিল, তবু যে আয়োজন করা হয়েছে, তা এই প্রবল বৃষ্টিতে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। কিন্তু বাবুমশায়ের পদার্পণেই এই সুবৃষ্টির জন্য প্রজাদের সরল আনন্দ-কলরবে তিনিও হাসিমুখে অভ্যর্থনাদি নানা ব্যবস্থায় মেতে উঠলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রজাদের এই আনন্দের আতিশয্যে হাসতে লাগলেন।

সন্ধ্যা হয়ে এল,—সেদিনকার মত প্রজা-কর্মচারীদের বিশ্রাম করতে বলে বোটের মধ্যে গেলেন। রাত্রি প্রায় আটটার পর রবীন্দ্রনাথ আহার শেষ করে বোটে বিছানায় শুতে যাবেন, দেখেন ভৃত্য বনমালী তাঁর শোবার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, কিন্তু তাকে যেন খুব বিব্রত, মনমরা মনে হল। বাবুমশাই

জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী রে বনমালী, জমিদারিতে এসে ভাল লাগছে না বুঝি? তোর বিছানা করেছিস কোথায়? আজ সকাল সকাল শুয়ে পড়। কাল তো অনেক হৈ-হাঙ্গামা আছে, কাল সব দেখে বেড়াস। শুয়ে পড় তাড়াতাড়ি, তোর বিছানা কোথায়?'

বনমালী কথা কয় না, মুখে চোখে বিব্রতভাব, তার শুকনো হাসিতে তার অসহায় ভাব যেন বেশি প্রকট হয়েছে। কিন্তু নির্বাক। বোটের পাহারারত বরকন্দাজ ও মাল্লাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কী রে,—বনমালীর মন খারাপ হয়েছে—কথা কয় না যে—'

বোটের মাল্লা ভয়ে ভয়ে বলল, 'হুজুর, হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হলে বোটের ছাদের মালপত্র সব ভেতরে আনা হল, কিন্তু বৃষ্টির আনন্দে ভুল করে বনমালীর বিছানার বাণ্ডিলটা ছাদেই পড়ে রইল,—সেটা ভিজে একেবারে—'

তার মুখের কথা শেষ না হতেই কবি রেগে উঠলেন, 'কী আশ্চর্য, এত জিনিষ ছাদ থেকে নামানো হল, আর বেচারি বনমালীর বিছানাটা কারো চোখেই পড়লো না? এ অত্যন্ত অন্যায়, অদ্ভুত ব্যাপার তো! এত লোক জিনিষপত্র টেনে নামাল—কারো খেয়াল হল না এই গোবেচারির বিছানার ওপর। এখন এ বেচারি শোবে কী ক'রে? ছি ছি, ছি ছি, তোদের কী বলব। যা—এখুনি যা, ম্যানেজারবাবুকে ডেকে আন—এখুনি এর ব্যবস্থা করতে বল—' কবি বোটের মাঝিমাল্লা, বরকন্দাজ সব্বাইকে খুবই বকতে লাগলেন। অনেকদিন তারা এমন বকুনি খায় নি।

ম্যানেজারবাবু সারাদিনের পরিশ্রমের পর বাসায় সবেমাত্র খেতে বসেছেন, বরকন্দাজ-মুখে 'বাবুমশাই ভয়ানক চটেছেন' শুনেই তৎক্ষণাৎ হন্তদন্ত হয়ে ছুটলেন—একজন চাকরের মাথায় বালিশ, তোশক, চাদর ইত্যাদি চাপিয়ে। এসেই দেখেন, ভয়ানক ব্যাপার; কবি রেগে আগুন, খুব বকছেন—সবাইকে দোষ দিচ্ছেন—চুপটি করে সবাই বকুনি খাচ্ছে, কিন্তু একাজটা যে বনমালীরও কর্তব্য ছিল—সে কথা বলবার সাহস কার? বনমালী চুপটি করে বসে। মুখে কথাটি নেই।

ম্যানেজারবাবু আর একপত্তন বকুনি খেলেন। বনমালীকে গিয়ে বললেন, 'বনমালী, নে ভাই, ভালো করে বিছানা পেতে নে—এই নে ডবল বালিশ।' বনমালী একটু হেসে নিয়মমত বাবুমশায়ের বিছানার নিচে পাটাতনে পরিপাটি করে সেই বিছানা পেতে নিল। ডবল বালিশ, পাশ বালিশ! বাবুমশাই

খুব খুশি—বললেন, 'তোর বেশ বিছানা হয়েছে—শুয়ে পড় বনমালী—শুয়ে পড় চট্‌পট।'

বনমালীর বিছানাপর্ব মিটল। রাত ভোর হলেই জমিদারির পুণ্যাহ অনুষ্ঠান। তার পরের দিন অভিনন্দন-সভা, ইস্কুলেও সভা হবে। বৃষ্টিতে সমস্ত আয়োজন বরবাদ হয়ে গেছে—কারও আর বিশ্রাম নাই। কবির নিষেধ সত্ত্বেও এই ক'টি আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছে।

পরের দিন পুণ্যাহ সভা—রোশনচৌকি ও দিশি বাদ্য বাজনা আরম্ভ হয়েছে, লোকসমাগম হয়েছে অসম্ভব রকম। কারণ, দীর্ঘ বার বছর পরে কবি কালীগ্রামে এসেছেন। পুণ্যাহ আরম্ভ হবার প্রারম্ভে মাতব্বর প্রজারা বোটে এলেন কবি-জমিদারকে সভায় নেবার জন্যে। অসম্ভব জনতা চারিদিকে গিজগিজ করছে। কবি শারীরিক অসুস্থতার জন্য সভায় যেতে চাইলেন না, 'তোমরা পুণ্যাহ করো গে—আমি অনুমতি দিচ্ছি' বলে খবরের কাগজ পড়তে লাগলেন। প্রজারা হতাশ হলেন, কিন্তু ম্যানেজারবাবুর নিষেধে কবিকে আর পীড়াপীড়ি করলেন না। পুণ্যাহ শেষ হল। বিকালে প্রজাদের ভোজ ও দরিদ্র বিদায়। বুড়ো মাতব্বর প্রজারা দু বেলাতেই বোটের চারিদিক ঘিরে জমিদার-বাবুকে প্রণাম করল—কবি-জমিদার বাইরে এসে সবার কুশল প্রশ্ন করলেন।

পরদিন কবির সম্বর্ধনা সভা। প্রাতে নগর সংকীর্তন ইত্যাদির অনুষ্ঠান শেষ হল। তার পরেই হাই স্কুলের সভায় অভিনন্দন। মাস্টার মশাইরা এলেন বোটে কবিকে সভায় নিতে। কবি অসুস্থ শরীরেও ধীরে ধীরে হেঁটে গেলেন সভায়। অনেকেই বক্তৃতা করলেন; কবি সামান্য গুটিকতক কথায় তাঁদের সবাইকে উৎসাহ দিলেন—'সংসার থেকে বিদায় নেবার আগে, তোমাদের দেখে যাবো—আমার সেই আকাঙ্ক্ষা আজ পূর্ণ হল। তোমরা এগিয়ে চল,—জনসাধারণের জন্যে সবার আগে চাই শিক্ষা—এডুকেশন ফার্স্ট, সবাইকে শিক্ষা দিয়ে বাঁচাও, মানুষ করো।' অনেক বৃদ্ধ প্রজা কথা বলতে বলতে আবেগে কেঁদে ফেললেন,—কয়েকজন যুবকের উচ্ছ্বসিত ভাবা-বেগে কবির চোখও ছলছল করতে লাগল। কবি যেন ব্যথিত হলেন—একটু বিচলিত হয়ে বোটে ফিরে যাবার জন্য ইঙ্গিত করলেন,—মনে হল, বেশি অসুস্থ বোধ করছেন। পালকি করে তিনি বোটে ফিরলেন—দুধারে অগণিত জনতা জয়ধ্বনি করতে লাগল।

বিকালে কাছারির প্রাঙ্গণে সম্বর্ধনা-সভার বিরাট আয়োজন অগণিত

জনসমাগম। কালীগ্রামের প্রজারা সুদীর্ঘ বার বছর পরে তাদের প্রিয় কবি-জমিদারকে পেয়েছে নিজেদের মধ্যে। বিকালে কবিকে প্রফুল্ল দেখা গেল, সভায় যাবার জন্য নিজেই প্রস্তুত হলেন,—খুব উৎসাহের সঙ্গেই বোটের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট প্রজার সঙ্গে গল্প করলেন।

কাছারি-প্রাঙ্গণে বিরাট সুসজ্জিত অভ্যর্থনামণ্ডপ। লোকে লোকারণ্য, তিলধারণের স্থান নাই। কবি-জমিদার পালকি করে সেই বিপুল জনসমাবেশের মধ্যে এলেন। গ্রাম্য প্রজাদের এত বড় বিরাট সম্মেলন কোন জমিদারের দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে কি না জানি না।

উচ্চমঞ্চে কবি-জমিদারের জন্য সুসজ্জিত আরামপ্রদ আসন দেওয়া হয়েছে। মঞ্চের নিচে কয়েকখানা চেয়ারে সুধাকান্তবাবু, নগেনবাবু বসেছেন, একখানা আসন রয়েছে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের জন্যে। ম্যানেজার বীরেনবাবু চারিধার ঘুরে সমস্ত ব্যবস্থা করছিলেন, আর মাঝে মাঝে একখানা বেঞ্চের এককোণে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সম্মুখে বিশাল জনসমাগম, কবির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তা নীরব, টুঁ শব্দটি নেই। রবীন্দ্রনাথ মঞ্চে উঠতেই দেখতে পেলেন, ম্যানেজার বীরেনবাবু ঘর্মাক্ত কলেবরে একখানা বেঞ্চের এককোণে বসে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছেন। হঠাৎ কবি বেশ উত্তেজিতভাবে চারিদিকে চেয়ে দেখে কঠোর স্বরে বলে উঠলেন নগেনবাবুকে, 'এ কী রকম হল? জমিদারির মধ্যে এত বড় সভায় আমার ম্যানেজার, আমার প্রতিনিধি বীরেনের জন্য একটা বসবার আসনের অভাব হল! এ কী রকমের ব্যবস্থা তোমাদের? আমার অভ্যর্থনা আয়োজনের কী চমৎকার নমুনা! তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

বিরক্ত ও উত্তেজিত অবস্থায় তাঁর এই শ্লেষবাক্যে নগেনবাবু তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে ম্যানেজার বীরেনবাবুকে ধরে এনে কবির সামনে শূন্য চেয়ারখানায় বসিয়ে দিলেন। কবি একটু হাসলেন। একটু গোলমাল হল,—রবীন্দ্রনাথ হাত তুলে ইশারা করে সবাইকে শান্ত হতে বললেন। একজন শিক্ষিত মুসলমান প্রজা কবি-জমিদারের উদ্দেশ্যে অভিনন্দনপত্র পাঠ করলেন—

মহামান্য দেশবরেণ্য দেবতুল্য জমিদার
শ্রীযুক্ত কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের
পরগণায় শুভাগমন উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি—

প্রভো, প্রভুরূপে হেথা আস নাই তুমি
দেবরূপে এসে দিলে দেখা।
দেবতার দান অক্ষয় হউক্
হৃদিপটে থাক্ স্মৃতিরেখা॥

তোমার করুণাকাঙ্ক্ষী—

পতিসর, সদর কাছারী
(রাজসাহী)
১২ই শ্রাবণ, ১৩৪৪

কালীগ্রাম পরগণার রাজভক্ত প্রজাবৃন্দের পক্ষে
মো: কফিলদ্দিন আকন্দ রাতোয়াল্।

সামান্য কটি কথায় সরল সহজ প্রজাদের অন্তরের অকপট শ্রদ্ধা ও ভক্তির অভিব্যক্তি এই অভিনন্দন-পত্রটি। যিনি পাঠ করলেন তাঁর স্বর বারবার কম্পিত হচ্ছিল। কয়েকজন বৃদ্ধ প্রজা শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন, অনেক পুরানো কাহিনী সরল গ্রাম্যভাষায় অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বিবৃত করলেন। কয়েকজন যুবক কবির দীর্ঘজীবন কামনা করে তাঁদের অনন্যসাধারণ সৌভাগ্যের কথা নিবেদন করলেন; কেউ এই ভয়ানক অনাবৃষ্টির বৎসরে তাঁদের প্রাতঃস্মরণীয় কবি-জমিদারের পদার্পণের সঙ্গে সুবর্ষণের কথা উল্লেখ করে 'আমরা দেবতার রাজ্যের প্রজা' বলে বেশ একটু আন্দোলন সৃষ্টি করলেন।

রবীন্দ্রনাথ বসে বসেই বললেন, 'সংসার থেকে বিদায় নেবার সময় তোমাদের সঙ্গে দেখা হল—এইটিই আমার সান্ত্বনা। তোমাদের কাছে অনেক পেয়েছি,—কিন্তু কিছু দিতে পেরেছি বলে মনে হয় না। সেসব কথা মনে হলে বড়ো দুঃখ পাই। কিন্তু আর সময় নেই, আমার যাবার সময় হয়েছে, শরীর আমার অসুস্থ—এ অবস্থায় তোমাদের মধ্যে এসে, তোমাদের সঙ্গে থেকে তোমাদের উন্নতির জন্য কিছু করবার খুব ইচ্ছা থাক্‌লেও, আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। তোমরা নিজের পায়ে দাঁড়াও,—তোমাদের সবার মঙ্গল হোক— তোমাদের সবাইকে এই আশীর্বাদই আমার শেষ আশীর্বাদ।'

এই কটিমাত্র কথা প্রজাদের মধ্যে, বিশেষ করে বৃদ্ধদের মধ্যে একটা গভীর আবেগের সৃষ্টি করল, অনেকে চোখ মুছতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথও অত্যন্ত বিচলিত হয়ে—আজ তোমাদের সবার কাছে বিদায় নিতে এসেছি। তোমরা আমার বড় আপন জন, তোমরা সুখে থাকো!'—বলে নীরব হলেন। দুটি চোখ তাঁর ছলছল করতে লাগল—স্বর অবরুদ্ধ হয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথের কথাগুলো সভায় বিরাট জনতা নীরবে শুনছিল। কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার বললেন, 'তোমাদের জন্যে কিছুই করতে পারি নি। ইচ্ছা ছিল, মান সম্মান সম্ভ্রম সব ছেড়ে দিয়ে তোমাদের সঙ্গে তোমাদের মতই সহজ হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেব। কী করে বাঁচতে হবে তোমাদের সঙ্গে মিলে সেই সাধনা করব; কিন্তু আমার এই বয়সে তা হবার নয়, আমার যাবার সময় হয়ে এসেছে। এই নিয়ে দুঃখ করে কি করব? তোমাদের সবার উন্নতি হোক,—এই কামনা নিয়ে আমি পরলোকে চলে যাব—' কবি অসুস্থ; আর বেশি কিছু না বলে বোটে ফিরবার জন্যে সংকেত করলেন।

পরের দিন বিকালে কর্মচারীদের বাড়ির মেয়েরা নানারকম খাবার তৈরি করে নিয়ে কবির বোটে তাঁকে প্রণাম করতে এলেন। নানারকম পিঠে, আচার প্রভৃতি দেখে খুব সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'আমার খাওয়া হয়ে গেছে, বড় খুশি হলাম এইসব দেখে, খেয়ে আর কত খুশি হব?' মেয়েরা অতি সংকোচে কথা বলছেন দেখে বললেন, 'আমাকে ভয় করছ কেন? একটা গল্প বল দেখি শুনি। আচ্ছা, তুমি বলো, তোমার বাপের বাড়ির গল্প। আচ্ছা তুমি বলতো,—কী খেতে তোমার ভাল লাগে? কোন্ রান্নাটা ভালো।' অনেক সাধ্যসাধনার পর দুই একজন মহিলা সাহস সঞ্চয় করে দুচারটি কথা বললেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'তোমাদের সংসারের কাজের চাপ খুব বেশি, তা বুঝি। তবু বল্‌ছি—তোমরা ভাল বই পোড়ো,—এখানকার লাইব্রেরিতে অনেক ভাল বই, মাসিকপত্র আছে, সে সব পোড়ো, আনন্দ পাবে।' মেয়েরা এনেছিলেন অজস্র ফুল, উলের মোজা, কার্পেটের জুতা ইত্যাদি। জিনিসগুলো নিজে হাতে করে নিয়ে বললেন, 'এগুলি আমায় দিচ্ছ,—আমি নিলুম,—আমি পরব,—আর তোমাদের কথা মনে করব।'

মেয়েরা চলে যাবার সময় ভূলুন্ঠিত হয়ে প্রণাম করল। কবি সবার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

কলিকাতায় ফিরবার সময় হল। আবার বোটের ধারে বিরাট জনতা। বনমালী মহা খুশি, এ কয়দিন ধরে সে বেশ আমোদেই ছিল। নিকটবর্তী জমিদারবাড়ি থেকে কবির জন্য নানারকম খাবার এল,—সে যেন একটা রাজভোগের রাজসূয়। রবীন্দ্রনাথ কৌতূহলী হয়ে চেয়ে দেখছেন, কৌতুকপ্রিয় কবি বললেন, 'আমি দেখেই আনন্দ পাচ্ছি,—সুধাকান্ত, তুমি এগুলোর সদ্‌ব্যবহার করবে, রাস্তার বাজে জিনিস খেয়ো না।'

সুধাকান্তবাবু হাসতে লাগলেন। বোট ছাড়ল পতিসর কাছারির ঘাট থেকে। নাগর ও আত্রাই নদী পেরোচ্ছেন, নদীর দুধারে অগণিত নরনারীর জয়ধ্বনি। কালীগ্রামের প্রজাদের শেষ-সম্বর্ধনা কবি শান্ত নিরাসক্ত ভাবে গ্রহণ করলেন।

কালীগ্রাম পরগণায় (সদর পতিসর) রবীন্দ্রনাথ জমিদারি ও প্রজা-সাধারণের উন্নতির জন্য নিজস্ব ব্যবস্থায় অনেক সংগঠনের চেষ্টা করেছিলেন। শিলাইদহে যা পারেন নি, কালীগ্রামে সেই 'মণ্ডলী প্রথা' প্রচলিত করেছিলেন। সাধারণ হিতকর হাই স্কুল ও ডাক্তারখানা স্থাপন ও উন্নতির জন্য জমিদারির বার্ষিক দানের বরাদ্দ ছাড়াও প্রজাদের খাজনার উপর স্থায়ী 'কল্যাণবৃত্তি' নামে একটি চাঁদা আদায়ের প্রচলন করেছিলেন। এবিষয়ে সে সময়কার সরকারী শাসন-বিভাগের ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে প্রকাশিত মন্তব্য কৌতুহলী পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দিলাম—

EXTRACT FROM 'BENGAL DISTRICT GAZETTEERS, RAJSHAHI'

By Mr. L. S. S. O'Malley (1916)

It must not be imagined that a powerful landlord is always oppressive and uncharitable. A striking instance to the contrary is given in the Settlement Officer's account of the estate of Rabindranath Tagore, the Bengali poet, whose fame is world-wide. It is clear that to poetical genius he adds practical and beneficial ideas of estate management, which should be an example to the local Zemindars.

A very favourable example of estate government is shown in the property of the poet, Sir Rabindranath Tagore. The proprietors brook no rivals. Sub-infeudation within the estate is forbidden, raiyats are not allowed to sublet on pain of ejectment. There are three divisions of the estate, each under a Sub-manager with a staff of tahsildars, whose accounts are strictly supervised. Half of the Dakhilas are

checked by an officer of the head office. Employees are expected to deal fairly with the raiyats and unpopularity earns dismissal. Registration of transfer is granted on a fixed fee, but is refused in the case of an undesirable transferee. Remissions of rent are granted, when inability to pay is proved. In 1312 it is said that the amount remitted was Rs. 57,595. There are Lower Primary Schools in each division, and at Patisar, the centre of management, there is a High English School with 250 students and a Charitable dispensary. These are maintained out of a fund to which the Estate contributes annually Rs. 1,250/- and the raiyats 6 pies to rupee in their rent. There is an annual grant of Rs. 240/- for the relief of cripples and the blind. An agricultural bank advances loans to raiyats at 12 per cent per annum. The depositors are chiefly Calcutta-friends of the poet, who get interest at 7 per cent. The bank has about Rs. 90,000/- invested in loans.

জীবিত ও মৃত

রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত বহুপঠিত 'জীবিত ও মৃত' গল্পটি তাঁর 'গল্পগুচ্ছে' পড়বার বহু পূর্বে (যখন আমার দশ-এগারো বছর বয়স) এই রকমের একটি গল্প শুনেছিলাম আমার জ্যাঠামশাইয়ের কাছে। আমার জ্যাঠামশাই স্বর্গীয় তারকনাথ অধিকারী ছিলেন তখন পাবনার বিখ্যাত উকিল এবং ঠাকুরবাবুদের ঘরের উকিল বা আমমোক্তার। তিনি বাড়ির মেয়েদের আসরে রবীন্দ্রনাথের সে সময়কার 'হিতবাদী' সংস্করণের গ্রন্থাবলি থেকে 'জীবিত ও মৃত' গল্পটি পড়ে শুনিয়েছিলেন। তাঁর অনুপম পঠনভঙ্গি ও আবৃত্তি তাঁর জমকালো বিরাট চেহারার সঙ্গে মিলে এই গল্পটি আমাদের মনে এমন ভয়ঙ্কর ও করুণভাবের

সৃষ্টি করেছিল যে, সে সময় কতদিন স্বপ্নে কাকিমার (কাদম্বিনীর) করুণ চেহারাখানা দেখে আমাদের কিশোরচিত্ত কেঁদে আকুল হয়ে উঠত। গল্পটি আমরা 'কাকিমার গল্প' বলে অনেককে মুগ্ধ করেছি।

জ্যাঠামশাই গল্পটি পড়েই বলেছিলেন অবিকল এমনি একটি সত্যকাহিনী তিনি বাবুমশাইকে বছর দুই-তিন আগে শুনিয়েছিলেন এবং কাহিনীটি রবীন্দ্রনাথ খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ৪।৫ বছরের বড় ছিলেন এবং জমিদারির কাজের অবসরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে গল্প শুনতে বড় ভালবাসতেন। তাঁর গল্প বলবার ভঙ্গিটি ছিল অপূর্ব ও জীবন্ত, কারণ তিনি একজন ভাল অভিনেতা ছিলেন। তাঁর কাছে শোনা সত্য কাহিনীটিই যে রবীন্দ্রনাথের 'জীবিত ও মৃত' গল্পের আসল উপাদান, তা অনুমান করবার যথেষ্ট কারণ আছে। সে-সময় রবীন্দ্রনাথ (১২৯৭-৯৮) 'হিতবাদী' পত্রিকার জন্যে অনেক ছোটগল্প লিখেছিলেন শিলাইদহে বোটে বসে। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের যে রূপ আজ বিশ্ব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যের সমপর্যায়ে উন্নত স্থানের দাবি করছে, রবীন্দ্রনাথই সেই ছোটগল্পের আবিষ্কার-কর্তা, আজ সবাই সে কথা স্বীকার করছেন। রবীন্দ্রনাথের কলমে বাংলা ভাষায় যে অনুপম কথাসাহিত্যের সৃষ্টি, তার অধিকাংশ উপাদানই যে তিনি পল্লী-জীবনের বাস্তব ঘটনা থেকে পেয়েছিলেন, তার প্রমাণ বিশেষ অনুসন্ধান করলেই পাওয়া যায়। তিনি নিজেও তাঁর অনেক কাহিনীর বাস্তব উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন (প্রভাতবাবুর রবীন্দ্র-জীবনী ১ম সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২২)।

আমার জ্যাঠামশাইয়ের কথিত কাহিনী থেকেই বোঝা যাবে যে তাঁর কাহিনী রবীন্দ্রমানসের অপূর্ব কল্পনায় কি অনুপম মননশীলতায় একটি সুন্দর সার্থক পল্লীচিত্রে রূপায়িত হয়েছে। তিনি যেন স্বয়ং পল্লীর নদীতীরে মৃতদাহের কাজেও অভিজ্ঞ। গল্পের অপূর্ব ভয়াবহ পটভূমিকা এবং ভীষণ শ্মশানে দুর্যোগময়ী গভীর নিশীথে করুণ শবদাহের বাস্তবচিত্র তাঁর গল্পের মধ্যে যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তিনি বলেছেন যে তাঁর গল্পের উপাদানই যে রবীন্দ্রনাথের 'জীবিত ও মৃত'-এর সৃষ্টি করেছিল—তাতে তাঁর অনুমাত্র সন্দেহ ছিল না। জ্যাঠামশাই যেভাবে কাহিনীটি বলেছেন, আমি হুবহু সেইভাবেই গল্পটি বলছি—

তিনি বলেছিলেন—'তখন আমরা পাশ করে পাবনায় উকিল হয়ে বসেছি, পয়সাও বেশ পাচ্ছি। আমাদের তরুণ উকিলদের একটা দল ছিল। তাতে

উকিল গিরিশ রায়, প্রকাশ রায়, ডাক্তার জগৎ রায়, গৌরীবাবু আর আমি ছিলাম বিশেষ উৎসাহী ও সাহসী। পাবনার তাঁতিবন্দ জমিদার পরিবারের সঙ্গে আমরা অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুভাবে মেলামেশা করতাম।

'সেই সময় ঐ জমিদারবাবুদের বাড়িতে এক বর্ষণমুখরিত সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলছি। ক্রমেই রাত্রি বাড়ছে, হঠাৎ বাবুদের অন্দর থেকে কান্না শোনা গেল। খবর এল হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে তাঁদের বাড়ির এক বালবিধবার মৃত্যু হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বাবুদের এক ছেলে "কাকিমা কোথায় গেলি—" বলে কেঁদে অস্থির হয়ে পড়ছে। সদ্যমৃত বিধবাটির নয়নের মণি ছিল তাঁর শিশু দেবর-পুত্রটি। আবার সেও ছিল কাকিমা-অন্ত প্রাণ, কারণ তার মা ছিলেন চিররুগ্না।

'শ্রাবণ মাস। সকাল থেকেই আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন; সেদিন যেন কিসের ছুটিতে আদালত বন্ধ, তাই তাসের আড্ডা বেশ জমকালো। জমিদারবাবু খুব মুসড়ে পড়লেন। আর যাই হোক, তাঁর বিশেষ ভাবনা হল এই ভীষণ দুর্যোগে শবদাহ হবে কেমন করে। মৃত্যুটাও এত আকস্মিক যে দাহকার্যের উপযুক্ত কাঠ সংগ্রহ করাও সময়-সাপেক্ষ। জমিদারবাবু তাঁর আমলাদের বললেন। কিন্তু শুকনো কাঠ ঐ ঘন বর্ষায় কোথায়ও সংগ্রহ করতে না পেরে বাগানের আমগাছ কেটে কাঠের ব্যবস্থা হল। রাত্রিও বাড়ছে, আকাশ ক্রমেই বেশি রকম মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। এদিকে অন্তঃপুরে ছেলেটি "কাকিমারে—কাকিমা—" বলে কেঁদে গড়াচ্ছে; মেয়েরা সবাই কাঁদছে। একে দুর্যোগের রাত, তার ওপর শোকের দুঃসহ আঘাতে মনটা যেন ভেঙেচুরে চৌচির হয়ে গেল।

'কাঠ তৈরি হচ্ছে দেখে আমরা চার-পাঁচজন উকিল ও ডাক্তার বন্ধু শব নিয়ে শ্মশানযাত্রা করলুম। আকাশে মেঘের গর্জন; আমরা "হরিবোল" বলে বেদনাভরা মনে শবকাঁধে রওনা হলুম— আর ছেলেটি "ওরে কাকিমারে—কোথা গেলিরে—" বলে কেঁদে গড়াতে লাগল। কী ভয়ঙ্কর সে রাত!

'শিঙের শ্মশান পাবনা টাউন থেকে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে। নিকটে আর শ্মশান ছিল না তখন। শিঙের শ্মশানকে লোকে মহাশ্মশান বলে জানে। প্রবাদ,—সেখানে নাকি রাত্রি হলেই মা কালী জিভ বের করে চুল এলিয়ে দিয়ে দৈত্যদানা, প্রেতিনী-যোগিনীদের নিয়ে ভীষণ নৃত্য শুরু করেন। সারারাত নেচেগেয়ে রক্ত খেয়ে খল্‌খল্‌ হেসে শেষ রাত্রে ইছামতীর কালো জলে শেওলার মধ্যে শুয়ে থাকেন, আর প্রেতিনী-যোগিনীরা মড়ার হাড় চিবিয়ে

শ্মশানের বড় বড় তেঁতুল আর বট-অশ্বথ গাছের পাতার মধ্যে শুয়ে থাকে। আমরা দলবেঁধে একটা লণ্ঠন আর হুঁকোকল্‌কে নিয়ে রওনা হলাম।

'মেঘের গর্জন বেড়ে উঠল, বিদ্যুতের চমক চোখ ধাঁধিয়ে দিতে লাগল। আমরা বহুকষ্টে শ্মশানে পৌঁছে ইছামতী নদীর একেবারে জলের কিনারায় মড়ার খাটিয়া রেখে সবাই তামাক খেয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে নিলুম। তারপর খাটিয়া থেকে শব নাবিয়ে শবটা ছুঁয়ে থেকে কাঠের জন্য তীরের দিকে হাঁক ছাড়লুম। কাঠের গাড়ির কোন সাড়া পেলুম না। এদিকে সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে এল ভয়ানক বৃষ্টি। মুষলধারে বৃষ্টি, সঙ্গে সঙ্গে মেঘের গুরুগর্জন আর বিদ্যুতের চম্‌কানি আমাদের যেন কোন্ ভয়াবহ প্রেতপুরীতে নিয়ে গেল। লণ্ঠন গেছে নিবে, গভীর অন্ধকার। আমরা আর কোনও উপায় না দেখে সেই অবিশ্রান্ত বৃষ্টি মাথায় করে তীরের দিকে ছুটলুম এবং কাছে-পিঠের একটা ভাঙা বাড়ির বারান্দায় গিয়ে হি হি ক'রে কাঁপতে লাগলুম,—মড়া থাকল ঐখানে, ইছামতীর তীরে।

'ঝাড়া দুঘণ্টা মুষলধারে বৃষ্টি, তার পর শুরু হল ঝড়। মড়মড় করে কতকগুলো তেঁতুলের ডাল ভেঙে পড়ল আমাদের সামনেই। এই দুর্যোগে কাঠের গাড়ি এই শিঙের মহাশ্মশানে আসবে কি না কে জানে! ঝড়বৃষ্টি থেমে গেলে সবাই কাঁপতে কাঁপতে শ্মশানে জলের কিনারে এসে দেখি, কী সর্বনাশ! মড়া নেই; মড়ার খাটিয়াটার খানিকটা ইছামতীর জলে দোল খাচ্ছে।

'এখন উপায়? শীতে কাঁপতে কাঁপতে মড়া খুঁজতে লাগলুম, জলের মধ্যে নেবেও খুঁজতে লাগলুম; কিন্তু হায়, মড়া কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। তখন আমাদের শোচনীয় অবস্থা, এখন কী করা যাবে? কাঠের গাড়ি বৃষ্টি বন্ধ হলেই এসে পড়বে, কিন্তু মড়া কোথায় যে পোড়াব! কয়জনে মিলে পরামর্শ করা গেল, আমরা ক'জন ছিলাম উকিল;—স্থির করলুম, গিয়ে বলব শবদাহ করা হয়ে গেছে। কিন্তু যদি মড়া ভেসে ভেসে কোনও গাঁয়ে গিয়ে ওঠে, তবে তো সেকথা তাঁদের কানে যাবে! কাঠের গাড়ির কোন খোঁজ নেই, মহা ভাবনা হল;—সোঁ সোঁ বাতাস,—বোধ হল ভোর হবার বেশি দেরি নেই। বৃষ্টির জলের তোড়ে ইছামতীর স্রোতে কোথায় গেল মড়া—এই গভীর অন্ধকারময়ী নিশীথে কে তার সন্ধান দেবে!

'তবু খুঁজছি কাদার মধ্যে, শেওলার মধ্যে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে এমন সময় ভোর হল। একটুখানি আলোর সন্ধান পেলুম। খুঁজতে খুঁজতে দেখি

ইছামতীর প্রায় এক মাইল উজানে এক জীর্ণশীর্ণ বিধবা মেয়ে নদীর মধ্যকার একটা শুকনো গাছের ডালে ঠেস দিয়ে বসে রয়েছে। তার ছেঁড়া কাদামাখা কাপড় বাতাসে উড়ছে। মেয়েটিও দিব্যি ডালে বসে আরাম করে দোল খাচ্ছে। ওরে বাপ্‌রে! সে কী দেখলুম! ওদের বৌ নিশ্চয়ই মরে নাই, সন্ন্যাসরোগে হয়ত অজ্ঞান হয়েছিল, শ্মশানে এসে বৃষ্টির ঠাণ্ডা জলে আর হাওয়ায় বেচেঁ উঠেছে। কী তাজ্জব ব্যাপার!

'আমরা দূরে দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলুম। বৌটির কাছে যেতেও সাহস হচ্ছে না, আর না গেলেও তো উপায় নেই। এখন এই জ্যান্ত বৌকে নিয়ে কী করা যাবে! মহা মুস্কিল। আমরা শুধুই ভাবছি। এমন সময় ঘাটে একটা লোক নাইতে এল। সে বললে, 'মশাইরা বোধ হয় মড়া পোড়াতে এসেছেন। ঐ তো আপনাদের মড়া, জলঝড়ে ভেসে এসে গাছের ডালে আটকে আছে। লোকে দেখে যে ভয়ে মরে যাবে। শিগ্‌গীর আপনারা দাহ করে ফেলুন গে।' অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে নদীর জলস্রোত তীব্রবেগে ছুটছে আর নদীমধ্যস্থ একটা শুকনো তেঁতুলগাছের ডালে আটকে গিয়ে শবদেহটি স্রোতের বেগে কাঁপছে।

'এতক্ষণে আমাদের বুদ্ধির গোড়ায় জল এল। কাছে গিয়ে দেখি,—কে বলবে মড়া,—বৌটি দিব্যি আরামে ডালে বসে দোল খাচ্ছে আর দুটো পা নাড়াচ্ছে। তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে মড়া শ্মশানে আনা হল। ইতিমধ্যে কাঠের গাড়ি এসে পড়েছে, তারাও আমাদের খুঁজছে। ভিজে সবই, কাঁচা কাঠ—বহুকষ্টে চিতায় তুলে শবদাহ শেষ করতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এল।

'শবদাহ সেরে বাড়ি ফেরবার পথে জমিদার বাড়ির পাশ দিয়ে আসতেই শুনতে পেলুম—সেই ছেলেটি আকুল হয়ে কাঁদছে—"ওরে কাকিমা রে—কোথায় গেলি রে—"।'

রবীন্দ্রনাথ এই বাস্তব ঘটনাকে নিয়ে যে করুণ চিত্র এঁকেছেন—তার গভীর বেদনার আবেদন মনকে অনেকক্ষণ ভারাক্রান্ত করে রাখে। তাঁর 'কাকিমা' জীবন্ত ফিরে গিয়ে মরে প্রমাণ করে গেলেন—তিনি 'জীবিত না মৃত।' *

*শ্রীপুলিনবিহারী সেন-সংকলিত "রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, তথ্যপঞ্জী" শ্রীপ্রমথনাথ বিশী-প্রণীত গ্রন্থ) পৃঃ ৭২।

রসিকদাসের বাহাদুরি

ধোবড়াকোল এস্টেট ঠাকুরবাবুরা খরিদ করেন সুবিখ্যাত মার্টিন কোম্পানির নিকট থেকে ১৩১৪ সালে। সেই সময়ে ঐ একটি বড় মহাল তাঁদের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হল।

ধোবড়াকোলের কুঠি যা সাহেব কোম্পানির আমল থেকে এতদঞ্চলে পদ্মাতীরবর্তী একটি সুন্দর বাংলো বলে প্রসিদ্ধ ছিল, সেই কুঠিতেই ঠাকুরবাবুদের কাছারি বসত। ধোবড়াকোল ছিল শিলাইদহের অধীনে একটি বড় বিভাগীয় কাছারি। শ্রীযুক্ত ভূপেশচন্দ্র রায় * তার বিভাগীয় ম্যানেজার ছিলেন। তাঁর কাছারিতে রসিকদাস নামে একজন পেয়াদা ছিল। তার বাড়ি ছিল বরিশালের নরোত্তমপুর গ্রামে,— ভূপেশবাবুদের দেশে।

রসিকদাস অন্তরে-বাইরে ছিল বেশ রসিক। তার মাথায় ছিল লম্বা চুল, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে তাগা। সে পরত গেরুয়া বা লাল রঙের কাপড়। মাঝে মাঝে শিঙা বাজাত আর অবসর পেলেই ত্রিনাথের পাঁচালি গাইত। ত্রিনাথ হচ্ছেন মহাদেব। তার বেশভূষাও ছিল অবিকল মহাদেবের অনুচরেরই মত। ধোবড়াকোলের লোকেরা তাকে কেউ কেউ ভৈরবঠাকুর বলত, কেউ বা রসিক-দা বলে আপ্যায়িত করত।

রসিকদাস বেশ স্ফূর্তিতে আছে। দেশে তার ভাই-বোন আর ছেলেরা ছিল, কিন্তু সে ছিল বিষয়াসক্তিহীন সদানন্দ মুক্তপুরুষ। স্বদেশ-স্বগণের জন্যে কেউ তাকে কখনও চিন্তিত হতে দেখে নি। তার মহা দোষ ছিল—সে তামাক খেত অত্যন্ত গুরুতরভাবে—টানের চোটে কলকে ফাটিয়ে ফেলত। বড় কলকে ছাড়া সে ছোট কলকে অর্থাৎ গঞ্জিকারও মহাভক্ত ছিল। তাই প্রায়ই তার চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল হয়ে থাকত। কিন্তু সে কখনও গাঁজার নেশায় বেচাল হয়ে যেত না। হঠাৎ দেখলে তাকে আধপাগলা বা খেয়ালি বলে মনে হত, কিন্তু তা নয়, আসলে সে সব কাজই বেশ বুদ্ধিমানের

* সুবিখ্যাত সতীশচন্দ্র রায়ের ভ্রাতা। এঁরা বরিশাল উজিরপুরের জমিদার-বংশের।

মতই করে যেত। প্রথমে সে দেশ থেকে এসে জানিপুর কাছারির পেয়াদা হয়েছিল, তার পরে সে ধোবড়াকোল কাছারিতে বদলি হল। প্রায় মৃত্যুকাল পর্যন্তই সে ধোবড়াকোলে ছিল। প্রজাসাধারণ সরল নিরীহ আত্মভোলা রসিক-দাকে খুব ভালবাসত।

রসিক ছিল বাবা ত্রিনাথের ভক্ত। তাই চৈত্র মাসে গ্রামে গ্রামে পাট-ঠাকুরের পূজা আরম্ভ হলে শিবভক্ত রসিক সন্ন্যাসীদের দলে মিশে মহানন্দে শিবের গাজন গাইতে বড় ভালবাসত। গাজন গানের সঙ্গে ত্রিনাথের পাঁচালি গেয়ে সে পাড়া মাত করে দিত।

খবর এল—রবীন্দ্রনাথ দু-একদিনের মধ্যেই ধোবড়াকোল মহাল পরিদর্শনে আসছেন। তাঁকে নিয়ে বোট ছেড়েছে শিলাইদহ থেকে। কাছারিতে ও গ্রামের মধ্যে সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে। রসিকের স্ফূর্তি দেখে কে! তার স্ফূর্তির প্রধান কারণ, সে এতকাল ঠাকুরবাবুদের চাকরি করে আজই প্রথম বাবুমশায়ের দর্শন পাবে; তাঁর সঙ্গে গল্প করবে,—বাবা ত্রিনাথের পাঁচালি শোনাবে। কাছারির বরকন্দাজেরা তাকে ঠাট্টা করত, 'বাবুমশাই এসেই রসিকের মাইনে বাড়িয়ে দেবেন।' রসিক তাদের বলত, 'আরে ঠাট্টা করিস নে। রসিকদাসকে তোরা চিনলি নে। বাবুমশাই এলে তিনি চিনবেন, —দেখিস তোরা।'

রসিক মিথ্যা বলে নি। ধোবড়াকোল কুঠির ঘাটে বোট থেকে নেমেই বাবুমশায়ের দৃষ্টি সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হল ভৈরববেশী রসিকের অপরূপ চেহারা-খানার দিকে। রসিক পরম ভক্তিভরে গড় হয়ে বাবুমশায়ের পায়ে করল এক প্রণাম। বাবুমশাই তার দিকে অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইলেন। রসিকের বেশভূষা ও ভাবভঙ্গী তাঁকে যেন আকর্ষণ করল।

ধোবড়াকোল কুঠিতে পৌঁছে বড় বড় প্রজারা বাবুমশাইকে প্রণাম করলেন, আমলারা প্রণাম করলেন। কুশলবার্তা শুনবার পরই রসিক এসে পরমভক্তি-ভরে তাঁকে আবার প্রণাম করল। রবীন্দ্রনাথ তার দিকে আবার অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কি? কী কর এখানে?'

রসিক প্রণাম করে হাত জোড় করে বলল, 'আজ্ঞে আমার নাম রসিক-দাস। আমি এখানে পেয়াদাগিরি করি। আমি আজ প্রায় এক বছর হুজুর ইস্টাটে পেয়াদাগিরি করছি। আমার বাড়ি ম্যানেজারবাবুদের হ্যাশে।'

রবীন্দ্রনাথ এই রকমের লোকদের সঙ্গে বেশ গল্প জমাতে পারতেন।

রসিকের ভিতর-বাইরের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য তাঁর মনে বোধ হয় রং ধরিয়েছিল। তিনি রসিকের সঙ্গে দিব্যি গল্প জমিয়ে নিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার এ সন্ন্যাসীর বেশ কেন?'

'আজ্ঞে, আমি বাবা তেরনাথের স্যাবক,' এই বলে সে পরম ভক্তিভরে যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বাবা ত্রিনাথের উদ্দেশে প্রণাম করে বাবুমশায়ের পায়ের কাছে বসল। রবিবাবুর চেহারাখানা দেখে সে প্রথমত বেশ খানিক ভড়কে গিয়েছিল; এখন তার ভয় ভেঙে গেল, পরমাত্মীয়ের মত গল্প জুড়ে দিল—'হুজুরকে দর্শন করে আজ আমার জন্ম সার্থক হল। এমন রূপ আমি জন্মে দেখি নি।'

বাবুমশাই বললেন, 'তুমি কি কি কাজ কর?'

রসিক বিনীতভাবে বলল, 'হুজুর, পেরজা-টেরজা ডাকি, চালান নিয়ে শিলাইদ' যাই, চিঠি-পত্র ঘাঁটি আর বাবুদের জন্যে রাঁধি। সময় পেলে বাবা তেরনাথকে ডাকি যে—বাবা, আমার ভববন্ধন মোচন করে দাও।'

বাবুমশাই তার ভাবভঙ্গীতে ও কথাবার্তায় তাকে জমিদারি সেরেস্তার উপযুক্ত বরকন্দাজ বলেই মনে করতে পারলেন না; হয়ত ভাবলেন, সে একটা সরল আত্মভোলা মানুষ। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি বরকন্দাজি কর কেমন করে? তুমি তো দেখছি সাদাসিধে সরল সহজ মানুষটি। প্রজারা তোমাকে মানে?'

এই বারে রসিক যে উত্তর দিল তাতে রবীন্দ্রনাথ খুব খুশি হলেন। সে বললে, 'হুজুর, আমাকে কেউ মানে কিনা জানি না, ভয় করে কিনা তাও জানি না; তবে সবাই আমাকে ভালবাসে—দাদা বলে ডাকে, আমার গান শুনতে ভালবাসে। আমি তো কারুর মনে কষ্ট দিই না।'

বাবুমশাই হেসে বললেন, 'বেশ বেশ তুমি জোর না খাটিয়ে ভালবাসা দেখিয়ে কাজ কর। এতে বড় সন্তুষ্ট হলাম। সন্ন্যাসী মানুষের এই তো কাজ। তোমার বাড়িতে কে কে আছে?'

রসিক এইবারে তার গল্পের ভাণ্ডার উজাড় করে দিল। তার দেশের কথা, স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজনের কথা, তার বাবা ত্রিনাথের মহিমা, তার সংসার-নির্লিপ্ত খ্যাপামি— সব বর্ণনা করল। বাবুমশাই বুঝলেন কী কারণে রসিক গেরুয়া পরে ও বরকন্দাজি করে। কর্তব্যপরায়ণ রসিক তার গল্প শেষ করে রান্না করতে চলে গেল।

সন্ধ্যার আঁধারের মধ্যে চাঁদের আলো এসে ধোবড়াকোল কুঠির বারান্দায় একটা অতি প্রশান্ত আবেশের জাল বুনে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ চুপ করে ইজি-চেয়ারে বসে আছেন। প্রজাদের দরবারের ঝামেলা মিটে গিয়েছে। এমন সময়ে রসিক এসে তাঁকে প্রণাম করে পায়ের তলায় বসে বলল, 'হুজুর, বাবা তেরনাথের গান শোনাব?'

'বেশ শোনাও'—বাবুমশায়ের স্নিগ্ধ কণ্ঠের এই সহজ অনুমতি পেয়ে রসিক জুড়ে দিল বাবা ত্রিনাথের গান, * স্তব-স্তুতি, লীলা-কাহিনী। হাতে তাল দিয়ে নানা রকম অঙ্গভঙ্গী সহকারে তার অদ্ভুত বাজখাঁই গলার ত্রিনাথের গান বাবুমশাই শান্তভাবে বসে উপভোগ করলেন। রসিকের অশিক্ষিত কণ্ঠের গান সেই সন্ধ্যার আলো-ছায়ার মধ্যে একটা পল্লীসুলভ শান্ত ধর্মভাবের সরল মাধুর্যের ছবি এঁকে দিল।

রবীন্দ্রনাথ তার অশিক্ষিত অদ্ভুত গলার গ্রাম্য সংগীত শান্ত ভাবে শুনলেন, অন্যের মত হাসলেন না, বা ঠাট্টা-বিদ্রূপও করলেন না। এতে রসিক ভয়ানক খুশি হল। সে বলল, 'হুজুর, পাগোল-ছাগোলের গান, একি আর শুনবার মত? তবু সাহস করে হুজুরকে এ সব যে শুনাতে পারলাম, সে শুধু বাবা তেরনাথের কৃপায়।'

বাবুমশাই বললেন, 'তুমি সংসারত্যাগী কেন? তোমার তো সবাই আছে।'

'আমার সবই আছে হুজুর, কিন্তু বাবা ত্রিনাথ ছাড়া আমার কেউ নাই এহকালে। পরকালে তাঁর চরণ পাব কিনা—কে জানে? আমার কি এমন কপাল হবে?'

---

* ত্রিনাথের গানের নমুনা—

আমার ঠাকুর তেন্‌নাথ কিছু নয় রে খায়।
এক পয়সার ত্যাল দিয়ে তিন বাতি জ্বালায়॥

*   *   *

আমার ঠাকুর তেন্‌নাথে যে করিবে হেলা।
হাত-পাও শুকাইয়ে যাবে বন্ন হইবে কালা॥
কলিতে তেন্‌নাথের মেলা।
খোঁড়ায় নাচে, কানায় দ্যাখে, বোবায় বলে বোম্‌ ভোলা॥
সাধু রে ভাই, দিন গেলে তেন্‌নাথের নাম লইও।—
তেল খায় ব্রহ্মা রে ভাই, বিষ্ণু খায় রে পান।
মহাদেবের সিদ্ধি খাইলে শীতল হয় রে প্রাণ॥

'বেশ, তোমার গান শুনে খুব আনন্দ পেলাম' —বাবুমশায়ের এই সুখ্যাতি শুনে, অমায়িক ব্যবহার দেখে রসিক আনন্দে অধীর হয়ে গেল। সে বলল, 'হুজুর, এই দেশ আমার বেশ ভাল লেগেছে। এখানেই আমি থাকব,—একটা আখড়া বানাব। বাবা তেরনাথের গান গেয়ে জীবন কাটাব। আমায় যদি খানিকটা জমি দয়া করে দেন, তবে আমার মনের বাসনা পূর্ণ হয়।'

রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, 'আখড়া তো বানাবে, খাবে কি—ভক্তদের খাওয়াবে কি?'

রসিক বলল, 'তাইতেই তো বাবা তেরনাথের কৃপায় হুজুরকে এত কাছে পেয়ে গেছি।'

দুই-একদিন গেল। কাছারির কর্মচারীরা রসিকদাসের সঙ্গে বাবুমশায়ের এই অদ্ভুত অন্তরঙ্গতায় বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে গেল। অনেকে তাঁকে বোঝালে যে, ও একটা গেঁজেল পাগল, খেয়ালি লোক, তবে লোকটা বেশ—সরল, বিশ্বাসী, কোন গোলমাল নাই। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাকে অত ছোট মনে করলেন না। তাঁর কাছে রসিক একটা অপূর্ব মানুষ বলে প্রতিপন্ন হল। তিনি রসিককে দশ বিঘা বেশ উৎকৃষ্ট জমি বিনা নজরে দেবার জন্য লিখিত ভাবে হুকুম দিলেন। যাবার দিন রসিককে বললেন, 'রসিক, তোমার আখড়ার জন্যে আর ভরণ-পোষণের জন্যে তোমায় বেশ ভাল জমি দশ বিঘে দিয়ে গেলাম। ত্রিনাথ তোমার মঙ্গল করুন। আশীর্বাদ করি— তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হক।'

বাবুমশায়ের শিলাইদহ যাবার সময় হল। রসিক অনেক পরিশ্রম করে নানা রকম ফুল দিয়ে একটা মালা গেঁথে রবীন্দ্রনাথের গলায় পরিয়ে প্রণাম করল। আবার বাবুমশাইকে মহাদেব কল্পনা করে জোড়াতালি দিয়ে এক গান বেঁধে গেয়ে শুনিয়ে দিল। বাবুমশাই হেসে বললেন, 'এসব কেন? তোমার বাবা ত্রিনাথের গান গাও।'

—'হুজুর, সে গান কি ভদ্রলোকে শোনে? হুজুর মহাদেবের অংশ, তাই হুজুরের ভাল লাগল,—রসিকদাসের জন্ম সার্থক। এমন ভাগ্য ক'জনের হয়?'

আবার বাবা ত্রিনাথের গান আরম্ভ হল। এবারে ত্রিনাথের পাঁচালি,—গ্রাম্য হলেও রবীন্দ্রনাথের কাছে বোধ হয় খুব উপভোগ্য মনে হল। তিনি ঝাড়া এক ঘণ্টা চুপ করে বসে রসিকের হেঁড়ে গলার পাঁচালি শুনলেন। এদিকে কিন্তু তাঁর যাবার সময় হয়ে গেছে। বোট তৈরি, লোক-লস্কর-আমলারা

অনেকক্ষণ থেকে তাঁর বিদায়ের জন্য অপেক্ষা করে আছে। তিনি কিন্তু তখনও রসিকের গান শুনছেন!

রবীন্দ্রনাথকে বোটে তুলে দিয়ে রসিক গড় হয়ে প্রণাম করে কাছারিতে ফিরল খুব বিমর্ষভাবে—আজ তার আনন্দের হাট ভাঙল।

ম্যানেজারবাবু ডাকলেন—'ও রস্‌কে—শোন্‌। হাঁ, বাহাদুর বটে রসিকদাস।'

দেবী মৃণালিনী

রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী দেবী মৃণালিনীকে খুব ছোট বেলায় দেখেছি। তাঁর সম্বন্ধে সত্যকাহিনী সংগ্রহ করাও কষ্টকর, কেউ কিছু সংগ্রহ করেছেন কিনা জানি না। দেবী মৃণালিনীর আসল নাম ছিল ভবতারিণী। তিনি ছিলেন যশোর জেলার মেয়ে, দক্ষিণডিহির বেণীমাধব চৌধুরীর কন্যা। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবংশের সেকালের ঘরণীরা অনেকেই ছিলেন যশোর ও খুলনা জেলার মেয়ে। ঠাকুরবংশের আদি নিবাসও যশোর জেলায়।

১৩০৬ কি ১৩০৭ সাল হবে। সে সময়ে কয়েক বছর ধরে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শিলাইদহে বাস করতেন। তখনকার শিলাইদহ কুঠিবাড়ি তাঁর ছেলেমেয়ে আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের সমাগমে গমগম করত। সে যেন একটা সোনার যুগ ছিল। সারা ভারতের কত বিখ্যাত মনীষী ঐ সময়ে শিলাইদহে পদার্পণ করতেন। বাংলার অধিকাংশ অভিজাত জমিদারই শহরবাসী, পল্লীর জমিদারি তাঁদের পায়ের ধূলা বড় একটা পায় না; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে রকমের ভূস্বামী ছিলেন না। পল্লীপ্রকৃতিকে ভালবেসে সাহিত্য-সাধনার জন্যেই হক বা জমিদারির কাজকর্মের দায়িত্ববোধেই হক, তিনি ছায়াঘেরা পাখিডাকা পল্লীতে বহুদিন বাস করতেন,—এমন কি সপরিবারে,—অনেকটা স্থায়িভাবে বললেও চলে।

সে সময়ে শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে যে কয়েকজন দারোয়ান আর বরকন্দাজ থাকত, তাদের মধ্যে দু'জন ছিল শিখ। তাদের নাম শরণ সিং আর গণপৎ সিং। তারা স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান বরকন্দাজের চেয়ে বেশি মাইনে

পেত। সেকালের বরকন্দাজদের মাইনেও কম ছিল, তবু তাদের খাওয়া-পরার কোন কষ্ট ছিল না।

শরণ সিং আর গণপৎ সিং অনেক দিন থেকে শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে চাকরি করছিল—তাদের মাইনে ছিল মাসে ২০ কুড়ি টাকা করে। তারা প্রথমে ১৪ টাকায় বহাল হয়েছিল। সেই সময়ে গণপৎ সিংয়ের একজন আত্মীয় দারুণ অভাবের জ্বালায় দেশ ছেড়ে নানা জায়গায় চাকরির চেষ্টা করছিল। কোথায়ও কোন সুবিধা করতে না পেরে সে শেষে শিলাইদহে এসে চাকরির প্রার্থনা জানাল। এই পাঞ্জাবিটির নাম ছিল মুলা সিং। মুলা সিং যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। তার ছিল ভীমের মত বিরাট দেহ, তেমনি জমকাল চেহারা। শিলাইদহ কুঠির হাটের মধ্যে যখন সে দাঁড়াত, তখন লোকের ভিড়ের মাথার উপরেও একহাত উঁচুতে তার মাথা দেখা যেত। তার দেহ যেমন বিরাট, তার আহারও ছিল তদনুরূপ,—এমন কি রাক্ষসের মত।

মুলা সিং যেদিন নিযুক্ত হল, সেদিন রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে উপস্থিত ছিলেন না। গণপৎ সিং তার দুর্দশা দেখে এস্টেটের ম্যানেজারবাবুর কাছেও না নিয়ে গিয়ে একেবারে তাকে কুঠিবাড়ির দোতালায় তাদের 'ছোট মাইজির' কাছে নিয়ে হাজির করল। মুলা সিং কেঁদে-কেটে তার দুঃখদুর্দশার বর্ণনা করে প্রার্থনা জানাল, তাকে যেমন করেই হক পালন না করলে তাকে সপরিবারে ধরাপৃষ্ঠ থেকে চলে যেতে হবে। করুণাময়ী মৃণালিনী দেবী নিজেই তাকে দারোয়ানের কাজে বহাল করে দিলেন। সেইদিনই তার পনেরো টাকা মাসিক মাইনে ধার্য হল। জমিদারগৃহিণী বললেন, 'বাবু এলে তাঁকে ধরে পরে মাইনের বিষয় বিবেচনা করা যাবে।'

মুলা সিং অকূল সাগরে কূল পেল,—বেশ হাসিখুশি হয়ে কাজে লেগে গেল। কিন্তু বেচারি যে মাইনে পেত তার প্রায় সবই খরচ করে ফেলত—আটা, অড়হরের ডাল আর 'ঘেউ' খেয়ে। তার ঐ অমানুষিক বিরাট দেহ-খানাকে চালু রাখবার জন্য তার খোরাক ছিল সে যুগের বৃকোদরের মত—সবাই মুলা সিংকে 'ভীম সিং' বলে ডাকত আর তার তৈরি চাপাটির দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকত।

বেচারা মুলা সিং বেশ ফুর্তির সঙ্গেই কাজকর্ম করে যাচ্ছে, কিন্তু মাসের শেষে তার মুখখানা বড়ই মলিন হয়ে গেল, কাজের উৎসাহও যেন নিবে যাবার মত হল। রাত্রে দেউড়িতে বসে গালে হাত দিয়ে সে ভাবত। তার

এই বিমর্ষভাব কি কারণে তাও সকলেই জানত,—তা দেবী মৃণালিনীর দৃষ্টিও এড়ায় নি।

একদিন ছোটমা মুলা সিংকে ডেকে তার বাড়িঘরের অবস্থা সব জিগ্‌গেস করলেন। নিজের অসহায় অবস্থার কথা বলে সে তার প্রশ্নকর্ত্রীর চোখও ভিজিয়ে দিল। শরণ সিং ছোটমাকে জানাল, 'মাইজি, মুলা সিংয়ের রোজ তিন সের করে আটা লাগে দু'বেলায়। ও খেয়েই সব শেষ করে। বাড়িতে টাকা পাঠাতে পারে না।' দেবী মৃণালিনীও শুনে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন।

ঠাকুর এস্টেটে চিরকালই নিয়ম-কানুনের বড় কড়াকড়ি। ছোটমা তো হঠাৎ এস্টেটের ধরাবাঁধা আইনের ব্যতিক্রম করতে পারেন না। মুলা সিংয়ের কাজ দু'মাসও হয় নি। তার মাইনে বাড়াবার কী উপায় হবে,—বিশেষ, রবীন্দ্রনাথ তখনও শিলাইদহে আসেন নি। তার পরদিন ভোরে ছোটমা তাঁর সংসার থেকে তিন সের আটা মুলা সিংকে পাঠিয়ে দিলেন।

মুলা সিং ছোট মাইজির চাকর বিপিনের হাতে তিন সের আটা পেয়ে অবাক হয়ে গেল। বিপিন তাকে জানিয়ে দিল—এখন থেকে রোজ সকাল বেলা তিন সের করে আটা দারোয়ানজিকে দেবার বরাদ্দ হয়ে গেছে।

মুলা সিং তিন-চার মাস বেশ ফুর্তিতে কাজ করে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে এলেই মৃণালিনী দেবী তার মাইনে বাড়াবার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন। ম্যানেজারবাবুর মন্তব্যাদি শুনবারও সময় হল না,—মুলা সিং-এর মাইনে বেড়ে কুড়ি টাকা হল। মুলা সিংয়ের আনন্দ-উৎসাহ আর ধরে না!

সবাই ভাবল এইবারে মুলা সিংয়ের দৈনিক বরাদ্দ তিন সের আটা বন্ধ হবে। বিপিন গিয়ে ছোটমাকে পরামর্শ দিল যে, এখন সংসার-খরচ থেকে তাকে আটা দেওয়া বন্ধ করা হক। কিন্তু তাতে কোন ফল হল না; পাচক ঠাকুরও ঐরকম প্রস্তাব করতে গিয়ে উপর থেকে তাড়া খেয়ে এল। এত করেও দৈনিক আটার বরাদ্দ বহাল তো রইলই, উপরন্তু ছোটমা প্রায়ই তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করতেন, 'খাওয়ার তো কষ্ট হচ্চে না? বাড়িতে ছেলেমেয়েরা ভাল আছে তো?' মুলা সিংয়ের মত দর্শনধারী দারোয়ান শিলাইদহে বড় একটা দেখা যায় নি।

সেই সময় মৃণালিনী দেবী শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে একটি সুন্দর শাকসব্‌জির

বাগান করেছিলেন। নিজে ঐ বাগানে কাজকর্ম দেখতেনই, অনেক সময় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে বাগানের কাজকর্মও করতেন। তিনি নিজে উদ্যোগ করে ঐ বাগানের শাকসব্‌জি ও তরকারি কর্মচারীদের বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। যে সময়ে যে সমস্ত আমলা সপরিবারে বাস করবার সুবিধা পেতেন না, তাঁদের জন্য একটা মেস খুলবার প্রস্তাব হয়; এস্টেট থেকে মেসের ঘরদোর করে দেওয়া হল: আবার অল্প-বেতনভোগী কর্মচারীদের জন্য যাতে মেসে এস্টেট থেকে একজন পাচক দেওয়া হয় মৃণালিনী দেবীই তার ব্যবস্থা করে দেন; পরে একটি চাকরও এস্টেটের খরচে মেসে রাখবার ব্যবস্থা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, কুঠিবাড়ির বাগানের তরিতরকারি সপ্তাহে দু'দিন করে মেসে পাঠাবার ব্যবস্থাও করে দেন।

বিদেশী আমলাদের প্রায়ই কুঠিবাড়িতে নিমন্ত্রণ থাকত। ছোটমা প্রায়ই নিজে উদ্যোগ করে নানারকমের পিঠে-পরমান্ন তৈরি করতেন এবং আমলাদের ডেকে এনে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে 'এটা দাও, ওটা দাও' করে সবাইকে পরিতোষ করে খাওয়াতেন। সে সময়কার লোকেরা বলে যে তিনি খুব ভাল গৃহিণী ছিলেন এবং গৃহস্থঘরের খুঁটিনাটি সমস্ত গৃহস্থালি নিজের হাতে করবার জন্য সব সময় আগ্রহ প্রকাশ করতেন।

কিছুদিন পরে যখন দেবী মৃণালিনী তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে শিলাইদহ ছেড়ে চলে যান, তখন কুঠিবাড়ির চাকর-দারোয়ানদের মন একেবারে ভেঙে গেল। শরণ সিং, গণপৎ সিং, বিশেষ করে মুলা সিংয়ের সে কী কান্না! বিজয়া দশমীর দিনে যেন মায়ের বিসর্জন হবে! বিদায়ের আয়োজনের সোর-গোলের মধ্যে যেন বিরাট হাহাকার ডুকরে কাঁদছিল—ছোট বড় কোন আমলা-চাকরদের মনে আর আনন্দ ছিল না। মুলা সিংয়ের কান্না দেখে ছোটমা তাদের সবাইকে ডাকালেন নিজের কাছে, তাদের বললেন, 'আবার তোদের কাছে ফিরে আসব। তোদের কথা আমি কখনও ভুলতে পারব না।' তাদের সজল চোখের সেই বিদায়—সেই বিদায়েই শিলাইদহ থেকে মায়ের বিসর্জন হয়েছিল। দেবী মৃণালিনী স্বামী-পুত্রকন্যা রেখে ১৩০৯ সালে ৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে সবাইকে শোকসাগরে ভাসিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। সে দুঃসংবাদ শিলাইদহে পৌছলে শিলাইদহ কাছারি আর কুঠিবাড়ির ছোট বড় সকল কর্মচারীই চোখের জল ফেলেছিল।

শিলাইদহের অনেকেই বলেন যে, স্ত্রী-বিয়োগের পর। রবীন্দ্রনাথকে

এখানকার সবাই সন্ন্যাসীর বেশেই দেখতেন। রবীন্দ্রনাথের অন্তরের শোক কোন দিনই বাইরে প্রকাশ পায় নি। সেকালকার পুরানো কর্মচারীরা বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ স্ত্রী-বিয়োগের পর থেকে শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে থাকতেন না, —তাঁর বোটেই বাস করতেন, নিতান্ত কোন উপলক্ষ না হলে কুঠিবাড়িতে যেতেন না।

মূলা সিংয়ের কথা আর একটু বলে গল্প শেষ করব। মৃণালিনী দেবী শিলাইদহ ছেড়ে যাবার দিন মূলা সিংয়ের মাইনে বেড়ে পঁচিশ টাকা হয়েছিল, —সেই নজিরে শরণ সিং আর গণপৎ সিংও বেতন-বৃদ্ধি পেয়েছিল। দেবী মৃণালিনী চারদিকে করুণ ছলছল চোখে চেয়ে যেন শিলাইদহের কাছ থেকে সেদিন চিরবিদায় নিয়ে সকলকে কাঁদিয়ে পালকিতে উঠেছিলেন। সেই করুণ দেবী-বিসর্জনের দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছে, এমন লোক আজও আছে।

দেবী মৃণালিনী এত বড় অভিজাত ঘরের ঘরণী হয়েও বাংলাদেশের নিষ্ঠাবতী গৃহস্থবধূর মত ছিলেন। তাঁর ব্যবহারে ছিল সুন্দর সারল্য, মধুর সামাজিকতা আর শ্বশুর কূলের উপর অবিচলিত নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা। তাঁর শ্বশুর ছিলেন মহর্ষি, তাঁকে রাজর্ষিও বলা যেতে পারে। শ্বশুরের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিতে তাঁর মন ভরে থাকত, মহর্ষিদেবেরও কনিষ্ঠ পুত্রবধূটির উপর স্নেহের অন্ত ছিল না। শ্বশুর যেটা পছন্দ করতেন না তা তিনি সযত্নে পরিহার করে চলতেন। 'বাবা মশাইয়ের এটা মত নয়, এটা তাঁর পছন্দ নয়; এটা আমি করব না।' সত্যিকার হিন্দু কুলবধূর মত, সেবাপরায়ণা গৃহিণীর মত তিনি নিজ হাতে সংসারের কাজ করতে ভালবাসতেন। রান্নাতে তিনি অসাধারণ পটু ছিলেন। তাঁর গার্হস্থ্য জীবন রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের প্রভাব পড়ায় অপূর্ব হয়ে উঠেছিল। সংসারের কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব সমস্তই তাঁর হাতে সঁপে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিরুদ্বিগ্ন মনে সাহিত্য ও দেশসেবার সুযোগ ষোল আনা পেয়েছিলেন।

অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশাল সাহিত্য-সাধনায় সুযোগ্য সহধর্মিণীই পেয়েছিলেন। হয়ত তাঁর সমকক্ষ যথেষ্ট প্রতিভা-শালিনী কোন মহিলাকে তিনি তাঁর উপযুক্ত সহকর্মিণীরূপে পেলেও সার্থক সহধর্মিণীরূপে জীবনসঙ্গিনী করে নিতে পারতেন না। দীপ্ত রবির খরতাপের সঙ্গে বনের শ্যামল স্নিগ্ধচ্ছায়ার মিলন ও বিকাশই স্বাভাবিক, শোভন ও ফল-প্রসূ হয়ে থাকে। সহধর্মিণীর অকালমৃত্যুর শোকে কবি 'স্মরণ' কবিতাগুচ্ছ রচনা করেছিলেন, কিন্তু শোকের ব্যাকুলতা বা সামান্য হতাশা কোন রচনাতেই

প্রকাশ করেন নাই। তাঁর প্রিয়বন্ধু দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখেছিলেন—

ঈশ্বর আমাকে যে শোক দিয়াছেন তাহা যদি নিরর্থক হয়, তবে এমন বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে! ইহা আমি মাথা নীচু করিয়া গ্রহণ করিলাম। যিনি আপন জীবনের দ্বারা আমাকে নিয়ত সহায়বান করিয়া রাখিয়াছিলেন তিনি মৃত্যুর দ্বারাও আমার জীবনের অবশিষ্টকালকে সার্থক করিবেন। তাঁহার কল্যাণী স্মৃতি আমার সমস্ত কল্যাণ কর্মের নিত্যসহায় হইয়া বলদান করিবে। ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৩০৯ সাল।

অলোকসামান্য কবিজীবনের বিরাট ইতিহাসে কবিপ্রিয়ার নগণ্য উল্লেখের কারণ উপনিষদের ঋষির মতই কবি দুইটি কথায় প্রকাশ করে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথ চাইতেন তাঁর গৃহিণী ও পুত্র-কন্যারা পল্লীর সরল আবেষ্টনের মধ্যে জীবনধারণের আড়ম্বর-শূন্য স্বল্প উপকরণের মধ্যে নিঃস্বার্থ কল্যাণময় জীবন গড়ে তুলবেন। তাই তিনি পত্নীকে লিখেছিলেন—'সেইজন্যেই আমি কলকাতার স্বার্থদেবতার পাষাণ মন্দির থেকে তোমাদের দূরে নিভৃতে পল্লীগ্রামের মধ্যে নিয়ে আসতে এত উৎসুক হয়েছি···এখানে অল্পকেই যথেষ্ট মনে হয় এবং মিথ্যাকে সত্য বলে·ভ্রম হয় না।' *স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে শিলাইদহের নিভৃত পল্লী-নিকতনে সংসার বাঁধবার জন্য তাঁর অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ছিল গভীর।

শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে কবিগৃহিণী তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে অতি সুন্দর একটি ফুলের ও সব্‌জির বাগান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ একখানা চিঠিতে তাঁর সযত্নে-গড়া বাগানের গাছগাছালির কুশল সংবাদ জানাচ্ছেন অপরূপ ভাষায়। শাক, ডাঁটা, বেগুন, কুমড়া, গোলাপ, রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ, মালতী, ঝুম্‌কো, মেদি, হাস্‌নুহানা প্রভৃতি তাঁর মানসপুত্রকন্যারা কে কেমন আছে তা খুঁটিয়ে লিখে শেষে জানিয়েছেন, 'সবাই জিজ্ঞাসা করচে মা কবে আস্‌বেন? আমরা আস্‌ব না শুনে এখানকার আমলারা সব দমে গিয়েছিল।' তা তো হবারই কথা, কারণ আমলা বরকন্দাজদের কোন না কোন ছুতোয় প্রতি সপ্তাহেই কুঠিবাড়িতে নিমন্ত্রণ ফস্‌কে যায় যে!

দেবী মৃণালিনী পাকা গৃহিণী ছিলেন। সংসারের ব্যবহারের জন্য তাঁর ঘি-এর ফরমাইজ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠিখানিতে জমিদারির গোয়ালাদের কাছ থেকে 'ঘেরতো' সংগ্রহ করে পাঠাবার খবর লিখেছেন সে চিঠিখানি পড়লেই কবির রহস্যপ্রিয়তায় অপরিসীম আনন্দে মন ভরে ওঠে। শান্তি-

*চিঠিপত্র, প্রথম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ।

নিকেতনের সেকালের ছাত্রেরা তাঁর কাছে সত্যিকারের মাতৃস্নেহ পেয়ে যেন আশ্রম-লক্ষ্মীর কোলে মানুষ হয়ে উঠত। শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা ও চালাবার জন্য কবিগৃহিণীর নানাভাবে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার ও হাসিমুখে দুঃখবরণও রবীন্দ্রনাথের যোগ্য সহধর্মিণীর পরিচয় দিচ্ছে। সেই গৃহলক্ষ্মীর বিচ্ছেদে বিরহী কবিগুরুর প্রাণেও প্রশ্ন জেগেছিল—

আজ শুধু এক প্রশ্ন মোর মনে জাগে,—
হে কল্যাণী! গেলে যদি, গেলে মোর আগে ;
মোর লাগি কোথাও কি দু'টী স্নিগ্ধ করে
পাতিয়া রাখিবে শয্যা চিরসন্ধ্যা তরে ?

লরেন্স সাহেব

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকাল শিলাইদহ বাসের সুযোগে আমরা দেশ-বিদেশের অনেক মহাপ্রাণ মানুষের অন্তরের পরিচয় পাবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সেকালে অনেক সাহেব, জাপানি ও চীনবাসী শিলাইদহে আসতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অনেকদিন শিলাইদহে বাস করে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথের ইংরাজির গৃহশিক্ষক লরেন্স সাহেবের কথা আগে আমি একটু বলেছি। লরেন্স সাহেব কিছুকাল শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়েও ইংরাজি ভাষার শিক্ষকতা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই মহাপ্রাণ সাহেবের কথা তাঁর অনেকগুলো চিঠিতে বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের পুরানো প্রবাসীর পৃষ্ঠা খুঁজলে সেই সুন্দর চিঠিগুলো পাওয়া যাবে।* শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সৃষ্টির ইতিহাসে এই মহাপ্রাণ সাহেবের নাম সোনার অক্ষরে লিখে রাখবার যোগ্য।

লরেন্স সাহেবকে সাক্ষাৎভাবে দেখেছেন এমন লোক এখনও শিলাইদহে আছেন। একজন সুসভ্য ইংরাজের সেই প্রাণখোলা সহৃদয়তা আজও কেউ ভুলতে পারেন নি। লরেন্স সাহেব যেমনভাবে সাধারণ লোকের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে ও সরলভাবে মিশতেন, তেমন আমি তো শুনি নি। সাহেবের সম্বন্ধে

* প্রবাসী ১৩৩৩ মাঘ, পৃঃ ৫৬২।

যে কাহিনী বলছি তা একটুও অতিরঞ্জিত নয়। এই রকমের সুন্দর কাহিনী দু-দশ বছর পরে হয়ত মহাকালের গায়ে বিলীন হয়ে যাবে।

লরেন্স সাহেবের বাসের জন্য শিলাইদহ কুঠিবাড়ির প্রাঙ্গণের দক্ষিণপ্রান্তে একটা বাংলো ছিল। তার চিহ্ন আজও আছে। সাহেব সেইখানেই থাকতেন। তাঁর দুটি প্রচণ্ড শখ ছিল,—একটি হচ্ছে ছিপ দিয়ে মাছ ধরা, আর-একটি পাইপে তামাক খাওয়া। নানান রকমের হুইল, ছিপ, ফাৎনা, সুতো ইত্যাদি ভরা ব্যাগটি তাঁর একটা বড় সম্পত্তি ছিল।

তিনি গোপীনাথের পুকুরে (শিলাইদহের গোপীনাথ দীঘি) প্রায় প্রত্যহই একজন চাকরকে সঙ্গে নিয়ে মাছ ধরতে আসতেন। সে সময়কার অনেক গ্রাম্য যুবক ও বালক তাঁর বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েছিল। তাঁর মাছ ধরার সঙ্গী ছিল তিনজন ইস্কুল-পালানো ছেলে—অনন্ত রায়, সতীশ সরকার আর জ্যোতিষ মজুমদার (জটা মজুমদার)। এঁরা সবাই আজ পরলোকে।

সাহেব গোপীনাথ দীঘির দক্ষিণপাড়ে একটা টুল পেতে বসে ছিপে মাছ ধরেন, আর ঐ বালকের দল ছিপ, বড়শি, টোপ, চার ইত্যাদির তদ্বির করে দেন। সাহেব মাছ ধরেন আর হরদম পাইপে করে বিলিতি তামাক টানেন।

ঐ তিনটি প্রিয়পাত্র একদিন সাহেবকে বললেন, 'স্যার আপনি আলা তামাকের কড়া পাইপ টানেন। আমাদের দিশি তামাক খেয়ে দেখুন,—কী আরাম আর কী সুন্দর।' সাহেব পল্লীজীবনের বড় ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন ; তিনি বললেন, 'খুব ভাল কথা, একটা ভাল হুঁকোও চাই তো।'

সাহেব কুষ্টিয়া থেকে বেশ বড় একটা ডাবা হুঁকো আনালেন। খোরসেদ-পুর বাজার থেকে গ্রাম্য দা-কাটা তামাকও যোগাড় হল। মাছ ধরবার সময় ঐ হুঁকো, কল্কে, তামাক ইত্যাদিও ঘাটে উপস্থিত হল।

মাছ ধরা চলেছে। অনন্ত রায় বেশ যত্ন করে তামাক সেজে হুঁকোয় লাগিয়ে সাহেবকে খেতে দিল। সাহেব সশব্দে হুঁকো টেনে আনন্দে হাসতে লাগলেন, হুঁকোর মধ্যকার জলের গড়গড় শব্দ তাঁকে বেশি করে মুগ্ধ করল। সাহেব বললেন—'বাঃ, তামাক খেতে তো বেশ।' হুঁকোর মধ্যে জল থাকায় গলা ধরে যায় না, আবার তামাকটাও বেশ মিষ্টি লাগে দেখে সাহেব হুঁকো আর তামাকের সুখ্যাতিতে একেবারে পঞ্চমুখ হলেন। সাহেব একদিন তাঁর অন্তরঙ্গ অনুচর অনন্ত রায়কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শুকনো পাতা থেকে এই রকম কালো কুচকুচে তামাক তৈরি হয় কেমন করে?'

অনন্ত রায় সাহেবকে ইংরাজি বাংলায় খিচুড়ি পাকিয়ে তামাক তৈরির যে কাহিনী বলল, তা সাহেব ভাল বুঝতে পারলেন না। সতীশ সরকার ছিল একটু বেশি রসিক। সে সাহেবকে ইংরাজি বাংলা হিন্দি আর অঙ্গভঙ্গী সহকারে বুঝিয়ে দিল—'দেখুন স্যার, এই টোবাকো গার্ডেনে জন্মে। তা কেটে ড্রাই করে মচ্‌মচে হলে দা দিয়ে কাট্‌ করে, এই এ্যায়সা স্মল টুক্‌রো করে নিতে হয়। ফিন্‌ তার সঙ্গে চিটেগুড় অর্থাৎ মোলাসেস্‌ মিক্স করে চটের উপর ফেলে রাইট হ্যাণ্ড দিয়ে এই এম্‌নি ভেরি ভেরি জোরসে টোবাকো মেকুইং করতে হয়, আবার বিষ্ণুপুরি বা বালাখানা দিয়ে মিক্স্‌ করে আবার এম্‌নি রুরে টোবাকো মেকুইং করতে হয়।' সাহেব তামাক তৈরির কায়দাটা খাসা বুঝলেন এবং এমন ভয়ানক হাসলেন যে তাঁর হাসি আর থামে না,—বরাবরই সতীশ সরকারকে 'টোবাকো মেকুইং' নামেই ডাকতেন। বালকে বৃদ্ধে, বাঙালি আর ইংরেজে এই রকম সরল প্রাণখোলা আমোদ চলত।

স্বর্গীয় তারকনাথ অধিকারীর (লেখকের জ্যাঠামশাই) বড় ছেলেটি ছিলেন পাগল। কিন্তু সাহেবের সঙ্গে ছিল তাঁর খুব ভাব; কারণ যুবক পাঁচুবাবু পাগল হলেও লেখাপড়া কিছু করেছিলেন আর বেশ ইংরাজি বলতে পারতেন। পাঁচু পাগলের পাগলামি বাড়লে তাঁকে লোহার বেড়ি দিয়ে রাখা হত। একবার পাঁচু ক্ষিদেয় অস্থির হয়ে গভীর রাত্রে বেড়ি ভেঙে দিলেন ছুট। হাজির একেবারে কুঠিবাড়িতে সাহেবের বাংলোয় গিয়ে; সাহেব ধড়মড়িয়ে উঠলেন। তখন অনেক রাত; সাহেবের কাছে গিয়েই পাগল বললেন, 'সাহেব বড্ড ক্ষিদে, খেতে দাও।' সাহেবের শোবার ঘরে অত রাত্রে খাবার কোথা থেকে আসবে! ঘরে ছিল একছড়া মর্তমান কলা, তাই পাগলকে খেতে দিলেন। তাই দেখে পাগল চোটে লাল হয়ে বললে, 'অ্যাম আই এ মংকি?' সাহেব যত বুঝান, পাগল ক্ষিদের জ্বালায় ততই চটে ওঠে। শেষে কলা খেয়ে পাঁচু পাগল সাহেবের একটা জামা নিয়ে বাংলোর দক্ষিণদিকের শার্শি-পাল্লা-ওয়ালা একটা জানালার শিক ভেঙে উধাও!

গোলমাল শুনে লোকজন এসে পড়লে সাহেব আমোদে হাসতে হাসতে বললেন, 'পাঁচু ইজ এ গুড চ্যাপ। দো ম্যাড, ভেরি স্ট্রং।' এর পরে সাহেব প্রায়ই পাঁচুপাগলের খোঁজ করতেন—'হাউ ইজ পাঁচু? হোয়ার ইজ পাঁচু?'

এর পর লরেন্স সাহেবকে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়েরই অধ্যাপকরূপে গ্রহণ করা হয়।

লরেন্স-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দুখানি চিঠি—

১. আচার্য জগদীশচন্দ্রকে শিলাইদহের কুঠিবাড়ির গুটিপোকার চাষ সম্বন্ধে চিঠি লিখেছেন—'লরেন্স স্নান আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কীটসেবায় নিযুক্ত। আমাকে সে দিনের মধ্যে দশবার করিয়া টানাটানি করে—প্রায় পাগল করিয়া তুলিল। ইংরেজ জাতি কেন যে সকল বিষয়ে কৃতকার্য হয় তাহার প্রত্যক্ষ কারণ দেখিতেছি। উহাদের শক্তি চালনা করিবার জন্য বিধাতা ঊনপঞ্চাশ বায়ু নিযুক্ত করিয়াছেন, অথচ উহাদের মধ্যে বোঝাই এত আছে যে কাৎ করিতে পারে না।'

২. '…আমাদের শান্তিনিকেতন বোর্ডিং বিদ্যালয়ে রথীকে পড়াইব, সেইজন্য লরেন্সকে অত্যন্ত দুঃখের সহিত বিদায় দিতে হইতেছে। যদি তোমাদের আগরতলার ঠাকুরদের স্কুলে তাহাকে ইংরাজি অধ্যাপক নিযুক্ত কর তবে তোমাদেরও উপকার, তাহারও উপকার। এরূপ সুযোগ আর পাইবে না। লরেন্স পড়াইবার বিদ্যা যেমন জানে, এমন লোক অল্পই দেখিয়াছি। ও আমাকে এখনও ছাড়িতে চায় না, কিন্তু উপায় দেখি না।' …(ত্রিপুরায় মহিম ঠাকুর মহাশয়কে লিখিত)

জাপানি মিস্ত্রির বৌ

হে পদ্মা আমার,
তোমায় আমায় দেখা শত শত বার !

এই কবিতাটি পড়েই বুঝতে পারা যায়, পদ্মানদী ছিল রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রবাহের উৎস, আর 'পদ্মাপ্রবাহচুম্বিত শিলাইদহ' ছিল তাঁর যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের সাহিত্যরস-সাধনার তীর্থস্থান। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে প্রথম প্রথম যে বজরাখানাতে থাকতেন তার নাম ছিল 'চিত্রা'।

চিত্রা ছিল ছোট। তাই রবীন্দ্রনাথ নিজের পছন্দমত বড় করে বিখ্যাত 'পদ্মা' বোটখানি তৈরি করিয়েছিলেন অনেক টাকা খরচ করে। এই বোট তৈরির জন্যে তিনি শিলাইদহে জাপানি মিস্ত্রি আনিয়েছিলেন। সে বোধ হয় আজ থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। তখন ঐ কাজের জন্য একজন

জাপানি মিস্ত্রি সপরিবারে শিলাইদহ কুঠিবাড়ির কাছে বাস করত। তারা অনেকদিন ছিল। আমরা তখন সেই বেঁটে জাপানি মিস্ত্রি-দম্পতিকে দেখে অবাক হতুম, আর ভাবতুম এই বেঁটে অদ্ভুত লোকেরা এমন সুন্দর কারিগর হয় কেমন করে, আর এত কঠিন পরিশ্রম করেই বা কী করে!

'পদ্মা' বোট তৈরি হচ্ছে শিলাইদহের পুরানো হাটের কাছে, যেখানে নীলকর শেলি সাহেবদের সেকালের প্রাচীন কুঠির ভগ্নাবশেষ ছিল। সেই লুপ্তপ্রায় নীলকুঠির ইটের স্তূপের উপর দিয়ে কীর্তিনাশা পদ্মা কলকল করে গান গেয়ে নেচে নেচে চলেছে। বোটের সবই তৈরি হয়ে গিয়েছে; তখন কামরাগুলো তৈরি হচ্ছে।

জাপানি মিস্ত্রি আর তার বৌ সারাদিন ঠুক্ ঠুক্ করে হাতুড়ি পেটে, ঘ্রোস্ ঘ্রোস্ করে করাত চালায়, পদ্মার ধারে সেই নূতন বোটে। বাসায় গিয়ে খায়-দায়, ছেলেপিলে নিয়ে আমোদ করে, চুংচুং করে গান গায়। স্বামী-স্ত্রী মিলে, হাটে-বাজারে শিলাইদহের প্রসিদ্ধ মর্তমান কলা কিনে খায়, আর সবার সঙ্গে বেশ মিলেমিশে থাকে।

একদিন রবীন্দ্রনাথ নদীর ধারে এলেন সেই নূতন বোটের কাজ দেখতে। এসে দেখেন যে জাপানি মিস্ত্রি বা তার বৌ সেখানে নেই। তিনি বোটের কামরা তৈরি সম্বন্ধে নূতন কিছু ফরমাশ করবার জন্য মিস্ত্রিবৌকে খোঁজ করলেন। তাকে না পেয়ে ফিরে যাবার বেলায় বোটের পাহারায় মোতায়েন জামাল বরকন্দাজকে বলে গেলেন, 'কাল সকালে এই সময়ে মিস্ত্রিবৌ যেন এইখানে উপস্থিত থাকে, তাকে আমি কাজের সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দেব। তাকে আজই এই কথা বলে রেখ।'

জামাল বরকন্দাজ সেকালের একজন জবরদস্ত বরকন্দাজ ছিল, বেশ জোয়ানমর্দ চালাক-চতুর লোক বলে পশার-প্রতিপত্তিও ছিল খুব। সে প্রায়ই জলকর মহালে মোতায়েন থাকত। তাই জেলে আর নিকারিরা তাকে খুব ভয় করে চলত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জামাল বরকন্দাজ নানান কাজের তালে রবীন্দ্রনাথের ঐ হুকুম মিস্ত্রিবৌকে বলতে একেবারেই ভুলে গেল।

তার পরদিন ভোরে যথাসময়ে রবিবাবু বোটের কাছে এসে দেখেন মিস্ত্রিবৌ তখনও আসে নি। তিনি কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করে খুব বিরক্ত হয়ে কুঠিবাড়িতে ফিরে গেলেন। মিস্ত্রিবৌয়ের একটি ছেলের অসুখ হওয়ায় সে ম্যানেজারবাবুকে বলে দুই-তিন দিনের ছুটি নিয়েছিল, তার স্বামীও কি

যেন কিনবার জন্যে কলিকাতায় গিয়েছিল। এদিকে জামাল বরকন্দাজ এমন ভুল করে বসল যে তাতে ব্যাপার গড়াল অনেক দূর।

রবীন্দ্রনাথ কুঠিবাড়িতে মিস্ত্রিবৌকে রান্না করতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'জামাল বরকন্দাজ কি তোমাকে কোন খবরই দেয় নি?' মিস্ত্রিবৌ এই কথা শুনে খুব দুঃখিত হল। সে জানাল, 'বাবু, আমি এই খবরটুকু পেলেই আজ সকালে বোটের কাছে হাজির থাকতুম। তা আমি মোটেই জানতে পাই নি।'

রবীন্দ্রনাথ কুঠিবাড়ির মধ্যে চলে গেলেন। তৎক্ষণাৎ মিস্ত্রিবৌ ক্ষ্যাপা বাঘিনীর মত ছুটল কাছারিতে জামাল বরকন্দাজের কাছে। জামাল বরকন্দাজ তখন কাছারির মেসের পেছনে জামগাছ তলায় বসে তামাক খাচ্ছে আর তার সহকর্মীদের সঙ্গে গল্প করছে।

জামাল বরকন্দাজের কাঁধে ছিল গামছা। ঝড়ের বেগে মিস্ত্রিবৌ এসে তার গলার গামছা ধরে পেঁচিয়ে টান মেরে বললে, 'তুমি আমায় জানাও নি কেন? বাবুমশায়ের হুকুম আমায় বল নি কেন? বোকা কোথাকার!' জামাল সত্যিই বড় লজ্জিত ও ব্যাকুল হয়ে পড়ল।

জামাল যতই বলে 'ওরে, আমার ভুল হয়েছিল'—মিস্ত্রিবৌ ততই রেগে একেবারে ক্ষেপে ওঠে। জামালের গলায় গামছার প্যাঁচ কসে টেনে জামালের মত জোয়ান মর্দকে একেবারে কাবু করে ফেলল। জামাল বলে, 'আমার ভুল হয়েছিল, আমায় ছাড়্‌রে—ছাড়্‌।' মিস্ত্রিবৌয়ের রাগ পড়ে না—সে শুধু চীৎকার করে; 'মুনিবের কাজে এত বড় ভুল? ফাঁকি দিয়ে মাইনে খাও?' মিস্ত্রিবৌ জামালের গলায় গামছা দিয়ে এমন নাস্তানাবুদ করল যে, জাপানি-বাঘিনীর হাত থেকে তাকে বাঁচায় কার সাধ্য? যারা সেখানে ছিল তারা তো হতভম্ব হয়ে গেল জাপানি মেয়ের শক্তি ও সাহস দেখে। মিস্ত্রিবৌ এমনি করে জামাল বরকন্দাজকে নাস্তানাবুদ করে বকতে বকতে হন্‌-হন্‌ করে তার বাসায় ফিরে গেল।

জামাল খুব লজ্জিত হয়েছিল। সে বলত, 'বাঘিনী বেটি আমায় খুব জব্দ করেছে।' সকলেই বলাবলি করত,—'স্বাধীন জাপানের মেয়ে! ওর তেজ, ওর শক্তি, আমরা কী করে পাবো!'

ভুষ্টুলাল

শিলাইদহ বেড়পাড়ার জঙ্গলি প্রামাণিকের বেটা ভুষ্টু প্রামাণিক শিলাইদহ অধিকারীবাবুদের বাড়িতে (বড়বাড়িতে) গরুর রাখালি করত। তখন মাত্র দশ-এগারো বছরের চ্যাংড়া ছেলে ভুষ্টু। ফুটফুটে চেহারা, লম্বা একহারা গড়ন, ভারি চালাক আর পেটুক। কিসে খাওয়ার তরিজুৎ হবে, কিসে অল্প পরিশ্রমে কাজ হাসিল হবে, সেই মতলবেই সে ঘুরত।

অধিকারীবাবুদের গরুর রাখালি কাজটা তার আদৌ পছন্দ হল না। দুধ, চিড়ে, মুড়ি, মাছ, পায়েসাদি খাওয়া-দাওয়ার বেশ জুৎ ছিল; কিন্তু রামবাবুর তামাক সাজা আর এক পাল দুষ্টু বেয়াদব গরু নিয়ে ভুষ্টু বড়ই মুস্কিলে পড়ল। বারো-তেরোটা গরু আর তিন-চারটে নাল্‌কি বাছুর মাঠে চরছে, আর ভুষ্টু এক গাছে উঠে মনের আনন্দে আম খাচ্ছে, বা কারও ক্ষেতের মটরের ফল বা শাক তুলছে, অথবা অন্য রাখালদের সঙ্গে ডাংগুলি খেলছে,— অমনি দুই-তিনটি বেয়াড়া গরু চাষিদের ক্ষেতে লাগছে, ধরতে গেলেই লেজ উঁচু করে দৌড়, আর তাদের পেছনে ছুটতে ছুটতে চষা মাঠের ঢিলে হোঁচট খেয়ে-খেয়ে হাতে-পায়ে জখম হওয়া। ভুষ্টুলালের গোচারণের লীলা ছিল এই প্রকার। বাড়িতে এলেই ভুষ্টুর বিরুদ্ধে চাষিদের নালিশের পর নালিশ। ভুষ্টু দেখল, বাবুদের কাছে মার-ধোর খাওয়ার আগে মানে মানে চম্পট দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

বলা নেই কওয়া নেই, সত্যিই একদিন ভুষ্টুর আর টিকি দেখা গেল না। ভুষ্টু বাঁচল; ঐ রকম ঠ্যাটা বেয়াদব গরুর পাল আর রামবাবুর হরদম তামাক সাজার আর গাল খাওয়ার ঝামেলা থেকে হাড় জুড়াল। কিন্তু চাষার ছেলে, তার বাবার হাতে সে রেহাই পেল না। তখন রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে দীর্ঘকাল শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে বাস করছেন। ভুষ্টুর বাড়িও কাছারিপাড়া ও কুঠিবাড়ির কাছে। তার বাপ কুঠিবাড়ির সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে অনেক খোসামোদ করে কুঠিবাড়িতে ভুষ্টুর মনের মত একটা চাকরি ঠিক করে দিল।

ভুষ্টু কুঠিবাড়িতে ছেলেবাবুদের চাকর হয়ে গেল। ভারি মজা, আহারের খুব জুৎ! ভুষ্টু চা খায়, তখনকার দিনের আজগুবি খাদ্য সেই পাউরুটি বিস্কুট ইত্যাদি কত কী খায়। ফুর্তির আর সীমা নেই। কিন্তু বড় কষ্ট হল তার, যখন-তখন বাড়ি যাবার ছুটি সে পায় না, গুলসড়ি খেলতে পায়

না ; কুঠিবাড়ির কলমের আমগাছে উঠতে পায় না। উঃ ! সে যেন জেলখানা। হঠাৎ একদিন এখান থেকেও তুষ্টু দিল চম্পট।

আর তুষ্টুর দেখা নেই, নিজের বাড়িতেও সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। ত্বেলা তুটো খায় মাত্র। জঙ্গলি তার এই বেয়াড়া ছেলের টিকিটিও দেখতে পায় না। রবিবাবু, দেবী মৃণালিনী তুষ্টুকে খুব ভালবাসতেন। রবিবাবু বিশেষ করে ওর তুষ্টুমি ও লম্ফঝম্ফ পছন্দ করতেন, বলতেন, 'ও মিটমিটে শয়তান।' একদিন রবিবাবু বড় বড় আমলাদের সঙ্গে সদর রাস্তা দিয়ে নদীর দিকে বেড়াতে যাচ্ছেন। ফেরার হয়ে তুষ্টু রাস্তার বাঁদিকের মাঠে তার দলবল নিয়ে হাডু-ডু খেলছে, 'চোল্ মারি ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্!' রবিবাবু দূর থেকেই তা দেখেছেন। তিনি এক বরকন্দাজকে জিজ্ঞেস করলেন—'ঐ না তুষ্টু, সে নাকি পলায়ন করেছে ?' সত্যি তাই,—তুষ্টু বাবুমশাইকে দেখেই দৌড়,—একেবারে ভোঁ—দৌড়। কোথায় যে পালাল—তার ঠিক নেই। বাবুমশাই হেসে অস্থির। তার পরের দিন জঙ্গলি কুঠিবাড়িতে তুষ্টুকে ধরে এনে হাজির করে বহাল করে দিয়ে গেল। তখন কুঠিবাড়িতে তার নামডাক পড়ে গেল—'তুষ্টু তুষ্টু !' বাবুমশাই তুষ্টুকে সপ্তাহে তিনদিন রাত্রে বাড়ি যাবার ছুটির হুকুম দিলেন।

কিছুদিন যায়। এবারে তুষ্টু ভাল হয়েছে। বড় হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে তো! বেশ মনোযোগ দিয়ে কাজকর্ম করছে। আর সে চ্যাংড়া মানুষ নয়, ভারিক্কি চালে বড় বড় চাকর দারোয়ানদের মত কাজ করে যাচ্ছে।

কি কারণে যেন হঠাৎ মৃণালিনী দেবী কলকাতা যাবেন। তুষ্টু তাঁকে ধরে বসল, 'আমিও মায়ের সঙ্গে যাব, ওরা তো যেয়েই থাকে। এবারে আমি যাব।' মহা মুস্কিল! ছেলেমানুষ, জানে না শোনে না—যাবে কলকাতা! দেবী মৃণালিনী ও রবিবাবু নিজে অনেক বুঝালেন। তুষ্টু গোপনে গোপনে কাঁদে,—মনমরা হয়ে বসে থাকে। তুষ্টুর বড্ড মন খারাপ—কলকাতার যাতুঘর, চিড়িয়াখানা, হাইকোর্ট, থিয়েটার, ট্রামগাড়ির গল্প শুনেছে সে। এত সব দেখার ভাগ্য তার হবে না! সে কি বোকা ? শেষকালে, 'আমি কহিলাম আরে রাম রাম, নিবারণ সাথে যাবে' রকমখানা করে বাবুমশাই তুষ্টুকেই সঙ্গে দিয়ে দিলেন। বললেন,'ও মিটমিটে শয়তান,—ও সব পারবে, কোন ভয় নেই।' এইবার তুষ্টুর প্রথম কলকাতা দর্শন হল!

তুষ্টু ফিরে এসে গল্পের বাহার খুলে দিল ; জোড়াসাঁকো বাড়ির কাণ্ড-কারখানা, কলকাতা সহরের আজগবি ব্যাপার, খানাপিনার বহর—গল্পে

একেবারে আসর মাৎ করে দিল। শুধু তাই নয়, ছোট-মা বলে দিয়েছেন, 'কলকাতা আসতে হলে তুষ্টুই যেন সঙ্গে আসে, সে খুব চালাক-চতুর, অন্য চাকর-বাকরের মত ভ্যাবা গঙ্গারাম নয়।' আর তুষ্টুকে পায় কে? এমন সেরা সার্টিফিকেট পেয়েছে সে!

মৃণালিনী দেবী আবার শিলাইদহে এলেন। তুষ্টুর প্রবল বাসনা সে প্রমোশন নেবে, খানসামাগিরি থেকে বরকন্দাজগিরিতে। সে এই মতলব করেই মস্ত চোখতোলা তেলকুচ্কুচে লাঠি বানিয়েছে,—সুন্দর লাঠি। এখন খাকি কোট, পট্টি, চাপরাস, পাগড়ি ইত্যাদি পেলেই ব্যস্!

মৃণালিনী দেবী বললেন, 'তুই বড্ড ছেলেমানুষ, আর একটু বড় হ। দেব তোকে বরকন্দাজ করে। ভাবনা কি?'

তুষ্টু ছিল ঢ্যাঙ্গালম্বা, ছেলেমানুষ হলে কি হয়। আর তখনকার ঠাকুর-বাবুদের একজন শ্রেষ্ঠ লেঠেল বরকন্দাজ হয়ধর ছিল অত্যন্ত বেঁটে, মেছেরও তাই। তুষ্টু অমনি জবাব দিল, 'হয়ধর, মেছের, এদের চেয়েও আমি লম্বা, তবেই তো বড় হয়েছি।'

মৃণালিনী দেবী খুব হাসলেন। তুষ্টু খুব গম্ভীর চালে বলল, 'ওদের চেয়েও আমি ভাল কাজ পারব। ওরা এ্যাত এ্যাত খাবে আর লাঠি খেলাবে, ফাইফরমাজ খাটতে আমার সঙ্গে পারতে হচ্ছে না।'

সত্যিই তাই। তুষ্টুর চালাকি ফন্দিফিকিরের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি গুণ ছিল, সে খুব হুঁশিয়ার আর বিশ্বাসী। যাই হক, তুষ্টুর কান্নাকাটিতে অতিষ্ঠ হয়ে, ছেলেমানুষ হলেও মাঠাকরুণ তাকে দিলেন বরকন্দাজ করে। তার বড় কাজ হল, দরকারের সময় আমলাবাবুদের সঙ্গে কলকাতা যাওয়া, তাঁদের সঙ্গে চালানের টাকা জোড়াসাঁকো বাড়িতে পৌছান, জিনিসপত্র কেনাকাটা ইত্যাদি। কলকাতা সহরে কোথায় কোন্ জিনিস কিনতে পাওয়া যায়, কোথায় কোন্ ব্যাঙ্ক, কোথায় বাবুদের আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি, ঘি ময়দা মাছ শাক-সব্জি আম ইত্যাদি শিলাইদহ থেকে কি করে কলকাতা নিয়ে আসতে হয়, কেমন করে খরচের টাকার হিসাব রাখতে হয়—এসব তুষ্টুলালের নখদর্পণে।

যেবারে মৃণালিনী দেবী শেষবার শিলাইদহ ছেড়ে যান সেবার তুষ্টু কেঁদেছিল খুব—সঙ্গেও গিয়েছিল কলকাতা অবধি।

লেখাপড়া না জানলেও তুষ্টুর গাঁঠে-গাঁঠে বুদ্ধি। জমিজমাও সে কিছু করল, ভাল গেরস্থও হল। কিছুকাল পরে শিলাইদহ সদর কাছারির

জমাদারগিরি (হেড্ বরকন্দাজ) করেছিল। কয়েকটা মেয়ে রেখে তার বৌটিও মারা গেছে।

ফরসা, লম্বা, মাথায় মস্ত টাক—ভুট্টুলাল আজও বেঁচে আছে—আজও সে গল্পে আসর মাৎ করে। সেকালের লোক সে, দীর্ঘজীবী হক।

মৃত্যুঞ্জয় রবীন্দ্রনাথ

পূজনীয় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের কাছে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে একটি চমৎকার কাহিনী শুনেছি। এ কাহিনীটি তিনি কিছুদিন আগে 'প্রবাসী'তে লিখেছিলেন। তাঁর কাছে বসলে অনেক পুরানোকাহিনী শোনা যেত। পাঠক-পাঠিকাদের কাছে তাঁর সেই কাহিনীটা দিলাম—

রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী রূপে আমার পাবনায় সাহিত্য-সম্মিলনে যাবার কথা ছিল। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শিলাইদহে, আমি ছিলুম কলকাতায়। তাই বন্দোবস্ত ছিল যে, আমি শিলাইদহে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বজরায় পদ্মা পাড়ি দিয়ে পাবনায় যাব। পাবনা শিলাইদহ থেকে বেশি দূর নয়। একটু উজিয়ে গিয়ে পদ্মা পাড়ি দিলেই পাবনা শহরে উপস্থিত হওয়া যায়।

আমি ভোরে ঘুম থেকে উঠে আমার দুটি অনুচর সমভিব্যাহারে শিয়ালদহ স্টেশনে গিয়ে হাজির হলুম। আমার অনুচর দুটির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক, কারণ এ দুটিকে আমি ছাড়া অপর কেউ হজম করতে পারবে না। আমার আত্মীয় মহেন্দ্র রায় ছিল বেপরোয়া লোক। কথা বলত চোখা চোখা, আর অসাধারণ পরিশ্রমী ছিল। এ পরিশ্রমশক্তির কারণ পরে আবিষ্কার করি। মহেন্দ্র গাঁজা খেত আর গাঁজায় দম দিয়ে সে বিনা আপত্তিতে শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট হেঁটে চলে যেত।

আর হেদায়েৎ নামক মুসলমান ছোকরাটি বাল্যকাল থেকেই আমার বাড়ি থাকত। বড় হয়ে সে মধ্যে মধ্যে বছর কয়েকের জন্য অন্তর্ধান হত। জাহাজে চলে যেত বাবুর্চি হিসাবে আবার ফিরে এসে আমার বাড়িতেই আস্তানা গাড়ত, আমার অনুমতি না নিয়ে। তার প্রধান গুণ ছিল সে রাঁধত চমৎকার—দেশি বিলেতি দু রকমই। আর এরা উভয়েই আমার বিশেষ অনুগত ছিল।

শিয়ালদহ স্টেশনে উপস্থিত হয়ে দেখি ঠাকুরবাবুদের আমলা গোপাল চাটুজ্জে আর জামাই মণিলাল গাঙ্গুলী আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

মণিলাল আমার সঙ্গে এক গাড়িতে এক কামরায় কুষ্টিয়া যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে তিনি আমাকে বললেন যে, শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে একজনের কলেরা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রাম করে খবরটা আমাকে দিতে বলেছেন। খবরটা শুনে আমার হরিভক্তি উড়ে গেল। কারণ কলেরা ও বসন্ত, এ দুটি রোগকে আমি ভারি ডরাই।

মণিলাল আমাকে নানারূপ প্রশ্ন করতে লাগলেন, কিন্তু মনে সোয়াস্তি ছিল না বলে সে-সব প্রশ্নের উত্তরে যা মনে এল তাই বললুম।

সে যাই হক, শেষটায় কুষ্টিয়ায় নেমে খেয়া নৌকায় গড়াই পার হয়ে, পালকিতে শিলাইদহ গিয়ে হাজির হলুম। কুঠিবাড়িতে উপস্থিত হয়ে দেখি রবীন্দ্রনাথ বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাকে দেখে বললেন, 'আমার টেলিগ্রামে এখানকার খবর পাও নি?'

আমি বললাম, 'পেয়েছিলুম, মাঝপথে।'

তিনি বললেন, 'যে লোকটির কলেরা হয়েছিল, সে আজ সকালে মারা গেছে। পথ-চল্‌তি একটি হিন্দুস্থানির কলেরা হয়ে রাস্তায় পড়ে ছিল। আমি খবর পেয়ে তাকে রাস্তা থেকে তুলিয়ে এনে এই কুঠিবাড়িতে রেখেছিলুম। দুদিন ধরে তার সেবা-যত্ন করেছি ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিয়েছি, কিন্তু তাকে বাঁচাতে পারলুম না।'

আমি ভয়ে ভয়ে সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজন করলুম। তারপর তিনি বললেন, 'প্রমথ, তোমার এ বাড়িতে থাকা হবে না। আজ বিকেলেই আমরা বজরায় গিয়ে উঠব, এবং কোন বালির চরের পাশে বজরা লাগাব। আমি অবশ্য ভয় পাই নি; কিন্তু তুমি ভয় না পাও, কলকাতায় তোমার স্ত্রী ভয় পাবে।'

আমি এ প্রস্তাবে সম্মত হলুম এবং রবীন্দ্রনাথকে বললুম যে, আমার দুটি অনুচর আছে, অনুমতি করেন তো তাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাব। একজন রাঁধে ভাল, আর একজন খুব করিৎকর্মা লোক।

একথা শুনে তিনি খুশি হলেন আর আমার অনুচরদ্বয়ের সঙ্গে আমরাও কুঠিবাড়ি ছেড়ে বোটে গেলুম এবং তিনরাত বোটেই রইলুম।

এই সময় আমি আবিষ্কার করি যে তিনি মনে মনে মৃত্যুঞ্জয়, যা আমরা নই।*

* প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪৮ সাল। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের অনুমতিক্রমে।

রবীন্দ্রনাথের পল্লীবাসভবন শিলাইদহ কুঠিবাড়ির নিচের তলার ঘরের মধ্যে একজন হিন্দুস্থানির মৃত্যু হয়েছিল, এ খবরটা আমরাও জানি। চাকরেরা নাকি হিন্দুস্থানি ভূতের সঙ্গে মোলাকাৎ করত। কিন্তু ব্যাপারটা কি হয়েছিল তা এই কাহিনীতেই জানা গেল।

কান্নাহাসির গঙ্গাযমুনায়

....

পলানের মা

শিলাইদহের গয়লাপাড়ায় কৈলাস ঘোষের বিধবা স্ত্রী পলানের মা নাম্নী জনৈকা গয়লানির দুধে জল থাকবেই—এই তুচ্ছ সংবাদটা রবীন্দ্রনাথের কানে কি করে উঠল, তা নিয়ে গ্রামের অনেকে গবেষণা করত। কিন্তু পলানের মা যে কী রকম অসাধারণ কোন্দলপ্রিয়া, তা তিনি টের পেলেন যে কী উপায়ে সেই গল্পই বলব।

সেই সময় রবীন্দ্রনাথের বোট কিছুদিন গয়লাপাড়ার নিকটেই 'হানিফের ঘাটে' বাঁধা ছিল। ফাল্গুন-চৈত্র মাস। পদ্মা শীর্ণা। বোটের মাঝিরা জটলা পাকিয়ে প্রায়ই বিখ্যাত পাড়াকুঁদুলি পলানের মার কীর্তি-কাহিনী আলোচনা করত। তা হয়ত সহজ মানুষ রহস্যপ্রিয় রবীন্দ্রনাথের কর্ণগোচর হত। মানুষের অনেক বিচিত্র মানসিক রহস্য তিনি নিজের ভূয়োদর্শনে ও প্রতিভায় দেখেছেন, সাহিত্যেও রূপ দিয়েছেন।

একদিন কৌতূহলী রবীন্দ্রনাথ তপসি মাঝিকে বললেন, 'হ্যাঁরে, তোদের নামকরা পলানের মাকে দেখাতে পারিস?'

তপসি বলল, 'হ্যাঁ হুজুর, একটু পরেই বোধ হয় পলানের মা ঘাটে আসবে, তখন দেখাব।'

তপসির কথা মিথ্যা হল না। একটু পরেই মাথায় চুলের ঝুঁটিবাঁধা, ময়লা কাপড় পরা জনৈকা কৃষ্ণাঙ্গী প্রৌঢ়া বিধবা পদ্মার স্নানের ঘাটে এক রোরুদ্যমান বালককে নিয়ে অবতীর্ণ হল। বালকটি কাঁদছে অবিরাম, আর তার মাকে অবিশ্রান্ত কিল-চড়-ঘুষি মারছে। মা তাকে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে স্নানে চলেছে।

তপসি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'হুজুর, ঐ যে পলানের মা, আর ঐ ছেলেটি তার পলান।'

কৌতূহলী, রঙ্গপ্রিয় রবীন্দ্রনাথ সেই অপরূপ দৃশ্য দেখলেন।

পলানের মার একটু ইতিহাস বলা হয়ত অসঙ্গত হবে না। পলানের মার

বাড়িখানি শিলাইদহের সদর রাস্তার একেবারে ধারে। তার গলার স্বর ছিল ভাঙা কাঁসরের মত, চেহারাখানাও একটু অস্বাভাবিক রকমের ভীমা। সংসারে ঐ হাবাগোবা আট-নয় বছরের পলান ছাড়া তার কেউ ছিল না। তা ছাড়া, তার এক বিধবা জা ছিল, সে নীলের মা। সে বেচারি পলানের মার মুখের দাপটে তার ছেলেটিকে নিয়ে সদর রাস্তার অপর পারেই তার এক নিকট-আত্মীয়ের বাড়িতে শান্তিতে বাস করত। পলানের মার চার-পাঁচটি গরু ছিল। সে অনেককেই দুধের জোগান দিত, বিশেষ করে শিলাইদহ কাছারির আমলা-বাবুদের বাসায়; কিন্তু পলানের মার দুধের বিশেষত্ব এই ছিল যে, তাতে একটু বেশি পরিমাণে জল মেশান থাকত। এই নিয়ে প্রায়ই গোলমাল, ঝগড়া লোকের গা-সহা হয়ে গিয়েছিল। তার মাথাটাও একটু যেন কিছু পাগলাটে ধরনের ছিল—কারণ, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তার ঝগড়া অতি ভয়ঙ্করভাবে পরিসমাপ্ত হত!

রবীন্দ্রনাথের বোধ হয় পলানের মার সঙ্গে একটু আলাপ-পরিচয় করার ইচ্ছা হয়েছিল। অপ্রত্যাশিতভাবে তার একটা সুযোগও মিলে গেল। পলানের মার অনেক জমিজমা ছিল, কিন্তু খাজনা দিতে তার খুব আলস্য, যদিও তার পাওনাগণ্ডা সাড়ে ষোল আনা আদায় করতে সে খুবই তৎপর ছিল। পলানের মার তিন বছরের খাজনা বাকি। ম্যানেজারবাবু তার বকেয়া খাজনার ড্যামেজ চার্জ করে পেয়াদার পর পেয়াদা পাঠাতে লাগলেন। পলানের মা খাজনা হিসেবে অনেক টাকার দায়ী হয়ে পড়ল, তার উপরে আবার ড্যামেজ।

সে দরখাস্ত করল ড্যামেজ মাপের প্রার্থনা করে। সে প্রার্থনা ম্যানেজার-বাবু মঞ্জুর করলেন না। পলানের মা ম্যানেজারবাবুর হুকুম শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। আরও যখন সে শুনতে পেল যে, তার অবস্থা বেশ ভাল বলেই তার ড্যামেজ মাপ হয় নি, তখন সে বাড়ি বসে আপন মনে ঝগড়া সুরু করল—মুখপোড়া ড্যাক্‌রারা আমায় বড়লোক পেয়েছে! আমি যে না খেয়ে মরি, তা তারা চোখে দেখতে পায় না; চোখের মাথা খেয়েছে—ইত্যাদি।

এর পর দুই-তিন দিন সে পদ্মার-স্নানের ঘাটে মহাকলরবে সালঙ্কারে ম্যানেজারবাবু যে অন্যায় করে তার ড্যামেজ মাপ দেন নি, এই নিয়ে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে তুমুল বকাবকি করে স্নানের ঘাট একেবারে তোলপাড় করে তুলল; উদ্দেশ্য, বোটের মধ্যেই বাবুমশাই আছেন, যেন তাঁর কানে এই কথাগুলো যায়।

রবীন্দ্রনাথ ব্যাপারখানা বুঝে নিলেন। এক মাঝি চুপি চুপি পলানের মার

বাড়িতে গিয়ে খুব সহানুভূতি দেখিয়ে বলে এল, খোদ বাবুমশায়ের কাছে দরখাস্ত করলে এর প্রতিকার নিশ্চয়ই হবে। এদিকে হঠাৎ একদিন বাবুমশাই ম্যানেজারের কাছে পলানের মার ড্যামেজ মাপের দরখাস্ত তলব করলেন। ম্যানেজারবাবু ভেবে আশ্চর্য হলেন যে, এই সামান্য ব্যাপার বাবুমশায়ের কাছে গেল কি করে।

পরের দিন বাবুমশায়ের বোটে জমিদারির কাজকর্ম চলছে, ম্যানেজারবাবু বসে আছেন। এমন সময় পলানের মা সশরীরে বোটের মধ্যে গিয়ে টেবিলের উপর তার দরখাস্ত পেশ করল। দরখাস্ত যে লিখে দিয়েছে সে নিচে লিখেছে— 'আজ্ঞাধীনা—পলায়নের মাতা···সাং কশবা।'

'পলায়নের মাতা' পড়েই বাবুমশাই হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, 'তুমি তো এসেছ, তোমার পলায়ন কই?'

পলানের মা তার স্বাভাবিক কাংস্যকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে বলল, 'হুজুর, সে অনাথ অবোধ বালক, তার কেউ নেই তিনকুলে। সে এত টাকা কোথায় পাবে?'

বাবুমশাই হেসে বললেন, 'সে দিতে না পারুক, তার মা তো পারবে। সে এত-এত দুধ বেচে, দই বেচে। কত টাকা লাভ করে জল বেচে।'

তখন ম্যানেজারবাবু তার অনেক কাহিনী, ঘোষদের অবস্থা ও জমাজমির কথা বাবুমশাইকে বললেন।

ম্যানেজারবাবুর কথা শুনে পলানের মা গেল ভীষণ চটে। সে হাত-পা নেড়ে, চোখ দুটো লাল করে ভীষণ বক্তৃতা শুরু করল, আবার শেষকালে রৌদ্ররসের পরিবর্তে করুণরস ঢেলে বক্তৃতার পরিসমাপ্তি করল—চোখ দিয়ে খুব জলও ঝরাল।

বাবুমশাই ব্যথিত হলেন, কিন্তু পলানের মার সুমধুর কোন্দল শুনবার লোভ ছাড়তে পারলেন না। 'সময় মত সরকারের টাকা দাও নি কেন?' তিনি এই রকমের এক একটা প্রশ্ন করেন, আর পলানের মার বীভৎস ও করুণরস-মিশ্রিত বক্তৃতা শুনে খুব খানিক হাসেন। এমনি করে আধঘণ্টা পলানের মার সঙ্গে মোলাকাৎ করে কৌতুকপ্রিয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৌতূহল চরিতার্থ করলেন। পুত্র পলানের নির্বুদ্ধিতা, তারণ ঘোষের হিংসা, নীলের মার অবিবেচনা ইত্যাদি অনেক কাহিনী তিনি উপভোগ করলেন। হাসি গোপন করে বললেন, 'যা, তোর দরখাস্ত আমি মঞ্জুর করব না।'

হুকুম শুনবামাত্র পলানের মা রাগে দিগ্‌বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য হয়ে বোট থেকে

পদ্মায় ঝাঁপ দিল। বোটের চারদিকে 'ধর্‌-ধর্‌' শব্দ উঠল। বাবুমশাই ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। পলানের মা বোটের পাশে সাঁতরায় আর বলে, 'বাবু, ড্যাম্মিস্‌ মাপ দিলি না, এই আমি ডুবে মলাম।'

বাবুমশাই চেঁচিয়ে বললেন, 'মাপ দেব, তুই মরিস্‌ নে, উঠে আয়।'

পলানের মা সাঁতার কাটে আর বলে, 'মিথ্যে কথা! আগে বল্‌, মাপ দিয়েছিস্‌। নইলে এই ডুবে মলাম।'

বাবুমশাই এমন আমোদ কমই উপভোগ করেছেন। শেষে বললেন, 'তুই উঠে এসে ত্থাখ্‌, তোর দরখাস্ত মঞ্জুর করেছি।'

তখন পলানের মা জল থেকে ওঠে, হুকুম সত্য কিনা দেখার পর বাড়ি যায়।

পলানের মার কোন্দল-কৌশলে সত্যিই তার দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছিল। এর পরে পলানের মা যদি কখনও বাবুমশায়ের দেখা পেত, অমনি গলায় আঁচল দিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করত। বাবুমশাই জিজ্ঞেস করতেন, 'তোর পলায়ন ভাল আছে তো?' সে বলত, 'হাঁ বাবু, সে হাবাটা হুজুরের আশীর্বাদে ভালই আছে।'

আনারসের মামলা

দুই বুড়ি বোষ্টমির মধ্যে তুমুল ঝগড়া; শুধু ঝগড়া নয়, ঝগড়া গড়ায় মারা-মারিতে এবং তার ফলে রক্তপাত। শিলাইদহের পদ্মাতীরে জেলেপাড়ার ছেলে-বুড়ো ঐ দুই নারীযোদ্ধার রণকৌশলে স্তম্ভিত।

শ্রীধর বৈরাগীর বোষ্টমি খঞ্জনি বাজিয়ে বেশ মিষ্টি গান গাইত, আবার কোন্দলে তার সেই মিষ্টি গলা ভৈরব গর্জন করত। তার নাম অনেকেরই সুপরিচিত, সে 'পুণ্যা বোষ্টমি'।* বৃদ্ধা হলেও তাকে বুড়ি বলা যেত না, তার স্বাস্থ্য দেখে সকলে তাকে হিংসা করত। কালাচাঁদ বৈরাগীর বাড়ির সীমানা-লাগোয়া ছিল উমা বোষ্টমির বাড়ি। দুই বাড়ির মাঝখানে কয়েকটা আমগাছ এবং তার নিচে কয়েকটা আনারসের ঝাড় ছিল।

উমা বোষ্টমি বেশি বৃদ্ধা, একটু ভারিক্কে,—তাকে পাড়ার অনেকে 'উমা-

---

* এই গল্পের পাত্রীদের সম্বন্ধে সেকালের লোকদের কাছে নানারূপ কথা শোনা যায়। সবচেয়ে প্রামাণ্য কাহিনীটাই বিবৃত হল। ঐ পাড়ায় অনেক বৈরাগী-বোষ্টমি ছিল।

ঠাকরুণ'ও বলত। উমাঠাকরুণই সুন্দরকান্তি মুরলী বৈরাগীকে বাল্যকাল থেকে পরম স্নেহে নিজের বাড়িতে পালন করে। মুরলী এককালে খুব ভাল গাইতে পারত, আর খাসা চেহারাখানা ছিল তার।

ঝগড়া বাধল এই পুণ্যা বোষ্টমি আর উমা বোষ্টমির মধ্যে। ঝগড়া ও রক্তপাতের কারণ, আনারস উত্তোলন।

ব্যাপারখানা এই—এই উভয় বোষ্টমির বাড়ির সীমানার মধ্যে যে কয়েক ঝাড় আনারসের গাছ ছিল, সেই গাছে পাঁচটি আনারস ছিল। উমাঠাকরুণ একদিন ভোরে সেই আনারসের দুইটি মাত্র তোলে। ঠিক সেই সময়ে পুণ্যা বোষ্টমি সেখানে এসে বলে, 'আনারসের সবগুলো ঝাড় আমারই বাড়ির সীমানায়, উমাঠাকরুণ কেন চোখের মাথা খেয়ে আনারস তুলল?'

উমাঠাকরুণের বক্তব্য, আনারসের ঝাড় তারই সীমানার মধ্যে, পুণ্যা যে কয়টি চারা ঐ ঝাড়ের কাছে বুনেছিল তা অনেকদিন মরে গেছে। অতএব এ সবগুলো ঝাড় তারই এবং আনারসগুলো সে-ই তুলে নেবে।

এই নিয়ে দুজনে ভীষণ ঝগড়া। পুণ্যা বোষ্টমি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে কাস্তে বার করে এনে বাকি তিনটি আনারস কাটতে উদ্যত হয়। উমাঠাকরুণ তাকে বাধা দেওয়ায় দুজনে ঝগড়ার পরিবর্তে হুড়াহুড়ি লাগে। বৃদ্ধা উমাঠাকরুণ সুবিধা করতে না পেরে একটা বাঁশের আগা নিয়ে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হয়। কোন্দল এবং আক্রমণ চলতে চলতে পুণ্যা উমাঠাকরুণের পায়ে কাস্তে ফেলে মারে; তাতে উমাঠাকরুণের পা বেশ একটু কেটে রক্তপাত হয়। উমাঠাকরুণও অবিশ্যি দুচার ঘা দিয়েছিল।

রক্তপাত হবার পরই দুজন নিজের নিজের ঘরে গিয়ে মহা চীৎকারে পাড়া একেবারে তোলপাড় করে ফেলল। নিকটেই ছেপাতুল্যার বাড়ি। বেচারি এই কুরুক্ষেত্র কাণ্ডের মধ্যে এসে দুজনকেই থামাতে চেষ্টা করল। কিন্তু কে কার কথা শোনে! 'বলি ব্যাপার কী?' বলতে বলতে প্রতিবেশী বসন্ত মণ্ডল ছুটে এল।

শেষে ঠিক হল ঠাকুরবাবুর কাছারিতে নালিশ করা হবে, তা হলে এই ঘটনার বিচারও হবে, সীমানার গোলমালেরও মীমাংসা হবে।

পুণ্যা বোষ্টমি অনেকবার রবিবাবুকে খঞ্জনি বাজিয়ে গান শুনিয়েছে, 'নবনটবর গোরা, তপত-কাঞ্চন-কায়'। তাই সে মহা-আস্ফালন করে বলল, 'আমি কাছারিতে যাব কেন? আমি খোদ বাবুমশায়ের কাছেই নালিশ করতে চললাম।'

সত্যই সে গায়ে আরও খানিক ধুলো-কাদা মেখে নিয়ে ছুটল বাবুমশায়ের বোটের কাছে। তার পিছু পিছু উমাঠাকরুণও চলল হাঁফাতে হাঁফাতে। ব্যাপার কি গড়ায় দেখবার জন্য পাড়ার কয়েক জন যুবকও গেল বোটের কাছে।

বাবুমশাই হেসে বললেন, 'তোমরা কি বুয়োর যুদ্ধে গিয়েছিলে? তোমাদের ব্যাপার কি বল দেখি।'

উভয়েই নিজ নিজ পক্ষ সমর্থন করে নালিশবন্দি হল। উভয়েই বলল— যখন এই ব্যাপার ঘটে তখন সেখানে কেউ সাক্ষী ছিল না, পরে ছেপাতুল্যা আর বসন্ত মণ্ডল আসে, তারপর পাড়া ভেঙে ছেলেবুড়ো আসে মজা দেখতে।

ঐ দুই সাক্ষীর তলব হল। কিন্তু সীমানার সত্য পরিচয় কেউ দিতে পারল না। কে আগে মারে, কি দিয়ে মারে, ইত্যাদির সাক্ষ্য নেওয়া হল। পাঁচটি আনারসও বোটে আনা হল। সেদিনকার বিচার শেষ করে রবিবাবু হুকুম দিলেন—ঐ জমি যে জোতদারের অধীন, সেই জোতদার নিতাই রায়কে* তলব দেওয়া হক।

রবিবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমরা আজ যাও। আনারস যেদিন পাকবে, সেই দিন তোমাদের বিচার হবে। তোমাদের আমি তলব দেব; সেদিন তোমরা দুজন বাদে আর কেউ বিচারের স্থানে আসতে পারবে না। তোমরা দুজনেই মাত্র আসবে আর নিতাই রায় আসবে।'

পাঁচটি আনারস বোঁটায় বোঁটায় দড়ি দিয়ে বেঁধে বোটের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখা হল। যেদিন আনারস কটা পেকে হলদে হয়ে মিষ্টি গন্ধ ছড়াতে লাগল, সেদিন নিতাই রায় আর দুই বোষ্টমি বোটে হাজির।

নিতাই রায়কে জিজ্ঞাসা করে বাবুমশাই জেনে নিলেন, কালাচাঁদ বৈরাগী এবং উমাঠাকরুণের বাড়ির 'দো-সীমানা'র জায়গায় ঐ বিরোধীয় আনারস-ঝাড়গুলো এই কোন্দল ও রক্তপাতের কারণ। উভয় বোষ্টমিই নিতাই রায়-মশায়ের প্রজা।

বাবুমশাই নিতাই রায়কে বলে দিলেন, 'তুমি আজই এদের উভয়ের জমি মেপে ঐ সীমানায় লাইন করে গোটাকতক জিউলি গাছ পুঁতে দাও গে।'

নিতাই রায় চলে গেলে বাবুমশাই বললেন, 'তোমরা কখনও এই আনারস খাও নি। এ আনারস নিশ্চয়ই ভয়ানক তেতো।'

পুণ্যা বলল, 'না হুজুর, এমন মিঠে আনারস এদেশে নেই। উমা বোষ্টমির

* নিতাই রায় তখন ঠাকুর-জমিদারির একজন বড় নায়েব ছিলেন।

আনারস গাছগুলো মরো-মরো হলে আমি তারই পাঁচটি চারা ঐ জায়গাতেই পুঁতেছিলাম। আমার গাছেই এগুলো হয়েছিল, আরও চার-পাঁচটা জালি গাছে হচ্ছে। ওর কোন গাছই মুরলীর মার নয়।'

অমনি উমাঠাকরুণ আপত্তি করল, 'ধর্মাবতার হুজুর, পুণ্যার পাঁচটা চারাই শুকিয়ে মরো-মরো হয়েছিল। আমার ঝাড়গুলো শুকিয়ে উঠতেই আমি প্রত্যহ তাতে জল ঢেলে তাজা রেখেছিলাম; তা ও চোখ-খাকি দেখেই নি। সেদিন সুপুষ্ট আনারসগুলো দেখে ওর জিভ লক্‌লক করছিল—তাই এই কাণ্ড।'

রবীন্দ্রনাথ জেরা করে বেশ বুঝে নিলেন ব্যাপারখানা কি ঘটেছিল। তিনি একটু আমোদ উপভোগ করবার জন্য বেশ গরম হয়ে বললেন, 'এমন মিষ্টি, খাসা জিনিসের জন্যে তোমরা যে মারামারি কাটাকাটি করেছ, তার জন্যে আমি তোমাদের জরিমানা করব। তোমরা প্রায়ই খুঁটিনাটি নিয়ে দুজনে ঝগড়া কর, আমি তা বেশ টের পেয়েছি। যাতে ঝগড়া মারামারি বন্ধ হয় সেজন্যে তোমাদের শাস্তি হওয়া উচিত।'

এই কথা শুনবামাত্র ভয়ে দুজনেরই মুখ শুকিয়ে গেল। উভয়েই হাত জোড় করে বলল, 'হুজুর, আমরা আর এ জীবনে কেউ কারও সঙ্গে কথা কইব না। আমাদের জরিমানা করবেন না হুজুর।'

রবীন্দ্রনাথ কৃত্রিম রাগে বলে উঠলেন, 'না, তা কখ্‌খনো হবে না। তাতে তোমরা কিছুদিন বাদে সাংঘাতিক খুন-খারাবি করে বসবে। তোমার না এক ছেলে আছে উমা,—তার নাম মুরলী না?'

উত্তর হল, 'হাঁ হুজুর।'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'ডাক মুরলীকে।'

ফুট্‌ফুটে কিশোর বালক মুরলী ভয়ে জড়সড় হয়ে বোটের মধ্যে এসে বাবু-মশাইকে প্রণাম করল।

বাবুমশাই মুরলীকে বললেন, 'মুরলী, তুই এখ্‌খুনি পুণ্যার কাছে গিয়ে তার হাত ধরে মাসি বলে ডাক্ তো!'

মুরলী ভয়ে লজ্জায় তাই করল। অমনি পুণ্যা বোষ্টমি চেঁচিয়ে ছল-ছল চোখে বলল, 'ওরে হারামজাদা, এতদিন আমায় গাল পেরেছিস,—তোর মায়ের মারের ভয়ে আমার ঘরে লক্ষ্মীপুজোর ভুজো খেতে আসিস নি। তোকে আমি দুচোখে দেখতে পারি নি—তোর ঐ বুড়ি ডাইনির জন্যে। আর আজ তুই চোখ দুটো জলে ভাসিয়ে আমায় 'মাসি' বলে ডাকলি! তুই পোড়ারমুখোই

আজ আমায় জব্দ করলি। আয় হারামজাদা, আয়!' এই বলে পুণ্যা বোষ্টমি মুরলীকে বুকের মধ্যে চেপে ধরল। তার চোখ দুটোয় কয়েক ফোঁটা মুক্তাবিন্দু সেই প্রভাতরৌদ্রে ঝলমল করতে লাগল।

বাবুমশাই হো-হো করে হেসে উঠলেন, 'যা, তোদের মামলা আমি ডিস্‌মিস্ করে দিলাম।...মুরলী, ঐ আনারস ক'টা পেড়ে আন্। ওর মধ্যে যেটা কান্তের কোপওয়ালা, সেটা পুণ্যাকে—তোর মাসিকে দে, বাকিগুলো সব তুই বাড়ি নিয়ে গিয়ে খেয়ে ফেলবি। তোর মাসিকে ভালবাসবি তো?'

মুরলী হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যা বোষ্টমি ও উমা বোষ্টমির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বাবুমশাই মুরলীকে আবার বললেন, 'মুরলী, হুকুম দিচ্ছি, ঐ জমিতে যতগুলো আনারসের ঝাড় আছে, তুই এখ্‌খুনি গিয়ে সব উপড়ে তুলে ফেলবি, আর গাছগুলো দুই ভাগে ভাগ করে অর্ধেকগুলো তোর মায়ের ঘরের পেছনে আর অর্ধেকগুলো তোর মাসির ঘরের পেছনে বুনে দিবি, বুঝলি? আর তোমরা শোন, তোমাদের বাড়ির সীমানা কালই রায়মশাই ঠিক করে দেবেন।'

আবার হাসতে হাসতে বাবুমশাই বললেন, 'কিন্তু এখনও বিচার শেষ হয় নি; এই মামলার জরিমানা-স্বরূপ, পুণ্যা, একখানা গৌরাঙ্গের গান গাও; উমা বোষ্টমি আজ থেকে তোমার বড় বোন হল, কেমন? আমি বিচার করে দিলাম, তোমাদের আর কখ্‌খনো ঝগড়া হবে না। এখন একখানা গান শুনিয়ে দাও তো।'

হাসিমুখে পুণ্যা বোষ্টমি মাথাটি দুলিয়ে গ্রীবাভঙ্গী করে মিষ্টিস্বরে তার জানা সব চেয়ে ভাল গানটি গাইল। তার চোখ দুটি চক্-চক্ করতে লাগল। গানের সুর পদ্মার তীরে নেচে বেড়াতে লাগল—

'নব নটবর গোরা তপত-কাঞ্চন-কায়
ভাবে অঙ্গ গদগদ—শ্রীনবদ্বীপে উদয়।'

পুণ্যা বোষ্টমি বাড়ি এসে বলেছিল, জীবনে আমার এই গলায় অত সুন্দর গান আর কখনও গাই নি, বাবুমশায়ের কাছে যেমনটি গেয়েছিলাম।'

এই মামলার আসামি ফরিয়াদি সবাই হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরল।

মুরলী নিজ হাতে আনারস কেটে তার মা-মাসিকে খাইয়েছিল। তারা খেয়ে দেখেছিল, মামলার আনারস ডবল মিষ্টি হয়েছে।

যজ্ঞেশ্বরের সিদ্ধিলাভ

রবীন্দ্রনাথের শ্বশুরমশায় তাঁর স্বগ্রাম থেকে একটি যুবককে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এনেছিলেন চাকরি-বাকরি দিয়ে প্রতিপালন করবার জন্য। যুবকটির নাম যজ্ঞেশ্বর। মা সরস্বতীর সঙ্গে বিশেষ পরিচয় না থাকলেও তিনি ছিলেন খুব চটপটে ও সুচতুর।

যজ্ঞেশ্বর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বিরাট পারিবারিক সমাবেশের মধ্যে এসে মেয়েদের রকমারি ফাইফরমাশ খাটেন; কিন্তু তাঁর ভাগ্যে একটি চাকরি আর হয়ে ওঠে না। তখন ঠাকুরবাবুদের সমস্ত জমিদারির সদর আপিস ছিল জোড়াসাঁকো ভবনে। সকল জমিদারি থেকেই কর্মচারীরা মাঝে মাঝে নানা কাজের উপলক্ষে সদর আপিসে আসতেন। তাঁদের জাঁকজমক চাল-চলন দেখে যজ্ঞেশ্বরের মনের দুঃখ গুমরিয়ে কেঁদে উঠত—আহা, ওদের মত জমিদারের আমলা হব কবে!

একবার রবীন্দ্রনাথের শ্বশুরমশায়কে যজ্ঞেশ্বর ধরে পড়লেন, 'আমার উপায় কি করলেন?' তিনি বললেন, 'আচ্ছা, জামাইকে বলব।' কিন্তু তবু আমলাগিরি তাঁর ভাগ্যে জুটল না। যজ্ঞেশ্বর এবারে রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীকে তাঁর মনের দুঃখ জানালেন।

'তুমি কি সে কাজ পারবে? জমিদারির কাজ বড় শক্ত কাজ।' এই বলে তিনি 'বৌমাকে' (৺দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী) রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করতে লাগিয়ে দিলেন। রবিবাবু তাঁদের আবেদনে বললেন, 'জমিদারির কাজ তো সহজ নয়, ও পারবে কেমন করে?'

যজ্ঞেশ্বর রবীন্দ্রনাথের গৃহিণীকে বেশ জোরের সঙ্গে বললেন 'আচ্ছা ফুলিদিদি,* আমি কাজ শিখে নেব—আমি তো নির্বোধ নই।'

রবীন্দ্রনাথ একথা শুনলেন। তারপর গৃহিণী ও বৌমার অনুরোধ-উপরোধে বললেন, 'দেখ যজ্ঞেশ্বর, তুমি কেমন কাজের লোক তার একটু পরিচয় নেব। আমার "সাধনা" পত্রিকার চাঁদা সাড়ে ছয় হাজার টাকা অনাদায়ী হয়ে পড়ে আছে। তুমি তা আদায় করে দাও দেখি! পারবে তো? দেখ, এ কিন্তু মেয়েদের ফরমাশ খাটা নয়।'

---

* রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীর ঘরোয়া ডাকনাম।

যজ্ঞেশ্বর তাঁর কিস্মৎ বুঝাবার জন্য তার পরদিনই খাতাপত্রসহ মহোৎসাহে সেই কাজে লেগে গেলেন। কাজটা রবীন্দ্রনাথ কঠিন বলে মনে করেছিলেন, কিন্তু যজ্ঞেশ্বর খুব পরিশ্রম করে দুমাসের মধ্যে বেশ প্রমাণ করে দিলেন যে, তাঁর পক্ষে একাজ অতি সহজ। তাগিদের একান্ত অভাবেই এতগুলো টাকা আদায় হবে না বলে তাঁর ধারণা হয়েছিল। দুমাসের মধ্যে যজ্ঞেশ্বর নগদ ছয় হাজার টাকার উপর খাজাঞ্চিখানায় জমা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সামনে হাজির।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি যে একজন কাজের লোক তার পরিচয় পেলাম।' এই বলে দুশো টাকার নোট তাঁকে দিয়ে বললেন, 'এ কাজের পারিশ্রমিক আর পুরস্কার তোমার আরও পাওয়া উচিত। কিন্তু এ টাকা তো সব আমার নয়, এতে দেনা শুধতে হবে। এই দুশো টাকা তোমায় দিলাম।'

যজ্ঞেশ্বর বোকা ছেলে নন, বললেন, 'হুজুর, একটা টাকাও আমি চাই নে, আমি চাই ভাল একটা চাকরি। আমি কি অনুপযুক্ত?'

বাবুমশাই বললেন, 'আচ্ছা, চাকরি তোমায় দেব। কালীগ্রাম পরগণায় রাতোয়াল কাছারির মুহুরির কাজে তোমায় বহাল করব, একটু সবুর কর। আপাতত খাজাঞ্চিখানায় খাতা লেখ। কিন্তু জমিদারির আমলাগিরি করে সুখ পাবে না যজ্ঞেশ্বর।'

যজ্ঞেশ্বর রবীন্দ্রনাথের শেষ কথাটা বুঝতে না পারলেও বেশি কিছু বলতে সাহস পেলেন না। কিন্তু প্রায় ছমাস কলিকাতা সদরের খাজাঞ্চিখানায় টাকা আনা কড়াক্রান্তি যোগ-বিয়োগ করেও যখন দেখলেন যে তাঁর বড় সাধের আমলাগিরি মৃগতৃষ্ণিকায় পরিণত, তখন একদিন রবীন্দ্রনাথকে খুব শক্ত করে ধরে বসলেন। রবীন্দ্রনাথ একটু ভেবে বললেন, 'আচ্ছা, তুমি আমার সঙ্গে শিলাইদহে চল। রাতোয়াল কাছারির মুহুরিগিরির চেয়ে শিলাইদহেই তুমি ভাল কাজ পাবে।'

এইখানে শিলাইদহের ঠাকুর কোম্পানির (ট্যাগোর অ্যাণ্ড কোং) কাহিনীটা বলা নিতান্ত দরকার। এই সময়ে মফস্বল জমিদারি থেকে ভুষো মাল আর পাট কিনে বাঁধাই কারবার চালাবার জন্য শিলাইদহে ঠাকুর কোম্পানির প্রতিষ্ঠা হয়; তার আপিস কুষ্টিয়াতেও ছিল। পরে এই কোম্পানির প্রধান আপিস কুষ্টিয়া কুঠিবাড়িতে (কুষ্টিয়া মোহিনী মিলের নিকটে) উঠে আসে। ঠাকুরবাবুদের কুষ্টিয়া কুঠিবাড়ির দোতলার ফটকে সাদা পাথরে এখনও লেখা আছে—ট্যাগোর অ্যাণ্ড কোং। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ

এবং সুরেন্দ্রনাথও এই কারবার দেখাশুনা করতেন। এই ঠাকুর কোম্পানির ইতিহাস এখানে সবটা বললে পুঁথি বেড়ে যাবে। অতএব তার চেষ্টা মুলতুবি রইল। তবু তার কতকাংশ এই কাহিনীর মধ্যে আছে।

রবীন্দ্রনাথের উপদেশমত জমিদারির তৎকালীন ম্যানেজার অমৃতবাবু যজ্ঞেশ্বরবাবুকে বললেন, 'আপনি মৈত্রমশায়ের অধীনে ঠাকুর কোম্পানির কাজ করতে আরম্ভ করুন। তবে বিশেষ করে জেনে রাখুন, কোম্পানির অবস্থা ভাল নয়। আপনি এ কাজে সুদক্ষ হবেন বলেই বাবুমশায়ের বিশ্বাস। মৈত্রমশায়ের সঙ্গে থেকে যাতে কোম্পানিটা দাঁড় করাতে পারেন, তার জন্যে চেষ্টা করুন।'

যজ্ঞেশ্বরবাবু কাজে লেগে গেলেন।* তাঁর উপরওয়ালারা বিশেষত মৈত্রমশাই বেশ বুঝে নিলেন, যজ্ঞেশ্বরবাবু সুচতুর ও শক্ত লোক। বছর তিন-চার কাজকর্ম চলল, কিন্তু ক্রমশই ঠাকুর কোম্পানির কাজ অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও জটিল হয়ে উঠল। যদিও প্রথম কয়েক বছর কোম্পানির লাভ কিছু হয়েছিল, কিন্তু ক্রমশ কোম্পানির পরিণাম এমনই শোচনীয় হতে লাগল যে, এই কোম্পানি স্থাপনের মহৎ উদ্দেশ্য প্রায় ব্যর্থ হবার উপক্রম হয়ে উঠল।

আরও দু-এক বছর গেল। জোড়াসাঁকো সদর আপিস থেকে কোম্পানির প্রকৃত অবস্থা রিপোর্ট করবার জন্য ক্রমাগত তাগিদ আসতে লাগল। শিলাইদহ থেকে যে রিপোর্ট গেল তাতে যজ্ঞেশ্বরবাবুকে এই কাজের জন্য জবাবদিহি করা হল। যজ্ঞেশ্বরবাবুর উপরওয়ালারা তাঁর সঙ্গে খুব সদ্ভাব দেখিয়ে কাজ চালাচ্ছেন, কিন্তু যে রিপোর্ট ম্যানেজারবাবু সদরে পেশ করলেন, তাতে রইল যজ্ঞেশ্বরবাবুর অজ্ঞাতে তাঁর বিরুদ্ধে চোখা-চোখা বাণ নিক্ষেপের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

কিছুদিন যায়। যজ্ঞেশ্বরবাবু আদার ব্যাপারি হয়ে জাহাজের খবর রাখেন না। কলিকাতা সদর আপিস থেকে যজ্ঞেশ্বরবাবুর বরখাস্তের হুকুম এল এবং মৈত্রমশায়ের উপর ঠাকুর কোম্পানির হিসাব-নিকাশ অতি শীঘ্র পেশ করার হুকুম আসায় ব্যাপারটা অত্যন্ত ঘোরাল হয়ে উঠল। ঠাকুর কোম্পানির হিসাবপত্র এমনই জটিল হয়ে উঠেছিল যে, মৈত্রমশায়ের তার মধ্যে দন্তস্ফুট করবার সাধ্যও ছিল না। তিনি যজ্ঞেশ্বরবাবুকে কুষ্টিয়া থেকে ডাকিয়ে এনে হিসাব-নিকাশ লিখে পড়ে ঠিক করতে বললেন।

যজ্ঞেশ্বরবাবু এসেই শুনলেন তাঁর চাকরির জবাব হয়েছে। কোম্পানির

* ১৩০২ সাল, আষাঢ় মাস।

মুহুরিমাত্র হয়ে কি গাফিলতি তিনি করলেন এবং কি অপরাধে চাকরি গেল তিনি তার কিছুই বুঝতে না পেরে বিষম বিব্রত হয়ে পড়লেন।

এমনি অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে বলেন্দ্রনাথের সঙ্গে শিলাইদহে এলেন। যজ্ঞেশ্বরবাবু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকে তাঁর অপরাধের বিষয়টা জানবার জন্ত শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে গিয়ে দেখলেন রবীন্দ্রনাথ গ্রামের মধ্যে বেড়াতে বেরিয়েছেন। তিনি সোজা দোতলায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিণীর দেখা পেয়ে নিজের কথা সব বললেন।

সব শুনে জমিদার-গৃহিণী অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বললেন, 'যজ্ঞেশ্বর, তোমার এখানে চাকরি করে কাজ নেই। এত গোলমাল যেখানে, সেখানে আমি তোমায় কাজ করতে দেব না।'

ঠিক এমনি সময়ে রবিবাবু সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'যজ্ঞেশ্বর, কোম্পানিকে একেবারেই পদ্মার জলে ডুবিয়ে দিলে? এতগুলো টাকা একেবারে উড়ে গেল, অথচ তোমরা কেউ জানতে পারলে না। আবার আরও টাকা চাই বলে মৈত্রমশাই রিপোর্ট করেছে। তোমাকে তো খুব হুঁসিয়ার লোক বলেই জানতাম।'

কবিগৃহিণী অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে অভিমানের সুরে বললেন, 'যজ্ঞেশ্বরের জন্যেই তো তোমার কোম্পানি ফেল হল! আমি আগেই জানি, আমার দেশের লোক বলেই তার অপরাধ। তার অপরাধের আর বিচার করে কাজ নেই। তাকে জবাব দিয়েছ, বেশ করেছ। ও আর তোমাদের কাজ করবে না।'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'কী আর করব বল, ওর উপরওয়ালার রিপোর্ট তো আমায় শুনতে হবে। আচ্ছা, যজ্ঞেশ্বর, আমি ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে চাই। চল তো আপিস-ঘরে, আমায় আসল ব্যাপারটা বুঝিয়ে দাও দেখি।'

যজ্ঞেশ্বরবাবু একটা মোটামুটি হিসাব সঙ্গে এনেছিলেন। সে-সব তিনি দেখালেন এবং বুঝিয়ে দিলেন যে, যাঁরা কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাঁদের বহু প্রকারের গাফিলিতির দরুণ মাল আদৌ কাটতি হচ্ছে না। ভুষো মালের দর ক্রমশ সব মহালেই চড়েছে, তবু কোম্পানি ফেল হয়েছে এ রকম ধারণা বদ্ধমূল হবার কারণ এখনও ঘটে নি।

রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ ব্যাপারটা নিয়ে কিছুক্ষণ মাথা ঘামালেন। শেষে বলেন্দ্রনাথ বললেন, 'মজুত মাল বিক্রি না করলে ঘর থেকে আর কত টাকা দেওয়া যায়? বাজার যাচাই করে বিক্রি করলে কি লোকসান হবে মনে কর?'

বলেন্দ্রনাথকে যজ্ঞেশ্বরবাবু বুঝিয়ে দিলেন, আরও ছটি মাস দেরি না করে মাল বেচলে খরিদ দরেই বেচতে হবে।

আলোচনা চলতে লাগল। বলেন্দ্রনাথ বললেন, 'আচ্ছা, ছমাস দেরি না হয় করা গেল। কিন্তু বাজার যাচাই করে বিক্রি কে করবে? কিছু লাভ হবার আশা কোথায়? বিক্রি করবার দায়িত্ব তুমি নেবে?'

যজ্ঞেশ্বরবাবু বললেন, 'আমি সামান্য মুহুরি মাত্র, তবু আমি সে ভার নিতে রাজি আছি, তবে মৈত্রমশায়ের উপর সেই রকম হুকুম দিতে হবে।'

চিন্তিত রবীন্দ্রনাথ এইবারে কথা বললেন, 'বেশ, আমি সেই রকম হুকুমই দিয়ে যাব। কিন্তু মৈত্র আরও টাকা চায় কেন? এখন আরও মাল কি কেনা উচিত?'

যজ্ঞেশ্বরবাবু বুদ্ধিমান। তিনি বললেন, 'তা জানবার তো আমার কোন অধিকার নেই হুজুর, তবে এ বাজারে মাল কিনলে টাকাটা বহুদিন ধরে আটকা পড়ে থাকবে।'

শেষে অনেক আলোচনার পর ভুষো মালের কারবার ছেড়ে দিয়ে, পাট বেশি পরিমাণ কেনাই সাব্যস্ত হয়ে গেল। এর ফলেই পাটের কারবারের উপর বেশি জোর দেওয়া হল। প্রচুর পাট কেনা আরম্ভ হল। এতে তাঁরই ঝোঁক ছিল বেশি।

এই আলোচনার দুইদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ কি যেন ভেবে একটা কাগজে লিখে হুকুম দিলেন, 'যজ্ঞেশ্বর তুমি মজুত মাল এখনই সব বেচে দাও, যেন ক্ষতি না হয়। আমি পাবনা যাচ্ছি, এসেই দেখতে চাই যে, মালগুলোর অন্তত খরিদ দাম তুমি জমা দিয়েছ।'

যজ্ঞেশ্বরবাবু হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত হুকুমের প্রতিবাদ করারও সময় পেলেন না। তার পরদিনই তিনি গুদামের সমস্ত মাল বস্তাবন্দি করে পাঁচ-ছখানা বড় পান্‌সি বোঝাই করে কুষ্টিয়া চলে এলেন। অনেক খোঁজ-খবর নিয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই কুষ্টিয়ার মারোয়াড়িদের ঘরে সমস্ত মাল বেচে নগদ নয় হাজার টাকা বাক্সবন্দি করে ষ্টীমারে চেপে সন্ধ্যায় যজ্ঞেশ্বরবাবু শিলাইদহে ফিরে এলেন। এসেই দেখেন পরিশ্রান্ত রবীন্দ্রনাথ সেই দিনই শিলাইদহে পৌঁছেছেন।*

* এই সময়টা রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এরই কিছু আগে শিলাইদহ ও কুষ্টিয়া কুঠিবাড়িতে এবং শিলাইদহ কাছারি প্রাঙ্গণে তিনি তিনটি প্রকাণ্ড তাঁতশালা প্রতিষ্ঠা করেন ও জমিদারির কাজের আমূল সংস্কার করেন। তিনি জমিদারির মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন সুরু করেন।

পরদিন প্রভাতেই বাক্সবন্দি টাকাসহ যজ্ঞেশ্বরবাবু কুঠিবাড়িতে বাবুমশায়ের সামনে এসে বললেন, 'নয় হাজার টাকা এনেছি। সেদিন মালের সর্বোচ্চ খরিদ মূল্যের যে হিসাব দেখিয়েছি, তার দেড়গুণ টাকা পেয়েছি। ছমাস অপেক্ষা করলে এর অন্তত ডবল টাকা পাওয়া যেত।'

ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত রবীন্দ্রনাথ একটু খুশি হয়েছেন বলে মনে হল; তিনি তবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তুমি এ কারবারের ম্যানেজারি নিতে পার?'

যজ্ঞেশ্বরবাবু বললেন, 'হুজুর, ব্যবসা চালান বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ। এতে আমার বুদ্ধিবিবেচনা কর্তৃপক্ষের পছন্দ হবে না বলেই বিশ্বাস। তার চেয়ে দয়া করে জমিদারির মধ্যে আমায় একটি চাকরি দিন।'

রবীন্দ্রনাথ একটু হাসলেন। তারপর গম্ভীর হয়ে টাকাটা খাজাঞ্চিখানায় জমা দিতে বলে উপরে উঠে গেলেন।

যজ্ঞেশ্বরবাবু সেই দিনই দুপুরে জানতে পারলেন, কোম্পানির শিলাইদহের শাখা-আপিসের ভার তাঁকে দেওয়া হয়েছে এবং কুষ্টিয়া আপিসের সমস্ত ভার মৈত্রমশায়ের উপর দেবার হুকুম হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় চলে গেলেন। ইতিমধ্যে আখমাড়াই-এর কলের ব্যবসাও ঠাকুর কোম্পানির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কাঠ, লোহা ইত্যাদি কেনা হয়েছে। কুষ্টিয়াতে আখমাড়াই-এর কল তৈরির সূত্রপাত এইখানেই। তখন রেন্উইক কোম্পানি ব্যাপকভাবে একাজে হাত দেয়। কাজটা লাভজনকই ছিল, কিন্তু অব্যবসায়ী কর্মচারীদের হাতে পড়ে বহু অর্থ ব্যয় করেও ঠাকুর কোম্পানি লাভের অঙ্ক দেখতে পেল না।

কিছুদিন পরে এমন কতকগুলো ব্যাপার ঘটে গেল যাতে ব্যবসাবুদ্ধিহীন কর্মচারীরা যজ্ঞেশ্বরের উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠলেন, কিন্তু যজ্ঞেশ্বরবাবুর কৌশলে কোম্পানিকে আর দেনা করতে হল না। শুধু তাই নয়, একখানা হুণ্ডি ভাঙ্গানর ব্যাপারে যজ্ঞেশ্বরবাবুর কৃতিত্বের কথা রবীন্দ্রনাথের কর্ণগোচর হল। কিন্তু তবু মোটের উপর কোম্পানির ক্রম-বর্ধমান ক্ষতি হতেই লাগল। শেষে শিলাইদহ ঠাকুর কোম্পানির পরিণাম রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের স্টীমার কোম্পানিরই ক্ষুদ্র সংস্করণ হয়ে দাঁড়াল।*

হঠাৎ টেলিগ্রাম এল যে রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ কুষ্টিয়া

* রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতিতে' এই কোম্পানির কতকটা পরিচয় পাওয়া যাবে। এবং দ্রঃ রথীন্দ্রনাথ 'পিতৃস্মৃতি'—পৃঃ ৪৫-৪৬,

আসছেন। যজ্ঞেশ্বরবাবু বেশ বুঝতে পারলেন, এইবারে আমলাতন্ত্রের অনেক কিছু সংস্কার হবে এবং ঠাকুর কোম্পানিরও একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। তিনি কুষ্টিয়া এলেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে ডেকে গোপনে বললেন, 'যজ্ঞেশ্বর, রবিকাকা তোমায় যা বলবেন তুমি তাতে রাজি হয়ো। ঠাকুর কোম্পানির এত কাণ্ডের পরেও তিনি তোমার উপর উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। রবিকাকার চেহারা দেখে আমরাও একটু ভীত হয়ে পড়েছি। কিন্তু তুমি ভয় পেয়ো না।'

যজ্ঞেশ্বরবাবু অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে তাঁর হাতবাক্সের সামনে বসে বসে একমনে রোকড় লিখছেন, এমন সময়ে রবীন্দ্রনাথ যে নিঃশব্দে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন তা টেরই পান নি। দেখতে পেলেন, রোকড়ের বইখানা যেন একটা অদৃশ্য হাত সশব্দে বন্ধ করে দিল। সামনে চেয়ে যজ্ঞেশ্বর হক্‌চকিয়ে ফরাস থেকে নেমেই সৌম্য-প্রশান্ত গম্ভীর মূর্তি রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করলেন। রবীন্দ্রনাথের গম্ভীর মূর্তি দেখে তাঁর ভয় হল। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'যজ্ঞেশ্বর, শোন, কথা আছে।' এই বলে ধীরে ধীরে কুষ্টিয়া কুঠিবাড়ির দক্ষিণের মাঠের প্রান্তে এসে হেসে বললেন 'যজ্ঞেশ্বর, কোম্পানির ব্যাপার দেখে তুমি জমিদারির আমলাগিরির মধ্যে বহাল হতে চাও নাকি ?'

যজ্ঞেশ্বরবাবুর ভয় বেড়ে গেল। কী একটা সাংঘাতিক ব্যাপারের আশঙ্কা করে তিনি নীরবে মাথা নিচু করে রইলেন।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'এই কোম্পানি আমি তোমাকে দিতে চাই, তুমি নাও। আমরা অব্যবসায়ী—কোম্পানি আমাদের ঘাড়ে অপদেবতার মত চেপে বসেছিল। কিন্তু তুমি এই কোম্পানি থেকেই লক্ষ্মী লাভ করবে,—আমি এই কথা আজ বলে দিলাম।'

যজ্ঞেশ্বরবাবু চিন্তা করতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, 'সবাই কি পরের গোলামি করতে পারে? তুমি যে গোলামি করবে না তা আমি জেনেছিলাম সেই দিন, যেদিন তুমি আমার "সাধনা" পত্রিকার টাকাগুলো আদায় করেছিলে। যদিও আমরা আজ এই ব্যবসা ত্যাগ করে মুক্তির নিশ্বাস ফেলতে চাই, কিন্তু তুমি সিন্ধবাদের মত এই অপদেবতাকে ঘাড়ে নাও। তোমার ভাল হবে। ভয় পেও না। মনে করো না—নিজের সর্বনাশ তোমার মত গরিব মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে আমরা পালাচ্ছি। টাকার জন্য ভেব না। আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার কাছে মা লক্ষ্মী ধরা দেবেন।'

মুগ্ধ স্তম্ভিত যজ্ঞেশ্বরবাবুর কানে এই কথাগুলো দৈববাণীর মত ঝংকৃত হল।

বিস্ময়ে আনন্দে তিনি বললেন, 'তা হলে হুজুর, এই সব কলকব্জা কি আমায় দেবেন ? এর দাম কত তা কি জানেন হুজুর ?' রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'কত বল দেখি ? ক হাজার টাকা ?' যজ্ঞেশ্বর বললেন, 'এর ঠিক দাম যা, তা আমায় বেচলেও হবে না।'

রবীন্দ্রনাথ হো-হো করে হেসে বললেন, 'ওঃ, সাংঘাতিক কথা বলেছ তুমি ! শোন—তোমাকে সাহায্য করবার জন্য অনুগ্রহও করব, আবার তোমার নতুন জীবনের পত্তনের জন্যে কিছু মূল্যও তোমায় দিতে হবে। তবু ভয় পেয়ো না। কলকব্জা ও মালপত্রের একটা তালিকা করে প্রত্যেকটার দাম ধরে নিয়ে এস দেখি আমার কাছে।'

সেইদিন সন্ধ্যায় কুষ্টিয়া কুঠিবাড়ির দোতলায় যজ্ঞেশ্বরবাবু রবীন্দ্রনাথের কাছে তালিকা পেশ করলেন। সুরেন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত। রবিবাবু বেশ মনোযোগ দিয়ে তালিকাটা দেখে নিলেন, পরে বললেন, 'শোন সুরেন, ব্যবসা চালান আমাদের কর্ম নয়। কিন্তু যে ব্যবসা বোঝে, শক্তিকে নষ্ট না করে তাকে ব্যবসার সুযোগ দিতেই হবে। যজ্ঞেশ্বর এতকাল যে সব জিনিস নাড়াচাড়া করেছে তাতে ওর মায়া জন্মেছে, ওগুলোর উপর ওর কিছু দাবিও আছে। তাই এসব জিনিস আমি ওকে দিতে চাই। তবু মূল্য বাবদ নাম-মাত্র তিন হাজার টাকা যজ্ঞেশ্বর আমাদের দেবে। গরিব মানুষ, এ টাকাও ও একটা বার্ষিক কিস্তিবন্দি-স্বরত দেবে। আর কুষ্টিয়া কুঠিবাড়ির পুবদিকের ফ্যাক্টরি ও বাসাবাড়ির বাবদ দুই বিঘা জমি ওকে দিতে হবে। তার ন্যায্য খাজনা বছরে পঞ্চাশ টাকা ও দেবে। আমরা তো আর ক্ষতিগ্রস্ত হব না, ও এই ক্ষতির স্তূপের উপর নিজেকে গড়ে তুলুক।'

রবীন্দ্রনাথের অনুপম বাচন-ভঙ্গী, সংগীতময় কণ্ঠ ও সহানুভূতির অমৃতে যজ্ঞেশ্বরবাবু বাক্যহারা; কৃতজ্ঞতায় তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তিনি জানেন, রবীন্দ্রনাথ বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন জমিদার। এই কলকব্জা, মালপত্র উচিত দামে বিক্রি করলে তাঁর অনেক টাকা উঠে আসবে, তা না করে আশ্রিতকে প্রতিপালনের জন্য তাঁর কী অপরিসীম আগ্রহ! কথাগুলো তাঁর কাছে ভগবানের আশীর্বাদের মত মনে হল।

সুরেন্দ্রনাথ বললেন, 'বেশ ব্যবস্থা হয়েছে! কেমন যজ্ঞেশ্বর, তুমি ব্যবসা চালাতে পারবে তো ?'

রবীন্দ্রনাথ নিরুত্তর যজ্ঞেশ্বরবাবুকে বললেন, 'যজ্ঞেশ্বর, এখনও ভাবছ ?

আমি বলছি, এতে তোমার মঙ্গল হবে।'

যজ্ঞেশ্বর অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় রবীন্দ্রনাথের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করে বললেন, 'হুজুর, আপনাদের এত দয়া! এই কলিকালে এ যে কেউ কল্পনাও করতে পারে না! আপনার আশীর্বাদ সম্বল করেই আমি চলব। আপনার মুখের আশীর্বাদই আমায় মানুষ করবে।'

সব ব্যবস্থা হয়ে গেল—দলিল লেখাপড়াও হয়ে গেল।* যজ্ঞেশ্বরবাবু আজ কুষ্টিয়ার একজন স্বনামধন্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী।

এ বিষয়ে প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় লিখেছেন—

রবীন্দ্রনাথ ব্যবসায়ে অত্যন্ত অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পৈতৃক জমিদারির আয় হইতে পাটের ব্যবসায়ের ঋণ পরিশোধ করিতে থাকেন। এজন্য তিনি বোধ হয় সান্ত্বনালাভের আশায় লিখিলেন—আকাশে জাল ফেলিয়া তারা ধরাই তাঁহার ব্যবসা,—অতএব—

থাক্‌গে তোমার পাটের হাটে
মথুর কুণ্ডু শিবু সা।

যে কুমারখালি কবিবরের সুবিস্তীর্ণ পৈতৃক জমিদারির অন্তর্গত, সেই কুমারখালির অধিবাসী মথুর কুণ্ডু ও শিবু সা (?) প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যবসায়ী ছিলেন। রাজসাহী জেলার আত্রাই-ঘাট রেলস্টেশনের কিছুদূরে তাঁহাদের যে জমিদারি কাছারি আছে (পতিসর, কালীগ্রাম জমিদারি) তাহার এলাকাস্থিত কোন গ্রামের একজন ধনাঢ্য অধিবাসীর নিকট কবিবর পাটের ব্যবসার জন্য লক্ষ টাকা কর্জ করিয়াছিলেন। ঋণদাতা তাঁহাদের কবি-জমিদারকে এতই বিশ্বাস করিতেন যে, তিনি কোন দলিলপত্র না লইয়া কেবল মুখের কথায় এক লক্ষ টাকা ধার দিয়াছিলেন। কবিবর জমিদারি পরিদর্শন উপলক্ষে তাঁহার কাছারিতে গমন করিলে বৃদ্ধ মহাজন সাহাজী তাঁহার কাছারিতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্মরণ করাইয়া দিলেন, টাকাটা আর কয়েক সপ্তাহ পরেই তামাদি হইবে। কবিবর হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'ভদ্রলোক যে টাকা ধার করেন—তা কি কখনও তামাদি হতে পারে? তুমি নিশ্চিন্ত থাক

* এই ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পাটের কারবারে নিজে লক্ষাধিক টাকা ঋণগ্রস্ত হন। তখন তিনি বিরাট কর্মযজ্ঞের আয়োজন সুরু করেছেন শান্তিনিকেতনে। তবু এই দুঃসহ ঋণভার ও অর্থাভাব তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি। পাটের কারবারের দেনা তিনি যে কত কষ্টে ও অপরিসীম ধৈর্যে পরিশোধ করেন, তার কাহিনীও এ অঞ্চলে গল্পে ও ছড়ায় সুপরিচিত।

বেণী।' যে সময়ে তামাদি হইবার কথা, তাহার কয়েক দিন পূর্বেই কবিবর এই ঋণ পরিশোধ করেন। তাঁহারা উভয়েই পরস্পরকে চিনিতেন; কিন্তু দেশের যে অবস্থা কিছুদিন পরে এ সকল কথা উপকথায় পরিণত হইবে।

—মাসিক বসুমতী, ভাদ্র, ১৩৪৮

গত ১৩২৮ সালের মাঘ মাসে রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ও মহামতি এণ্ড্রুজের সঙ্গে যখন শেষ বার শিলাইদহে এসে ফিরে যান, যখন কুষ্টিয়া স্টেশনে যজ্ঞেশ্বর-বাবু তাঁদের প্রণাম করে তাঁর বাড়িতে পদধূলি দেওয়ার প্রার্থনা করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখেই উৎফুল্লমুখে বললেন, 'কেমন যজ্ঞেশ্বর, আমার কথা ফলেছে তো? সেই ত্রিশ বছর আগেও তোমাকে চিনতে আমার দেরি হয় নি। কাজ বেশ ভাল চলছে তো?'

কৃতজ্ঞ যজ্ঞেশ্বরবাবু সেদিন অশ্রু সংবরণ করতে পারেন নি। পুনরায় বাবু-মশায়ের পা ধরে বলেছিলেন 'যে দেবতার আশীর্বাদে যজ্ঞেশ্বরের সিদ্ধিলাভ হয়েছে, তাঁর পায়ের ধুলো কি একটিবার পাব না হুজুর?'

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শেষ কথাগুলো তাঁর বুকে শেলের মত বাজল, তিনি বললেন, 'সেদিন আর নেই যজ্ঞেশ্বর, আজ আমি ভূতের বোঝা বয়ে ক্লান্ত। চললাম।'

চট্টগ্রাম মেল তাঁকে নিয়ে হুস্-হুস্ করে দৌড় দিল।

পুরাতন ভৃত্য

'পুরাতন ভৃত্য' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের নিছক কল্পনাপ্রসূত বলে আমার মনে হয় না; কারণ তাঁর বাস্তব জীবনে ভৃত্যবাৎসল্য দেখে তাঁর দরদি-প্রাণের 'আজ সাথে নেই চিরসাথী সেই মোর পুরাতন ভৃত্য' কথাগুলোর অন্তর্নিহিত করুণা ও স্নেহপ্রবণতার গভীরতা বেশ বুঝা যায়। কেষ্টাকে নিয়ে তিনি বেশ কৌতুকের সৃষ্টি করেছেন; আবার চোখের জলও টেনে বের করেছেন কল্পনার তুলিতে। আজ তাঁর বাস্তব জীবনের ভৃত্যস্নেহের কয়েকটি গল্প বলব। এতে আমরা দেখতে পাব, মহাপুরুষ অন্তরে বাইরে-সদরে-অন্দরে—সর্বত্রই মহাপুরুষ।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকজন চাকরের কথা আমি জানি। তাদের কথা তাঁর

পত্রসাহিত্যে অমর হয়ে রয়েছে। এরা অতি সাধারণ লোক হয়েও ভাগ্যবান যে, এদের অনেক কথা রবীন্দ্রসাহিত্যে স্থান পেয়েছে, যুগযুগান্তর পর্যন্ত রসপিপাসুর মনের ভিতর এদের স্মৃতি জেগে থাকবে।

উমাচরণ

উমাচরণ রবীন্দ্রনাথের খাস চাকর ছিল। বাড়ি ছিল তার যশোহর জেলায়। লোকটা খুব বুদ্ধিমান ও কর্মঠ ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাকে খুব ভালবাসতেন, এমন কি তার কাজকর্মে মনে হত যেন সে রবীন্দ্রনাথের অভিভাবক। শুনেছি, লোকটি ছিল বেশ সুদর্শন আর বেশ মিশুক প্রকৃতির।

কমলাপুরের (শিলাইদহ জমিদারির একটা বড় পল্লী) দ্বারি বিশ্বাস একজন বুদ্ধিমান ও নামকরা প্রজা; তিনি পরে জমিদারির মধ্যে তদারক-নবিশের পদেও অনেক দিন কাজ করে খুব খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দ্বারি বিশ্বাস প্রজা হিসাবে যখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, তখনই সেই অঞ্চলের উৎকৃষ্ট ফলফলারি বা খাবার জমিদারবাবুর জন্য নিয়ে আসতেন। এতে একদিন রবীন্দ্রনাথ খুব অনুযোগ করেন, তখন দ্বারি বিশ্বাস বলেছিলেন, 'প্রিয়-জন বাড়িতে এলে মূর্খ লোকেরা আর কিছু না করে মনের সাধ মিটিয়ে খাইয়ে থাকে। এতে রাগ করলে হুজুরের জমিদারিতে আসা বন্ধ করতে হবে।'

একবার দ্বারি বিশ্বাস তাঁরই গাছের অতি উৎকৃষ্ট পাঁচছড়া মর্তমান কলা আর দুটি অতিকায় কাঁঠাল বাবুমশায়ের সামনে রেখে প্রণাম করলেন। ঐ অতি উৎকৃষ্ট প্রকাণ্ড ফল কটি কুঠিবাড়ির একতলায় জালের আলমারির মধ্যে রাখা হয়েছিল। বাবুমশাই খাবার সময় এক-আধটা কলা ও কাঁঠালের কোয়া খেতেন, তাইতে অতগুলো সুন্দর মর্তমান কলা আর কাঁঠাল নষ্ট হয়ে যাবার মত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে একা। তাঁর সহধর্মিণী আর ছেলেমেয়ে সব কলিকাতায়।

রবীন্দ্রনাথ তখন সাহিত্য-সাধনায় মগ্ন। সারাদিন ও রাত্রির মধ্যে সকাল বা সন্ধ্যায় গ্রামের মধ্যে বা মাঠে বেড়াতে যেতেন। পাকা কাঁঠালের গন্ধে কুঠি-বাড়ির একতলাটা ম'-ম' করত। রবীন্দ্রনাথ একদিন ভোরে বেড়িয়ে ফিরবার সময় ঐ সুগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে পাশের কামরায় গিয়ে দেখেন কাঁঠাল আর কলাগুলোর কালো রঙ ধরে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ডাকলেন, 'উমাচরণ।'

উমাচরণ হাজির। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'এমন সুন্দর কাঁঠাল আর এমন

খাসা মর্তমান কলাগুলো পচিয়ে ফেলে দিবি তোরা? তোরা কি গেরোস্তালি জানিস নে?'

উমাচরণ মনে মনে গজ্‌গজ্‌ করতে লাগল—পচতে পচতেও আরও এক হপ্তা তাঁর খাওয়া চলবে। সে তাই অনেক যত্ন-তদ্বির করে বাবুমশায়ের প্রিয় ফলগুলো রেখে দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'আমি তো খাচ্ছিই, তোরা এতদিন খেলে আর পচিয়ে ফেলে দেবার দরকার তো হত না। এমনিই তোদের খাবার কষ্ট হচ্ছে।'

উমাচরণ উত্তরে হেসে বলল, 'আমি একা খেলে তো চলে না—এখানকার পাঁচ-ছজন বরকন্দাজ কুঠিবাড়ির পাহারায় রয়েছে, তাদেরও দিতে হয়। আর তা ছাড়া, এমন সুন্দর কাঁঠাল আর কলা খেতে হলে পয়সা খরচ করতে হয়।'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'বেশ তো, তোরা সবাই মিলে ফুর্তি করে খা। বেশ সরু চিঁড়ে আর ঘন দুধ কিনে নে। কেন বাপু অমন সুন্দর জিনিসগুলো পচিয়ে ফেলে দিবি?'

পাশের ঘরে কুঠিবাড়ির সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, তাঁর কানে একথা গেল। রবীন্দ্রনাথ যাবার সময় তাঁকে বলে গেলেন, 'ওদের দুধ চিঁড়ে মিষ্টি কিনে দিও আজই।'

সেই দিনই বাজার থেকে আট সের দুধ আর গয়ানাথ পালের দোকান থেকে সরু চিঁড়ে আর সন্দেশ কিনে এনে উমাচরণ সন্ধ্যার সময় মহা ফুর্তিতে অন্যান্য বরকন্দাজদের নিয়ে সপাসপ্‌ ফলার লাগিয়ে দিল। সাহিত্য-সাধনায় মগ্ন রবীন্দ্রনাথ একতলায় নেমে এসে উমাচরণদের ফুর্তির ফলার দেখে গেলেন।

ভোলানাথ

ভোলানাথকে আমি কবির জোড়াসাঁকো ভবনে মাঝে মাঝে দেখেছি। লোকটার চেহারাখানা বেশ সুঠাম। তার মুখের লম্বা গোঁফজোড়ার পারিপাট্য বেশ লক্ষ্য করবার মত। সে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, জাপান ইত্যাদি ঘুরে এসেছে; সাড়ম্বরে তারই গল্প সে শোনাত সবাইকে। জার্মানির কোন্ সাহেব রবিবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল, ইউরোপের বড় বড় রাজধানীতে রবিবাবুকে দেখার জন্য কী ভয়ঙ্কর ভিড় হত, অনেক মেমসাহেব তাঁকে যীশুখ্রীষ্ট বলত, বড় বড় সভা-সমিতিতে যাবার সময় কবি কি ভাবে যেতেন—এই সব গল্প সে মাঝে মাঝে রাত্রে অসাধারণ গর্বের সঙ্গে বলে যেত।

বিপিন

রবীন্দ্রনাথের আর একটি পুরাতন ভৃত্য ছিল। সে হচ্ছে বিপিন। বিপিন ছিল জবরদস্ত চাকর, তাকে দেখে সবাই ভয় পেত। সে সময়কার শিলাইদহ সদর কাছারির খাজাঞ্চি (স্বর্গীয় হরমোহন নন্দী) বলতেন, 'বিপিন ঠগাবগা লেখাপড়া যতটুকু জানুক আর না-ই জানুক, সে তদ্বিরের জোরে সেরেস্তায় বসে একজন পাকা আমলার কাজও করতে পারত।'

সে ছিল ভয়ানক হিসেবি, অতিরিক্ত সাবধানি আর অত্যন্ত বিশ্বস্ত। জমিদার-বাবুদের কোন ফরমাশ যদি কোন আমলা বা বরকন্দাজ ঠিক ভাবে তামিল না করত তা হলে আর রক্ষা ছিল না। তার বোল-চাল কায়দা-কানুন দেখে সাধারণের একেবারে তাক লেগে যেত। সব কাজেই সর্দারি করবার দিকে তার খুব ঝোঁক ছিল। তাকে দেখে ছোট-বড় সবাই সমীহ করে চলত। শুধু তাই নয়। বিপিন চ্যাচামেচি, সোরগোল খুব পছন্দ করত। কুঠিবাড়িতে অতিরিক্ত হৈ-চৈ থাকলেই বুঝতে হত যে সেবারে বাবুমশায়ের সঙ্গে বিপিনও এসেছে। আমরা মাঝে মাঝে গোলাপফুলের লোভে কুঠিবাড়িতে বাগানের আশেপাশে ঘুরতাম, কিন্তু বিপিন আমাদের দেখতে পেলেই আমাদের মতলব বুঝত, আর আমাদের নিরাশ করত না। বিপিনের অতিরিক্ত কড়াকড়ি ও হৈ-চৈ দেখে রবীন্দ্রনাথ নাকি বলতেন, 'বিপিনের সর্বমত্যন্তম্ গর্হিতম্।'

প্রসন্ন

শিলাইদহের প্রাচীনদের কাছে রবীন্দ্রনাথের আর একটি পুরাতন ভৃত্যের কথা শোনা যায় একটা বিশেষ বিপজ্জনক ঘটনার সংস্রবে। সে হচ্ছে প্রসন্ন। সে ঘটনার বর্ণনা 'ছিন্নপত্রে' পাওয়া যায় (শিলাইদহ, ১৮৮৮)। সেদিন জ্যোৎস্নারাত্রে চরের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে কবির ভাইপো বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী অনেক দূরে চরের মধ্যে নিখোঁজ হয়ে যান। রবীন্দ্রনাথ বোটের সামনেই চরে পাইচারি করছিলেন। প্রকাণ্ড চরের মধ্যে অতি প্রত্যুষে,জ্যোৎস্নারাত্রে সপরিবারে বেড়াতে তিনি খুব ভালবাসতেন, অনেক সময়ে আত্মস্থভাবে পদ্মার প্রকাণ্ড সৈকতভূমিতে একাকী বেড়াতেন।

রাত অনেক হয়ে যায়, তবু কবিগৃহিণী, বলু, এঁরা ফেরেন না। রবিবাবু ক্রমেই ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি ভৃত্য প্রসন্নকে পাঠালেন।

লণ্ঠন নিয়ে বোটের মাল্লা গফুর মিয়া তার প্যাজ-রসুনের কাবাব রান্না ফেলে বেরল লাঠি হাতে নিয়ে। তারা সারা চরময় খুঁজছে। তাদেরও আর খোঁজ নেই। রবীন্দ্রনাথ ডাকছেন, 'বলু', কোন সাড়া নেই। আবার তিনি ডাকছেন, 'প্রসন্ন, গফুর'—তাদেরও কোন সাড়া নেই। আবার শোনা গেল অনেক দূরে প্রসন্ন হাঁকছে, 'ছোটমা।' এইভাবে সেই প্রকাণ্ড মরুভূমির মধ্যে শুধু হাঁকাহাঁকি চলছে আর চারিদিকে নির্জন নিশীথিনীর বুক চিরে উদাস প্রতিধ্বনি ফিরে আসছে।

তখন কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাস হবে। পদ্মার জল সরছে হু-হু করে। চরে নানা জায়গায় চোরাবালি, সাপের ভয়। বলেন্দ্রনাথের ছিল মূর্চ্ছার রোগ, তিনিই আবার তাঁর ছোট কাকিকে চরে বেড়াতে নিয়ে গেছেন নিজে পথ-প্রদর্শক হয়ে। রবীন্দ্রনাথ মহা চিন্তিত ও ভীত হয়ে পড়লেন। বহুক্ষণ খোঁজা-খুজিতেও তাঁদের সন্ধান মিলল না। আরও বরকন্দাজ বেরিয়ে পড়ল; সারা চর খুঁজে তারাও ফিরে এল।

অনেকক্ষণ পরে বলেন্দ্রনাথ ছোট কাকিকে নিয়ে দুজনে সারা পায়ে কাদা মেখে একখানা ডিঙ্গি করে প্রসন্নর সঙ্গে ফিরে এলেন। প্রসন্ন বলল, 'ছোটমা আর বলুবাবু রাস্তা ভুলে কালকেপুরের চরের দিকে চলে যাচ্ছিলেন। আমি আর গফুর না থাকলে তাঁরা পাবনা জেলার কোন না কোন একপ্রান্তে চলে যেতেন!' রাত্রে চরের মধ্যে কিছুই দেখা যায় না,—চেনা যায় না; চেনা জায়গাও ভুল হয়। সে এক মহা বিপদ। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের পেয়ে শেষে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

প্রসন্নর নামটি তার স্বভাবের অনুরূপ। সে ছিল স্থির, সদা-প্রসন্ন। কবি-গৃহিণীর খুব পছন্দমত চাকর ছিল প্রসন্ন, সে নাকি তার ছোটমার মুখ দেখলেই তাঁর অভিপ্রায় বুঝতে পারত। প্রসন্ন শিলাইদহের সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিল।

ফটিক সেখ

এইবার ফটিক সেখের গল্প বলব। ফটিক সেখ শিলাইদহের লোক, দেখতে বেশ সুপুরুষ, গৌরবর্ণ লম্বা মানুষটি, মুখে সুন্দর দাড়ি। সে বাবুমশায়ের বাবুর্চি ছিল। মৃণালিনী দেবী তাকে খুব ভাল রান্না শিখিয়েছিলেন। ফটিক বাবুর্চিপদ পাবার পরেই তার পদবী হল 'ফরাস'। ফটিক ফরাস খুব সেয়ানা

ও রসিক লোক ছিল। সে বহুদিন বাবুমশায়ের বাবুর্চিগিরি করেছিল এবং সে পদগর্বে মাঝে মাঝে পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে উদ্ধত ব্যবহার করত।

ফটিক ফরাস পাকা বাবুর্চি ছিল বটে, কিন্তু তার অনেকগুলো দোষ ছিল। ফটিককে একটি প্রকাণ্ড পরিবার প্রতিপালন করতে হত। সে নিজে বেশ ভাল মাইনে পেত, কিন্তু তার ভাইরা কোন কাজকর্ম করত না, সামান্য জমি-জমাগুলো দেখে-শুনে খেতে জানত না—জানত শুধু ফটিকের ঘাড়ে বসে খেতে। ফটিকেরও ছেলেমেয়ে কয়েকটা ছিল। এই সবের জন্য ফটিকের অভাব মিটত না; নানা ফন্দি-ফিকির করে তার উপরি-উপার্জনের নূতন পন্থা তাকে বের করতে হত।

রবীন্দ্রনাথ ফটিকের এই গুরুতর দোষের কোন খবর জানতেন না—তবে ফটিককে যে একটি বৃহৎ গোষ্ঠীর পেট ভরাতে হয়, তা জানতেন; তাই তাকে কিছু জমিও দিয়েছিলেন। তবু প্রায়ই কুঠিবাড়ির ঘি, ময়দা, মিষ্টি প্রভৃতি কম পড়ে যেত। ফটিক একবার এইজন্যে ধরা পড়ে এবং তার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের কাছে নালিশ হয়। তাতে বাবুমশাই বলেছিলেন, 'ফটিকের এত বড় সংসার, তোমরা তাকে ক টাকা মাইনে দিয়ে থাক? তার কাছে জিনিস-পত্তরের অত কড়াকড়ি হিসেব নেবার দরকার কি?'

শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে প্রজারা সময়ে-অসময়ে দরবার করতে আসত। রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই সাহিত্য-সাধনায় মগ্ন থাকলেও প্রজারা এলেই তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের অভাব-অভিযোগ শুনতেন—হুকুম দিতেন, তাদের সঙ্গে বেড়াতেও যেতেন। ফটিক কোনও কোনও প্রজার কাছে ঘুষ নিয়ে দেখা করার সুবিধা করে দিত—আবার কিছু আদায় না হলে কোনও কোনও প্রজাকে ফিরিয়ে দিত। কি করে যেন রবীন্দ্রনাথের কানে এই কথা গেল। তিনি একদিন অত্যন্ত বেদনাপূর্ণ স্বরে বললেন, 'ফটিক, তোর হাতে আমি আর খাব না। তোর হাতে খেলে আমার পাপ হবে। তুই যা। বাড়ি চলে যা,—আমার সুমুখ থেকে চলে যা।'

রবীন্দ্রনাথের মৃদুস্বরে তিরস্কারের একটা নিজস্ব ভঙ্গী লোকের মনে তীক্ষ্ণ ভাবে আঘাত করত। তিনি রেগে বা অসন্তুষ্ট হয়ে আমাদের মত চ্যাঁচাতেন না, কিন্তু তাঁর বড় বড় চোখ দুটি দেখে অপরাধীর বুকের রক্ত হিম হয়ে যেত। তাঁর ঐ দুটি কথা এমন গভীরভাবে ফটিকের অন্তরে ঘা দিয়েছিল যে, ফটিক সেদিন বাড়ি গিয়ে রাত্রে খুব কেঁদেছিল! এর আগেও ফটিকের একটা চালাকি

বাবুমশাই ধরেছিলেন, সে অপরাধে তার গুরুতর জরিমানা হয়েছিল। কিন্তু সেইদিন থেকেই আর কেউ ফটিককে ঘুষের অপবাদ দিতে পারে নি।

ম্যানেজারবাবুর কাছে এর পরে একটা খুব গুরুতর রকমের মামলা হয়। সেই মামলায় ফটিক আর তার ভাই ছিল আসামি। মামলার বিচারে ফটিকের দণ্ড হল, কিন্তু খুব লঘুদণ্ড হয়েছিল। কি করে যেন সেই কথাটাও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কানে যায়। বাবুমশাই খুব গোপনে ঐ মামলার বাদীদের ডাকিয়ে সমস্ত ব্যাপার জেনে নিয়েছিলেন।

বাবুর্চি হিসেবে ফটিক ফরাসের একটুও খুঁৎ ধরবার উপায় ছিল না,—তার মত খাসা বাবুর্চি দুষ্প্রাপ্য ছিল। সাহেবরাও তার কাজ দেখে খুব খুশি হতেন। তখন শিলাইদহে বড় বড় সাহেব ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরা প্রায়ই বেড়াতে আসতেন এবং কুঠিবাড়ির অতিথি হতেন।

এই ব্যাপারের পরেই একদিন হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ অসময়ে ফটিক ফরাসকে তাঁর খাস কামরায় ডেকে পাঠালেন। ফটিক হাজির হলে তিনি বলেছিলেন, 'তোকে তো আর রাখা চলে না ফটিক, তোকে দূর করে দেব—পদ্মাপার করে তোকে তাড়িয়ে দেব। তুই আমার সঙ্গে থাকিস আর লোকের উপর এমন অত্যাচার করিস?'

ফটিক কেঁদে ফেলেছিল, নিজের দোষ অকপটে স্বীকার করেছিল এবং সেইদিন থেকেই ফটিকের সমস্ত দোষ সংশোধন হয়ে গিয়েছিল। এর পরে তার আর কোন অপরাধের বিষয় শোনা যায় নি। সে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কাজ করেছিল। তার ছেলে, নাতি, এরাও জমিদারি-সরকারে চাকরি করেছিল।

ঝগড়ু বেহারা

এইবার ঝগড়ু বেহারার কথা বলব। আমি ঝগড়ুকে খুব বুড়ো বয়সে দেখেছি কবির কলিকাতার বাড়িতে। তার যৌবনের কোন কাহিনী আমার জানা নাই। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে ঝগড়ুর অত্যন্ত প্রতিপত্তি ছিল। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কচিৎ কখনও আসতেন। সেজন্যে ঝগড়ুকে কোন কাজই করতে হত না,— বসে বসে মাইনে নিত আর তেতলার ঘর কখানা ঝাড়পোঁছ করত।

ঝগড়ুর সেরা কাজ ছিল ছাগল পোষা। তার ছিল লম্বা-দাড়ি আর শিং-ওয়ালা এক রামছাগল। এই রামছাগলের অত্যাচারে সকলকে অতিষ্ঠ হতে

হত। আমি তখন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কাজ করি। ঝগড়ুর আহ্লাদে রামছাগলের নাতি-পুতি এত হয়েছিল যে, তাদের অত্যাচার আমাদের নীরবে সহ্য করতে হত। কারণ আমরা জানতাম, ঝগড়ু আর তার রামছাগল-পরিবারের সাতখুন মাপ। যেমন বুড়ো ঝগড়ু, তেমনি তার দাড়িমুখো আদুরে রামছাগল—বাবুমশায়ের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসতেন, তখনই এক সময়ে বুড়ো ঝগড়ু আর তার ধাড়ি দাড়িমুখো রামছাগল তাঁকে দেখা দিয়ে যেত। বুড়ো ঝগড়ু বেহারার এতবড় পশার প্রতিপত্তি ছিল যে, অনেক সময়ে রবীন্দ্রনাথের পুত্র ও পুত্রবধূও তাকে খুব সমীহ করে চলতেন। ঝগড়ুর সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল, সে আমায় একটা রাম-ছাগলের বাচ্চা দিয়েছিল।

ঝগড়ু বহুকালের পুরানো চাকর। সে ঠাকুর-বংশের অনেক কিছু দেখেছে—অনেককে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। সে অনেক সময় বলত, 'রবিবাবুমশাই জীবনে এত শোক-তাপ পেয়েছেন যে, সে রকম কোন বাবুই পান নি। আর বাবু, আমি তাঁকে কোনো দিন কাঁদতে দেখি নি, সংসারের জন্য ভাবতে দেখি নি। আর দেখুন, এই বুড়ো বয়সে একটু আরাম করবেন,—তা না, 'বিশ্বভারতী' না কি যেন ওর নাম, তার জন্যে একেবারে পাগল হয়ে ক্ষেপে গেছেন, সারা "পিত্থিমী" দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। এতও সহ্য হয়? সব ছিষ্টিছাড়া কাণ্ড! এমন আর দেখি নি কোথাও!'

রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কাহিনী বলতে বলতে সে একেবারে ডুকরে কেঁদে উঠত; বলত, 'বাবু, এমন সোনার চাঁদ ছেলে মারা গেলে মানুষ পাগল হয়ে যায়। আমি খোকাকে কোলে করতাম। তার সেই মুখখানা আমি প্রায়ই রাত্রে স্বপ্নে দেখি। সেদিন আমার খেতে ইচ্ছে হয় না, কোনো কাজকর্ম করতেও ইচ্ছে হয় না।'

ঝগড়ু আরও অনেক গল্প করত,—বহুদিনের আগেকার শান্তিনিকেতনের গল্প, মৃণালিনী দেবীর বিয়ের গল্প, তাঁর সন্তানদের কত কাহিনী। বলত, আর বুড়ো কাঁদত।

এই স্নেহপ্রবণ ঝগড়ু—পুরাতন ভৃত্য ঝগড়ু রবীন্দ্র-সাহিত্যে অমর হয়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে যাবার সময় তাঁর স্নেহের নাতনিকে সোহাগ করে সেই সমুদ্রের বুকের উপরে জাহাজে বসে ঘুমপাড়ানি ছড়া লিখেছেন—

এক যে ছিল বাঘ
তার গায়ে কালো দাগ,
তাই বেজায় হলো রাগ
ঝগড়ুকে তাই বল্লে হেঁকে—
যা এখুনি প্রাগ।

চিতল মাছের পেটি

রবীন্দ্রনাথের পরিবারবর্গ তখন কিছুদিন স্থায়িভাবে শিলাইদহে আছেন, রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায়।

তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব* কলিকাতা থেকে শিলাইদহে আসবেন। তিনি কুষ্টিয়া ঠাকুর কোম্পানির কর্মচারী যজ্ঞেশ্বর বাবুকে লিখলেন, 'আমি অমুক দিনে অমুক ট্রেনে কুষ্টিয়া নেমে, সেখানে খাওয়া-দাওয়া করে শিলাইদহ যাব। তার বন্দোবস্ত রাখবেন।'

কুষ্টিয়া কুঠিবাড়িতে তখন রথীন্দ্রনাথের মামা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী কিছুদিনের জন্য ছিলেন। তাঁর নিজের পাচক ও চাকর ছিল। কিন্তু পাক-কার্যের চেয়ে বাজার-কার্যেই পাচকটির বেশি নৈপুণ্য দেখা যেত। যজ্ঞেশ্বরবাবু সেজন্য পণ্ডিতমশায়ের জন্যে ভাল রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করলেন।

পণ্ডিতমশাই কুষ্টিয়া পৌছে স্নান সেরে খেতে বসে নানা রকমের নিরামিষ ডাল, ঝোল, তরকারি ইত্যাদি খেয়ে পরিতুষ্ট হয়ে বললেন, 'এসব কি আপনার বাড়ির মেয়েদের রান্না. যজ্ঞেশ্বরবাবু? রাঁধুনি ঠাকুরের হাতে তো এমন রান্না হয় না!'

নগেনবাবু বললেন, 'এসব যজ্ঞেশ্বর ঠাকুরের রান্না। খেতে পারছেন তো?'

বিদ্যার্ণব মশায় বললেন, 'বিলক্ষণ! পেটুক বামুনকে আপনারা পেট ফাটিয়ে মারবার জোগাড় করেছেন! দেখছেন না, আমি যে তিনজনের খোরাক উদরস্থ করে ফেললাম।'

সত্যই বিদ্যার্ণব মশাই আহার সেরে, তিন-চার ঘণ্টা বিশ্রাম করে, গুরুভার

* শান্তিনিকেতন সৃষ্টির সময়ে ইনি সেখানেরও অধ্যাপক ছিলেন।

আহারের অস্বস্তি একটু কমিয়ে, পাল্‌কি চেপে শিলাইদহে চলে গেলেন।

কুষ্টিয়ায় পণ্ডিতমশায়ের অতিথি সৎকারের গল্প চিঠিপত্রে কলিকাতায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কানেও গেল।

এই ব্যাপারের প্রায় এক মাস পরে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে আসবেন। তিনি নিজ হাতে যজ্ঞেশ্বরবাবুকে চিঠি লিখলেন, 'আমি কুষ্টিয়া নেমে, খেয়ে যাব। তুমি আমার খাবার বন্দোবস্ত করো; বিরাট কিছু করো না। আলু-ভাতে, ডালবাঁটা ভাতে, শাকভাজা, আর চুনো মাছ।'

যজ্ঞেশ্বরবাবু মনিবকে ডালবাঁটা ভাতে খাওয়াবার বন্দোবস্ত করলেন, শিলাইদহে এবিষয়ে কিছু জানালেন না। পদ্মা থেকে অতি প্রকাণ্ড এক চিতল মাছ আনালেন, আর গোপনে গোপনে মনিবসেবার রাজসূয় আয়োজন সেরে তৈরি হয়ে থাকলেন।

শিলাইদহ থেকে ম্যানেজারবাবু এই উপলক্ষে কুষ্টিয়া এসে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যজ্ঞেশ্বরবাবু বললেন, 'বাবুমশায়ের জন্যে তাঁর হুকুমমত ডালবাঁটা আর শাকভাত করে দেব; তার জন্যে আপনারা কিছু ভাববেন না।'

নগেনবাবু একটু হাসলেন।

যথাসময়ে রবীন্দ্রনাথ এসে কুষ্টিয়া কুঠিবাড়িতে উঠলেন। অভ্যর্থনাদির কাণ্ডকারখানা মিটে গেলে স্নান সেরে তিনি খেতে বসলেন। খাবার ঘরে গিয়ে দেখেন—কাঁঠাল কাঠের প্রকাণ্ড একখানা পিঁড়ি, পাকাসোনার মত তার রঙ। আর তার সামনে প্রায় দুই ঘনগজ জায়গা জুড়ে রকমারি খাবার—থালায়, বাটিতে, রেকাবিতে—নানান কায়দায় থরে থরে সাজান। গরম খাবারের সুগন্ধে ঘরখানা ম'ম' করছে। ঘরখানাতে যজ্ঞেশ্বরবাবু ভিন্ন আর কেউ নেই। বাবুমশাই ব্যাপার দেখেই বললেন, 'যজ্ঞেশ্বর, এসব করেছ কী? ডালবাঁটা ভাতে আর আলুভাতেই আমি ভালবাসি। তুমি এসব কী কাণ্ড করে ফেলেছ, বল দেখি।'

যজ্ঞেশ্বরবাবু বললেন, 'হুজুর যেদিন জমিদারিতে এসে ডালবাঁটা আর আলু ভাতে ভাত খাবেন সেদিন আমাদের সবাইকে উপোস করে থাকতে হবে।'

বাবুমশাই হো-হো করে উচ্চকণ্ঠে এমন হাসলেন যে, ঘরখানা গম-গম করে উঠল। খেতে বসে রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেলেন, রকমারি খাদ্য-সম্ভারের মধ্যেও তাঁর ফরমায়েসি ডালবাঁটা সেদ্ধ ও আলুভাতে আছে। বিপুল খাদ্য সমাবেশের সব রকমই একটু একটু করে মুখে দিয়ে তিনি বললেন, 'যজ্ঞেশ্বর, এসব কি করে

খাব, বলে দাও।' একটু একটু করে খেতে খেতে দেখেন, একখানা বড় ডিসে এক ফুট লম্বা প্রকাণ্ড দু খানা চিতল মাছের পেটি যেন সোনা মেখে হাসছে। রবীন্দ্রনাথ কচি ছেলের মত হাসতে হাসতে বললেন, 'যজ্ঞেশ্বর, এ দুটি কোন্ চীজ্? মাছ নাকি? কি মাছ?'

যজ্ঞেশ্বরবাবু বললেন, 'ও দু খানা চিতল মাছের পেটি। ওর অন্তত একখানা আপনাকে খেতেই হবে।'

আয়োজন দেখে রবীন্দ্রনাথের বোধ হয় বেশ ভাল রকম ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল। তিনি একখানা মাছই খেয়ে ফেললেন।* অন্যান্য অনেক রকমের মাছ মাংস ইত্যাদি একটু একটু মুখে দিয়ে উঠতে যাবেন, এমন সময়ে যজ্ঞেশ্বর বললেন, 'হুজুর এ ডিস্‌খানায় হাত দিতে ভুলেই গেছেন। এতে আছে কুষ্টিয়ার তৈরি ভাল "রাঘবসই"। এর একটা খেতেই হবে।'

রবীন্দ্রনাথ তার একখানা খেয়ে ফেললেন; বললেন, 'চমৎকার'।

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে চলে এলেন।

শিলাইদহে এসে একদিন তিনি ছেলে, মেয়ে, জামাই, শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিয়ে একটা ভোজ দেবার ব্যবস্থা করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞেশ্বরবাবুকে শিলাইদহে তলব করলেন।

যজ্ঞেশ্বরবাবু শিলাইদহে এসে তাঁর সামনে দাঁড়াতেই বললেন, 'যজ্ঞেশ্বর, শুনেছ তো? এই ভোজের ব্যবস্থা তোমার হাতে। আমাদের সব রকমের খাবার তুমি নিজে তৈরি করবে। ঠাকুর-চাকর সব তোমার ফরমাশ খাটবে। আমার ছেলে, মেয়ে, জামাই কেউ আজ ওদের হাতে খাবে না।'

বিদ্যার্ণব মশাই ঘরেই ছিলেন, বললেন, 'যজ্ঞেশ্বরবাবু, এসেছেন তো? বেশ। এখন থেকেই আদা-নুন খেয়ে ক্ষিধে পাকিয়ে নিই।'

সেদিনকার ভোজের সমারোহ তখনকার অনেকেরই মনে আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীকে বললেন, 'নাও, আজ আর তোমায় কত্তাগিরি করতে করতে হবে না। আজ তোমার কত্তাগিরি যজ্ঞেশ্বরকে ছেড়ে দাও।'

শিলাইদহ কুঠিবাড়ির দোতলার হলঘরে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে পিঁড়ি পেতে খেতে বসলেন। তাঁর প্রাণখোলা হাসি যেন ঘরখানাকে শঙ্খধ্বনিতে পূর্ণ করে দিল, স্বভাবসিদ্ধ নানা রকমের রঙ্গরস সবাইকে হাসাতে লাগল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাঁর চারপাশে জটলা করে বসে খেতে খেতে মধুর

* এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ মাছ মাংস সব খেতেন। পরে নিরামিষাশী হন।

কলগুঞ্জন করতে লাগল। পরিবেশক স্বয়ং যজ্ঞেশ্বরবাবু।

রথীবাবুর ইংরেজির শিক্ষক লরেন্স সাহেবও পিঁড়ি পেতে জোড়াসন হয়ে বসে খুব খেলেন আর রবিবাবুর নানান রসিকতায় হাসলেনও খুব। বিদ্যার্ণব মশাই গুরুতর রকমেই ভোজন সমাপ্ত করে লম্বা ঢেকুর তুলতে তুলতে বললেন, 'যজ্ঞেশ্বরবাবু, আজও পেটুক বামুনকে আপনি জব্দ করেছেন।'

এদিকে লরেন্স সাহেব নিচের তলায় এসে হুঁকোয় তামাক খেয়ে সবাইকে হাসালেন। তিনি শিলাইদহে এসে হুঁকোয় তামাক খেতে শিখেছিলেন স্থানীয় লোকদের কাছে। হাস্যকৌতুকে সেদিনকার ভোজ বড় আনন্দে পরিসমাপ্ত হয়েছিল।

যজ্ঞেশ্বরবাবুর কৃতিত্বে মহাসমারোহে ভোজ সাঙ্গ হল। সেদিনকার ভোজেও পদ্মা থেকে আনা প্রকাণ্ড চিতল মাছের পেটি ছিল। রবীন্দ্রনাথ খেতে খেতে উচ্চহাস্যে বার বার বলেছিলেন, 'আমার বড় আদরের ইলিশ মাছের পেটিকেও হারিয়ে দিয়েছে যজ্ঞেশ্বরের এই চিতল মাছের পেটি।'

জামাইবাবুর সমস্যা

বঙ্গ-সাহিত্যের 'বীরবল' শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী ব্যারিস্টার মহাশয় রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। তাই প্রমথ চৌধুরী মশাই রবীন্দ্রনাথের জামাই এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর খুড়াশ্বশুর। ঠাকুরবাবুদের সেকেলে প্রজারা এজন্য তাঁকে 'জামাইবাবু' আর একেলে ইংরেজি শিক্ষিত প্রজারা তাঁকে 'চৌধুরী সাহেব' বলে অভিহিত করতেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন খুব বেশি রকমে সাহিত্য-সাধনায় ও দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন আর নানা কাজে ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, সে সময় তাঁদের জমিদারির কাজ দেখা-শুনার জন্য প্রমথ চৌধুরী মশাই কিছুকালের জন্য জমিদারির ম্যানেজিং এজেণ্ট হয়েছিলেন।

সে সময়ে জমিদারির প্রজারা কোন দরবার নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলে

তিনি বলতেন, 'এখন জামাইবাবু তোমাদের কর্তা, তাঁর কাছে যাও।' আবার কোন দরবার নিজে শুনেও বলতেন, 'এর হুকুম জামাইবাবু দেবেন। তিনিই এর ব্যবস্থা করে দেবেন। তাঁর কাছে যাও।' এ কাহিনীতে আমি তাই প্রমথ চৌধুরী মশাইকে 'জামাইবাবু' বলেই উল্লেখ করলাম।

সে সময়টায় প্রজাদের ওজরি বকেয়া নজর খাজনা মাপের এক আন্দোলন চলেছিল। 'ওজরি' কথার অর্থ হচ্ছে 'আপত্তিকর'। সে সময়ে ঠাকুরবাবুদের শিলাইদহ জমিদারিতে ফি-বছরে প্রায় চার-পাঁচশ বিঘা জমি প্রজাদের মধ্যে বিলি-বন্দোবস্ত হত। চরের জমি আবার বন্দোবস্ত হত নানান প্রণালীতে। ডাকাডাকি করে জমির সেলামি ধার্য হত, প্রজারাও জিদের বশে বেশি সেলামিতে জমি ডেকে নিত; কিন্তু সেলামির সম্পূর্ণ টাকা দিতে হত না—জমির ফসল হলে সেলামির টাকা শোধ করবার নিয়ম ছিল। চরের জমিগুলি বড্ড খামখেয়ালি—কারও ভাগ্যে জমিতে সোনা ফলল,—আবার কারও কপালে উঠল বালি। যারা জমি নিয়ে এই রকম ক্ষতিগ্রস্ত হত তারা তাদের দেয় সেলামির টাকা মাপ নেবার জন্য জমিদারের শরণাপন্ন হত এবং সেলামির টাকা মাপও পেত—জমি ও ফসলের অবস্থা তদন্তের পরে। এত বড় জমিদারিতে এই রকম ক্ষতিগ্রস্ত প্রজাদের জমিজমার উপযুক্ত তদন্ত ঠিক সময়ে এবং উপযুক্ত ভাবে করাও খুব সহজ নয়। তাইতে প্রজাদের সেলামির টাকা বাকি পড়ে জমিদারের খাতাপত্রে জমে উঠত। এই রকমের সেলামির বাবদে বহু টাকার জন্যে প্রজারা দায়ী হয়ে থাকত—আবার চালাকি করেও বহু প্রজা সেলামির টাকা না দেবার ফন্দি আঁটত।

এইভাবে জমিদারিতে বছরের পর বছর সেলামি আর খাজনাতে প্রায় তিন লাখ টাকা সে সময়ে 'ওজরি' অর্থাৎ প্রজাদের তরফ থেকে 'আপত্তিকর' বলে চলে আসছিল। রবীন্দ্রনাথ হুকুম দিয়েছিলেন—প্রজাদের ওজরি এই সব বকেয়া টাকায় জমিদারির হিসাবপত্র জটিল না করে এবং তার জন্যে দায়িক প্রজাদের উপর জুলুম বন্ধ করে, উপযুক্তভাবে তদন্ত করে এই সব টাকা মাপ দেওয়া হক। তাতে প্রজাদের উপর পীড়নের আশঙ্কা দূর হবে, সঙ্গে সঙ্গে জমিদারির হিসাবপত্রের জটিলতা দূর হয়ে সব ঝরঝরে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বছরের পর বছর এইভাবে যে লাখ তিনেক টাকা ওজরি বলে চলে আসছে, তার উপযুক্ত তদন্ত ও মাপ হওয়া ব্যাপারটা তো বড় সোজা কথা নয় এবং সে মাপ দেবার ক্ষমতা জমিদারির ম্যানেজারের ছিল না,—এ ক্ষমতা স্বয়ং

জমিদারের। সেবারে পুণ্যাহের আগে ম্যানেজিং এজেন্ট জামাইবাবু নিজে জমিদারিতে এসে এই টাকা মাপ দেবেন—সবার কাছে এই খবর রাষ্ট্র হয়ে গেল। তদন্ত ও কাগজপত্র তৈরি করবার ধূম লেগে গেল। আমিন, মুহুরি ও তহশীলদার-বাবুদের ঝামেলার অন্ত নেই, প্রজাদের মধ্যেও হৈ-চৈ পড়ে গেল।

সদর পুণ্যাহের দশ-বারো দিন আগে জামাইবাবু প্রকাণ্ড নীল পাল্‌কিতে চেপে শিলাইদহে এলেন। ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের মত শিলাইদহে যে কী ভীষণ কাজ তাঁর অপেক্ষায় রয়েছে তা তিনি গোড়ায় বুঝতে পারেন নি। কুঠি-বাড়িতে এসে আমলাবাবুদের কাগজপত্র, তদন্তের রিপোর্টের পাহাড় দেখে তো তাঁর চক্ষু স্থির। এদিকে সদর পুণ্যাহের দিন এগিয়ে আসছে। তিনি জমিদারির কাগজপত্রের মধ্যে ডুবে গেলেন।

এমনি সময়ে হঠাৎ টেলিগ্রাম এল রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আসছেন শিলাইদহে—তাঁর বজরায়। রাজসাহী, পতিসর, পাবনা ইত্যাদি ঘুরে বিদ্যুৎপ্রবাহের মত প্রজাদের মধ্যে এ সংবাদ প্রচারিত হল। চর থেকে, টাঠি থেকে দলে দলে প্রজা শিলাইদহে আসতে আরম্ভ করল বাবুমশাইকে দেখতে আর তাদের ওজরির দরবার করতে।

বাজিতপুরের (পাবনা) কাছে রবীন্দ্রনাথের বোট আসছে। প্রজাদের মধ্যে সে কী উত্তেজনা! দেখা গেল পিঁপ্‌ড়ের সারির মত চরের প্রজারা বোটের পেছনে আসছে। শ্রাবণ-শেষের বর্ষণের পর সে এক আনন্দোজ্জ্বল ছবি।

এদিকে শিলাইদহ কুঠিবাড়ি লোকে লোকারণ্য। রবীন্দ্রনাথ কুঠিবাড়িতে পৌঁছেছেন। জামাইবাবু ব্যাপার দেখে একেবারে থ' মেরে গেছেন। তিনি আমলাদের নিয়ে পর্বতপ্রমাণ কাগজপত্রে মন দিলেন। প্রজাদের বলে দেওয়া হল, তারা যেন তিন দিন পরে আসে। তবু তারা যায় না। তখন রবীন্দ্রনাথ উপরতলা থেকে নেমে তাদের সামনে দেখা দিলেন। প্রণামপর্ব চলল। হিন্দু প্রজারা তাঁকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করত। মুসলমান প্রজারাও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করত, সেলাম তো করতই। প্রজাদের প্রণামের এই বিশেষত্বটা আমরা ভাল করে লক্ষ্য করেছি।

রবীন্দ্রনাথ হাসিমুখে সমবেত প্রজাদের বললেন, 'তোমাদের কোন চিন্তা নেই, জামাইবাবু তোমাদের জন্যই এসেছেন, কাগজপত্র দেখছেন। তিনিই তোমাদের ওজরি মাপ দিয়ে যাবেন—তাঁকেই সব ভার দিয়েছি। তোমরা আজ আর কষ্ট না করে বাড়ি যাও।'

দলে দলে তীর্থযাত্রীরা বাড়ি ফিরল।

জামাইবাবুর কাজ চলল। এক এক দল প্রজাকে ডেকে কাগজপত্রের সাহায্যে আমলাবাবুদের সামনে তাদের বক্তব্য শুনতে লাগলেন। কিন্তু হুকুম দিলেন না। এ কী রকম হল! প্রজারা কুঠিবাড়ির প্রাঙ্গণে এসে গা টেপাটিপি করে বলে,'এ কী রকম হল?—হুকুম হল কৈ?—তাই তো, হুকুম হল না তো!'

এ হুকুম তো বড় সহজ হুকুম নয়। জামাইবাবু আজ এক সপ্তাহ কাগজপত্র বুঝছেন—প্রজাদের কথা, আমলাদের বক্তব্য শুনছেন। পঞ্চাশ, ষাট, একশ, দুশ, তিনশ, এমনি সব টাকার অঙ্ক মাপ দেবার সমস্যা! কোন কোন ক্ষেত্রে প্রজার সঙ্গে আমলাদের বক্তব্যের সামঞ্জস্য হচ্ছে না,—কোন ওজরি সেলামির টাকা নিয়ে,কোনটা আবার খাজনার টাকা নিয়ে, কোনটা কোনটার নালিশও হয়েছে, ডিক্রিও হয়ে গেছে। এত হরেক রকমের মোটা মোটা টাকার অঙ্ক মাপ দেওয়া, আবার খাতাপত্রে সেই সব রকমারি মাপ-মকুব কি ভাবে লেখা হবে, এ সমস্যা বড় সহজ নয়। তিনি যেন সমুদ্রের মধ্যে পড়ে গেলেন—হুকুম দিতে পারছেন না। এদিকে প্রজাদের আসা-যাওয়ায় কুঠিবাড়িতে কদিনের জন্য হাট বসে গেল।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তেতলার ঘরে একেবারে সাহিত্য-সাধনায় মগ্ন। এদিকে যে কী ভীষণ কাণ্ডকারখানা চলছে তার কোন খবর রাখেন না। প্রজারা অবাক হয়ে গেল! বাবুমশায়ের এ কী রকম কাণ্ড! জামাইবাবু তেতলার ঘরে কাব্যসমাহিত শ্বশুর-মশায়ের কাছে পরামর্শের জন্যে উপস্থিত হয়ে দেখেন, তাঁর যেন হুঁস নেই। দু-একটি কথা অন্যমনস্কভাবে বলে দিলেন; তাতে জামাইবাবুর এই সমস্যার কোন সমাধান হয় না। কি পদ্ধতিতে কার কোন্ ওজর মাপ দিতে হবে—কাগজপত্র কি কিতাবতে (প্রণালীতে) লিখে পরিষ্কার করা হবে—এ বিষয়ে কোন উপদেশই তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে না পেয়ে এক-রকম হতাশ হয়ে পড়লেন; অত বড় বৈষয়িক বুদ্ধিমান ব্যারিস্টার মানুষ,—গলদঘর্ম হয়ে উঠলেন।

এদিকে প্রজারা ছাড়ে না, জামাইবাবু আর স্বয়ং বাবুমশাই পরগণায় এসেছেন, আর তাদের দরবার হবে না? তা কি হয়? ওজরি মাপ হবেই হবে। সাহসী প্রজারা কেউ কেউ তেতলায় গিয়ে একেবারে রবীন্দ্রনাথের কাছে হাজির! হুকুম মিলল, 'ও-হো, হাঁ, তোমাদের কোন চিন্তা নেই, জামাইবাবু মাপ দিয়ে দেবেন। আজ জামাইবাবুই তোমাদের মুনিব।'

প্রজারা কথা বলে যুৎ পায় না, কারণ রবীন্দ্রনাথ অন্যমনস্ক, যেন কোন্ সুদূর রাজ্যে সোনার তরী বেয়ে চলে গেছেন। তারা ফিরে এসে জামাইবাবুকে শক্ত করে ধরে বসে। জামাইবাবু বুঝলেন এ মজা মন্দ নয়, তাঁকে কর্তা বানিয়ে কবি কোন্ মায়াবীর কৌশল খেলছেন। এ যেন ভক্ত কবীরের সেই অবস্থা—

বিশ্বের লোক ঘরে ডেকে এনে তুমি পালাইবে নাকি ?

জামাইবাবু ম্যানেজার, জমানবিশ প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করলেন। একবার মাত্র মহর্ষিদেবের তিরোভাব উপলক্ষে প্রজাদের কিছু খাজনা মাপ দেওয়া হয়েছিল। তার পরে এই ধরনের জটিল মাপের ব্যাপার আর ঘটে নি। এই ওজরি মাপ যেমন জটিল, তেমনি ব্যাপক। স্বয়ং বাবুমশায়ের কাছে এ বিষয়ে উপদেশ না নিলে কোন হুকুম কাগজে-কলমে দেওয়া চলবে না, হিসেবপত্রও ঠিক করে লেখা যাবে না, সবাই মিলে এই স্থির করলেন। জামাইবাবু বললেন, 'কিন্তু তিনি লেখাপড়ায় একেবারে ডুবে আছেন। তাঁর কি আর এদিকে হুঁস্ আছে ? এদিকে প্রজাদের ঠ্যালাতে তো আর বাঁচিনে!' জামাইবাবু হাসবেন কি কাঁদবেন ঠাহর পেয়ে উঠলেন না।

সেদিন খুব ভোরে রবিবাবু বেড়াতে বেরিয়েছেন। ছাতীগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রাতর্ভ্রমণ সেরে ফিরে আসছেন। পথিমধ্যেই একদল প্রজা তাঁকে ধরে ফেলেছে আর তাদের দরবার জানিয়েছে। কিন্তু তাঁর মুখে হাসি আর ঐ এক কথা—'জামাইবাবু নিশ্চয়ই দেবেন, তাঁকে ধরোগে।'

এইভাবে আরও দু-একদিন গেল।

এদিকে পুণ্যাহ আসন্ন; তার আয়োজন চলছে সদর কাছারিতে। চিন্তায়-ভাবনায় জামাইবাবুর অবসরমাত্র নেই। তাঁর সামনে কাগজপত্র স্তূপাকার হয়ে উঠছে। প্রজারা দলে দলে আসছে-যাচ্ছে, তাদের হাতে কাগজ, মুখে বচন, চোখে উৎকণ্ঠা। ছুটাছুটি চলছে খুব, কিন্তু জামাইবাবুর কলম দিয়ে একটা হুকুমও বের হচ্ছে না।

পুণ্যাহের দুদিন আগের কথা। সেদিন রবীন্দ্রনাথ নদীর ধার দিয়ে পদব্রজে সান্ধ্যভ্রমণ সেরে কুঠিবাড়িতে ফিরছেন। চরের একদল প্রজা তাঁকে রাস্তার মাঝে আটকিয়ে ফেললে।

'কী ব্যাপার তোমাদের ?' রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন। আর ব্যাপার কী! কুঠির হাটের মধ্যে বসে বাবুমশাইকে দস্তুরমত তাদের সমস্যার কারণগুলো শুনতে হল,—তাদের হুকুম হচ্ছে না কেন ? জামাইবাবু কেবলই কাগজ

দেখছেন, ভাবছেন আর লিখছেন, কিন্তু হুকুম দিচ্ছেন না। তিনিই যদি মাপের কর্তা, তবে এ কয়দিন ধরে তাঁর কলমে হুকুম বের হচ্ছে না কেন?

রবীন্দ্রনাথ তাদের কথা শুনে এবার আর 'জামাইবাবু করবেন' বলে সমস্যা এড়ালেন না। মনুষ্যচরিত্রে তাঁর অসাধারণ অভিজ্ঞতা! এর কারণ কি, ভাবতে ভাবতে হয়ত তাঁর মনে সন্দেহ হল যে, আমলাতন্ত্রের চক্রান্তে এই সব ওজরি মাপ হচ্ছে না এবং জামাইবাবু বোধ হয় এই ব্যূহ ভেদ করতে পারছেন না। তিনি তাঁর প্রজা ও আমলাদের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর জানতেন। তিনি প্রজাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে সন্দিগ্ধমনে কুঠিবাড়িতে ফিরলেন। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের সবাইকে বলে দিলেন, 'তোমরা সবাই কাল সকালে এস, অন্যদেরও আসতে বলো! আমি জামাইবাবুকে তোমাদের সকলের পক্ষে সব অনুরোধ জানাব।'

প্রজারা কথাটা শুনে অবাক হল।

পরদিন প্রভাতেই রবীন্দ্রনাথ জামাইবাবুকে ডাকিয়ে বললেন, 'প্রমথ, প্রজারা ওজরি মাপ পাচ্ছে না কেন? বাধা কোথায়?'

প্রায় পুরা এক সপ্তাহ পরে জামাইবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত রবীন্দ্রনাথের এই আগ্রহ-পূর্ণ জিজ্ঞাসায় অকূল সমুদ্রে যেন কূল পেলেন। তিনি এই ব্যাপারের বাধা-বিপত্তি ও অসুবিধার কারণগুলো একে একে বললেন, কাগজপত্র দেখালেন।

রবীন্দ্রনাথ সেদিন ধীরভাবে সব শুনলেন, কাগজপত্রও দেখলেন অনেকক্ষণ ধরে। খানিক চিন্তা করে এই সব বিভিন্ন প্রকারের ওজরি টাকা কি ভাবে মাপ দিতে হবে, কি পদ্ধতিতে কাগজপত্র পরিষ্কার করা হবে, কি করলে প্রজা ও জমিদার পক্ষে কারো কোন স্বার্থ ভবিষ্যতে বাধাপ্রাপ্ত হবে না, অথচ প্রজাদের খুব উপকার হবে,—এসব বিষয় অতি সুন্দর প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দিলেন। সুবিজ্ঞ ব্যারিস্টার জামাইবাবু তাঁর শ্বশুরমশায়ের তীক্ষ্ণ বিচার-শক্তি, ক্ষুরধার বুদ্ধি আর জমিদারি কার্যে অসাধারণ অভিজ্ঞতা ও অধিকার দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সুবিজ্ঞ বহুদর্শী ম্যানেজার, জমানবিশ ও অন্যান্য বড় বড় আমলারা বলতে লাগলেন, 'বাবুমশায়ের কাছে আমাদের এখনও জমিদারির বহু কাজ শিখতে বাকি আছে।'

সমস্ত সমস্যা জলের মত সোজা হয়ে গেল। বাবুমশাই চটি পায়ে তাড়াতাড়ি তেতলায় চলে গেলেন।

বেলা হতে না-হতে অসংখ্য প্রজা দলে দলে কুঠিবাড়িতে এসে ভেঙ্গে পড়ল।

আজ তাদের পায় কে? আজ তারা তাদের বাবুমশায়ের নিমন্ত্রণ পেয়েছে, আজ হুকুম পাবেই। জামাইবাবুর সামনে তাদের দরবার আরম্ভ হল।

হঠাৎ প্রজারা এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। বাবুমশাই তেতলা থেকে চটির শব্দ করতে করতে নেমে এলেন। এসে দাঁড়ালেন আপিস-ঘরে নয়, একেবারে প্রজাদের বিরাট জনতার মাঝখানে। তাঁর মুখে অপূর্ব হাসি, চোখে অপূর্ব কৌতুক। খোলা বারান্দার উপর প্রজাদের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে সমস্ত প্রজাকে ডেকে বলতে লাগলেন, 'তোমরা যাও, জামাইবাবু তোমাদের সব বিষয় বিচার করবেন, তাঁকে আমি তোমাদের হয়ে অনুরোধ করেছি। তোমরা তাঁর কাছে যাও, কোন ভাবনা নেই তোমাদের, তোমরা প্রত্যেকে ন্যায় বিচার পাবে।' এই বলে তিনি যে কজন বরকন্দাজ দাঁড়িয়ে প্রজাদের ভিড় নিয়ন্ত্রিত করছিল তাদের হুকুম দিলেন, 'তোরা কাউকে কড়া কথা বলিস নে, সবাইকে দরবার করতে দে, একে একে আপিস-ঘরে পাঠিয়ে দে। কোনও অত্যাচার করিস নে।'

বিপদ কাটল। আপিস-ঘরের মধ্যে জামাইবাবু আজ হরদম হুকুম দিচ্ছেন আর দরখাস্তে সই করছেন। আজ তিনি মুক্তহস্ত। প্রজারা আপিস-ঘরে দলে দলে যাচ্ছে আর তাদের হুকুম শুনে আসছে। রবীন্দ্রনাথ তখনও ভিড়ের মধ্যে প্রজাদের বলছেন, 'এইবার তুমি যাও, তোমার হুকুম জেনে এস।' এইভাবে নিজে প্রজাদের দরবার করিয়ে দিচ্ছেন। আজ জমিদার যেন জামাইবাবুই, রবীন্দ্রনাথ যেন প্রজাদেরই একজন,—জমিদারের কাছে ন্যায়বিচারপ্রার্থী মাত্র।

সেইদিন থেকে পুণ্যাহের দিন পর্যন্ত প্রজাদের ওজরি মাপের হুকুম হতে লাগল। সেবারে পুণ্যাহও খুব জাঁকজমকে হয়েছিল, কিন্তু পুণ্যাহের মধ্যেও অতি স্মরণীয় ঘটনা ছিল সেই ওজরি মাপ, এবং সেই ওজরি মাপ হয়েছিল জামাইবাবুর হাত দিয়ে পুরানো প্রজারা এখনও সে গল্প করে থাকেন।

সেবারে জামাইবাবুর হাত দিয়ে প্রায় আড়াই লাখ টাকার উপর ওজরি সেলামি খাজনা মাপ হয়েছিল। সেই স্মরণীয় ওজরি মাপের মজাটা জামাইবাবু বেশ টের পেয়েছিলেন,—প্রজারাও কৌতুকপ্রিয় রবীন্দ্রনাথের এক অদ্ভুত মূর্তি দেখেছিল।

জলে ডোবা বৌ

সম্ভবত ১৩০৪ সাল। কালবৈশাখী—বছরের গোড়া থেকেই সুরু হল ঝড়। অনেক বড় বড় বট-অশ্বত্থগাছ উপড়ে গিয়েছিল—লোকের বাড়ি-ঘর উড়ে গিয়েছিল নদীতে বহু নৌকা ডুবে গিয়েছিল।

ঐ সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বোটে করে জলপথে বরাবর কালীগ্রাম থেকে শিলাইদহ আসছেন,—সঙ্গে তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ। তখন রথীন্দ্রনাথের বয়স নয়-দশ বছরের বেশি নয়।

বোট পাবনা অবধি আসবার পর ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হল। পদ্মা অমনি ক্ষ্যাপা মেয়ের মত উদ্দাম নৃত্য সুরু করল। মেঘের গর্জন, বিদ্যুতের চমকানি আর পদ্মার প্রচণ্ড ঢেউ দেখে যত নৌকা নদীর মধ্যে ছিল, তাদের মাঝিরা সব গ্রাম বা চরের ধারে নৌকা বেঁধে ভয়ে ভয়ে নোঙর করে রইল—না জানি আজ কী প্রলয় হয়ে যায়! রবীন্দ্রনাথের বোটও বাজিতপুর (পাবনা) আর হিমাইতপুরের মধ্যে এক কোলে আশ্রয় নিয়েছিল; কিন্তু ঝড় সমানভাবে প্রলয়-তাণ্ডবে মেতে আছে। আকাশ-বাতাস ও পদ্মা এককজোট হয়ে এমন একটা প্রলয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি করল যে, বোটের মাঝি ফুলচাঁদ ও রামগতি দস্তরমত ভয় পেয়ে গেল, এই ভয়ঙ্কর দুর্যোগে তারা পদ্মা পাড়ি দেবে কেমন করে!

সেকালের পদ্মার সঙ্গে একালের পদ্মার তুলনাই হয় না। এখন লোহা-লক্কড় আর পাথরে গড়া ইংরেজের হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ভয়ঙ্কর দৈত্যের মত ভয়ঙ্করী পদ্মাকে এমন করে ঘাড় চেপে ধরেছে যে, সেই কীর্তিনাশা পদ্মা যেন একটা থুনথুনে বুড়ির মত লাঠি ভর দিয়ে সাগরের কাছে নালিশ করতে চলেছেন। তাঁর সে রূপ নেই, সে বিক্রম নেই—সেই যৌবনমদে মত্ত তাণ্ডব-নর্তনও নেই। সেকালে শিলাইদহ 'কুঠির হাটের' সামনেই এমন কয়েকটি ভীষণ পাক (আবর্ত) ছিল যে, বড় বড় আড়াইতলা স্টীমারগুলো পর্যন্ত শিলাইদহের সামনে এসে ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে চলত। কত নৌকা যে সে পাকের কাছে এসে 'সামাল সামাল' বলে চেঁচিয়ে আত্মরক্ষার যথাসাধ্য চেষ্টা করেও রাক্ষসী পদ্মার গ্রাসে জীবন বিসর্জন দিয়েছে তার ঠিক নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই ভীমা-ভয়ঙ্করী পদ্মাকে বড় ভালবেসেছেন। কবিতা আর পদ্মা যেন তাঁর বহুকালের প্রেয়সী। পদ্মা কখনও মা কালীর মত আলুলায়িত কেশজাল আকাশে উড়িয়ে খল-খল হেসে তা-থৈ তা-থৈ নেচে রণচণ্ডিকার প্রলয় নাচন দেখিয়েছেন, কখনও নিস্তব্ধ

রাত্রে চাঁদের টিপ কপালে পরে তারার গয়নায় সর্বাঙ্গ ঝলমল করিয়ে কলস্বরে 'এই যে, এসো—এসো' বলে আদর করে কোলে বসিয়ে গান শুনিয়েছেন। তিনি তাঁর আদরিণী পদ্মার পরিচয় দিয়েছেন—

প্রতিবার এই পদ্মার উপর আসবার আগে ভয় হয়, আমার পদ্মা বোধ হয় পুরোনো হয়ে গেছে কিন্তু, যখনই বোট ভাসিয়ে দিই, চারি দিকে জল কুলকুল করে ওঠে—চারি দিকে একটা স্পন্দন কম্পন আলোক আকাশ মৃদুকলধ্বনি, একটা সুকোমল নীল বিস্তার, একটি সুনবীন শ্যামল রেখা, বর্ণ ও নৃত্য এবং সঙ্গীত ও সৌন্দর্যের একটি নিত্য-উৎসব উদ্ঘাটিত হয়ে যায়, তখন আবার নূতন করে আমার হৃদয় যেন অভিভূত হয়ে যায়।*

পাকা মাঝি ফুলচাঁদ ও রামগতি,—এরা পদ্মাকে খুব সমীহ করে চলত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পদ্মাকে বড় বেশি খাতির করতেন না; কারণ, পদ্মার কাছে অনেকবার নাস্তানাবুদ হয়ে তাঁর সাহস বেড়ে গেছে! তিনি হুকুম দিলেন—ঝড় কমে গেলেই বোট ছেড়ে দিতে হবে, যেমন করেই হক আজ সন্ধ্যার মধ্যেই শিলাইদহে পৌছুতে হবে।

কিছুক্ষণ পরে ঝড়ের মাতামাতি, মেঘের গর্জন, তার সাথে পদ্মার ভীষণ আছাড়ি-পিছাড়ি অনেকটা কমে এল। খুব প্রবলবেগে বেশ খানিক বৃষ্টি হয়ে গেল। কিন্তু চারদিক অন্ধকার। বেলা তখন আটটা-নয়টার বেশি নয়; কিন্তু আকাশের কোনায় কোনায় থম্‌থমে মেঘ যেন রাত্রির অন্ধকারে সুন্দরী পৃথিবীটার মুখে কালি মাখিয়ে রেখেছে। বৃষ্টি ছেড়ে গেলে রবিবাবু ফুলচাঁদকে বোট ছেড়ে পদ্মা পাড়ি দেবার জন্য হুকুম দিলেন।

বৃষ্টি ছেড়েছে বটে; কিন্তু আকাশের স্তরে স্তরে যে ঠাসা মেঘ জমে রয়েছে তাতে আবারও প্রবল বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা। ফুলচাঁদ একটুখানি আপত্তি জানাল, কিন্তু বাবুমশাই তার আপত্তি খণ্ডন করে বললেন, 'উত্তুরে বাতাস বইতে সুরু করেছে। অত ভয় করছ কেন, বৃষ্টি হক না, তাতে বোট ছাড়তে বাধা কি?'

ফুলচাঁদ আর আপত্তি না করে বোট ছেড়ে দিল। বৃষ্টির সঙ্গে বাতাসের বেগও কম ছিল না। পাহাড়ের মত বড় বড় পদ্মার ঢেউগুলো তখনও এক একটা মাতাল দৈত্যের মত অনবরত নদীর বুকের উপর গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে, আকাশের মেঘ মাঝে মাঝে চোখ রাঙিয়ে তাদের শাসাচ্ছে। সেই জমাট

* 'ছিন্নপত্র', ৯ ডিসেম্বর ১৮৯২ (শিলাইদহ)—পৃঃ ১৪৩

অন্ধকারের মধ্যে বোট চলল ধীরে ধীরে। অনুকূল বাতাস দেখে বোটের প্রকাণ্ড পাল তুলে দেওয়া হল পদ্মা পাড়ি দেওয়ার জন্যে। প্রকাণ্ড ঢেউগুলো যেন একটা ছোট্ট শিশুকে কাঁধে নিয়ে ছুটল পদ্মার বুক চিরে নক্ষত্র বেগে গম্ভীর গর্জনে আকাশ-বাতাস তোলপাড় করে।

এই সময়ে বৃষ্টিও কমে এল, কয়েকবার ভয়ানক গর্জন করে বিদ্যুৎ হেনে মেঘ উন্মাদিনী প্রকৃতিকে শাসন করে দিল। চারদিক অনেকটা হেসে উঠল, আকাশ চিরে কয়েক ঝলক আলো নেমে এল, তীরভূমির গাছপালা, ধানের ক্ষেত, ঘরবাড়ি দেখা যেতে লাগল। ঢেউয়ের মাথায় বোট ছুটেছে রেলগাড়ির মত—কালোয়া অভিমুখে। ফুলচাঁদ খুব হুঁসিয়ার হয়ে কসে হাল ধরে আছে। রবীন্দ্রনাথের দুর্জয় সাহস। তিনি পদ্মার ঐ অবস্থাতেও বোটের ছাদের উপর ইজি-চেয়ার পেতে বসে রইলেন—পদ্মার তাণ্ডব নৃত্য দেখতে লাগলেন। বালক রথীন্দ্রনাথও বসে রইলেন তাঁর কাছে, কিন্তু ভয়ে ভয়ে।

কালোয়া গ্রামের কাছাকাছি হতে রবীন্দ্রনাথ জলের ঢেউয়ের উপর কী যেন দেখে খুব উত্তেজিত হয়ে চীৎকার করে উঠলেন, 'ওরে তোরা ছাখ্‌রে, ছাখ্‌—কী যেন ভেসে যাচ্ছে, ওটা মানুষ না হয়ে যায় না।'

কত মড়া নদীতে ভেসে যায়, তাই ফুলচাঁদ কোন কথা না বলে চুপ করে হাল ধরে রইল। তপসিও সেদিকে বড় একটা লক্ষ্য করল না, কারণ তারা তখন নির্বিঘ্নে বোটখানা তীরে নেবার জন্য মনোযোগ দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ চেয়ারে বসে ছিলেন,—এবারে তিনি দাঁড়িয়ে আরও জোরে চীৎকার করে ঐ কথাই বললেন। তপসির ছেলে রামগতি তখন তরুণ যুবক। তাকে ডেকে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'ঐ ছাখ্‌তো, ঐ ঢেউয়ের উপর একটা মানুষের দেহ,—নিশ্চয় স্ত্রীলোক,—তার মাথার চুল ভাসছে। ওটাকে তুলতেই হবে।'

বুড়ো বাবুর্চি গফুর দেখে বলল, 'তাই তো, হুজুর, কিন্তু বোট যে ভাবে ছুটছে—জলের যে তোড়্‌—তাতে—'

রবীন্দ্রনাথ বাধা দিয়ে বলেন, 'কোন ভয় নেই তোদের, বোট ঠিক ভিড়ে যাবে কালোয়ায়। নৌকাডুবি হয়ে কোন স্ত্রীলোক ডুবেছে নিশ্চয়। ওকে যেমন করে হক, তুলতেই হবে—চেষ্টা করতেই হবে বাঁচাতে। তোর বাপ্‌কে ডাক।'

সেই প্রমত্ত পদ্মাবক্ষ থেকে সেই মৃত বা অর্ধমৃত স্ত্রীলোকটিকে ঐ সময়ে তুলে আনা একরকম অসম্ভব ব্যাপার। বোট তখন যে ভাবে ছুটেছে, তাতে বোট থামান বিপজ্জনক; বিশেষ, থানিক ভাটিতে গেলেই শিলাইদহের পাক

রয়েছে। কিন্তু তা হলে কি হয়, রবীন্দ্রনাথ তখন আরও উত্তেজিত হয়ে হাঁকলেন, 'ওরে তোরা কি শুনতে পাচ্ছিস্ নে আমার কথা? আমরা এতগুলো মানুষ নৌকোতে আরাম করে বসে একটা মানুষ মরতে দেখব? তোরা আয়, জালি-বোট নামিয়ে দে। তপসি, তুই জালি-বোট নিয়ে ধর ঐ স্ত্রীলোকটাকে।'

অসম্ভব ব্যাপার, মাঝিরা কেউ কথা কয় না। বোট যেভাবে তীরবেগে পালে চলেছে তাতে কোন বাধা পেলে বিপদ আসতে পারে, এ সময় জালি-বোট নামিয়ে ভয়ঙ্কর ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে মেয়েটিকে উদ্ধার করা—এ এক রকম অসম্ভব ব্যাপার!

রবীন্দ্রনাথ তখন আরও উত্তেজিত, কারণ জলের যে তোড় তাতে বেশি দেরি করলে মেয়েটা কোন্ ঢেউয়ের মধ্যে বহুদূরে চলে যাবে—হয়ত একেবারেই অদৃশ্য হয়ে যাবে। তিনি ভয়ানক চীৎকার সুরু করলেন, 'ওরে রামগতি ওরে তপসি,—বরকন্দাজরা, শীগ্‌গির আয়, জালি বোট নামা।'

তিনি বোটের ছাদের উপর ছুটোছুটি করতে লাগলেন; মাঝিরা কেউ এগোয় না দেখে জামা খুললেন, জুতো খুললেন,—জালি-বোট নামাবার জন্যে নিজেই দড়ি খুলতে আরম্ভ করলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার, 'ওরে রামগতি, ওরে তপসি,তারণ সিং,—শীগ্‌গির আয়,—দাঁড় ধর। দেরি করিস নে।'

স্তম্ভিত মাঝিরা তখন নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। তারা বাবুমশায়ের চীৎকার শুনেও শুনছে না, তাঁর ছুটোছুটি, উত্তেজনা দেখেও দেখছে না। তখন রবীন্দ্রনাথ প্রথমে রেগে খুব কড়াভাবে হুকুম দিলেন,—তবুও কেউ হুকুম শোনে না। নিরুপায় হয়ে তিনি তখন তাদের অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন, 'ওরে তোদের প্রত্যেককে পাঁচ টাকা করে বকশিস দেব,—মাইনে বাড়িয়ে দেব। তোরা এই মেয়েটাকে তোল—আর একটুও দেরি করিস নে। চোখের উপর একটা স্ত্রীলোক মরে যাবে,—তোদের কি দয়া-মায়া নেইরে।'

রবীন্দ্রনাথের ঐ রকম ভয়ানক উত্তেজনা, ছুটোছুটি দেখে, তারণ সিং আর রামগতি ছুটে এল। তপসিও এল। টাকার লোভে নয়, বাবুমশায়ের ঐ রকম ভাব দেখে তাদের মন নরম হয়েছে। ফুলচাঁদ একা বোটের হাল ধরে রইল। তপসি জালি-বোট খুলে রামগতি আর তারণ সিংকে নিয়ে পদ্মার ঢেউয়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বোটের ছাদে ছুটোছুটি করে বলতে লাগলেন, 'সাবাস্—হাঁ,—আরও এগিয়ে,—দেখো যেন হারিয়ে না যায়। যেমন করে হোক ধরা চাই,—এগোও—জোয়ান মর্দো।'

উত্তেজিত রবীন্দ্রনাথের ওরূপ অদ্ভুত মূর্তি কেউ কখনও দেখে নি। তিনি কখনও বোটের ছাদে,—কখনও পাটাতনে ছুটোছুটি করছেন আর তপসির দলকে উৎসাহিত করছেন,—চীৎকারে সবাইকে অস্থির করে তুলছেন। নদীর অবস্থা তখন অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে।

বহু কষ্টে প্রায় আধ ঘণ্টা পরে সেই ভাসমান নারীদেহ বোটের উপর আনা হল। তপসির দল একেবারে হিমসিম হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ একখানা কাপড় দিয়ে তৎক্ষণাৎ ঐ অচৈতন্য নারীদেহ মুড়ে দিয়ে বোটের কামরার ভিতরে নিয়ে গেলেন। মহা উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনার মধ্যেও খুব ধীরভাবে তার প্রাথমিক শুশ্রূষা করলেন নিজেই ক্ষিপ্রহস্তে। মেয়েটাকে বোটের মধ্যে এক ক্যাম্প-খাটে শোয়ান হল। সকলের পরিশ্রম সার্থক হল—মেয়েটা জীবিত। আস্তে আস্তে তার জ্ঞান হল—কোঁকাতে লাগল।

বোট ততক্ষণে শিলাইদহে বুনোপাড়ার ঘাটে পৌঁছে গেছে। রবীন্দ্রনাথ দুধ আনালেন। দুধ গরম করে ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে মেয়েটাকে খেতে দিলেন। বৌটা এতক্ষণে লজ্জায় জড়সড় হয়ে বোটের এক কোণে গিয়ে কাঁদতে লাগল। যম-রাজের বাড়ির অন্দরের মধ্যে ঢুকেও সে এই পৃথিবীর আলো-হাওয়ায় ফিরে এসেছে; কিন্তু সে ভয়ে ভাবনায় লজ্জায় জড়সড় হয়ে কেবল কাঁদতেই লাগল। কারও কথা সে শুনতে চায় না।

রবীন্দ্রনাথ তাকে আশ্বাস দিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। মেয়েটির পরিচয় পাওয়া তাঁর পক্ষে দুরূহ হয়ে পড়ল। সে লজ্জায় ভয়ে একেবারে কথা কওয়া বন্ধ করে দিল। বোটের কোন মাঝি বা বরকন্দাজই তার কোন সন্ধান দিতে পারলে না। সে কিছু খাবে না। দু-তিনবার গরম দুধ খেয়ে, জড়সড় হয়ে বসে কাঁদতে লাগল। রবীন্দ্রনাথ অনেক সাধ্য-সাধনা করেও তাকে আর কিছু খাওয়াতে পারলেন না,—তার পরিচয়ও জানতে পারলেন না। তখন তিনি সদর কাছারি থেকে ম্যানেজারবাবুকে ডেকে পাঠালেন। তখন বামাচরণ বসু শিলাইদহের ম্যানেজার। তিনি প্রবল প্রতাপশালী ম্যানেজার ছিলেন, সাধারণ লোকে তাঁকে খুব ভয় করত। ম্যানেজারবাবুর নাম করতেই বৌটি বাবুমশায়ের পায়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে তার পরিচয় দিল.—ভয়ে ভাবনায় সে প্রায় পাগলের মত হয়ে গেল।

মেয়েটি তেইশ-চব্বিশ বছরের, শিলাইদহ (কশবা) গ্রামের কোন অধি-বাসীর বৌ সে, জাতিতে কায়স্থ। সাংসারিক অশান্তি, পারিবারিক কলহ,

বিশেষত স্বামীর দুর্ব্যবহারে সে পদ্মায় ঝাঁপ দিয়েছিল। কিন্তু তুফানের মধ্যে পদ্মায় আত্মহত্যা করাটা এত কষ্টকর জানলে সে একাজ করত না। অনেকেই আত্মহত্যাটা এই রকম মুখের কথা মনে করে, পরে অনুশোচনা করে।

ম্যানেজারবাবু এলেন, অন্যান্য আমলারাও বোটে এলেন ভয়ানক উদ্বিগ্ন-ভাবে। শেষে অনেক দেখে শুনে বরকন্দাজ তারণ সিং স্ত্রীলোকটির সঠিক পরিচয় দিল। রবীন্দ্রনাথ তখনই তার স্বামীকে ডেকে পাঠালেন, বৌটিকে নানা রকম সদুপদেশ দিতে লাগলেন—তাকে আশ্বাস দিলেন।

স্ত্রীলোকটির স্বামী ভয়ে ভয়ে বোটে এসে হাজির হয়ে বাবুমশাইকে প্রণাম করল। তাকে রবিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ মেয়েটি তোমার কে?' সে বলল, 'আমার স্ত্রী।' 'তোমার লজ্জা করে না পরিচয় দিতে?' এই বলে তাকে খুব ধমকিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাকে অনেক সদুপদেশ দিলেন। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই রকম অসদ্ভাব প্রকাশ পেলে তাকে রীতিমত শাস্তি পেতে হবে—এই ভাবে তার কাছে থেকে 'মুচলেকা' লিখে নেওয়া হল।

লোকটি হাত জোড় করে বলল, 'হুজুর, আমার স্ত্রী জলে ডুবেছে, এ খবর গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে গেছে। যা হয়েছে, সেজন্য দোষ আমার বই আর কার? তবে এ নিয়ে আরও বাড়াবাড়ি হলে আমিও ডুবব। আমার মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না, সমাজে একঘরে হব। আমার ধোপা নাপিত সব বন্ধ হবে।'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'আমি তারও ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, কিন্তু তোমরা দুজনেই আমার কাছে এই সত্য করে যাও যে তোমরা এখন থেকে পরস্পরের উপর ভাল ব্যবহার করবে—স্বামী-স্ত্রীর সত্যকার সম্পর্ক বজায় রেখে চলবে। তা না হলেই কিন্তু তুমি ধর্মে ও সমাজে সত্যি সত্যি পতিত হবে।

রবিবাবু গ্রামের সমাজপতিকে বোটে ডেকে পাঠালেন; তাঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে দিলেন যাতে এই জলে ডোবা বৌকে নিয়ে সামাজিক বা অন্য কোন রকম অত্যাচার না হয় এবং এরা দুজনে পরস্পর সদভাবে বাস করতে পারে, এদের মান-সম্মানের যেন কোন হানি না হয়। এসব বলে তিনি একখানা পালকি বোটের কাছে আনতে হুকুম দিলেন।

জলে ডোবা বৌ পালকি চেপে গ্রাম্য রাস্তা সচকিত করে বহু মানে বাড়ি ফিরল। এ বিষয় নিয়ে গ্রামে কোন রকম আন্দোলন হল না।

চালাক লোকেরা বলল, 'ওদের বৌ "নায়র" করে ফিরল।'

দ্রঃ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পিতৃস্মৃতি'—পৃঃ ৪৬-৪৭

পদ্মা বোটের বিপদ

রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত জলনিবাস 'পদ্মা বোট' একবার তাঁকে বড় বিপদের মধ্যে ফেলেছিল। তাঁর 'পদ্মা', 'চিত্রা', 'আত্রাই' বোট যারা দেখেছেন, তাঁরা জানেন, কী সুন্দর আর বিরাট বজরা ছিল সেগুলো। তাঁর ঐ জলনিবাস কটি তাঁর কবিতার মতই সুরুচি, শান্তি আর কল্পনা দিয়ে তাঁর মনের মতন করে গড়া। তিনি লিখেছেন—

> এই বোটটি আমার পুরোনো ড্রেসিং-গাউনের মতো। এর মধ্যে প্রবেশ করলে খুব একটি ঢিলে অবসরের মধ্যে প্রবেশ করা যায়।—যেমন ইচ্ছা ভাবি, যেমন ইচ্ছা কল্পনা করি, যত খুশি পড়ি, যত খুশি লিখি, এবং যত খুশি নদীর দিকে চেয়ে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে আপন মনে এই আকাশপূর্ণ, আলোকপূর্ণ, আলস্যপূর্ণ দিনের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকি।*

রবীন্দ্রনাথের পল্লীভ্রমণের জলনিবাসখানা সেবারে একাদিক্রমে পাঁচ-ছয় দিন ধরে বাঁধা ছিল পদ্মার মধ্যে পাবনা বাজিতপুরের নিকটে একটা কাঁচি চরের কোলের মধ্যে। এদিকে পদ্মার জল ভয়ানক কমে আসছে। এই জল সরে যাওয়ার সময়ে ছোট্ট কোলগুলো যেন ভোজবাজির মত হঠাৎ দু-চার দিনের মধ্যেই এমন শুকিয়ে যায় যে, ঐ সময়ে বড় বড় বজরা বা নৌকা নদীর গভীর জলে সরিয়ে না নিলে তাদের অবস্থা হয়ে পড়ে বিপজ্জনক। অনড় অবস্থায় পদ্মার বালিতে বজরাগুলো ক্রমে শক্ত হয়ে এমনভাবে বালিতে আর মাটিতে আটকে পড়ে যে, অনেক সময় সে-সব বজরার খোল ভেঙে একেবারে অব্যবহার্য হয়ে পড়ে, অনেক আদরের—অনেক টাকার জিনিসটা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ বোটের মধ্যে কয়েকদিন ধরে লেখাপড়া নিয়ে একেবারে সমাধিস্থ হয়ে আছেন। তপসি মাঝি একদিন বোটের পাশে স্নান করতে নেমে টের পেল যে, সেই 'আওড়ের' মধ্যে জল এত কমে গিয়েছে যে, এই বিরাট বোটের আর এক হাত জায়গাও এগোবার সাধ্য নেই। সে তো মাথায় হাত

* ছিন্নপত্র (শিলাইদহ, ২০ মে, ১৮৯৩)—পৃঃ ১৬০

দিয়ে বসে পড়ল। অন্য মাঝিরাও এল—আওড়ের মধ্যে চারদিকে হেঁটে দেখল। সবার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল—এখন উপায় কি!

রাধাকান্তপুরের মেরজান সেখ সেইখানে গরু ঝাপাবার জন্যে এসে তাদের ঐ অবস্থায় মুখ কালি করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলে, 'মাঝি ভাই, হল কি তোমাদের? আওড়ে তো হাঁটুপানি। তারপর উপায়?'

তপসি বললে, 'মেরজান ভাই, বোট যে একেবারে আটকে রইল,—এখন একে বড় গাঙে নেওয়া তো বড় সহজ ব্যাপার নয়। এখন উপায়? আর তো একটি বেলাও দেরি করা চলে না।'

ফুলচাঁদ বললে, 'বাবুমশায়ের হুকুম। তাইতেই এই বিপদ এসে পড়ল। এখন দেখছি ম্যানেজারবাবু আমাদের সবগুলোকে বরখাস্ত করে দেবেন। এখন উপায় কি?'

সবাই মহা চিন্তায় পড়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথ বোটের মধ্যে থেকেই ওদের এই আলোচনা বেশ শুনতে পাচ্ছেন। সত্যিই তো এজন্যে তিনিই দায়ী, তিনিই তো মাঝিদের হুকুম দিয়ে এই-খানে বোট চার-পাচ দিনের জন্যে বাঁধিয়ে রেখেছেন তাদের আপত্তি সত্ত্বেও।

রবীন্দ্রনাথ বোট থেকে নামলেন, তাঁর চোখে-মুখেও দুশ্চিন্তা ফুটে উঠেছে। তিনি জলের অবস্থাটা দেখবার জন্যে নিজে জালিবোটে করে আওড়ের চারদিকে বেড়িয়ে দেখে এলেন,—লগি দিয়ে জল আর কাদার অবস্থাটাও দেখে এসে চিন্তায় পড়লেন। এখন উপায় কি! এই বিরাট বজরা এক দিনের মধ্যে বড় গাঙে নিয়ে যাওয়া—সে তো এক ভয়ানক ব্যাপার! বহু লোকলস্করের দরকার, তাতে দু-একদিন সময়ও লাগবে যোগাড়যন্ত্র করতে। এদিকে তাঁরও কাল-পরশুই কলিকাতা যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। বাবুমশাই ভাবনায় পড়লেন। ভেবে-চিন্তে ম্যানেজারবাবুকে চিঠি দিলেন বোটেরই এক বরকন্দাজের মারফতে, 'এই পত্রপাঠ পালকি পাঠাও আর বোট সরাবার বন্দোবস্ত কর যত শীঘ্র সম্ভব।'

এদিকে অছিমদ্দি সর্দার স্নান করতে এসে দেখে গেছে যে, বাবুমশাই জালিবোটে করে চিন্তিতভাবে আওড়ের জল দেখে বেড়াচ্ছেন। সে জেনেও গিয়েছে যে, শিলাইদহে পালকির জন্যে চিঠি যাচ্ছে। তার সঙ্গে মেরজান প্রামাণিকেরও দেখা হয়ে গেল রাস্তায়। দুইজনের খানিক পরামর্শ হল।

মেরজান কয়েকদিন বোটে রবীন্দ্রনাথকে করিম বয়াতির গান শুনিয়েছে, অনেক গল্প করেছে। সে বিকালবেলা বাবুমশায়ের কাছে হাজির হল তার

দলবল দিয়ে। চরের প্রায় একশ প্রজা তার সাথে।

এসময়ে পালকি চেপেও বাবুমশায়ের শিলাইদহে ফেরা একেবারেই অসম্ভব। পালকি যাবে কি করে? চারদিকে হাঁটুজল আর নিচে লুকিয়ে আছে দু-তিন হাত গভীর পাঁক, কোথাও বা চোরাবালি চিকচিক করছে রৌদ্রে। হাঁটা-পথে বা পালকি চেপে এখান থেকে কোথাও যাওয়া আদৌ সম্ভব নয়। সম্ভব হতে পারে এক গা কাদা-পাঁক মেখে হেঁটে গেলে।

মেরজানের দল গিয়ে প্রণাম করে বললে, 'হুজুর, পালকি চেপে যাবেন কি করে? রাস্তা কই? পালকি একেবারে অচল।'

রবীন্দ্রনাথ বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

তারা তখন বললে, 'হুজুর, বোটে এসেছেন আমাদের গাঁয়ে, বোটেই আপনাকে ফিরতে হবে। তা না হলে আমাদের সকলের অপমান—আমাদের গাঁয়ের অপমান, সমস্ত প্রজা-সাধারণের অপমান, চর-মহলের অপমান।'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'আমি একটা ছোট ডিঙ্গি নৌকো করে যাই।'

'ছি-ছি-ছি! হুজুর যাবেন ডিঙ্গি নৌকোয়, তা কি হয়?'

রবীন্দ্রনাথের দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে গেল। চর শুকিয়ে না গেলে পালকি চলবে না।

তারা তখন আনন্দধ্বনি করে বললে, 'হুজুর, বোটের মধ্যেই বসে থাকবেন। আমরা এতগুলো হুজুরের প্রজা—বোট বড় গাঙে নিয়ে যাব, টেনে হক, মাথায় করে হক,—যে করে হক। এ তো অতি সামান্য কাজ। আমরা চরের "পেরজারা" এখান থেকে দোতলা দালান মাথায় করে নিয়ে যেতে পারি না?'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'সে বড় কষ্টকর ব্যাপার। ম্যানেজারবাবু তার ব্যবস্থা করে দেবেন। আমি বরঞ্চ জালিবোটে বা একটা ডিঙ্গি নৌকো করে শিলাইদহ যাই, তোমাদের আর অত কষ্ট করতে হবে না।'

তারা বলল, 'এ সামান্য কাজটাও কি ম্যানেজারবাবু না করলে হবে না? আমরা কি কেউ না? চল অছিমদ্দি, আজ রাত্তিরের মধ্যেই বাবুমশাইকে নিয়ে এই বোট আমরা বড় পদ্মায় নিয়ে যাব। চল।'

আল্লা-আল্লা-হো ধ্বনি দিয়ে তারা চলে গেল। সন্ধ্যার আঁধার চরে নামতে নামতেই 'পদ্মা বোটের' কাছে হাজির হল প্রায় পাঁচশ চরের প্রজা—স্তূপীকৃত হল দড়াদড়ি, বাঁশ, আর ডিঙ্গি বোঝাই হয়ে হাজির হল রাশি রাশি কলাগাছ। শুকনো গাদাকরা খড়ে আগুন ধরিয়ে স্থানটা আলোকিত করে তারা বোটে

রশি বাঁধতে লাগল,—জায়গায় জায়গায় কাদার উপরে কলাগাছ, বাঁশ ইত্যাদি পেতে দিতে লাগল। সে এক হুলুস্থুল ব্যাপার!

রবীন্দ্রনাথ দেখেশুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সামান্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এ কী ব্যাপার আরম্ভ হল! আরও ভিড় বেড়ে গেল। চরের সব নমঃশূদ্র প্রজারা এল। সমস্ত চর-মহল ভেঙে পড়ল। একদল করছে হরিধ্বনি, আর একদল করছে আল্লা-আল্লা-হো।

চরের মেয়েরাও এল ব্যাপার দেখতে! সন্ধ্যার কিছু পরই সারা চরে চাঁদের আলো আনন্দের জোয়ার এনে দিল। উৎসাহ-উদ্দীপনায় ও ভক্তিতে প্রজারা বললে, 'হুজুর, বোটের মধ্যে গিয়ে বসুন।'

এই বলে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই একচোট প্রণাম করে নিল। প্রজাদের প্রণাম-পর্ব চলল অনেকক্ষণ ধরে। তারপরে পড়ল রশিতে টান।

প্রায় তিন মাইল রাস্তা বোট চলল হাঁটুজল আর কাদার উপর দিয়ে কল্‌কল্‌ শব্দে—যেন বেশি জলেই আরামে চলেছে। প্রজাদের প্রদীপ্ত উৎসাহ আর ভক্তি প্রায় দু ঘণ্টার মধ্যে অত বড় ভারি বোটখানাকে এনে ফেলল বড় পদ্মায়, বাবুমশাই বোটেই ছিলেন। জ্যোৎস্নালোকিত পদ্মাবক্ষে সেদিন সে এক বিরাট সমারোহ—পদ্মার কলধ্বনি আর প্রজাদের আনন্দোল্লাস!

আবার প্রজাদের প্রণামের পালা। এবারে তারা সবাই বাড়ি ফিরে যাবে —সবাই প্রণাম করবে। বাবুমশাই বোটের পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে চারদিকে চেয়ে দেখলেন।—কী সমারোহ সেদিন জ্যোৎস্নালোকিত পদ্মা-তীরে। কী অসীম উৎসাহ প্রজাদের, এ যেন ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের ব্যাপার।

রাত্রি প্রায় এগারোটায় 'পদ্মা বোট' বাবুমশাইকে নিয়ে শিলাইদহ—মুখে রওনা হল, আর ওদিকে চর প্রকম্পিত করে উঠল হরিধ্বনি আর আল্লা-আল্লা-হো।

গভীর রাত্রে

মধ্য-রাত্রি। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী, হাস্যময়ী। গ্রামখানা নিশুতি। শিলাইদহ কাছারির মালখানার পেটা ঘড়িতে বারোটা বেজে উঠল।

কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরই শোকার্ত রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ শিলাইদহে চলে আসেন ১৩১৪ সালে—শীতকালে।* নিদারুণ পুত্রশোকে অধীর না হয়ে মনকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখবার জন্যই বোধ হয় তিনি এসময়ে জমিদারির কাজে বেশি রকম মনোযোগ দেন। শিলাইদহ জমিদারির ভৈরবপাড়া মৌজার সীমানার গোলযোগ নিয়ে তখন নাটোররাজ ছোট তরফের সঙ্গে খুব মামলা-মোকদ্দমা চলছিল। সেই সব মামলামোকদ্দমার কাগজ নক্সা ইত্যাদি নিয়ে রবিবাবু, ম্যানেজার, আমিন, তহশীলদারদের সঙ্গে আলোচনা করছেন। কোন কোন দিন এই সব কাজ শেষ হতে রাত অনেক হয়ে যেত। পুরানো কাগজপত্র ঘেঁটে ঠাকুরবাবুদের অনুকূলে এই মোকদ্দমা-সংক্রান্ত অনেক তথ্য খুঁজে বার করা হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই সব কাজে একেবারে মগ্ন হয়ে থাকতেন, কাজকর্ম শেষ হলে গম্ভীরভাবে বসে থাকতেন।

সতীশচন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণা চৌধুরী, শরৎ সরকার, এঁরা সেদিন রাত নটা অবধি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাজ করে কাছারির মেসে এসে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়েছেন। তখন শিলাইদহ কাছারির মেস ছিল কাছারির পুবধারে দীঘির ঠিক পাশে। রাত্রি গভীর হল। কাছারির মালখানায় পাহারা মাঝে মাঝে হাঁকছে—ঠিক সময়ে পেটা ঘড়ি ঢং ঢং করে বেজে রাত্রির প্রহর ঘোষণা করছে, মাঝে মাঝে শেয়াল ডেকে সেই থমথমে রাত্রির ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিচ্ছে।

তখন রাত প্রায় একটা। হঠাৎ সতীশবাবুদের ঘুম ভেঙে গেল একটা অপ্রত্যাশিত সকরুণ আহ্বানে, 'সতীশ—সতীশ, ওঠো তো।'

সতীশবাবুর ঘুম ভেঙে গেল, তিনি কতকটা ভীত স্তম্ভিত ভাবে ঐ ডাক শুনে ভাবতে লাগলেন, 'এ কি সম্ভব? এত রাত্রে?—নাঃ এ শুনবার ভুল।'

তবু আহ্বানটা স্পষ্টভাবে শুনবার জন্য সতীশবাবু উৎকর্ণ হয়ে রইলেন, চুপি চুপি দক্ষিণাবাবুর গায়ে নাড়া দিলেন! তাঁরও ঘুম ভেঙে গেছে, তিনিও ঐ ডাক শুনেছেন; ভাবছেন, 'তাই তো—এ কী! এত রাত্রে! নাঃ এ স্বপ্ন না হয়ে যায় না।' তিনিও চুপ করে উৎকর্ণ হয়ে রইলেন।

আবার রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙে ঐ আহ্বান, 'সতীশ—সতীশ, একবার ওঠো তো।' অতি স্পষ্ট, অতি পরিচিত, আর অতি সকরুণ সেই আহ্বান!

সবাই জাগলেন। সতীশবাবুর মনে আর সন্দেহ নেই, তিনি দরজা খুলে

* দ্রঃ প্রভাতকুমারের রবীন্দ্র-জীবনকথা—পৃঃ ৯৫, এসময়ে কবি একাদিক্রমে পাঁচ মাস শিলাইদহে ছিলেন।

ছুটে বেরিয়ে এলেন। 'সতীশ—সতীশ, ওঠো তো একবার'—প্রাঙ্গণে নেমেই আবার ঐ সুপরিচিত আহ্বান। উচ্চারণ জড়িত, অস্বাভাবিক, সকরুণ। 'সতীশ—সতীশ, উঠবে একবার?' এ তো স্বপ্ন নয়—প্রত্যক্ষ! সতীশবাবু সেই দিনের মত জ্যোৎস্নায় যা দেখলেন, তাতে তাঁর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

ঐ গভীর জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, উদাসভাবে চাঁদের দিকে চেয়ে রয়েছেন।

সতীশবাবু বাবুমশাইকে প্রণাম করলেন! দক্ষিণাবাবুরা সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন—প্রণাম করলেন। কিন্তু তাঁরা এমনি অবাক হয়ে গেছেন যে, তাঁদের ক্ষমতা হল না বাবুমশাইকে কোন কথা জিজ্ঞেস করতে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সবাইকে দেখে, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'তোমরা সবাই উঠে পড়েছ?' এই বলে আবার আকাশের দিকে চাইলেন। জ্যোৎস্নালোকে তাঁর ধবধবে পোষাকে আবৃত দীর্ঘ দেহখানা যেন কাঁপছে। সত্যিই তাই। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'আমি একটু বসব এখানে। বড় ক্লান্ত।'

বসবার জন্য কী দেবেন বাবুমশাইকে! সতীশবাবু মেসের ঘরে আর কিছু না পেয়ে একখানা হাতলভাঙ্গা চেয়ার এনে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই চেয়ারে বসে আর একবার দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে আকাশে চাঁদের দিকে চেয়ে রইলেন। মুখে আর কোন কথা নেই।

সতীশবাবু এইবার বললেন, 'হুজুর, এমন কী কথা বলবেন যার জন্যে এই নিশুতি রাত্রে এতখানি পথ পায়ে হেঁটে এই মেসে আসবার দরকার হল?'

রবীন্দ্রনাথের মুখে কোন কথা নেই। তিনি ঐখানে বসে উদাসভাবে চাঁদের দিকে চেয়ে রয়েছেন। সতীশবাবুর কথাগুলো বোধ হয় শুনতেও পান নি। সতীশবাবুরাও তাঁর মূর্তি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন, বেশি কথা বলতে সাহসও পাচ্ছেন না। সবাই মনে মনে ভাবছেন, এ রকম হবার কারণ কি।

হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ আপন মনেই হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে মাথা নেড়ে বললেন, 'কী আশ্চর্য সতীশ, আমি তোমাদের যে কী কথা বলতে এলুম, তাই মনে করতে পারছি না। কথাগুলো সব ভুল হয়ে গেল? এ কী হল? আচ্ছা, আমি এখন উঠি,—তোমরা সবাই শোওগে।' এই বলে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠলেন; ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলেন।

'ত্যাখ তো আমার কী ভুল! এই নিশুতি রাত্রে মিছামিছি তোমাদের সবার ঘুম ভাঙ্গিয়ে কী কাণ্ড করলুম আমি।' এই বলে, তিনি ধীরে ধীরে

চলতে লাগলেন। আবার হেসে বললেন, 'তোমরা সবাই খেটেখুটে ঘুমিয়েছ, আর আমি কি কারণে তোমাদের ডেকে তুললুম? কী ভুল আমার!'

সতীশবাবুরা বাবুমশায়ের অনুসরণ করছেন, কাছারির গেট পেরিয়ে সবাই চলছেন। সতীশবাবু বললেন, 'হুজুর, চলুন আমরা বোট পর্যন্ত আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি। কাল সকালে কাগজপত্র নিয়ে বোটে যাব।'

তাঁরা প্রথমে ভাবলেন বোধ হয় ভৈরবপাড়ার মোকদ্দমার বিষয়ে কোন বিশেষ কথা হঠাৎ তাঁর মনে হয়েছে, তাই বলতে এসেছেন। কিন্তু এত রাত্রে, এ অবস্থায় তা তো অসম্ভব। এ রকম তো কখনও হয় না। কিন্তু শেষে তাঁরা বেশ বুঝতে পারলেন, এ শোকার্ত পিতার অন্তরের গোপন ভাবের আকস্মিক প্রকাশ মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ এবারে হো-হো করে হেসে বললেন, 'তোমরা সবাই যাবে আমার বোট পর্যন্ত? কেন মিছামিছি কষ্ট করবে? আমি একাই যেতে পারব। তোমরা শোওগে।' আবার অসংলগ্নভাবে নিজেই বলে উঠলেন, 'বুঝলে সতীশ, এ মামলায় আমরা জিতব, কিন্তু নাটোর ছাড়বে না—তারা শেষ পর্যন্ত লড়বে।'

সতীশবাবু কোন উত্তর খুঁজে পেলেন না। হঠাৎ আবার একথা কেন?

রবীন্দ্রনাথ যেন হঠাৎ বদলে গেলেন। হো-হো করে হেসে দক্ষিণাবাবুকে বললেন, 'তা হলে দক্ষিণা, চল, আমায় বোট পর্যন্ত এগিয়ে দেবে। তোমার তো রাত জাগা অভ্যাস আছে, তুমি রাত জেগে জেগে যে রকম যাত্রাগান গাও।'*

শোকার্ত রবীন্দ্রনাথের এই সরল আলাপে বিচলিত কর্মচারীরা মনের মধ্যে তীব্র আঘাত অনুভব করলেন। তবুও পরিস্থিতিটা বদলে নেবার জন্য দক্ষিণাবাবু বললেন, 'এবারে হুজুরকে আমাদের নূতন পালা শোনাব।'

কথায় কথায় তাঁরা বোটের কাছে পৌছলেন। দেখেন বোটের মাঝি-বরকন্দাজেরা উদ্বিগ্নভাবে দাঁড়িয়ে আছে, বোটের মধ্যে কোন আলো ছিল না, আকাশের তারা আলো জেলেছে।

রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই অনেক জ্যোৎস্নারাত্রে বোট ছেড়ে চরের উপর ঘুরে বেড়াতেন। পুত্রশোকাতুর রবীন্দ্রনাথ অন্তরের বেদনাকে কখনও বাইরে প্রকাশ করেন নি। কেউ তাঁকে শোককাতর বা বিচলিত হতে দেখেন নি।

* দক্ষিণারঞ্জন চৌধুরী—ইনি অনেক দিনের আমলা। এঁর যাত্রাগানের দল ছিল। এঁদের যাত্রাভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ খুব উৎসাহ দিতেন।

কিন্তু শিলাইদহের নিভৃত নিকেতনে তাঁর অন্তরের এই গোপন ব্যথা প্রকাশ পেয়ে ছিল সেই গভীর জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে।

রবীন্দ্রনাথ বোটে উঠলেন। কাছারির ঘড়িতে তখন রাত তিনটে বাজল—ঢং ঢং ঢং।

কদা কাঁঠালে

সেকালের শিলাইদহ। শিলাইদহের উত্তর-পূবে মৌলবির গলি ছাড়িয়ে পদ্মার যে বাঁওড়টা সোজা কল্যাণপুরের পাশ দিয়ে চলে গেছে, ঐ বাঁওড়ের বাঁকের ধারেই কদম সেখের বাড়ি। কদম সেখ বললে তাকে ঠিক পরিচিত করা যাবে না। তার বকেয়া নাম ছিল 'কদা কাঁঠালে'—অর্থাৎ উৎকৃষ্ট কাঁঠালের মালিক। তার অমন সুন্দর নাম 'কদম' বিকৃত হয়ে 'কদা'য় পরিণত হয়েছিল ও নামটি বিখ্যাত হয়েছিল।

কদমের বাড়িতে আম কাঁঠালের অনেকগুলো গাছ ছিল, কিন্তু তার বাড়ির কাঁঠালই ছিল দেশবিখ্যাত। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ থেকে শ্রাবণের প্রথম পর্যন্ত তার গাছে অসংখ্য উৎকৃষ্ট ও বিরাট আকারের কাঁঠাল ফলত; গোলা কাঁঠাল, খাজা কাঁঠাল সব রকমের সেরা কাঁঠাল। রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী দেবী তার কাঁঠাল খেয়ে তার কাঁঠালের খ্যাতি আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন সপরিবারে শিলাইদহে ছিলেন একেবারে জমিদারির সদর পুণ্যাহ পর্যন্ত। পুণ্যাহ শেষ করেই বোধ হয় সপরিবারে কলিকাতা চলে যান। ফটিক ফরাস ছিল তাঁদের নামকরা বাবুর্চি, তার বাড়িও শিলাইদহে। মৃণালিনী দেবী একদিন ফটিককে বেশ ভাল কাঁঠাল কিনে আনতে বললেন। তাই ফটিক সুবিখ্যাত কদা কাঁঠালের একটা বেশ দর্শনধারী কাঁঠাল এনে শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে হাজির করল। অমন সুন্দর কাঁঠাল খেয়ে তিনি খুবই খুশি হলেন, রবীন্দ্রনাথও সে কাঁঠাল খেয়ে একেবারে সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ হয়ে পড়লেন। হাজার মিষ্টি হলেও তিনি কাঁঠাল খুবই কম খেতেন, কিন্তু কদার কাঁঠাল খেয়ে এতই প্রীত ও পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন যে, দুপুরে খাওয়া শেষ হবার আগেই বলতেন, 'আজ কদা কাঁঠালে কৈ রে ফটিক?'

তার ফলে মৃণালিনী দেবী ফটিককে হুকুম দিলেন, 'আমরা যতদিন শিলাইদহ থাকব, প্রত্যহ একটা করে কদা কাঁঠালের কাঁঠাল কিনে আনবে। তাকে প্রত্যেক কাঁঠালের দাম চার আনা করে দিয়ে বিল করবে।' তাঁর ছেলেমেয়েরাও কদার কাঁঠালের ভক্ত হয়ে পড়লেন। তাঁরা কেউ কখন এই কাঁঠালের মালিককে চোখে দেখেন নি, কিন্তু 'কদা কাঁঠালে' কুঠিবাড়িতে জমিদার-পরিবারের মধ্যেও ঐ অদ্ভুত নামে সুপরিচিত হয়ে পড়ল। কদা কাঁঠালের কাঁঠাল আর গগন দামের আম সেকালের শিলাইদহে সুবিখ্যাত ছিল।

এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও গগন দামের একটু পরিচয় দেবার লোভ আমি সামলাতে পারছি নে। এই গগনচন্দ্র দামই কবি রবীন্দ্রনাথের অতি পরিচিত একজন মরমি পল্লীকবি 'গগন হরকরা'। অবশ্য তাঁর প্রসিদ্ধি ছেউড়ের লালন-সাঁই ফকিরের মত ছিল না। কিন্তু তাঁর রচিত 'আমার মনের মানুষ যে রে, আমি কোথায় পাবো তারে' গানটি রবিবাবুর অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং তিনি গগন হরকরার গান অনেকগুলো সংগ্রহ করে মাসিক পত্রিকাতে তাঁর রচিত উচ্চাঙ্গের বাউল গানের আলোচনা করেছিলেন। গগন হরকরা ছিলেন শিলাইদহ পোস্টাপিসের পিওন, অতি সামান্য বাংলা লেখাপড়া জানতেন, গাঁয়ে গাঁয়ে চিঠি বিলি করতেন, কিন্তু তাঁর বুকের মধ্যে পোরা ছিল রসের নির্ঝর, কণ্ঠে ছিল কোকিলের ঝংকার,আর তাঁর গানে ছিল অরূপরতনের জন্যে চিরমধুর বিরহ-ব্যথা। তিনি শিলাইদহে 'সখী সংবাদের' গানে এমন করুণ আখর লাগিয়ে গান গাইতেন যে, শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে সে গান শুনত। রবীন্দ্রনাথও তাঁর গান শুনতেন বিরলে, আদর করে কাছে বসিয়ে।

ফটিক ফরাস সেয়ানা খানসামা। বড়লোকদের বাড়িতে চাকর-বাকর যে নানা ভাবে দস্তুরি আদায়ের ফন্দি-ফিকির করে থাকে সে বিদ্যায় ফটিক ছিল ওস্তাদ। সব কাজেই লোকটা ছিল ঝানু। জমিদারবাবুদের সংসারের বাজার-সওদা সে-ই করত, আর খরচের বিল তৈরি করে মৃণালিনী দেবীর সই নিয়ে খাজাঞ্চিখানা থেকে বিলের টাকা বুঝে নিত। কিন্তু ভারি মজার কথা, কদা কাঁঠালে তার কাঁঠালের দাম নিত না,বাবুদের খাবার জন্য স্বেচ্ছায় দিত। কিন্তু ট্যাটনের ওস্তাদ ফটিক প্রত্যহ বিল করে চার চার আনা আদায় করে টাকা রোজগার করত। সেকালে একটা কাঁঠালের দাম চার আনা বড় কম ছিল না, সাধারণ কাঁঠাল তো কেউ দাম দিয়ে কিনতই না সুজলা সুফলা বাংলার পল্লীতে।

হঠাৎ ফটিক অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার জায়গায় একটা নূতন লোক অস্থায়ি-ভাবে বাবুর্চির কাজে লাগল। সে বেচারি ভাল মানুষ, ফটিকের মত ফন্দি-ফিকির কায়দা-কসুন জানত না। সে কদা কাঁঠালের বাড়িতে কাঁঠালের দাম দিতে গিয়েছে। 'সর্বনাশ। কাঁঠালের আবার দাম? আমি বাবুমশাইকে মাঠাকরুণকে কাঁঠাল খেতে দি, দাম নিই না; আমার বাড়ির গাছের ফল!' এই বলে কদম চটে মটে উঠল। নতুন বাবুর্চি দেখল, এ তো বড় মজা! এই চালাকিতে অনেকগুলো সিকি তো ফটিক উপার্জন করেছে। কেউ তো তার চালাকি এতদিনেও টের পায় নি। কিন্তু সে নূতন লোক, চাকরিও অস্থায়ী, সে যদি এই রকম চালাকি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়, তখন তো তার ভবিষ্যতের আশা একেবারেই নষ্ট হবে।

কদম পয়সা না নেওয়ায় নূতন বাবুর্চি তার বিলের মধ্যে কাঁঠালের দাম লেখায় না, কিন্তু কাঁঠাল নিয়মিত আনে। একদিন চার দিনের বিল নিয়ে সে ছোট মার সই নিতে গিয়েছে। তার বিল দেখেই তিনি বলে উঠলেন, 'কাঁঠালের দাম দাও না কেন, তোমার বিল লিখতে যে ভুল হয়েছে।' সে তখন আসল ব্যাপারটা সবিস্তারে ছোটমাকে বলে দিল। তিনি রেগে চীৎকার করে উঠলেন; তাঁর কথা রবিবাবুও শুনতে পেলেন। সে এক ভয়ানক অবস্থা! রবিবাবু রেগে বললেন, 'একটা গরিব প্রজাকে এই রকম করে ঠকানো হচ্ছে— এত দিন ধরে! কী ভয়ানক অন্যায়! এত বড় পাজি, জোচ্চোর, মিথ্যাবাদী ফটিক!' হুকুম হল, 'কাল সকালে কদা কাঁঠালেকে আমার কাছে ডেকে আনবে; আর ফটিককেও এখানে হাজির করা চাই।'

পরের দিন সকালে কদা হাজির। সে রবীন্দ্রনাথের কাছে সাক্ষাৎভাবে অপরিচিত। তার পরিচয় পেয়ে রবীন্দ্রনাথ হো-হো করে হেসে বললেন, 'তুমিই কদা কাঁঠালে? এতদিন ধরে তোমার কাঁঠাল খেয়ে তোমায় একবার দেখতে ইচ্ছা হল। বেশ! আমি জানতে পেরেছি তুমি এ পর্যন্ত একটা কাঁঠালেরও দাম পাও নি। এটা ভারি অন্যায় কাজ হয়ে গেছে।'

'কাঁঠালের দাম! আমি তো কাঁঠাল বেচি নি হুজুর, সেবার জন্যেই দিয়েছি, ওর দাম নেব না।' এই বলে সে ভীষণ প্রতিবাদ জানাল। সে তো একটা হেঁজিপেঁজি হ্যাংলা প্রজা নয় যে, মুনিবকে দুটো কাঁঠাল বেচে পয়সা নেবে! দশ গাঁয়ের লোক তাকে মানে, হুজুরের আশীর্বাদে তার কিছুর অভাব নেই, ইত্যাদি বলে সে ঘোরতর আপত্তি প্রকাশ করল।

রবিবাবু বললেন, 'সে হয় না কদা, দু একটা কাঁঠাল তুমি শখ করে ভালবেসে আমাদের খাওয়াতে পার ; কিন্তু এ্যাতগুলো কাঁঠাল,আর এমন মিষ্টি সেরা কাঁঠাল তোমার কাছ থেকে নিয়েছি, তার দাম তোমায় নিতেই হবে। না নিলে কিছুতেই হবে না, আমি তোমার উপর ভারি রাগ করব। তোমার কাঁঠাল আর কোন দিনই খাব না—জেনে রাখ। এর দাম আমি তোমাকে দেবই, আর সন্তুষ্ট মনেই তোমাকে তা নিতে হবে, এইআমার হুকুম।'

রবিবাবু আন্দাজে কত দাম দেবেন বোধ হয় তা ঠিক করেছেন, এমন সময়ে ফটিক কাঁপতে কাঁপতে এসে তাঁকে প্রণাম করল। তাকে দেখেই বাবু-মশাই তেলে-বেগুনে চটে বললেন, 'ফটিক, তুই এমন পাজি,—এমন মিথ্যাবাদী,—ছি-ছি-ছি! আমি কিছুই জানতে পাই না মনে করেছিস্ ?' একজন বরকন্দাজকে তক্ষুণি হুকুম দিলেন, 'তুই দৌড়ে গিয়ে খাজাঞ্চিবাবুর কাছ থেকে ফটিকের মাইনে থেকে দশ টাকা নিয়ে আয় তো। আমার নাম করিস ; যা—এক্ষুণি দৌড়ে যা।'

হুকুম তৎক্ষণাৎ তামিল হল। রবিবাবু ফটিককে বললেন, 'তুই থাকিস ডালে ডালে, আমি থাকি পাতায় পাতায়। তোকে আমি বিদায় করব। তার আগে তোকে আমি পাঁচ টাকা জরিমানা করলাম।' এই বলে খাজাঞ্চিবাবুকে একটা স্লিপে এই হুকুম লিখে দিয়ে ভীষণ বিরক্তি ও রাগে বললেন, 'যা—আমার সমুখ থেকে চলে যা।'

ফটিক সেয়ানা লোক, সে বিনা বাক্যব্যয়ে চলে গেল। তার অনেকগুলো বদঅভ্যাস ছিল। সেগুলোর সংশোধন হয়েছিল পরে, রবিবাবুরই শাসনে।* সেদিন বাবুমশাই তার উপর এমন চটেছিলেন যে, আর কোন মনিব হলে ফটিক নির্ঘাৎ মার খেত। রবীন্দ্রনাথ দুষ্টবুদ্ধি চাকর-বাকরদের শাসন করতেন অদ্ভুত উপায়ে। তাতে তাদের চরিত্র সংশোধন হত আশ্চর্য রকমে।

পরের দিন রবিবাবু বোটে বসে জমিদারির কাজ দেখছেন, এমন সময় দেখতে পেলেন কদা কাঁঠালে একখানা দরখাস্ত হাতে করে বোটের জানালার কাছে খুব চিন্তিত মনে ঘুরছে। 'এই যে—কদা কাঁঠালে যে' বলে তিনি তাকে বোটের মধ্যে ডাকলেন। সে দরখাস্তখানা বাবুমশায়ের হাতে দিয়ে বলল, 'হুজুরও আমার ঐ বিশ্রী নামটা ধরেই ডাকছেন! বাপজান আমার এমন সুন্দর নামটা রেখেছিলেন 'কদম', তার বদলে কিনা ঐ একটা যাচ্ছে তাই বিদ্‌ঘুটে

* এই গ্রন্থের 'পুরাতন ভৃত্য' দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২৬৭।

নাম দেশময় রটে গেল! হুজুর, আমি দশ টাকা নজর দিচ্ছি,—হুজুর এস্টেটের কাগজ-পত্রে আমার নাম 'কদম বিশ্বাস' চলিত করে দিতে আজ্ঞা হয়; আর যেন কেউ, কোন আমলাবাবু বা প্রজা আমায় ঐ বিশ্রী নাম ধরে না ডাকেন।'

বাবুমশাই হো-হো করে হেসে দরখাস্তটা পড়ে বললেন 'কিন্তু জানো কি,—এটা তোমার কাঁঠালের খ্যাতি আর আদরের ঘরোয়া ডাকনাম—নামটা মন্দ কি? আমার কাছে তো বেশ লাগে 'কদা কাঁঠালে'! যাই হক, যদি তোমার তাতে মনে কষ্ট হয়, তবে তোমার নাম কদম বিশ্বাস বলেই আমি হুকুম দিলাম। তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর।'

হুকুম হয়ে গেল। কদম সোল্লাসে বাড়ি গেল। যাবার সময় বাবুমশাই তাকে বলে দিলেন, 'দেখ কদম, বিশ্বাস পদবী পেয়ে বাবু বনে যেও না, নিজের চাষবাস ছেড় না কিন্তু। চাষির মর্যাদা রেখ।'

কদম তাঁর এ অনুরোধ আজীবন অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। অবস্থা খুব ভাল হওয়া সত্ত্বেও সে নিজের হাতে চাষবাস করত।

'কদম বিশ্বাস' নামের গুমোরে সে কিছুদিন খুব মশগুল হয়েছিল। একবার একজন দূর গ্রামের যুবক চাষি মজা দেখবার জন্যে কদমের বাড়িতেই এসে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাগো ভালমানুষটি, কদা কাঁঠালের বাড়ি কোন্‌টা?' আর যাবে কোথায়! কদম তাকে এমন সুমধুর অভ্যর্থনাই করল যে, সে বেচারি পালাবার পথ পায় না,—'মারকুট্টে মিন্‌সে, কদা কাঁঠালে তোর ইয়ারকির পাত্তর? ব্যাটা বলোদ কোথাকার! দাঁড়া তোকেই আমি হালে জুড়ব—ঘাস খাওয়াব।'

একদিন একজন তার বাড়িতে ছাগল কিনতে এসে ব্যাপর-স্যাপার বুঝে বলল, 'বিশ্বাস ছাহেব, সেলাম।' অমনি কদম তাকে পরম আদরে বসিয়ে নিজ হাতে তামাক সেজে খাইয়ে 'জনাব, কতদূর থেকে আসছেন? রোদ্দুরে ঘেমে গেছেন যে' বলে আপ্যায়িত করে পাখা নিয়ে নিজ হাতে তাকে হাওয়া করতে লাগল। সে খুব অল্প দামেই ছাগল কিনল—সে কথা বলাই বাহুল্য।

আমারই এক বন্ধু একদিন 'কদম চাচা' বলে তার সঙ্গে আলাপ করেছিল। কদম এতই খুশি হয়েছিল যে, একটা সুন্দর কাঁঠাল তাকে এমনিই খেতে দিয়েছিল আর বলেছিল, 'দেখুন বাবু, বাবুমশাই আমায় কত ভালবাসেন, জমিদারিতে এলেই কদম বিশ্বাসের সঙ্গে একবার তাঁর কথাবার্তা হবেই।'

চখা শিকার

আজ কিসের তরে নদীর চরে

চখা-চখির মেলা !

কাশের বনে, শূন্য নদীর তীরে সারা দিনমান চখা-চখিরা দল বেঁধে খেলা করত, নীল আকাশে উড়ে বেড়াত। এরাই ছিল রবীন্দ্রনাথের পদ্মা-তীরের নির্জনবাসের সঙ্গী। তিনি তাঁর বোটে বসে লিখছেন। ধব্‌ধবে পাখাগুলো মেলে চখা-চখিরা চরের উপর কলরব করছে, আউস ধানের ক্ষেতে 'ধানকাটা হল সারা।' শারদলক্ষ্মীর নিমন্ত্রণে তাদের ভোজ চলেছে। সারা দিনমান চলেছে আনন্দ-কলরব। দূরে কাশের বন মাথা নেড়ে বাতাসের সঙ্গে মিতালি করছে। রবীন্দ্রনাথ দেখছেন আর লিখছেন কবিতা।

পদ্মা বোট 'চরের সঙ্গে নোঙর করা' ছোট ঢেউগুলো দলবেঁধে দৌড়িয়ে এসে বোটের তলায় লুকোচুরি খেলতে শুরু করেছে, কলগুঞ্জনে মেতে উঠেছে। শরতের পর শীতকাল সবে পড়েছে। সারাদিন চরে সোনার রৌদ্র ঝিক্‌মিক্ করছে, আবার বহুদূর-বিস্তৃত বালির উপরে প্রকাণ্ড ধবধবে ফরাসের চাদর বিছিয়ে রেখেছে। কলাই নিড়াতে নিড়াতে চাষিরা মেঠো সুরে গান ধরেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখতে লিখতে খানিক বোটের বাইরে এসে চরের সেই শান্ত-শুভ্র ছবি দেখছেন। এমন সময়ে বহুদূর থেকে দুম্-দুম্ শব্দ তাঁর কানে গেল। তিনি একটু চমকে উঠে বরকন্দাজ তারণ সিংকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও শব্দটা কিসের রে? রাধাকান্তপুর গ্রামের পাড়ি ভাঙছে বুঝি?'

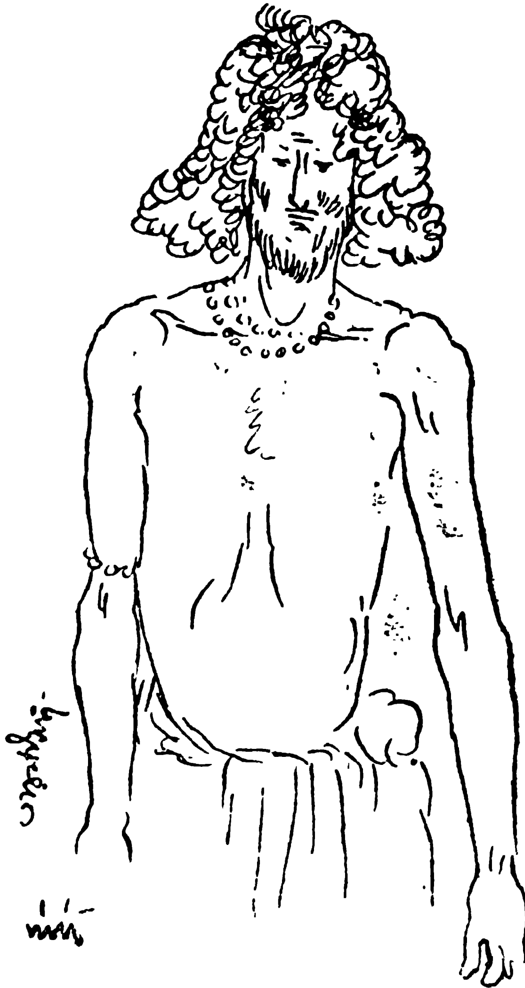
এ সময়ে পদ্মার জল কমার সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন চরের উঁচু পাড়ি ভাঙতে সুরু করে। তার দুম্-দুম্ শব্দ অনেকে দূর থেকে শোনা যায়।

তারণ সিং বললে, 'হুজুর, এ পাড়ি ভাঙার শব্দ নয়। আমাদের এলাকায় এবার ভাঙন ধরে নি। এ হচ্ছে বন্দুকের শব্দ—কেউ হয়ত বন্দুক দিয়ে চখা শিকার করছে।'

রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে বললেন, 'চখা শিকার করছে? আমাদের এলাকার মধ্যে?'

'না হুজুর, এ শব্দ হচ্ছে অনেক দূরে, বোধ হয় কালকেপুর চর ছাড়িয়েও অনেক দূরে।'—তারণ সিং বললে।

বাবুমশাই বললেন, 'এই সুন্দর নিরীহ চখাগুলোকে মেরে তারা শিকারের শখ মেটায়? দেখিস তো, আমাদের এলাকায় যেন কেউ চখা শিকার না করে।' এই বলে তিনি বোটের মধ্যে গেলেন।



তরণ সিং

সে বোধ হয় পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেকার কথা। তখন দারোগাবাবুরা ছিলেন পাড়াগাঁয়ের হাকিম। তাঁরা গ্রামে এলে গ্রামের লোকেরা ভয়ে ভক্তিতে জড়সড় হয়ে পড়ত। ক্ষুদে লাট সাহেবেরা চরে এসে বন্দুক দিয়ে চখা মেরে শিকারের সখ মেটাতেন। তা ছাড়া, ধোবড়াকোল কুঠির সাহেবরাও কখনও কখনও চরে পাখি শিকার করতে আসতেন।

পাবনাতে একজন দারোগা ছিলেন, তাঁর পাখি শিকারের ভীষণ শখ ছিল। তিনি প্রায়ই শিকারের পোষাক পরে বন্দুক আর লোকজন নিয়ে পদ্মাচরে শিকারে আসতেন ; চখা, বক, হরিয়াল, বেলেহাঁস এই সব শিকার করতেন। তাঁদের এই প্রমোদ লীলায় কেউ কখনও আপত্তি তো করতই না, বরং গ্রামের ছোট বড় সবাই সেকালের রাজ-রাজড়াদের মৃগয়ার মতই এগুলোকে হাকিমি ব্যসন বলে সমীহ করে চলত। সেইদিনই ম্যানেজারবাবু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে এলে রবিবাবু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাদের চরে অনেকে পাখি শিকার করে থাকে শুনছি,—এটা তো ভয়ানক অন্যায়। তোমরা এটা বন্ধ করে দিতে পার না ?'

ম্যানেজারবাবু যা জানতেন সবই বললেন। তিনি বললেন, 'হাকিমরা বা সাহেবরা এসে চরে শিকার করেন। সেজন্য আমরা কোন কড়াকড়ি করি না।'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'তারা এই সুন্দর নিরীহ পাখিগুলোকে মেরে শিকারের শখ মেটায় ? বাঘ-শুয়োর শিকার করতে পারে না ? না, এ কখনও হতে পারে না। তুমি কালই চরমহলের সমস্ত তহশীলদারকে জানিয়ে দাও, চরে কেউ পাখি শিকার করতে পারবে না। কেউ এই আদেশ অমান্য করলে তার কঠিন শাস্তি হবে, সব তহশীলদারকে এই হুকুম বেশ ভাল করে জানিয়ে দাও।'

ম্যানেজারবাবু 'যে আজ্ঞে' বলে তাঁর কাজকর্ম সেরে চলে গেলেন।

তার পরদিনের কথা। সন্ধ্যার একটু আগে, তখনও ঝিকমিকে বেলা রয়েছে। বোটের ধারে জল আর রৌদ্র একপাল কচি ছেলের মত খলখলিয়ে হেসে খেলা করছে। রবীন্দ্রনাথ একা বোটের ছাদে চুপ করে বসে আছেন। এমন সময় দুম্ দুম্ করে কয়েকটা বন্দুকের আওয়াজ হল। শব্দ যেন বেশি দূরের নয়।

কথা নেই, বার্তা নেই, রবীন্দ্রনাথ ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে ডাকতে লাগলেন, 'তারণ সিং, তারণ সিং !'

হেড বরকন্দাজ তারণ সিং বাবুমশায়ের এই রকম কড়া ডাক শুনে তখনই হাজির বন্দুক ঘাড়ে করে। সে বোটের কাছে পাহারায় ছিল।

'তারণ সিং, দেখো তো খুব কাছেই কে যেন বন্দুকের গুলিতে চখা শিকার করছে। সে যে-ই হক,—সে যে অবস্থায় থাক এখুনি আমার সামনে হাজির করে দাও। এখুনি যাও।' বাবুমশায়ের ভয়ানক কড়া হুকুম।

তারণ সিং চলল বন্দুক ঘাড়ে করে, বাবুমশায়ের হুকুম তামিল করতে। সোজা ব্যাপার নয়। সে জানে, আজ পাড়াগাঁয়ের ক্ষুদে লাট এসেছেন চরে চখা শিকার করতে; তিনি হচ্ছেন মহাপ্রতাপশালী পুলিশের কর্তা 'লাল পাগড়িধারীদের' মালিক—যাদের দেখে গাঁয়ের ছোট-বড় সবাই ভয়ে সন্ত্রস্ত। তবু তারণ সিং ঠাকুরবাবুর বরকন্দাজ। ক্ষুদে লাটই হক আর যেই হক, তাকে সে বাবুমশায়ের সামনে হাজির করবেই। তা সে বুদ্ধির জোরেই হক—আর লাঠির জোরেই হক—তারা সে সব আদবেই কেয়ার করত না।

বাবুমশাই রেগে আগুন হয়ে আছেন। বোটের ছাদ থেকে নেমে চরের উপর, আর একবার বোটের উপর উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন।

খানিক পরেই তারণ সিং ডিঙি নৌকায় করে এল, সঙ্গে খাকি কোট-প্যাণ্ট পরিহিত এক বাঙালি সাহেব, হাতে বন্দুক। চেহারাখানা দেখাচ্ছিল প্রায় খাঁটি সাহেবের মতই।

দারোগাবাবু বোটের সামনে এসেই রবীন্দ্রনাথের ঐ রকম উগ্রমূর্তি দেখে একেবারে ঘাবড়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের ঐ চেহারা, ঐ মর্মভেদী কঠোর চোখ দুটো দেখে দূর থেকেই সে বেচারা একেবারে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চরের উপর দিয়ে হেঁটে হাতদুটো জোড় করে আসতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথের সে সময়-কার চেহারা, বিশেষ তাঁর আকর্ণ-বিস্তৃত ভয়ানক বড় বড় চোখ দেখে সাধারণে ভয়ই পেত।

উগ্রমূর্তি রবীন্দ্রনাথ কিছু জিজ্ঞাসা না করতেই দারোগাবাবু হাত জোড় করে বিনীতভাবে বললেন, 'আজ্ঞে, আমি পাবনার বড় দারোগা।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

দারোগাবাবু হাত জোড় করে আবার প্রণাম করে বললেন, 'হুজুর, আমি বড় লজ্জিত হয়েছি। আমার ভয়ানক অন্যায় হয়েছে। আমি আর কখনও পাখি শিকার করব না। আমায় মার্জনা করুন।' বলে বারবার প্রণাম করতে লাগলেন।

রবীন্দ্রনাথের উগ্রমূর্তি নরম হয়ে এল।

বেশি রাগলে বাবুমশাই কথা বলতেন না। তিনি চট্ করে ঘুরে বোটের মধ্যে চলে গেলেন।

দারোগাবাবু বললেন, 'আমি আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করলাম, জীবনে আর কখনও পাখি শিকার করব না। আজ এই শুভ মুহূর্তে আমার যে শিক্ষা হল

তা আমি জীবনে কখনও ভুলব না।' এই বলে দারোগাবাবু দূর থেকে বাবুমশাইকে প্রণাম করলেন।

সেই দারোগাবাবু এখন কোথায় জানি না। সেই তারণ সিংও আজ আর ইহজগতে নাই। এই কাহিনীর প্রত্যক্ষদর্শী সদিরাজপুরের অছিমদ্দি সর্দার এখনও আছে। সে বলে, 'বাবুমশায়ের সেদিনকার রাগ আর সেই আগুনের মত চেহারাখানা এখনও আমার চোখের উপর ভাসছে।' এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন আর একজন—তিনি পূজনীয় শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু মহাশয়।*

* এই সময় (১৯১৬ ইং) শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু, মুকুল দে ও সুরেন্দ্রনাথ কর রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে কিছুদিন শিলাইদহে ছিলেন।

শিরোমণি মশাই

'—' চক্রবর্তী ছিলেন ছিলেন গ্রাম্য পুরোহিত—সহজ, সরল, হঠাৎ-রাগী, অল্পে-সন্তুষ্ট, গরিব মানুষটি। যজমানি-বৃত্তিতে তাঁর সংসার কোনমতে চলত।

কিন্তু আর চলে না। লাউ-কুমড়ো, শাকের ডাঁটা বাদে সবই কিনে খেতে হয়। একরত্তি জমিজমা নেই, শুধু যজমানবাড়ি ফুল-জল ফেলে কি আর সংসার চলে? চক্রবর্তীমশাই কিছু জমিজমা করবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। কিন্তু জমিজমা করতে হলে তো টাকা চাই! তাঁর টাকা কই?

তাঁর শুধু টাকারই অভাব নয়, জমিজমা করতে হলে যে বিষয়বুদ্ধির দরকার, তদ্বির-কৌশলের দরকার তারও অভাব। সে সব তিনি মোটেই জানতেন না,—জানতেন কেবল গ্রামে গ্রামে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ষষ্ঠীপুজো, লক্ষ্মীপুজো, মনসাপুজো, শ্রাদ্ধশান্তি ইত্যাদি করে যে যা দেয় তাই নিয়ে পোঁটলা বাঁধতে।

সংসারে ছেলেপিলের আবির্ভাব হল। সংসারের অভাব কিছুতেই মেটে না দেখে শেষে চক্রবর্তী ঠাকুরবাবুর ম্যানেজারবাবুকে খুব কাঁদাকাটি করে ধরলেন, তহশীলদারবাবু ও আমিনবাবুদের পেছনে পেছনে অনেকদিন ঘুরলেন; কিন্তু বিনা পয়সায় জমি পাওয়ার হদিস আর মিলল না,—ঘোরাঘুরিই সার হল। বহুদিন এখানে সেখানে আমলাবাবুদের খোশামোদি করে শেষে চক্রবর্তী হতাশ হয়ে পড়লেন। তাঁর মেজাজ গেল বিগড়ে, বাড়িতে ঝগড়াঝাঁটি শুরু হল। শেষে গ্রামের বুদ্ধিমানেরা তাঁকে পরামর্শ দিলেন, 'যদি খোদ বাবু-মশাইকে ধরতে পার তবে তোমার আশা পূর্ণ হতে পারে।'

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহের জমিদার। প্রজারা তাঁকে 'বাবুমশাই' বলত। চক্রবর্তী যেন আঁধারের মাঝে আলো দেখতে পেলেন; বাবুমশাইকে একবার ধরতেই হবে, কিন্তু সে তো বড় সোজা কথা নয়। পাইক-পেয়াদা, বরকন্দাজ, আমলা-ফয়লা ডিঙিয়ে বাবুমশায়ের কাছে হাজির হওয়া তাঁর সাধ্যে বুঝি কুলায় না।

তখন রবিবাবু শিলাইদহে পদ্মার উপরে বোটে থাকতেন। বোটের উপরেই

জমিদারির কাগজপত্র দেখতেন, প্রজার অভাব-অভিযোগ শুনতেন, বিচার-ব্যবস্থা করতেন। মাথায় লাল-পাগড়ি-বাঁধা চক্‌চকে তক্‌মাওয়ালা বরকন্দাজেরা চব্বিশ ঘণ্টা লাঠি হাতে তাঁর বোটের কাছে মোতায়েন থাকত। চক্রবর্তী বাবুমশায়ের বোটের কাছে কাছে ঘোরেন, হা-পিত্তেসে সব কাণ্ডকারখানা দেখেন, কিন্তু বাবুমশায়ের কাছে উপস্থিত হবার কোনই উপায় ঠাওরাতে পারেন না। চক্রবর্তী এইভাবে পাঁচ-ছ দিন নিরাশ-হৃদয়ে ঘুরে ঘুরে আবিষ্কার করলেন যে, বাবুমশাই যখন একা নির্জনে বসে লেখাপড়া করেন, সেই সময়ে যে কোনও উপায়ে তাঁর সামনে হাজির হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু তারও বাধা ঢের ; বরকন্দাজেরা প্রায় সময়েই বোটের চারদিকে হাজির থাকে, আর তারা চক্রবর্তীকে একেবারে পাগল ঠাওরিয়েছে। এখন উপায় কি ? চক্রবর্তী অনেক ভেবে ভেবে মরিয়া হয়ে এক মতলব পাকালেন।

দুপুর বেলা। ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ, বেলা আন্দাজ দুইটা। বাবুমশায়ের বোটখানা সে সময় তীরে বাঁধা ছিল না, পদ্মার প্রায় মাঝখানে নোঙর করা ছিল। চক্রবর্তী সেদিন মনের দুঃখে অনাহারে আছেন। বাবুমশাই নির্জনে বোটের মধ্যে লেখাপড়া করছেন। চারদিক জনহীন, নিস্তব্ধ। এমন সময় হঠাৎ বোটখানা ভয়ানক রকম দুলে উঠল। বাবুমশাই বোটের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখেন, কে যেন বজরার একপাশ ধরে ঝুলে পড়ে কাঁপছে। তিনি ব্যস্তসমস্ত হয়ে বজরার বাইরে এলেন, মাঝিদের ডেকে লোকটাকে ভিতরে আনালেন। তখনও লোকটা কাঁপছে।

বাবুমশাই অবাক হয়ে গেলেন। লোকটি যে প্রায়ই বোটের কাছে ঘোরে তা জানতেন। ভিজে কাপড় ছাড়িয়ে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'ব্যাপার কী ?'

চক্রবর্তী মনের দুঃখে অভিমানে একেবারে হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললেন। পরে আস্তে আস্তে তাঁর অভাব-অভিযোগের বিষয় সবিস্তারে বললেন। তাঁর যজমানি-বৃত্তির কাহিনীও সাড়ম্বরে বর্ণনা করে বললেন, 'হুজুর, ফুল-জল খুবই ছিটাই, মন্তরও পড়ি খুব, কিন্তু ট্যাঁকে পয়সা আসে না, আসে কিছু চাল, কলা, নাড়ু-বড়ি আর ভিখিরি-বিদায়ের মত দু-চার আনা মাত্র। টাকা কোথায় পাব যে জমি কিনব ?'

রহস্যপ্রিয় বাবুমশাই কৌতূহলী হয়ে গল্প জুড়লেন, 'তুমি লেখাপড়া তেমন জান না, সংস্কৃতও শেখ নি, তবে অত মন্ত্র পড় কেমন করে ?'

চক্রবর্তী সদর্পে বললেন, 'হুজুর, দেহে ব্রহ্মরক্ত রয়েছে, মন্ত্র পড়ায় কেউ

আমায় হারাতে পারে না। আমি নীলমাধব পণ্ডিতের কাছে সাকরেদি করে একেবারে দশকর্মান্বিত হয়েছি। এতদ্দেশের "হেলেরই" মহলে আমি বিশ্বামিত্র ঋষি, সে-সব পাড়ায় আর কোন পুরুতের কল্কে পাবার যো নেই।'

বাবুমশাই খুব একচোট হেসে নিলেন, বললেন, 'আচ্ছা বেশ, একটা মন্ত্র মুখস্থ বলে আমায় শোনাও দেখি।'

চক্রবর্তী আনন্দে আত্মহারা হয়ে কার বাড়িতে বিয়ের মন্ত্র পড়াবার সময় কোন্ পুরোহিতের তিনি ভুল ধরেছেন, নীলমাধব ভট্চাজ, ললিত পণ্ডিত কবে কি কারণে তাঁকে দশকর্মান্বিত বলে সুখ্যাতি করেছেন, এক রাত্রে তিনি কতগুলো গাঁয়ের কতগুলো লক্ষ্মীপুজো সারতে পারেন, সেই সব কাহিনী সাড়ম্বরে শোনাতে আরম্ভ করলেন।

এইবার মন্ত্র শোনাবার পালা। চক্রবর্তী কেশে গলা পরিষ্কার করে, পৈতে হাতে জড়িয়ে, সুরু করলেন, 'হুজুর, সব দেবতার আগে গণেশের পুজো। তিনি সিদ্ধিদাতা কিনা—তাই গণেশের ধ্যান বলছি।'

এই বলে চক্রবর্তী হাত দুখানা জোড় করে 'খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং' থেকে আরম্ভ করে সেই অত্যন্ত লম্বা সমাসবদ্ধ কথাগুলো একেবারে আস্ত রেখে মন্ত্র আওড়াতে সুরু করলেন। তাঁর বড় বড় চোখ দুটো আরও বড় আর লাল হয়ে উঠল, দাঁড়ি-কমা নেই, প্রায় এক নিশ্বাসে কয়েকবার টিকিশুদ্ধ মাথাটাকে সজোরে ঝাঁকি দিয়ে গণপতির দীর্ঘ ধ্যান আউড়ে একেবারে হাঁফিয়ে পড়লেন।

বাবুমশাই হেসে অস্থির হয়ে উঠলেন। হুহুঙ্কারে মন্ত্র আওড়ান শেষ হলে তিনি হেসে বললেন, 'তুমি এই মন্ত্রের মানে জান?'

চক্রবর্তী বললেন, 'আজ্ঞে, হুজুর, মুখ্যুসুখ্যু লোক, তাই বলে কি এটা জানি নে?' এই বলে লম্বা হাত দুটিতে নানান কসরৎ করে, 'লম্বোদর গজেন্দ্র-বদনং'-এর পেট এবং শুঁড়ের আকৃতিটা বুঝিয়ে, 'দন্তাঘাতবিদারিতারি' কথাটা আক্রমণোদ্যত বিঘ্নবিনাশের পরাক্রম অদ্ভুত অঙ্গ-ভঙ্গি সহকারে প্রকাশ করে দেখিয়ে দিলেন।

তাঁর মুখে ও শরীরে সিদ্ধিদাতার মাহাত্ম্য এমন কিম্ভূত ও বিকট হয়ে প্রকটিত হল যে, বাবুমশাই চক্রবর্তীর আস্ফালন এড়াবার জন্যে একটু পিছিয়ে বসে খুব হাসতে লাগলেন।

চক্রবর্তী রণজয়ী বীরের মত হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, 'এসব সাকরেদি করা বিদ্যে হুজুর, কোন তর্কালঙ্কারেরও এতে ভুল ধরবার সাধ্যি নেই।'

চক্রবর্তী ছাড়বার পাত্র নন, বাবুমশায়ের আমোদ দেখে আবার শিব-ঠাকুরের বলদবাহন-সমেত এমন স্তুতি জুড়ে দিলেন যে, শিবঠাকুরের আর তাঁর বাহনের সাধ্য ছিল না যে, সেই ক্ষুদ্র বোটের মধ্যে এগোয়। তার পরে দুর্গার স্তব। সেই কাঠের তৈরি ক্ষুদ্র বোটের মধ্যে যেন সত্যিকার শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই বেধে উঠল। চক্রবর্তী আত্মপ্রসাদের উৎসাহে মরিয়া হয়েছেন; চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখ দিয়ে থুথু পড়ছে, হাত-পা ছুঁড়ে, শিখা দুলিয়ে, মন্ত্রের অদ্ভুত এক-টানা বিকট আবৃত্তিতে সমস্ত দেবদেবীকে সেই অল্পপরিসর স্থানে বাহনাদিসহ হাজির করে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। পরে বুক চেপে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে কাশতে কাশতে একেবারে অস্থির হয়ে পড়লেন। হাঁপানি যদি বা থামল, কাশি আর থামতে চায় না।

রঙ্গপ্রিয় বাবুমশাই ব্যাপার দেখে একটু সরে বসেছিলেন। এইবার হাসি থামিয়ে কাছে এসে বললেন, 'বেশ, বেশ! তুমি যে-সে পণ্ডিত নও,—একেবারে শিরোমণি মশাই। তোমাকে আজ থেকে আমি, "শিরোমণি মশাই" উপাধি দিলাম; দেখো, মন্ত্রে যেন কেউ তোমাকে হারাতে না পারে।'

চক্রবর্তী স্বয়ং বাবুমশাইয়ের প্রদত্ত অতবড় উপাধি-ভূষণে ভূষিত হয়ে আনন্দে সকল দুঃখ ভুলে গেলেন। কাশির ধমক বহুকষ্টে থামিয়ে বিজয়গর্বে বাবুমশাইকে প্রণাম করে আনন্দে আটখানা হয়ে হাতজোড় করে চক্রবর্তী বললেন, 'হুজুর, পেটে খেলে পিঠে সয়। কি খেয়ে মন্ত্রতন্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করব? হুজুর পরম দয়াল। একটি পয়সা আমার সম্বল নেই। আমাকে পাঁচ বিঘে জমি বিনা নজরে না দিলে আমি না খেয়েই মরব।'

বাবুমশাই চক্রবর্তীর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন; শেষে চক্রবর্তীর খাওয়া হয় নি জেনে, একটা কাগজে ম্যানেজারের বরাবর নিজ হাতে হুকুম লিখে দিলেন। হুকুমটা খুব পরিষ্কার মনে নেই, তবে এই রকম—'শিরোমণি মহাশয়কে (চক্রবর্তীকে) পাঁচ বিঘা ভাল জমি বিনা নজরে দিবে। যাতে জমিটা এ বেচারি ভোগ করতে পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিবে।'

শিরোমণিমশাই সেদিনের মত চলে গেলেন। পরদিন প্রভাতে সেই হুকুমনামা ম্যানেজারবাবুকে দিতেই সকলে একেবারে অবাক।

'শিরোমণি মশাই' অত্যন্ত হাসিখুশি হয়ে তাঁর রাজদর্শনের কাহিনী ও গণেশের স্তব সবাইকে শুনিয়ে দিলেন। যে শোনে সে-ই হাসে। বাবুমশাই নিজ হাতে চক্রবর্তীকে 'শিরোমণি মশাই' বলে লিখেছেন দেখে, তাঁর রঙ্গ-

প্রিয়তায় সবাই অবাক হয়ে গেল। বিনা নজরে অল্প বার্ষিক খাজনায় পাঁচ বিঘে উৎকৃষ্ট জমি তিন দিনের মধ্যে চক্রবর্তীর প্রাপ্তি হয়ে গেল!

ছ-সাত মাস পরে একদিন বাবুমশাই বোট থেকে কাছারির দিকে আসছেন, সঙ্গে আমলা-প্রজায় মিলিয়ে বহু লোক। পথেই শিরোমণির সঙ্গে দেখা। এত লোকের সাক্ষাতে হেসে হেসে বাবুমশাই নিজেই আগে সম্ভাষণ করলেন, 'কেমন শিরোমণি, ভাল তো?'

শিরোমণি প্রণাম করে সঙ্গে সঙ্গে চললেন। বাবুমশাই হাসিমুখে শিরোমণির কুশলবার্তা নিলেন, আবার তাঁর বোটে গিয়ে নূতন নূতন স্তব শোনাবার জন্য বললেন। শিরোমণি প্রণাম করে বিদায় হলেন। অতগুলো লোক বাবুমশাই আর শিরোমণির এই সহৃদয় আলাপে মুগ্ধ হয়ে গেল।

দু-চার দিন পরে জানা গেল, শিরোমণি বাবুমশায়ের দ্বিতীয় হুকুমের বলে বাড়ি তৈরি করার জন্য দুশো টাকা দাতব্য পেয়েছেন। সবাই বুঝল, শিরোমণির প্রসাদে বাবুমশায়ের গণেশ, কার্তিক, দুর্গা, মা কালীর দর্শন লাভ আবারও ঘটেছে।

এরপর শিরোমণি মশাই নামেই চক্রবর্তী সুবিখ্যাত হয়ে গেলেন। শিরোমণি মশায়ের গণেশের ধ্যান আমরাও শুনেছি; সেকালের অনেকেই শুনেছেন।

শিরোমণির যজমানি-বৃত্তির পশারও হু-হু করে বেড়ে চলল। তিনি হেলেরই ও কুরিপাড়ায় প্রচার করলেন, 'আমি হচ্ছি বাবুমশায়ের দ্বার-পণ্ডিত। সোজা কথা নয়!'

বাবুমশাই শিলাইদহে এলেই শিরোমণি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। কেউ যদি বলত, 'শিরোমণি, কোথায় যাও?' শিরোমণি দ্বার-পণ্ডিতের পদগর্বে উত্তর দিতেন, 'জান না বাপু? রাজদর্শনে যাচ্ছি।'

মৌলবি সাহেব

শিলাইদহের জমিদারিতে যে বছরে জমিদারবাবুরা দ্বিতীয়বার খাজনা বৃদ্ধি করে জমাবন্দি করেন, সেবারে প্রথম প্রথম প্রজাদের মধ্যে খুব ব্যাপকভাবে অসন্তোষের আগুন জ্বলেছিল। সেই সময়ে এখানকার গ্রাম্য ইতিহাসে যে

কয়জন লোক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, তার মধ্যে এই অদ্ভুত মানুষটি ছিলেন ; তাঁর একটি চোখ ছিল কানা এবং সেই কারণেই বোধ হয় তাঁর বুদ্ধিটি ছিল খুব প্রখর।



মৌলবি সাহেব

শোনা যায়, তিনি নাকি স্থানীয় মুসলমান নন, তিনি ছিলেন পাঞ্জাবি ; আরবি ও পারসি সাহিত্যে সুপণ্ডিত, বড় বড় পারসিক কবিদের বাণী ও কবিতা প্রায়ই আওড়াতেন ; সাধারণত উর্দু বা হিন্দীতেই কথা কইতেন। তিনি খুব সুপুরুষ ছিলেন, আমির-ওমরাহদের মত দাড়িগোঁফ-সমেত তাঁর সুগৌর দেহকান্তি দেখে সকলেই মুগ্ধ হত। তাঁর চালচলনে বেশ বিলাসিতা ছিল ; মুসলমান সম্প্রদায় তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করত। তাঁর বাড়িখানি ছিল শিলাইদহে (খোরসেদপুরে, সেকেলে ডাকুণ্ডা), ঠিক পদ্মার ধারে।

মৌলবি সাহেব নিজের দর্শনধারী রূপ, আদব-কায়দা আর আরবি-পারসির পাণ্ডিত্যের জোরেই রবীন্দ্রনাথের খুব পরিচিত হয়ে পড়লেন। প্রায়ই নানা বিষয় নিয়ে তিনি রবিবাবুর কাছে আসতেন, খুব মিশতেন,—স্থানীয় উন্নতিকর নানা আলোচনায় যোগ দিতেন এবং সব বিষয়েই বেশ উদারতার পরিচয় দিতেন।

এই সব কারণ ছাড়াও তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে বেশি রকম অন্তরঙ্গ হলেন এস্টেটের একজন বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী রূপে নানাভাবে নিজেকে পরিচয় দিয়ে। তিনি রবীন্দ্রনাথকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি এবারের জমাবন্দি ব্যাপারে প্রজাদের ব্যাপক অসন্তোষ নিবারণে সর্বদাই সাহায্য করতে প্রস্তুত। একজন বিশিষ্ট প্রজা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে আপোষ করে জমিদারির

কাজে সাহায্য করতে চান,—এই ন্যায়সঙ্গত এবং শোভন প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে সমর্থন করেন। ফলে মৌলবি সাহেব প্রজাসাধারণের সঙ্গে খুব মিশবার সুযোগ পেলেন এবং এতে তাঁর নাম ও ক্ষমতা বেশ জাহির হয়ে গেল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁর অনেক প্রস্তাব ন্যায়সঙ্গত বলে অনুমোদন করতেন। এইসব কারণে আমলাবর্গ ও প্রজাসাধারণ ধারণা করেছিল, মৌলবি সাহেব রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়পাত্র, অতএব জমিদারির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি।

সেই সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার্থে শিলাইদহে এ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসাশালার সৃষ্টি হয় নি। তখন কাছারির পশ্চিমধারে একটি দাতব্য কবিরাজি চিকিৎসার প্রতিষ্ঠান ছিল। 'খোসাল কবিরাজ' নামে একজন বিচক্ষণ কবিরাজ ঐ চিকিৎসালয়ের কর্মকর্তা ছিলেন।

মৌলবি সাহেব নিজের পদমর্যাদায় পরিতৃপ্ত এবং সেই মর্যাদা জাহির করতে তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। তিনি একদিন অনেক রাত্রে তাঁর গৃহিণীর অসুখের জন্য খোসাল কবিরাজ মশায়কে বলে পাঠালেন শীঘ্র আসবার জন্য। কবিরাজ মশায় সেদিন নিজেই অসুস্থ, অত রাত্রে প্রায় একমাইল হেঁটে রোগী দেখতে যাওয়া তাঁর পক্ষে অসাধ্য। তাই চাকরের কাছে রোগের বিবরণ শুনে তিনি মৌলবি-গৃহিণীর জন্যে উপদেশসহ বটিকাদি পাঠিয়ে দিলেন। কবিরাজ স্বয়ং আসেন নি দেখে মৌলবি সাহেব রেগে আগুন হলেন, কিন্তু ঔষধ খেয়ে তাঁর গৃহিণী ভাল হয়ে গেলেন।

এই ব্যাপারে পদমর্যাদা-দৃপ্ত মৌলবি সাহেব কবিরাজ মশায়ের উপর বিষম কুপিত হলেন এবং তাঁকে জব্দ করতে কৃতসঙ্কল্প হলেন। তার পরদিন একটু বেলা হলে মৌলবি সাহেব স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের বোটে এসে উপস্থিত হলেন।

একথা-সেকথা আলোচনার পর মৌলবি সাহেব বাবুমশাইকে বোঝাতে লাগলেন, 'হুজুর, আপনার জমিদারির খরচ বড্ড বেশি। এত বেশি আমলা-ফয়লা রেখেছেন যে, কালে আমলাদের মাইনে, পার্বণী দিতে এস্টেটকে খুব বেগ পেতে হবে। আর কর্মচারী বাড়ান তো উচিতই হবে না, বরং একটু কার্পণ্য এখন থেকেই করা দরকার।'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'তা ঠিক, কিন্তু কাজগুলো তো ঠিকমত হওয়া চাই।'

মৌলবি সাহেব বললেন, 'সে তো দরকারই, কিন্তু দেখুন হুজুর, একটা উদাহরণ দিই। আপনি অত টাকা মাইনে দিয়ে এক কবিরাজ রেখেছেন।

তিনি মাইনে পাচ্ছেন, ওষুধের দাম পাচ্ছেন এস্টেট থেকে, তার উপর ফি পাচ্ছেন। অথচ তাঁর প্রত্যহ দুপুরে নাক ডাকিয়ে নিদ্রা দেওয়া চাই কেন? তিনি দুপুরবেলা যদি দু-তিন ঘণ্টা মহাফেজখানার কাজ করে দেন, তবে তো এই গা-পোষা আলিস্যিতে লোকটা জাহান্নমে যায় না। এই জমাবন্দির ব্যাপারে এস্টেটের পুরানো কাগজপত্র ঘাঁটা তো সোজা ব্যাপার নয়, বিশেষ হুজুরের মহাফেজখানা একটা মহাসাগর-বিশেষ, নিজে দেখেছি তো।'

রবীন্দ্রনাথ একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'তা আপনি কি করতে বলেন?'

মৌলবি সাহেব একটু হেসে বিজ্ঞ অথচ নিঃস্বার্থ হিতার্থীর মত বললেন, 'হুজুর এসব বিষয় আমার চেয়েও বেশি বোঝেন এবং জানেন। আমার কথা এই যে, আপনি হুকুম দিন কবিরাজমশাই বেলা একটা থেকে তিনটা পর্যন্ত মহাফেজখানার কাজ করবেন। তাতে কবিরাজের কাজের ক্ষতি তো হবেই না, বরং লোকটার উপকার করাই হবে, সরকার বাহাদুরেরও একটু কাজ হবে।'

রবীন্দ্রনাথ কথাটা শুনে হাসলেন, মনে মনে মৌলবি সাহেবের জমিদারির কার্যে অযথা হস্তক্ষেপের উৎসাহে ও স্পর্ধায় অসন্তুষ্ট হলেন; কিন্তু এমন একজন শিক্ষিত লোকের মুখের উপর ন্যায় ও স্পষ্ট অভিমত না জানিয়ে তাঁকে আর একটু বিশেষভাবে পরীক্ষা করবার জন্য বললেন, 'তা দেখা যাবে। আচ্ছা,— আপনি এখন তবে আসুন।'

মৌলবি সাহেব যাবার সময় একটু খুশি হয়ে বললেন, 'হুজুর, এটা আমার পক্ষপাতিত্ব নয়, একাজটা আজই করা উচিত। কবিরাজও তো অন্য আমলাদের মত বেতনভোগী কর্মচারী, তিনি শুয়ে-বসে মাইনে নেবেন কেন?'

রবীন্দ্রনাথ আবার একটু তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, 'আচ্ছা, সে দেখা যাবে।'

মৌলবি সাহেব হাসিখুশি মুখে বোট থেকে নেমেই সদর কাছারিতে ম্যানেজারবাবুর বৈঠকখানা ঘরে বসে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। ম্যানেজারবাবু এলে তাঁকে খুব গম্ভীরভাবে বললেন, 'বাবুমশাই আমাদের কবিরাজ মশাইয়ের উপর খুব বিরক্ত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, লোকটা আলসের গুরুমশাই, তাঁকে প্রত্যহ দুঘণ্টা করে মহাফেজখানার কাজ করতে হবে।'

ম্যানেজারবাবু খুব চিন্তিত হয়ে বললেন, 'হুকুম দিয়েছেন! কই? আমি তো সে হুকুম পাই নি!'

মৌলবি সাহেব বললেন, 'আজ-বিকালেই হুকুম পাবেন। তিনি নিজে এ

প্রস্তাব করে আমাকেও একটু জিজ্ঞাসা করলেন। আমি কি বলি বলুন, আমি তাঁর মতেই মত দিলাম।'

ম্যানেজারবাবু বহুদর্শী লোক। তিনি মৌলবি সাহেবকেও চিনে নিয়েছেন। তবু কী জানি, এত বড় ফারসির পণ্ডিতকে রবীন্দ্রনাথ একটু বিশেষ চক্ষে দেখেন বলে তিনি এই অদ্ভুত হুকুমের অর্থ বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে বসে রইলেন।

মৌলবি সাহেব চলে গেলে ম্যানেজারবাবু কবিরাজমশাইকে ডাকিয়ে তাঁর কোনও কার্যে মৌলবি সাহেব অসন্তুষ্ট হয়েছেন কিনা জানতে চাইলেন। কবিরাজ মশাই গত রাত্রের ঘটনা বলতেই ম্যানেজারবাবু এই সম্ভাবিত হুকুমের তাৎপর্যটা বুঝতে পারলেন। তিনি আহারান্তেই বাবুমশায়ের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টা জেনে আসবেন ঠিক করলেন। ঠিক সেই সময়ে বোটের বরকন্দাজ তাঁকে এসে খবর দিল যে, বাবুমশায়ের সঙ্গে তিনি যেন আজই বেলা চারটার সময় দেখা করেন। ম্যানেজারবাবু কিছু প্রকাশ না করে চিন্তিতভাবে বাসায় গেলেন।

এদিকে মৌলবি সাহেব বাড়ি ফিরবার সময় কাছারিতে নিজেই দু-একজন পদস্থ কর্মচারীকে গম্ভীরভাবে জানিয়ে গেলেন যে, কবিরাজ কাল থেকেই প্রত্যহ দুঘণ্টা করে মহাফেজখানায় চাকরি করবে, হুকুম হচ্ছে। সবাই শুনে অবাক। মৌলবি সাহেবের অসাধারণ প্রতিপত্তি দেখে আমলাবাবুরা একেবারে থ মেরে গেলেন।

বেলা চারটায় ম্যানেজারবাবু বাবুমশায়ের বোটে পৌঁছুলেই লোকচরিত্রাভিজ্ঞ বাবুমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কবিরাজ মশায়ের সঙ্গে মৌলবি সাহেবের কোনো মনোমালিন্য হয়েছে কি? কোন খবর রাখো?' বলেই তিনি স্থির জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন।

ম্যানেজারবাবু আদ্যোপান্ত সব ঘটনা বিবৃত করে বললেন, 'মৌলবি সাহেব এটা আপনার হুকুম বলে কাছারিতে রাষ্ট্র করে গেছেন।'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'আমি তার সঙ্গে একটু আলাপ করি বলে মৌলবির স্পর্ধার মাত্রাটা বেড়ে গেছে—সে আরও ভেবেছে যে আমি কাঁচা ছেলে, বুঝি কাব্য-কবিতা ছাড়া আর কিছু বুঝি না!

ম্যানেজারবাবু হাসতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লোকের বিচিত্র চরিত্র অধ্যয়নের কৌশল ও অভিজ্ঞতা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। আশ্চর্যের বিষয় যে, তিনি মৌলবি সাহেবের অযথা এবং অন্যায় স্পর্ধায় যে কতখানি

অসন্তুষ্ট তাও তাঁকে ঘুণাক্ষরে বুঝতে দেন নি, ভদ্রতার রীতি বজায় রেখে মৌলবি সাহেবের মনে একটু আঘাতও দেন নি। তিনি ম্যানেজারবাবুকে বলে দিলেন, 'লোকটার মনে কোন আঘাত দেবার মত কাজ কর না, তবে সে যেন জমিদারির কাজে অযথা হাত না দেয়, সেদিকে সাবধান থেক।'

এর পর মৌলবি সাহেব প্রায়ই এসে দেখতেন বোটের দরজা বন্ধ। তিনি পাঁচ-ছয় দিন পরে সাধারণ প্রজার মত বাবুমশায়ের দেখা পেতেন। তিনি বুঝে নিলেন—রবীন্দ্রনাথ তাঁকে চিনে ফেলেছেন।*

দুই বিঘা জমি

রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনারই ইতিহাস আছে। তিনি চিঠিপত্রে সাহিত্যসৃষ্টির সময় ও ঘটনার কিছু কিছু উল্লেখ করে গেছেন। তাঁর 'ছিন্নপত্রে' যে সব মানব-মানবী তাঁর সে যুগের দৈনন্দিন চিন্তাকে আশ্রয় করে থাকত বলে আমরা জানতে পাই, তারা তাঁর অনেক কবিতা ও গল্পে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর 'পোস্ট মাস্টার', 'বৈষ্ণবী', 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা'—এগুলো যে বাস্তব চিত্র সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই, তবে সে চরিত্রগুলো কবির হাতের রঙ পেয়ে আরও মধুর—আরও উজ্জ্বল হয়েছে। পল্লীর অতি সাধারণ অতি দরিদ্র সর্বহারার যে-সব ছবি তাঁর বহু কবিতায় ও গল্পে ফুটে উঠেছে তার অধিকাংশই তিনি তাঁর ব্যবহারিক জীবন থেকেই পেয়েছেন—নিপুণভাবে অনুসন্ধান করলেই তার বাস্তব ভিত্তির সন্ধান মেলে।

তাঁর 'দুই বিঘা জমি' অতি বিখ্যাত ও বহুপঠিত কবিতা। এর করুণ কাহিনীটির মাল-মশলা যে তিনি শিলাইদহ গ্রাম থেকেই পেয়ে হুবহু চিত্রিত করেছেন, ভাল রকম অনুসন্ধান করে তা আমি জেনেছি; সেই সত্য কাহিনী-টাই আজ বলব। কবির জীবিতকালে আমার এই রকম কয়েকটি ধারণার কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করবার খুবই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে সময় ও সুযোগ পাই নি।

শিলাইদহ যে তাঁর অতি প্রিয় স্থান ছিল, তাঁর 'সাহিত্যরস-সাধনার

* রবীন্দ্রনাথ তাঁর নানা চিঠিতে (দ্র. 'ছিন্নপত্রাবলী') এই মৌলবি সাহেবের কথা উল্লেখ করেছেন।

তীর্থস্থান' ছিল, তা অনেকেই জানেন। সেকালের শিলাইদহের অনেক দৃশ্য, অনেক চরিত্র নানা ভাবে তাঁর জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতে তাঁর সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে। তাই সেকালের শিলাইদহের অনেক মানব-মানবীকে তাঁর কবিতা ও গল্পের মধ্যে হুবহু দেখতে পাই।

রবীন্দ্র-চরিতকার প্রভাতবাবু 'বৈষ্ণবী' গল্পের রচনাস্থান সাজাদপুর বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বৈষ্ণবী যে শিলাইদহেরই কোন সেকেলে অধিবাসিনী তাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। আমরা দেখেছি সেই বৈষ্ণবী রবীন্দ্রনাথের নাম করলেই 'গৌর গৌর' বলে কপালে হাত তুলে প্রণাম করত। 'বৈষ্ণবী' গল্প 'সবুজপত্রে' প্রথম প্রকাশিত হবার পরেই শিলাইদহের 'সর্বখেপি' নাকি সে বিষয়ে কোথাও জানতে পেরে তাঁর কাছে এসে অনুযোগ করে বলেছিল, 'তুমি নাকি আমার কথা নিয়ে বই ছাপিয়েছ?'

'দুই বিঘা জমির' পটভূমিকা যে শিলাইদহ পল্লী, এর চরিত্র, ঘটনা সমস্তই যে এই গ্রামেরই কোন বাস্তব চিত্র, তার প্রধান প্রমাণই উদ্ধৃত পংক্তি দুটি—

রাখি হাটখোলা, নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে,
তৃষাতুর শেষে পঁহুছিনু এসে আমার বাড়ির কাছে।

এই হাটখোলা, নন্দীর গোলা আর মন্দির,—সেকালের শিলাইদহ গ্রামের রাস্তা দিয়ে হেঁটে গ্রামের মধ্যে দিয়ে আসতে হলে যে কোন পথিককেই এই কয়টি স্থান পর পর অতিক্রম করতে হত। হাটখোলা—শিলাইদহের কুঠিরহাট, যা আজ পাঁচ-ছয় বছর হল একেবারে পদ্মার উদরস্থ হয়ে গেছে,—এখন তার চিহ্নটিও নেই। নন্দীর গোলা—সেকালের শিলাইদহের বিখ্যাত লালনচন্দ্র নন্দীর গোলা, গ্রামমুখো রাস্তার একেবারে ধারে। তার পরেই মন্দির অর্থাৎ গোপীনাথ দেবের মন্দির। সেকালে গোপীনাথের দুটো মন্দিরই অনেক দূর থেকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত, কারণ তখন গোপীনাথবাড়ির সিংহদরজা তৈরি হয় নি, রাজা সীতারাম রায়ের আমলে তৈরি এই মন্দির দুটোই গ্রামের কেন্দ্রস্থলের নিশানা ছিল।

'দুই বিঘা জমি'র 'বাবু' আর 'উপেন' এই দুটি চরিত্র আলোচ্য। তিনি কোন কল্পিত বড়লোকের নাম দেন নি—'বাবু' আর 'রাজা' বলেই খাঁটি চরিত্র-টিকে এঁকেছেন, কারণ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত ধনীরাই গরিবদের কাছে 'বাবু' বা 'রাজা' নামে অভিহিত হয়, আর 'উপেন'ও সত্য মানুষটার ছদ্মনাম মাত্র।

এই কবিতার সত্য ঘটনা ও পটভূমিকায় শিলাইদহের প্রাচীন ইতিহাসের

যে ক্ষুদ্র অধ্যায়টুকু চিত্রিত হয়েছে, সেইটুকুই বলব—অবশ্য কবি সে ঘটনাকে প্রাণের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ করে সোনার রঙে এঁকে রেখে গেছেন।

শিলাইদহের সেকালের অধিকারী পরিবার সর্ববিষয়ে গ্রামে প্রাধান্য পেয়েছিলেন। অধিকারী-বাড়ি 'বড় বাড়ি' বলে আজও পরিচিত। সে সময় অধিকারী বংশে হরচন্দ্র ও গুরুচরণই ছিলেন বড় কর্তা আর মেজ কর্তা। তবে মেজ কর্তা গুরুচরণই ছিলেন অতি বৈষয়িক, বুদ্ধিমান ও অসাধারণ প্রতিপত্তিশালী। তিনিই অধিকারীদের সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতেন আর পারিবারিক সব বিষয়েই কর্তৃত্ব করতেন, গ্রামের নেতৃত্ব করতেন কাঞ্চনকৌলিন্য-প্রভাবে।

সেকালে অধিকারী-বাড়ি একালের মত অত বড় ছিল না। পরিবার বৃদ্ধি ও বাগান-বাগিচার জন্য তাঁরা আশে পাশের কয়েকজন গরিব গৃহস্থের বসত বাড়ি তাঁদের বাড়ির সামিল করে বাড়ির আয়তন বাড়িয়েছিলেন। তালুক ও বহু জোতজমা থেকেও তাঁরা প্রমাণ করেছিলেন—

এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি,
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

অধিকারী পরিবারের প্রবল প্রতাপান্বিত মেজ কর্তা গুরুচরণ তাঁদের ভদ্রাসন পাকাবাড়ি, চণ্ডীমণ্ডপ, বৈঠকখানা, ভিন্ন-ভিন্ন সরিকের অন্দরমহল, বাগ-বাগিচার জন্য যে দু-তিনজন গরিব দুবিঘার মালিককে উচ্ছেদ করলেন, তাদের অন্যতম ছিল যদু দত্ত। এই যদু দত্তই রবীন্দ্রনাথের কবিতার উপেন। জমিদারি সেরেস্তার অতি পুরানো জরিপি কাগজ চিঠা ইত্যাদিতে এখনও তাদের নাম পাওয়া যাবে। 'উপেন' এই ছদ্মনামধারী যদু দত্তই গুরুচরণের সর্বগ্রাসী প্রস্তাবে 'সজল চক্ষে, বক্ষে জুড়িয়া পাণি' বলেছিল—'চেয়ে দেখ মোর আছে বড় জোর মরিবার মত ঠাঁই।'

গুরুচরণ অধিকারীর দালানের পার্শ্বস্থ বাগানের ধারেই গরিব যদু দত্ত ছোট একখানা খড়ের কুটিরে সস্ত্রীক বাস করত। গুরুচরণের কাছে তার সামান্য কিছু দেনা ছিল, পল্লীগ্রামের গরিব গৃহস্থদের ধনী প্রতিবেশীর কাছে যেমন হয়ে থাকে।

গুরুচরণের প্রস্তাবে যদু দত্ত কিছুতেই কিছু টাকা নিয়ে অন্যত্র চলে যেতে রাজি না হয়েই 'সজল চক্ষে, করুন রক্ষে গরিবের ভিটেখানি' বলে বাবুর দয়া ভিক্ষা করেছিল। বৈষয়িক প্যাঁচে, দেনার দায়ে ফেলে গুরুচরণ 'করিল ডিক্রি, সকলি বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে।' তাই গরিব যদু দত্ত স্ত্রীর হাত ধরে 'সপ্ত-

পুরুষ যেথায় মানুষ' সেই 'সোনার বাড়া' দুবিঘা জমি থেকে বঞ্চিত হয়ে পথে বের হল। দরদি কবি তাই লিখলেন—

তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল, দু'বিঘার পরিবর্তে।

যদু দত্ত গৃহী হলেও জাতে বৈষ্ণবই ছিল। কারণ তার স্ত্রীর নাম ছিল সখী বৈষ্ণবী—যদুর কণ্ঠী-বদল-করা বৌ। যদু নাকি তার স্ত্রীকে আদর করে ডাকত—'সখী সুন্দরী'। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, যদু ও সখী দুজনে ঘরছাড়া সর্বহারা পথচারী হয়ে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগল। রবীন্দ্রনাথ তাই অপরূপ করুণায় লিখলেন—

সন্ন্যাসীবেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য।

পথচারী বৈষ্ণব যদু দত্ত বারো-তেরো বছর পরে নানা তীর্থে ঘুরে সাত পুরুষের ভিটা-মাটির মায়ায় ঘুরতে ঘুরতে তার বাড়ি এসেছিল সস্ত্রীক। এইখানে কবি তার গ্রাম-প্রবেশের রাস্তার বর্ণনায় প্রথমে 'কুমোরের বাড়ি দক্ষিণে ছাড়ি রথতলা করি বামে'—একটু রঙ ফলিয়ে লিখেছেন, কারণ বাস্তবে কুমোরের বাড়ি আর রথতলা দিয়ে যদুর বাড়ি আসা কাশী ঘুরে কুষ্টিয়া আসবার মত ব্যাপার। 'রাখি হাটখোলা নন্দীর গোলা মন্দির করি পাছে'ই যদুর পরিত্যক্ত বাড়িতে আসবার ঠিক রাস্তা।—

গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।

শিলাইদহ গঙ্গাতীরে নয়, পদ্মাতীরে। গঙ্গার ঝঙ্কার বেশি এবং গঙ্গা হিন্দুর তীর্থ, তাই বোধ হয় কবি পদ্মার তীরের পরিবর্তে গঙ্গাকেই স্থান দিয়েছেন, আবার পদ্মাও গঙ্গা।

পনেরো-ষোল বছর পরে বাড়ির মায়া ঘরমুখো বাঙালি যদুকে খুবই ব্যাকুল করেছিল—তাইতে আম কুড়োনো বা অনুরূপ অপরাধে সে মেজবাবু গুরুচরণের কাছে লাঞ্ছিত হয়েছিল, এটাও সত্য। এখনও ঐ স্থানটার নাম 'যদু দত্তের বাগান' বলে পরিচিত। এজন্য যদু তার বড় সাধের আমগাছের দু-একটা আম কুড়িয়েছিল তা-ই বেশ অনুমান করা যেতে পারে।

গুরুচরণ অধিকারীকে 'বাবু' এবং 'রাজা' বলা বেশ শোভনই হয়েছে, কারণ সেকেলে চলতি ফ্যাশানে তিনি বেশ একটু বিলাসী ছিলেন। সব সময়ে চটি জুতো পায়ে ধবধবে থান কাপড় পরে থাকতেন, দেখতেও সুপুরুষ ছিলেন। অধিকারী-বাড়ির কর্তা ও অর্থশালী বৈষয়িক লোক হিসাবে তাঁর যে অসীম প্রতাপ ছিল, তাতে যদু তাঁকে 'রাজা' বলতে দ্বিধাই করতে পারে

না। ধনী গুরুচরণ প্রায়ই তাঁর অনুগত এবং পাশাখেলার সঙ্গিগণ পরিবৃত হয়ে থাকতেন। তাঁর মাছ ধরার শখও ছিল—বাড়িরই নূতন পুকুরে।

গেরুয়াপরা সখী বৈষ্ণবীর সঙ্গে ঝোলা কাঁধে সন্ন্যাসিবেশেই যদু বারো-তেরো বছর পরে গ্রামে এসেছিল। গুরুচরণের কাছে লাঞ্ছিত হয়ে সে শেষে এই গ্রামেরই এক বাড়িতে থাকত আর গোপীনাথ দেবের প্রসাদ খেত। সাত পুরুষের ভিটা দুই বিঘা জমির মায়া তাকে সন্ন্যাসের পথ থেকে ফিরিয়ে এনেছিল। তার মত দরিদ্র বৈষ্ণব যে রবীন্দ্রনাথের দেখা পেয়েছিল এবং তার করুণ-কাহিনী তাঁকে শুনিয়েছিল এটা খুবই স্বাভাবিক। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ তরুণ জমিদার হলেও বাউল, বৈষ্ণব, গৃহহীন ফকিরদের ডেকে তাদের গান শুনতেন, তাদের জীবন-কাহিনী শুনবার জন্য তাঁর খুব আগ্রহও ছিল। ১৩০১-০২ সালের অনেক সময় তিনি শিলাইদহে বাস করতেন এবং 'কথা ও কাহিনী'র অনেক কবিতাই যে শিলাইদহে লেখা হয়েছিল, তারও বিশিষ্ট প্রমাণ মেলে।

গুরুচরণ অধিকারীও রবীন্দ্রনাথের অপরিচিত ছিলেন না, কারণ শিলাইদহের অধিকারী পরিবার রবীন্দ্রনাথের বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর শিলাইদহের কুঠিবাড়ি ভবন তৈরি হয়েছিল অধিকারীদের এবং আরও কয়েকজন গ্রামবাসীর জমি কিনে তারই উপর। অধিকারী বংশের অনেকেই ঠাকুরবাবুদের শিলাইদহ, সাজাদপুর ও কালীগ্রাম কাছারিতে চাকরি করেছেন, এই লেখকও প্রায় পনেরো বছরের উপর চাকরি করেছে। অধিকারীরা তাঁদের অনুগতও ছিলেন খুব, আবার ঠাকুরবাবুদের সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদিও করেছেন কম নয়। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে অধিকারীদের বৈশিষ্ট্য ছিল খুব বেশি রকম। তিনি অধিকারীদের গাছকাটা মোকদ্দমা আপিল হবার সময় আপোষে নিষ্পত্তি করে দিয়েছিলেন।

গাছকাটা মোকদ্দমা

সম্ভবত ১৩২২ সালের শীতকাল। তখন ঠাকুরবাবুদের জমিদারির কাজকর্ম দেখেন ম্যানেজিং এজেণ্ট স্বর্গত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়, যিনি বাংলা সাহিত্য

জগতের 'বীরবল'। রবীন্দ্রনাথের উপর জমিদারির কর্তৃত্ব না থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাঁর উপদেশ নেওয়া হত।

শিলাইদহের অধিকারী পরিবারের সঙ্গে ঠাকুরবাবুদের সম্পর্ক ছিল শুধু প্রজা-জমিদারের নয়, তার চেয়ে বেশি। অধিকারী পরিবারের কর্তা তারকনাথ অধিকারী ছিলেন ঠাকুরবাবুদের পাবনা আদালতের উকিল ও আমমোক্তার। কেদারনাথ অধিকারী ছিলেন ঠাকুরবাবুদের রাজসাহী আদালতের (কালীগ্রাম পরগণার জন্য) উকিল, আমমোক্তার ও এজেন্ট। নগেন্দ্রনাথ অধিকারীও কিছুদিন ঠাকুরবাবুদের পাবনা কোর্টের মোক্তারের কাজ করেছিলেন। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ বছর পূর্বে যখন শিলাইদহ (বিরাহিমপুর পরগণা) জমিদারির ব্যাপক নিরিখ বৃদ্ধির ভার রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করতে হয়েছিল, সে সময়ে প্রজাসাধারণ বিদ্রোহী হয়ে আন্দোলন শুরু করে। সম্ভ্রান্ত জোতদার হিসাবে অধিকারী পরিবার রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত ন্যায়-সঙ্গত নিরিখ বৃদ্ধি মেনে নেন এবং প্রজাদের ব্যাপক আন্দোলন প্রশমনে জমিদার-পক্ষকে সাহায্য করেন।

শিলাইদহ কুঠিবাড়ির ছয়-সাত বিঘা জমির মালিক ছিলেন অধিকারী-বাবুরা। কুঠিবাড়ি ঐ নির্বাচিত স্থানে তৈরি হবার সময় রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে তাঁরা ঐ জমি ছেড়ে দেন—দস্তাবেজ, দামদস্তুর কোন প্রসঙ্গই তোলেন নাই। এবং এই বিষয়ে দামদস্তুরের মীমাংসা হয় প্রায় বারো-তেরো বছর পরে। সেজন্য অধিকারীবাবুরা আদৌ ক্ষুন্ন হন নাই। অধিকারীবাবুদের পদ্মাতীরবর্তী তালুক কল্যাণপুর চরের অনেক জমি প্রবল-প্রতাপান্বিত ঠাকুরবাবুরা তাঁদের চর সদিরাজপুরের সামিল করে বে-দখল করে রেখেছিলেন। ক্ষতিপূরণসহ সে সমস্ত গোলমালেরও মীমাংসা হয়েছিল ঐ সময়ে।

রবীন্দ্রনাথ নিজে জমিদারি পরিচালনা করতেন, ম্যানেজারের রিপোর্টের উপর নির্ভর করে বসে থাকতেন না। তাই তিনি জমিদারি ও সেই সঙ্গে প্রজাদের নাড়ীনক্ষত্রের সন্ধান রাখতেন।

এত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও অধিকারী-পরিবার ঠাকুরবাবুদের সঙ্গে ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলা চালিয়েছিলেন দীর্ঘকাল। এই ব্যাপারটা বেশ একটু বিস্ময় ও সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। প্রথম বিরোধ উপস্থিত হল—শিলাইদহ কুঠিবাড়ি ও কাছারির মধ্যস্থ আমবাগানের স্বত্ব নিয়ে। এই প্রকাণ্ড বাগানের অংশ-বিশেষ কাছারি-প্রাঙ্গণের জমি বলে জমিদারপক্ষ দাবি করলেন, অপর পক্ষ সে দাবি অস্বীকার করে তিনটে আমগাছ কেটে ফেললেন। আরম্ভ হল

ফৌজদারি। ঠাকুর-জমিদার হেরে গিয়ে স্বত্বের মামলা করলেন কুষ্টিয়া কোর্টে। ক্রমে এই মামলার আপীল হল কৃষ্ণনগর জজকোর্টে এবং পরে হাইকোর্টে। এই মামলা নানাপ্রকার সমালোচনারও কারণ হয়েছিল।

হাইকোর্টে আপীল চলবার কালে ম্যানেজিং এজেন্ট প্রমথ চৌধুরী মশাই একদিন তারকবাবুকে আলোচনাচ্ছলে বলেছিলেন, 'তারকবাবু, আপনাদের সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমা করায় আমাদের মাথা হেঁট হয়েছে। এ মামলার কি মীমাংসা হয় না?'

অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হয় যে, এই মামলা মীমাংসার ভার দেওয়া হক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উপর। এই উদ্দেশ্যে দিন-ক্ষণ স্থির হয়ে গেল। যথাসময়ে শিলাইদহ চলে এলেন রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। শিলাইদহ কুঠিবাড়ির দোতলায় দরবার বসবে, অধিকারীবাবুরা, এস্টেটের ম্যানেজার ও পেশকার ছাড়া আর কেউ সে দরবারে থাকবে না ঠিক হল।

অধিকারী বাড়ির তিন কর্তা সেজেগুজে দরবারে গেলেন। তারকনাথ ধবধবে পাঞ্জাবি আর উড়ানি চাপিয়ে তাঁর বিরাট দেহ নিয়ে প্রবেশ করলেন দরবার-কক্ষে। হলঘরের মেঝেতে জাজিম পাতা। একধারে একখানা বড় সোফায় রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, প্রমথনাথ বসে, সামনেই তিনখানা সোফা। তারকবাবু প্রবেশ করেই দুখানা গিনি নজরানা দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করে বসলেন মেঝের জাজিমের উপর হাঁটু গেড়ে, হাত জোড় করে, যেমন করে দেবতার সামনে ভক্ত বসেন।

রবীন্দ্রনাথ চীৎকার করে উঠলেন, 'সে কী তারক! তুমি ওখানে বসলে কেন? ছি, ছি! ঐ সোফায় বসো।'

তারকবাবু বললেন, 'প্রজা আজ রাজার কাছে বিচারপ্রার্থী। রাজদরবারে প্রজার উপযুক্ত স্থানেই আমি বসেছি হুজুর।'

রবীন্দ্রনাথ হো হো করে হেসে উঠলেন। তিনি তারকবাবুকে খুব ভাল-ভাবে চেনেন ও জানেন। দাঁড়িয়ে তারকবাবুকে হাত ধরে উঠিয়ে বললেন, 'না তারক, আজ তুমি প্রজা হয়ে রাজার কাছে বিচারপ্রার্থী নও। তুমি আজ বাদী আমরা বিবাদী—আমাদের সম্পর্ক রাজা-প্রজার নয়—বাদী-বিবাদীর, তোমরা আর আমরা আজ বিধাতার কাঠগড়ায় বিচারপ্রার্থী। এটা এজলাস নয়। তোমাকে ওকালতির সওয়াল করতে হবে না। এখানে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট নেই—আমরা উভয়পক্ষ যুদ্ধে নেমেছি। সন্ধি স্থাপনা হক।'

তারকবাবু বললেন, 'আদেশ করুন হুজুর!'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'আমি মীমাংসা চাই। তুমি নিজে পাকা উকিল, আমাদেরও উকিল। তুমিই মীমাংসা করে দাও। আমি আজ আদেশ দিতে আসি নি। মীমাংসা করতে এসেছি।'

তারকবাবু বললেন, 'হুজুর যা আদেশ করবেন তাই অবনত মস্তকে মেনে নেব। মামলা তুলে নেব। মীমাংসা দুটি মাত্র কথায় হবে।'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'ন্যায্য অধিকার পাবার জন্য তুমি লড়েছ, এতে আমি আনন্দিত হয়েছি, তারক। পাণ্ডবরা ন্যায্য অধিকারের জন্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আত্মীয় সংহার করেছিলেন। তুমি আমার উকিল। আমি বলছি—তোমার পরামর্শ মতই মীমাংসা হবে।'

তারকবাবু বললেন, 'মশা মারতে কামান দাগা হয়েছিল। হুজুর একে আমার রাজা—তার উপর অন্নদাতা। সম্পর্কটা গুরুতর। বেশ, দু কথায় মীমাংসা করে দিচ্ছি। ঐ আমবাগান আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি। ওটা আমাদের থাকবে, তবে দক্ষিণ সীমানার দেড় বিঘে জমি ঠাকুরবাবুর কাছারির সীমানা হিসেবে ছেড়ে দিচ্ছি। মামলার খরচা? আপনাদের কর্তৃপক্ষ ঐ খরচাটা করাতে এই গরিব প্রজাদের বাধ্য করেছেন। খরচার টাকাটা ন্যায়ত ও ধর্মত আমাদের পাওয়া উচিত।'

এক ধারে চেয়ারে উপবিষ্ট ম্যানেজার ও পেশকারের দিকে একবার চেয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'মামলার খরচা তারকবাবুকে দিতে হবে। মামলার নথি-পত্র আমি একটু পড়েছি। আমি আইন মানি না, মানি মনুষ্যত্ব। প্রমথ, গোলাগুলির রসদ বন্ধ কর, মামলা-মোকদ্দমার প্রশ্রয় দিও না।'

মীমাংসা হয়ে গেল। উঠবার সময় রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'তারক, কাল সকালে বোটে আমার সঙ্গে দেখা কর। তোমার গল্প শুনব।'

তাঁর আমলে ঠাকুর-এস্টেটের উপর প্রজাদের অটুট বিশ্বাস ছিল। স্বার্থপর কর্মচারীদের তহবিল তছরুপের অপরাধ প্রায়ই দেখা যেত। তদন্তে অপরাধ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর শাস্তিবিধানের জন্য কাগজে-কলমে কঠোর ব্যবস্থা হত, সময় দেওয়া হত, কিস্তিবন্দি করে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা হত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে টাকা আদায় প্রায়ই হত না,—অন্য কোন শাস্তি না দিয়ে শেষে অপরাধীকে ছাড়িয়ে দেওয়া হত। এস্টেট লোকসান সহ্য করত। এ বিষয় তাঁকে জানালে তিনি বলতেন, 'কর্মীদের অভাব মেটাবার মত মাইনে

না দিলে তার ফল অনিবার্য। তাদের উপযুক্ত মাইনে দাও। তা নইলে পাঁচ টাকা মাইনের গোমস্তা বাড়িতে দোলদুর্গোৎসব করবে।' শেষে হাসতে হাসতে বললেন, 'তবু অপরাধের বিচার চাই তো? তা করি বৈকি! ফোঁস ফোঁস করি ভয়ঙ্কর, কিন্তু কামড়াই না।'

রবীন্দ্রনাথ ফৌজদারি মোকদ্দমা ঘৃণা করতেন। আমার মনে আছে, একবার এক ফৌজদারি মোকদ্দমায় খুন তদন্তের জন্য পুলিস অফিসারেরা শিলাইদহ কাছারির মালখানা (Strongroom), এমন কি গোপীনাথঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে খানাতল্লাশি করেছিল, কারণ কাছারির বন্দুক তলোয়ার সব লুকিয়ে ফেলা হয়েছিল। গ্রামবাসীরা এসে অনুযোগ করেছিলেন। ঐ ফৌজদারি ব্যাপারও রবীন্দ্রনাথের কর্ণগোচর হয়। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের উপর কঠোর বদবদলের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি দেওয়ানি মোকদ্দমা অনুমোদন করতেন এবং নিজেও মামলার নথিপত্র উৎসাহের সঙ্গে দেখতেন, কিন্তু কোন ফৌজদারি মামলার কথা শুনলে আগুন হয়ে উঠতেন। বলতেন, 'ফৌজদারি মামলা, দাঙ্গা, খুন ইত্যাদি নিচ পাশবিক চরিত্রের পরিচায়ক।'

লালচাঁদ মিঞা

বাংলা ১৩০০ সালে রবীন্দ্রনাথ বহুদিন জমিদারিতে বাস করেছেন। সে সময়ে তাঁদের পৈতৃক জামিদারি ছাড়াও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সাজাদপুর (পাবনা) জমিদারি দেখাশোনার ভারও তাঁর উপরে ছিল। তাঁর যৌবনের ইতিহাসের অনেকখানি এই প্রাচীন সাজাদপুরের গায়ে মাখান আছে এবং এই গ্রামই বর্তমানে পাবনা জেলার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পল্লী। ১৩০৩ সালে গগনবাবুরা সাবালক হয়ে সাজাদপুর জমিদারির ভার গ্রহণ করেন।

এই সময়টা তিনি একাদিক্রমে কয়েক বৎসর শিলাইদহ, সাজাদপুর ও কালীগ্রামে প্রজাদের সান্নিধ্যে বজরায় বাস করায় প্রজাদের অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। শিলাইদহে যে সময়টা থাকতেন সে সময়টা প্রত্যহ তাঁর বোটে প্রজাদের আনাগোনা চলত প্রায় দু বেলাই। প্রজাদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে

মিশেছেন এমন জমিদারের খবর আমি জানি না।* ভাবলে অবাক হতে হয়। যৌবনে কবি, কর্মী ও বৈষয়িকরূপে তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখেছেন এমন লোক আজ কমই জীবিত আছেন।

সাজাদপুর কাছারির কাছেই একজন মুসলমান প্রজা ছিল, নাম তার লালচাঁদ মিঞা। 'রবীন্দ্র-জীবনী'তে শ্রদ্ধেয় প্রভাতবাবু এর কিছু পরিচয় দিয়েছেন। আমি আর একটু অনুসন্ধান নিয়ে আসল কাহিনীটা লিখছি। লোকটি বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু গায়ে বেশ শক্তি ছিল। বৈষয়িক ব্যাপারে ক্ষুরধার বুদ্ধি থাকায় এবং যথেষ্ট জমিজমার মালিক হওয়ায় সে মামলা-মোকদ্দমা খুব ভাল বুঝত। লেখাপড়া জানত না সে। গ্রামে তার অনুগত জনের অভাব ছিল না এবং তারা তাকে বলত—'লালচাঁদ বালেস্টার'। দেওয়ানি হক ফৌজদারি হক কোন্ মামলায় কি রকম তদ্বির করতে হবে, কেমন করে কোন্ কৌশলে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে সে-সব বিষয়ে সে ছিল ঝানু। শুধু তাই নয়, আইন-আদালতে না কুলোলে সে লাঠির আইন চালাবার কৌশল জানত এবং 'যেন তেন প্রকারেণ' কাজ হাসিল করে ছাড়ত। লোকটার পয়সা ছিল বেশ, তাই মামলা-মোকদ্দমা, জোর-জবরদস্তি কোন কাজেই সে পেছপাও হত না; কিন্তু দুর্দান্ত মামলাবাজ চাষি হলেও সে ইচ্ছা করে পরের অনিষ্ট করত না, তবে নিজের স্বার্থ সাড়ে-ষোল আনা বজায় রাখতে সে ত্রিভুবন তোলপাড় করে ছাড়ত।

এহেন দুর্দান্ত ভয়ঙ্কর লাঠি-ও মামলা-বাজ লালচাঁদ কিন্তু ঠাকুরবাবুদের খুব অনুগত ছিল,—বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথকে সে যে কী চোখে দেখেছিল, তা আর কি বলব! তাঁকে সে দেবতার মত অন্তরের সহিত ভালবাসত, ভক্তি করত। প্রায় প্রত্যহই সে রবিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসত আর তার 'বাঘ-সিঙ্গি' মারার গল্পের ভাণ্ডার খুলে দিত। রবীন্দ্রনাথ ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করে তাই শুনতেন, আবার প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গল্পের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে দিতেন। বালেস্টার মিঞা বারবার দাড়ি-গোঁফ চুমড়ে সোৎসাহে তার 'আরব্য উপন্যাস'

* এখানে আমার আর-একটি সুখ আছে। এক-এক সময় এক-একটি সরল ভক্ত বৃদ্ধ প্রজা আসে, তাদের ভক্তি এমনি অকৃত্রিম, তারা সত্যি সত্যি আমাদের এত ভালোবাসে যে আমার চোখ ছল ছল করে আসে।… বাস্তবিক এর সুন্দর সরলতা এবং আন্তরিক ভক্তিতে এ লোকটি আমার চেয়ে কত বড়! আমিই যেন এ ভক্তির অযোগ্য, কিন্তু এ ভক্তিটি তো বড় সামান্য জিনিস নয়। —ছিন্নপত্র, পত্র ৯৬, শিলাইদহ: ১১ই মে, ১৮৯৩।

জুড়ে দিত। প্রায় সবই কোন দুঃসাহসিক অভিযান বা দাঙ্গাহাঙ্গামার গল্প এবং সে-ই তার নায়ক। এমন ধীরভাবে অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে কোন অশিক্ষিত চাষির সুদীর্ঘ গল্প কোনও সুশিক্ষিত অভিজাত জমিদার শুনেছেন বলে জানি না।

লালচাঁদকে ম্যানেজারবাবুও খুব খাতির করতেন, কারণ সে ক্ষমতাশালী প্রজা। এই খাতিরের ফলে বালেস্টার মিঞা ঠাকুরবাবুদের অধীনে জমি-জমাও খুব বাড়িয়ে ফেলেছিল। তার একটা মস্ত দোষ ছিল, সে পার্শ্ববর্তী জমিদার বা জোতদারদের দু চোখে দেখতে পারত না; বলত, 'এমন দু-তিনশো টাকা কালেক্টারির খাজনা দিয়ে আমিও জমিদার সাজতে পারি। ঐ সব ছুটকো জমিদারেরা তো জমাদার,—আমাদের বাবুমশায়ের কাছারির জমাদার। ওঃ! ভারি তো ওদের খড়ের ঘরের ভাঙা কাছারি, সেই কাছারিতে সতরঞ্চ পেতে গোমস্তার হাতবাকসের পাশে বসে গরিব পেরজার উপর হম্বি-তম্বি করে বাবুরা। সে রকম তোখোড় পেরজা হলে কেরামতি বোঝা যায়। "নরম কাঠে ছুতোরের জোর, শক্ত কাঠে সেলাম কর।"লালচাঁদ মিঞার পাল্লায় পড়লে বাছাধনদের—'

চোখ দুটো ঘুরিয়ে সে হাসে। এ শুধু তার মুখের আস্ফালন নয়, কাজেও সে এক কড়া কম নয়। পার্শ্ববর্তী জমিদারদের সঙ্গে তার ঝগড়া প্রায় বেধেই থাকত। জমির সীমানা অতিক্রম করে, আইল চষে ফেলে পাশের জমি জবর-দখল করতে, জোর করে নিজের স্বত্ব বজায় রাখতে, পাশের জমিদারের জমির ধান রাতারাতি কেটে ঘরে তুলতে, সীমানার গোলযোগ বাধিয়ে মজা দেখতে সে ছিল ওস্তাদ। তার হাতে অনুগত লোকও ছিল যথেষ্ট, দুষ্ট বুদ্ধিও ছিল তার গেরোয় গেরোয়।

সেবারে এইরকমভাবে লেঠেল নিয়ে পার্শ্ববর্তী জমিদারের চরের জমি জবর-দখল করতে গিয়ে সে এক গুরুতর ফৌজদারি মামলায় পড়ে গেল। সে গোপনে রাতারাতি কাজ সারতে গিয়েছিল, কিন্তু তার মতলব টের পেয়ে অপর পক্ষ বাধা দিয়েছিল বেশ প্রবল ভাবেই। ফলে অপর পক্ষের দুজন লোককে সে জখম করে। তাইতে তার দলের তিন-চার জন লেঠেলকে পুলিসে চালান দেয়। ব্যাপার আরও গুরুতর দাঁড়িয়ে গেল এইজন্যে যে, ঐ জমির সঙ্গে নাকি গভর্ণমেণ্টের খাসমহলের জমিও ছিল। খাসমহলের একজন প্রজাও নাকি জখম হয়েছিল। কাজেই গভর্ণমেণ্ট থেকে মামলা পরিচালিত হতে আরম্ভ হল পাবনা কোর্টে। খাসমহলের তহশীলদার, আমিন, এঁরাও বালেস্টার মিঞার

বিরুদ্ধে মামলার তদ্বিরে কোমর বেঁধে লেগে গেলেন ; এই সঙ্গে পার্শ্ববর্তী জমিদার তো আছেনই।

লালচাঁদ কিন্তু হাল ছেড়ে দিল না সেও আদা-জল খেয়ে লেগে গেল। শেষে ব্যাপার এমনি ঘোরাল হয়ে দাঁড়াল যে, স্বয়ং জেলার ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব এলেন সদলবলে স্থানীয় তদন্তের জন্যে। লালচাঁদ একটু ভাবিত হয়ে পড়ল।

জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন সাহেব। সাজাদপুর কাছারিতে চিঠি এল, সাহেব সাজাদপুর ঠাকুরবাবুদের কাছারিতে এসে উঠবেন। সেখান থেকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে স্থানীয় তদন্তে যাবার জন্য পৃথক অনুরোধ-পত্র এল।

এই খবর পেয়ে দুশ্চিন্তার মধ্যেও লালচাঁদ খুব আমোদ অনুভব করল। স্বয়ং বাবুমশাই যাবেন তার প্রবল প্রতাপের পরিচয় পেতে, এতেই তার আনন্দ। সে বলল,'বাবু, ঢের ঢের ফৌজদারি-ফাদা করেছি—জলের মত টাকা ঢেলেছি। কিন্তু আমাদের বাবুমশাই তো তা দেখেন নি। এবারে তিনি দেখবেন, তাঁর পেরজার কল্‌জের জোর কত।'

বাবুমশাই লালচাঁদকে ডেকে বললেন, 'এ তুই কি করলি! তুই যে আমার এমন ঝগ্‌ড়াটে প্রজা তা তো জানতুম না।'

লালচাঁদ কিছু না বলে শুধু একটু হাসল। ম্যানেজারবাবু বাবুমশাই ও ম্যাজিস্ট্রেটসাহেবের চরে যাবার উদ্যোগ আয়োজন করতেই লালচাঁদ বলে উঠল, 'আপনি এর জন্যে একটুও ভাববেন না। এসব ব্যবস্থা আমি করব। মামলা আমার। এর সব তদ্বির আমিই করব। এতে আপনাকে কিছুই করতে হবে না। যত খরচ লাগে সব আমার। পালকি বেহারার সব ব্যবস্থাই করে দিচ্ছি।'

ম্যানেজারবাবু থ মেরে গেলেন।

বেলা একটু পড়ে এলে সাজাদপুর কুঠিবাড়ির সামনে প্রকাণ্ড এক ষোল বেহারার পালকি এসে দাঁড়াল। তার মধ্যে নরম বিছানা, তাকিয়া, ফুলের তোড়া। আর দশ-বারো জন লেঠেল লাঠি-হাতে, মালকোঁচা মেরে কাপড় পরে হাজির। ম্যানেজারবাবু বললেন, 'আর পালকি কই রে?'

ব্যস্ত-সমস্ত লালচাঁদ বললে, 'হচ্ছে হচ্ছে, সব হচ্ছে। ভাববেন না।'

'কই?' বলতে বলতে লালচাঁদের চাচার ঘোড়াটাকে জিন-লাগাম কসে নিয়ে একজন লোক এসে দাঁড়াল। ঘোড়াটায় লালচাঁদের চাচা চড়ত। চাচা মারা যাওয়ায় আর কেউ ঘোড়াটায় চড়ে না। আধবুড়ো বেতো ঘোড়া, এর ওর ক্ষেতে খেয়ে বেড়ায়, আর কেউ তাড়া করলেই অমনি চিঁ হিঁ চিঁ হিঁ করে

দাঁত খিঁচিয়ে পা ছোড়ে। বালেস্টার মিঞার সাধের ঘোড়াকে কেউ কিছু বলে না। ঘোড়াটা মহানন্দে খেয়েদেয়ে বেড়ায়, মাঝে মাঝে আনন্দধ্বনি করে মাঠের মধ্যে পরম ভক্তিভরে গড়াগড়ি দেয়। লোক দেখলে চাট্‌ মারে।

ম্যানেজারবাবু বললেন, 'আর একটা পালকি কই?'

যাবার সময় হয়েছে। বাবুমশাই ঘর থেকে বেরিয়ে দেখেন এক প্রকাণ্ড সুসজ্জিত পালকি, আর তার পাশে জিন-লাগাম চড়ান দিশি একটা ঘোড়া। লেজ নাড়ছে আর ফোঁস্-ফোঁস্ করে মাছি তাড়াচ্ছে। তিনি বললেন, 'ওরে এ ঘোড়াটা আবার কেন? আর একটা পালকি কই?'

লালচাঁদ সেলাম ঠুকে এগিয়ে বললে, 'পালকি কেন? সাহেব ঘোড়ায় যাবে। হুজুর এই পালকিতে যাবেন। এত বড় আস্পদ্দা সাহেবের, সাহেব যাবে হুজুরের সঙ্গে পালকিতে? আ আমার পোড়া কপাল। সাহেব ঘোড়ায় চড়ুক। হুজুর পালকি উঠুন। আর দেরি কেন?'

রবীন্দ্রনাথ ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'তা কি কখন হয়? সাহেব হচ্ছেন এই জেলার কর্তা, তাতে তিনি আজ আমার অতিথি। তিনি এই বেতো ঘোড়ায় যাবেন? এমন পাগলামি করছিস্ কেন? শীগ্‌গির আর একটি পালকি সাজিয়ে আন্।'

লালচাঁদ বিরক্ত হয়েই বলল, 'সাহেব যাবে হুজুরের সঙ্গে পালকিতে চেপে? তা কি হয়? আমার মুনিব-রাজা আর কটা-সাহেব কি এক? তা হবে না। আমাদের মান-সম্মান নেই নাকি? সাহেব এই ঘোড়াতেই উঠুক।'

লালচাঁদ কিছুতেই বোঝে না। বাবুমশাই তাকে যত বোঝান, সে ততই রাগে ফোঁস করে ওঠে। শেষে ম্যানেজারবাবুকে বলে বাবুমশাই আর একখানা বড় পালকি আনালেন। দুজনে তদারকে চলে গেলেন। লালচাঁদ মনমরা হয়ে তাঁদের সঙ্গে গেল।

তদারক শেষ হলে রবীন্দ্রনাথ এই বিরোধ আপোষে মিটিয়ে দিলেন; তা নইলে লালচাঁদের পক্ষের চালানি আসামিদের জেল হয়ে যেত। সাহেব রবীন্দ্রনাথের আপোষ-মীমাংসায় সন্তুষ্ট হয়ে রাজি হয়ে চলে গেলেন।

লালচাঁদ এই ব্যাপারে বাবুমশায়ের ক্ষুরধার বুদ্ধি, তর্কশক্তি আর হরদম ইংরাজি কথাবার্তা শুনে একেবারে থ মেরে গেল। একেই তো বাবুমশাই তার কাছে স্বর্গের দেবতা, তার পরে এই ভয়ানক সঙ্কটময় ব্যাপারে তার ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। সে বলতে লাগল, 'আমরা ভাগ্যবান যে

এমন রাজার পেরজা। রূপে-গুণে আমাদের রাজার কি এ ভূ-ভারতে তুলনা মেলে? এ্যাত বিদ্যা যে ইংরেজ সাহেব পর্যন্ত ঘোল খেয়ে গেল। আরে, ফেলে থো তোর জজ ম্যাজিস্টের।'

ভক্তিতে ডগমগ লালচাঁদ তার দূরদেশস্থ আত্মীয়দের পেলে তাদের বোটের কাছে এনে সাহিত্য-সাধনামগ্ন রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়ে চোখ দুটো বিস্ফারিত করে বলত,' দেখছিস্ রূপ? দেখ গা দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে। দেখে চর্মচক্ষু সাথক করে নে।'

একবার একদল লোক নিয়ে সে বোটের কাছে উপস্থিত। বাবুমশাই তখন বেড়াতে বেরুচ্ছেন, বললেন, 'ওরা কারা লালচাঁদ?'

লালচাঁদ সে কথার ছোট্ট একটু জবাব দিল, 'এদের দেখাতে এনেছি।'

রবিবাবু বললেন, 'কি দেখাচ্ছিস্?'

লালচাঁদ সঙ্গীদের বললে, 'দেখেছিস্ চাঁদ মুখখানা? এমন রূপ জন্মে দেখেছিস্!'

রবীন্দ্রনাথ লজ্জিত হয়ে বোটের ভিতরে চলে গেলেন।

তারা অনেকক্ষণ হাঁ করে সব দেখে ফিরল, আর লালচাঁদ সাড়ম্বরে নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত-পা নেড়ে বাবুমশায়ের রূপ-গুণ বিদ্যা-বুদ্ধির প্রশংসা শোনাতে শোনাতে তাদের নিয়ে গ্রামের দিকে চলল।*

তেরোছটাকের মামলা

রবীন্দ্রনাথের জমিদারি মেজাজ কেমন ছিল তার পরিচয় দেওয়া বাহুল্য হবে না। সেই উদ্দেশ্যে একটি কাহিনী বলছি।—

শিলাইদহের ঠাকুর জমিদারের একটা বড় মহাল জানিপুর। জানিপুরের গায়েই খোকসা। এই খোকসার অধিকাংশই বিখ্যাত নড়াইলের জমিদার-বাবুদের। জানিপুরে ঠাকুরবাবুদের প্রকাণ্ড পাকা কাছারিবাড়ি, কাছারিসংলগ্ন হাটবাজার, গোলাগঞ্জ অনেকটা সহরের মতই, গোরাই নদীর তীরে। মহাজনি

* দ্রষ্টব্য—ছিন্নপত্রাবলীর একাধিক পত্রে, বিশেষত ১২৭ সংখ্যক পত্রে এ ধরনের ঘটনার উল্লেখ আছে।

নৌকায় মালপত্র, পাট, গুড়, কলাই, মাছ ইত্যাদি আমদানি-রপ্তানি হত সারা বছর। জানিপুর ঠাকুরবাবুদের বড় লাভের মহাল। কাছারির লাগোয়া কমলাপুর, দশকাহনিয়া গ্রামগুলোয় শিক্ষিত ধনী তিলি ও ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভদ্রলোকদের বাড়ি, সবাই ঠাকুরবাবুর প্রজা।

সময়টা সম্ভবত ১৩১১ সাল। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৪৩ বছর। তিনি তখন পুরাদস্তুর প্রতাপশালী জামিদার, নিজে জমিদারি দেখাশুনা করেন। ঐ অঞ্চলে ঠাকুরবাবুদের মহাল বড় বলে যেমন খ্যাতি ছিল নড়াইল জামিদারবাবুদেরও খ্যাতি ছিল খোকসার কালীবাড়ি দেবোত্তরের মালিক বলে। তাঁদের ঐ কালীপূজার প্রকাণ্ড মেলা বসত প্রতিবছর পৌষ মাসে রটন্তী পূজার সময়ে। তিন সপ্তাহব্যাপী বিরাট মেলা ঐ অঞ্চলে সুবিখ্যাত। খোকসার মা কালী তৈরি হত দোতলার সমান উঁচু। পূজায় ধূমধাম ও মেলার সমারোহ হত খুব। তিন সপ্তাহে দু-তিন শো পাঁঠা বলি হত, মোষ বলিও হত, আমরা দেখেছি। ঐ মেলার জন্যই খোকসার জমিদারের ঐ অঞ্চলে বহুদিনের প্রসিদ্ধি।

দুই প্রতাপশালী জমিদারের লাগোয়া মহালের সীমানা ছিল খোকসা রেলস্টেশন থেকে গোরাই নদী পর্যন্ত পাকা জেলা বোর্ড রাস্তা। গোরাই-এর ভাঙনে ঐ রাস্তার শেষ অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ঐ জমিটুকুর পরিমাণ মাত্র তেরোছটাক। ঐ তেরোছটাক জমি ঠাকুরবাবুরা তাঁদের বলে দাবি করেন, অপরপক্ষে নড়াইলবাবুরা ঐ দাবির বিরুদ্ধতা করেন। এই নিয়েই দুই প্রধান জমিদারের মধ্যে প্রবল জিদের মোকদ্দমা চলে প্রায় তিন-চার বছর ধরে। সেই থেকে ঐ স্মরণীয় মামলার নাম 'তেরোছটাকের মামলা' বলে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে।

এই ব্যাপারেই তরুণ রবীন্দ্রনাথের আসল জমিদারের স্বরূপ প্রকাশিত হয়। জমির পরিমাণ এক কাঠারও কম, তাও ভাঙনের মুখে। অথচ ন্যায়সঙ্গত অধিকার কায়েম রাখবার জন্য ও সম্মান বজায় রাখবার জন্য রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম দৃঢ় সংকল্প। তার ফলে দীর্ঘকাল মামলা ও প্রচুর অর্থব্যয়। ঐ দীর্ঘকালব্যাপী দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলায় ঐ অঞ্চলে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। সামান্য তেরোছটাক জমির জন্য দুইজন শিক্ষিত প্রবল জমিদারের তিন বছরব্যাপী জিদের মামলা সকলেরই বিস্ময়ের কারণ হয়েছিল।

ঐ মোকদ্দমা তদ্বিরের জন্য রবীন্দ্রনাথ জানিপুরের লাগোয়া কমলাপুরবাসী দ্বারিকানাথ (দ্বারিক) বিশ্বাস্ নামে একজন বিচক্ষণ বৈষয়িক ধুরন্ধরকে নিযুক্ত করেছিলেন। দ্বারিক বিশ্বাসের কৌশলে ও তদ্বিরের জোরে এই দীর্ঘকালব্যাপী

মোকদ্দমায় ঠাকুরবাবুরা অবশেষে জয়লাভ করেন। দ্বারিক বিশ্বাসও জমিদার সরকারে উপযুক্ত পদে সমাসীন হয়ে সবার প্রিয়পাত্র হন।

এই প্রকাণ্ড জিদের মামলায় পরাজিত হয়ে নড়াইল-বাবুরা খুব মর্মাহত হয়ে পড়েন আরও একটি বিশেষ কারণে। সে কারণটি হল, তাঁদের প্রসিদ্ধ কালী-বাড়ি (খড়ের প্রকাণ্ড ঘরখানা) ঐ বিরোধীয় জমিরই লাগোয়া। এই পরাজয় তাঁদের বহুদিনের প্রসিদ্ধ বাৎসরিক কালীপূজা ও মেলা ধ্বংসের অগ্রদূত বলে সবাই মনে করলেন, কারণ ঠাকুরবাবুরা ঐ জমিটা বেশ শক্ত করে ঘিরে খেয়া-ঘাট বসিয়ে দিলেন।

মামলার ফল ঘোষিত হবার পর নড়াইল জমিদারবাবুরা তাঁদের ঐ গুরুতর পরিস্থিতির বিষয় পরোক্ষ ভাবে রবীন্দ্রনাথের কানে তুললেন। ভাবলেন, কবি মানুষ এই শত্রুতার কথাটা মনে রাখবেন না। আশ্চর্য ব্যাপার ! সত্যই তাঁদের ধারণা ! যে রবীন্দ্রনাথ এই প্রকাণ্ড মামলা পরিচালনের সময়ে ভয়াবহ অগ্নি-মূর্তি ছিলেন, তিনিই নড়াইলবাবুদের এই সংকট উপলব্ধি করে একেবারে জল হয়ে গেলেন। শান্তিস্থাপনের প্রস্তাব এল জোড়াসাঁকো ঠাকুর ভবনে।

রবীন্দ্রনাথ এই শান্তিপ্রস্তাব সানন্দে মেনে নিলেন। নড়াইলের তদানীন্তন জমিদার জোড়াসাঁকো ভবনে এলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এবং বললেন যে, দুইটি প্রাচীন জমিদার বংশের বন্ধুত্বের বিনিময়ে তিনি ক্ষতি স্বীকার করেও সমস্ত বিরোধ মীমাংসা করতে প্রস্তুত। মীমাংসা হয়ে গেলে লেখাপড়া হল যে—১. যে তিন সপ্তাহ নড়াইল-বাবুদের বাৎসরিক কালীপূজার মেলা চলবে, সে সময়টা কালীপূজার প্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে ঠাকুরজমিদার তাঁদের দৈনিক হাট-বাজার নড়াইল-বাবুদের পক্ষে ছেড়ে দেবেন। ২. গোরাই নদীর ভাঙনের মুখ থেকে কালীবাড়ি সরিয়ে নড়াইল-বাবুরা গ্রামের মধ্যে পাকা বাড়িতে কালীমন্দির গড়বেন। ভবিষ্যতে দু জমিদারের গোল-যোগের সম্ভাবনা থাকবে না। ৩. মেলার উৎসবাদির স্থানাভাবের জন্য ঠাকুর-বাবুরা তাঁদের নিজ দৈনিক হাট-বাজারের পাশের জমিতে প্রতি বৎসর নিজ ব্যয়ে টিনের চালা তৈরি করে দেবেন। ৪. কোন্ পক্ষের বলি আগে পড়বে এই নিয়ে এতদিন ধরে উভয় পক্ষের আমলা ও লেঠেলদের যে মারামারি হত তার অবসান হবে। ঠিক হল, স্বর্গীয় জমিদার রতনবাবুর নামে প্রথম পাঁঠা ও মহিষ বলিদানের পরই ঠাকুরবাবু ও নড়াইলবাবুদের উভয় পাঁঠা একসঙ্গে বলি হবে একই হাড়িকাঠে এবং ঠাকুর-জমিদারের পূজার শোভাযাত্রা মন্দিরে না

পৌঁছা পর্যন্ত মায়ের পূজা আরম্ভ হবে না। ৫. তিন সপ্তাহব্যাপী মেলার শান্তি রক্ষার জন্য ঠাকুর-জমিদারের জানিপুরের নায়েব সর্বপ্রকারে নড়াইল-বাবুদের সহযোগিতা করবেন এবং এজন্য তাঁরা দৈনিক দুটো করে প্রসাদী পাঁঠা পাবেন। এই মীমাংসার সর্তে ঠাকুরবাবুদের বাৎসরিক তিন চার শো টাকা খরচ বেড়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ এই ক্ষতি স্বীকার করে নিলেন শুধু বন্ধুত্বের বিনিময়ে, ২।৩ বৎসরব্যাপী বিরোধের পরে।

এইভাবে 'তেরোছটাকের মামলা'র মীমাংসা হল বটে, কিন্তু তার জের চলল ঐ মামলার তদ্বিরকারক দ্বারিক বিশ্বাসের উপর শাস্তিবিধানের ব্যাপারে। কৌশলী বৈষয়িক দ্বারি বিশ্বাস ঐ দীর্ঘদিনের মামলার সুযোগ নিয়ে নানা উপায়ে ফন্দি-ফিকিরে অনেক জমি দখল করে ভোগ করছিলেন। নূতন ম্যানেজার জানকীনাথ রায় সেরেস্তার মর্যাদা রক্ষার জন্য অপরাধের বিচার করে তাঁকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলেন। ম্যানেজার হলেও তিনি আমলাদের সততা রক্ষার দিকে খুব কড়া নজর দিতেন। শিলাইদহ সদর আপিসের বড় আমলারা কিন্তু দ্বারি বিশ্বাসের কাজগুলি পরোক্ষভাবে সমর্থন করলেন।

দ্বারি বিশ্বাসের বিচার-ব্যবস্থা বেশ ঘোরাল হয়ে দাঁড়াল। এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব বৈষয়িক বুদ্ধি ও সহানুভূতিপূর্ণ সুবিচারের পরিচয় বিশেষ অর্থপূর্ণ। জানকীবাবু এস্টেটের নিয়মানুসারে দ্বারি বিশ্বাসের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও তাকে পদচ্যুত করবার প্রস্তাব করতেই রবীন্দ্রনাথ সমস্ত ব্যাপারটা পুনর্বিবেচনার জন্য জানকীবাবুকে অনুরোধ করে চিঠি দিলেন—

> …স্বার্থ-রক্ষার জন্য প্রবল ব্যক্তি স্বভাবতই চাতুরি অবলম্বন করিয়া থাকে। সেস্থলে দুবলের বেলায় চাতুরি দেখা দিলে আমরা যে রাগ করি, সে চাতুরির প্রতি রাগ নহে, দুবলের প্রতিই রাগ। কারণ এই দ্বারি বিশ্বাসই চতুরতার দ্বারা আমাদের কোন কাজ উদ্ধার করিলে প্রশংসা ও পুরস্কারের পাত্র হয়। এস্থলে নিজের স্বার্থ-সাধনের জন্য চাতুরি-প্রয়োগ দেখিলে আমাদের রাগ করিবার কারণ নাই—১৮ আষাঢ়, ১৩১৩।

ঐ চিঠির ফলে দ্বারি বিশ্বাসের উপর ম্যানেজারের উদ্যত খড়্গ বন্ধ হল। তাঁর জমি বন্দোবস্ত করে তাঁকেই জমি ফেরৎ দেবার ব্যবস্থা হল। এই রকম সহানুভূতিপূর্ণ বিচার-বুদ্ধি নিয়েই রবীন্দ্রনাথ জমিদারি পরিচালনা করে প্রজাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি জমিদারির বিধিবদ্ধ আইন-কানুন

লঙ্ঘন না করেও প্রকৃত কর্মঠ কর্মচারীদের অনেকবার বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।

এ বিষয়ে কৌতূহলী পাঠক দ্বারি বিশ্বাসের বিচার-বিভ্রাট বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ বর্তমান গ্রন্থের ১৫০ পৃষ্ঠায় 'জানকী রায়' কাহিনীতে পাবেন। এই ব্যাপারের পরে নড়াইল ও ঠাকুর-জমিদার পরস্পর প্রীতি ও বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। নলডাঙার বিখ্যাত রাজাদের সঙ্গেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জমিদার রবীন্দ্রনাথের সংঘর্ষ বেধেছিল, কিন্তু তা এত সুফল প্রসার করে নি; সে কাহিনীও আমি অন্যত্র বলেছি। নাটোর ছোট তরফের জমিদারের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের জমিদারি 'ভৈরব পাড়ার' মামলা দীর্ঘকাল চলেছিল,—প্রিভি-কাউন্সিলের মোকদ্দমায় ঠাকুরবাবুরা জয়লাভ করেছিলেন। জমিদার রবীন্দ্রনাথ পার্শ্ববর্তী প্রবল প্রতাপশালী রাজা বা জমিদারগণের বন্ধুত্বকামী ছিলেন বটে কিন্তু ন্যায়সঙ্গত বৈষয়িক ব্যাপারে তিনি তাঁদের খাতির করেন নি। লাঠি আর অনর্থক মামলা সেকেলে রাজা-জমিদারদের অঙ্গের ভূষণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এগুলিকে অবশ্য তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করতেন।

প্রজার মান

কয়ার তারিণী শিকদারের (কর্মকারের) অবস্থা পূর্বে খুবই ভাল ছিল। জোত-জমা আর জাত-ব্যবসা নিয়ে তারা বেশ লক্ষ্মীমন্ত শান্ত সুখী গৃহস্থ; তাই ঠাকুরবাবুদের বড় বড় বর্ধিষ্ণু জোতদার প্রজার মতই তারা জমিদার-সেরেস্তায় বেশ মান-সম্ভ্রম বজায় রেখে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করত।

একবার ঠাকুর-জমিদারের সেরেস্তার একটা নিলাম-খরিদা জমি বন্দোবস্ত নিয়ে তার দখল পেতে তারিণী শিকদার বড় হাঙ্গামায় পড়ে। তাই তাদের এই জমি সরেজমিনে মেপে সীমানা ঠিক করে দেবার জন্যে আমিন পাঠাবার প্রার্থনা করে। আমিনের বারবরদারি খরচা কাছারিতে দাখিল করলে একজন আমিন বরকন্দাজ নিয়ে তাদের বিরোধীয় জমি জরিপ করতে আসেন।

এই আমলাটি নূতন—তিনি সার্ভে পাশ করে সদ্য এই এস্টেটে চাকরি নিয়েছেন। তাঁর মেজাজটা ছিল বেশ একটু কড়া, বিশেষত ঠাকুরবাবুদের দোর্দণ্ড প্রতাপের গরম তিনি যেন জাহির না করে পারেনই না। সরেজমিনে আমিনবাবুরা প্রজাদের মা-বাপ। সেলাম নমস্কার তাঁদের হরদমই প্রাপ্য। তখন ঠাকুরবাবুদের বরকন্দাজ দেখেই প্রজারা ভয়ে কাঁপত,—তিনি আমিন, —তাঁর তো কথাই নেই।

আমিনবাবু উভয় পক্ষকে ডেকে জরিপ আরম্ভ করলেন। তাঁর জরিপ শেষ হল, কিন্তু শিকদারেরা তাদের সীমানার গোলমাল মীমাংসায় সন্তুষ্ট হতে পারল না। তারা বারবারই সেই গোলমেলে সীমানাটা বুঝিয়ে দেবার জন্য আমিনবাবুকে অনুরোধ করতে লাগল। আমিনবাবু যা বোঝান, ওরা তা বোঝে না,—দু-একবার উভয় পক্ষের ভুল বেরিয়ে পড়ে, তা সংশোধনও হয়, কিন্তু সীমানাটার যে নকশা আমিনবাবু আঁকলেন সেটার বিষয়ে শিকদারেরা আপত্তি জানিয়ে সেটা ঠিক ভাবে সংশোধন করবার জন্য অনুরোধ জানাল।

আমিনবাবু গেলেন বিষম চটে। বেয়াদব নির্বোধ প্রজাকে শাসিয়ে তিনি বেশ খানিক কড়া কথা শুনিয়েও তৃপ্ত না হয়ে তারিণীকে 'ব্যাটা বেকুফ, কামার

কোথাকার' বলে গাল দিলেন। তারিণী জমিদারের সম্মানিত প্রজা। সেও অপমান সহ্য করতে না পেরে আমিনবাবুকে বেশ দুটো কড়া কথায় আপ্যায়িত করতে ছাড়ল না। এতে আমিনবাবু গেলেন একেবারে 'তেলে-বেগুনে' চটে। তিনি তাদের উপর বেশ খানিক শাসন-গর্জন করেও তাদের কাছে 'যে আজ্ঞে, যো হুকুম' রকম আনুগত্যের পরিবর্তে বেশ ঝাঁঝাল আপ্যায়নে অতি মাত্রায় রেগে বকতে বকতে কাছারিতে চলে গেলেন। শাসিয়ে এলেন—এর সমুচিত প্রতিফল পাবে।

তখন ম্যানেজার ছিলেন বামাচরণ বসু। খুব কড়া ম্যানেজার তিনি—শাসন-সংরক্ষণ খুব ভাল বুঝতেন। তিনি আমিনের কথাবার্তা শুনে তার পর-দিনই তারিণী শিকদার আর তার ভাইকে কাছারিতে ধরে এনে শাসন করবার জন্য দুজন জাঁদরেল বরকন্দাজ দিলেন পাঠিয়ে।

তারিণী এ সংবাদ পেয়ে ভয়ানক ভীত হয়ে পড়েছে। সদরে গিয়ে গুরুতর অপমানের ভয়ে সে পরদিন থেকেই পাড়ায় এর-ওর বাড়িতে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। এদিকে হয়ধর সর্দার ও আর একজন বরকন্দাজ কয়াতে এসে হাজির। হয়ধর সর্দার সেকালে ঠাকুরবাবুদের নামকরা লেঠেল বরকন্দাজ। সে তারিণীর বাড়ির সামনে তর্জন-গর্জন করতে লাগল।

তারিণী পাড়ার অন্য বাড়িতে লুকিয়ে খবর পেল যে, রবিবাবু এখনও শিলাইদহে আছেন। সে আর বাড়ির দিকে না গিয়ে গ্রামের পাশ কেটে মাঠ ভেঙ্গে আড়াআড়ি ছুটল শিলাইদহ কুঠিবাড়ি মুখে, বাবুমশায়ের কাছে।

হয়ধর অনেকক্ষণ তর্জন-গর্জন করে শিলাইদহে ফিরে জানাল—আসামি পলাতক! এতে তারিণীর উপর নূতন অত্যাচার বাঘের মত ওৎ পেতে রইল।

তখন রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে আছেন। তারিণী শিকদার হাঁপাতে হাঁপাতে নিচের তলায় এসে, চীৎকার করে বরকন্দাজদের অনুরোধ করল, 'আমায় এখনই একবার বাবুমশায়ের সঙ্গে দেখা করিয়ে দাও।'

বরকন্দাজেরা এই অবস্থায় কি করবে ঠাহর করতে না পেরে তাকে অপেক্ষা করতে বলে বাবুমশাইকে সংবাদ দিল। বাবুমশাই তখনই নিচে নেমে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'অমন হাঁপাচ্ছ কেন? তোমার কী হয়েছে বল।'

তারিণী বাবুমশায়ের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে নিবেদন করল যে, তারা কয়া গ্রামের বহুদিনের মানী প্রজা। আজ তাদের চূড়ান্ত অপমান হবার

অবস্থা হয়েছে। এ অবস্থায় তাদের এদেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়া ভিন্ন অন্য গতি নেই—ইত্যাদি।

বাবুমশাই মহা মুস্কিলে পড়ে গেলেন। একজন বর্ধিষ্ণু প্রজা মর্মান্তিক কষ্ট না পেলে এরকম করে কাঁদবে কেন—এমন অভিযোগই বা করবে কেন! তিনি ম্যানেজারবাবু আর সেই আমিনবাবুকে ডেকে আনবার জন্যে বরকন্দাজ পাঠালেন কাছারিতে। তারিণীকে তিনি অভয় দিয়ে শান্ত হতে বললেন।

আমিনবাবুরা এলেন, তিনি উভয় পক্ষের কথা শুনলেন। তারিণী বাবু-মশাইকে নকশাটা দেখতে অনুরোধ করল। রবিবাবু নকশাটা হাতে নিয়ে আমিনকে অনেকগুলো প্রশ্ন করলেন। সীমানাটা পূর্বে কোথায় ছিল তারিণী তা নকশায় দেখিয়ে দিল, কোথায় তার আপত্তি তাও সে বুঝিয়ে বলল। রবীন্দ্রনাথ ব্যাপারটা সমস্তই বেশ বুঝতে পারলেন, ম্যানেজারবাবুকেও গোল-মালের কারণটা দেখালেন; তারপরে আমিনকে বললেন, 'প্রজাকে তার জমি তো তোমায় বুঝ করে দিতেই হবে। সে যখন তোমার বারবরদারি দিয়েছে, তখন সে কাজটা তোমারই কর্তব্য। সে যতই বোকা হক, তুমি সরেজমিনে শিকল নিয়ে কাগজপত্র আর দুইপক্ষের বক্তব্য শুনেও সীমানাটা তাকে বুঝিয়ে দিতে পারলে না কেন?'

নকশাটা হাতে নিয়ে আমিন রবিবাবুর প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারলেন না। তিনি ম্যানেজারবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তারিণী শিকদার রেগে উঠে অতগুলো প্রজার সামনে জমিদার সরকারের আমিনকে খামখা অপমান করেছে, হুজুর। ওর আস্পর্ধা অত্যন্ত বেড়েছে। ওকে শাসন না করলে হামেসাই জমিদার সরকারের মান-সম্ভ্রম নষ্ট হবে।'

রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, 'জমিদার সরকারের মান-সম্ভ্রম তো তোমাদেরই হাতে রক্ষা করার ভার দেওয়া হয়েছে। সে মান যে তোমরাই নষ্ট করতে বসেছ। আমার প্রজারও তো মান-সম্ভ্রম আছে! সে কথাটা বুঝি মনেও আসে না?'

আমিন ভয়ানক লজ্জিত হয়ে চুপ করে রইলেন। রবীন্দ্রনাথ বড় কড়া জমিদার। এ ব্যাপারে তাঁর চাকরি থাকবে কিনা ভেবে আমিনবাবু খুব ভীত হয়ে পড়লেন। ম্যানেজারবাবু আমিনের উপর বিরক্ত হয়ে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথ আমিনকে বললেন, 'কাজকর্ম ভাল করে শিখতে হয় হে। তোমাদের আসল কর্তব্যই হচ্ছে প্রজাকে বুঝিয়ে দেওয়া। তার জন্যে সে

তোমার খরচাও দিয়েছে। তুমি নিজের দোষে নিজের এবং জমিদারের মাথা নিচু করে দিয়েছ। তার জন্য আমার প্রজা দায়ী নয়। সে যখন আমারই প্রজা, তারও একটা মান-সম্ভ্রম আছে। প্রজার সঙ্গে কোন অবস্থাতেই কখনও খারাপ ব্যবহার করবে না।'

তারিণীকে তিনি বললেন, 'যাও তুমি, তোমার উপরে আর কোনও অত্যাচার হবে না। কালই আমিনবাবু গিয়ে তোমার সীমানা ঠিক করে খুঁটি গেড়ে দিয়ে আসবেন।'

তারিণী চলে গেলে তিনি ম্যানেজারের সামনেই আমিনকে উপদেশ দিলেন, 'প্রজার মান দিয়েই জমিদারের মান। খবরদার, নিজের দোষে, নিজের কাজের ত্রুটিতে কোন কারণেই প্রজার প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ করো না। জমিদারের মান-ইজ্জত, ধর্ম—সবই তো তোমাদেরই হাতে। এমনি করে আর কখনও জমিদারকে অপমান করো না।'

পুণ্যাহ-সভা

অনেকদিন আগেকার কথা। তখন রবীন্দ্রনাথ যুবক, জমিদারি দেখাশুনার ভার তাঁর হাতে সবেমাত্র এসেছে। তিনি জমিদারির সদর পুণ্যাহ উপলক্ষে প্রথম শিলাইদহে এসেছেন।

তখন জমিদারির সদর কাছারির পুণ্যাহ-অনুষ্ঠান মহা আড়ম্বরে সম্পন্ন হত। বড় বড় জমিদারের যেমন হয়ে থাকে, এই উপলক্ষে কীর্তন, কবির লড়াই, যাত্রাগান, লাঠিখেলা, কুস্তির প্রতিযোগিতা, দীন-দরিদ্রদের খাওয়ান, বস্ত্রদান, আমলা ও প্রজাদের প্রীতিভোজ ইত্যাদিতে তিন-চারদিন ধরে প্রচুর অর্থব্যয় ও সমারোহ হত। জমিদারবাবু স্বয়ং পুণ্যাহ-সভায় বসতেন। সদর কাছারির একতলার প্রকাণ্ড হলঘরটি ঐ উপলক্ষে পরিপাটি করে সাজান হত, সিংহ-দরজায় নহবত বসত।

প্রকাণ্ড পালকিতে চড়ে জমিদারবাবু মহাসমারোহে পুণ্যাহ-সভায় আসতেই বন্দুকের আওয়াজে, রোশনচৌকির বাদ্যে, প্রজাদের জয়ধ্বনি আর মেয়েদের হুলুধ্বনিতে ও শঙ্খরবে কাছারি-প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠত। এঁদের পুণ্যাহ-

অনুষ্ঠানের একটু বিশেষত্বও আছে, সেইটুকু আগে বলে নিই।

জমিদারবাবু পুণ্যাহ-সভায় তাঁর প্রকাণ্ড সুসজ্জিত আসনে বসলেই কলিকাতার আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য সমাজের প্রথামত প্রথমেই গুরুগম্ভীর স্বরে প্রার্থনা করতেন এবং জমিদারবাবুকে পুষ্পমাল্য ও চন্দনাদি দিয়ে অভিষিক্ত করে আশীর্বাদ করতেন। তারপর হিন্দুশাস্ত্রমতে পুজো হত; স্থানীয় রাজপুরোহিত জমিদারবাবুকে বরণ করে কপালে চন্দনের টিকা পরিয়ে দিতেন। তারপরে জমিদারবাবু সমবেত প্রজা ও আমলাবর্গকে সম্বোধন করে তাঁদের শুভকামনা করতেন। ম্যানেজার তাঁকে পুষ্পমাল্যে অর্চনা করে প্রণাম করতেন, অমনি মাতব্বর প্রজারা ও আমলারা সবাই হাঁটু গেড়ে বসে জমিদারবাবুকে সসম্ভ্রমে নজরানা দিতেন। জমিদারবাবু তাঁদের কপালে চন্দন আর গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিতেন। সম্ভ্রান্ত প্রজাদের মধ্যে দুচার জন দাঁড়িয়ে জমিদারবাবুকে স্তুতি-বাচন ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন।

এর পর রাজপুরোহিত ও গ্রহাচার্য মন্ত্র পড়ে শুভক্ষণ নির্দেশ করে দিলেই জমিদারবাবু নিজে তাঁদের নূতন কাপড়, চাদর, দধি, মৎস্য ও দক্ষিণা দিতেন। 'পুণ্যাহপাত্র' হিসাবে নির্দিষ্ট সম্ভ্রান্ত প্রজাকে নূতন কাপড়, চাদর, দধি, মৎস্য, তাম্বুলাদি দিয়ে কপালে চন্দন, আর গলায় ফুল ও শোলার মালা দিয়ে অভিষেক করা হত। 'পুণ্যাহপাত্র' সসম্ভ্রমে হাঁটু গেড়ে বসে জমিদারবাবুকে নজরানা দিয়ে সকলের প্রথমে 'কর প্রদান' করতেন। তার পরেই প্রজাদের ও নায়েবদের কর-গ্রহণ পর্ব আরম্ভ হত। ঢোল, কাঁসি, জয়ঢাক, ব্যাগ্‌পাইপ ক্রমে তাদের বাজনা শুনাত। সেই দিনই বৈকালে দরিদ্রবিদায় হত। পরের দুতিন দিন ধরে ক্রমাগত আমোদ-প্রমোদ ও ভোজ চলত।

পুণ্যাহ-সভায় প্রজাদের সম্ভ্রম ও জাতিবর্ণ হিসাবে বিভিন্ন রকমের আসনের বন্দোবস্ত থাকত। হিন্দুরা এক ধারে, তার মধ্যে ব্রাহ্মণেরা পৃথকভাবে, মুসলমানেরা অন্য ধারে পৃথক পৃথক ভাবে পৃথক আসনে, সম্ভ্রান্ত প্রজারা আর সদর ও মফস্বল কাছারির কর্মচারীরাও নিজ নিজ আধিপত্য ও পদমর্যাদা রক্ষা করে পৃথক পৃথক আসনে বসতেন। আচার্য, রাজপুরোহিত, গ্রহাচার্য, পুণ্যাহ-পাত্রদের জন্য পৃথক পৃথক নির্দিষ্ট আসন থাকত।

সে বারে তরুণ জমিদার রবীন্দ্রনাথ প্রকাণ্ড পালকি থেকে নেমে বিরাট সমারোহ আর জয়ধ্বনির মধ্যে সুসজ্জিত পুণ্যাহ-সভায় প্রবেশ করেই আসন গ্রহণ না করে স্তম্ভিত হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, তাঁর জন্য নির্দিষ্ট

ভেলভেট-মোড়া সিংহাসনের কাছেও গেলেন না। দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে চারদিকে চাইতে লাগলেন। সভায় যে যার আসনে বসেছে, প্রকাণ্ড হলঘরখানা বহু লোকের সমাগমে গমগম করছে। সকলেই তাঁর বসবার জন্যে অপেক্ষা করছে। কিন্তু কী আশ্চর্য, কয়েক মিনিট চলে গেল, তরুণ জমিদারবাবু সভায় না বসে চুপ করে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন!

সবাই অবাক হয়ে গেল, হৈ-চৈ পড়ে গেল। অদ্ভুত ব্যাপার। ম্যানেজার ও আমলাবাবুরা মহা চিন্তিত এবং ভীত হয়ে পড়লেন। কি ত্রুটি হয়ে গেল, কি অপরাধ হয়ে গেল, কি জন্যে তরুণ জমিদারবাবু রুষ্ট হলেন,—কিছুই ঠিক করতে না পেরে সদর নায়েব (তখন ম্যানেজারকে 'সদর নায়েব' বলা হত) রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে এসে করজোড়ে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন।

রবীন্দ্রনাথ এইবারে পুণ্যাহ-সভা থেকে মুখ ফিরিয়ে সদর নায়েব মশাইকে বললেন, 'নায়েব মশাই, ব্যাপার কি? পুণ্যাহ-সভায় এমনি হরেক রকম বসবার ব্যবস্থা কেন? মানুষের বসবার জন্য এত বিভিন্ন রকম আয়োজন কেন?'

রবীন্দ্রনাথের এই প্রশ্নে অবাক হয়ে সদর নায়েব বললেন, 'এখানে পুণ্যাহ-আয়োজনে এই রকম ব্যবস্থাই তো চিরকাল চলে আসছে। মহর্ষিদেবের আমল থেকে এই রকম প্রথাই চলে আসছে যে, আপনার জমিদারির নায়েব, সদর ও মফস্বলের কর্মচারী, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, শূদ্র, চাষি, সদ্‌গোপ, চাঁড়াল—সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ প্রজা, মুসলমান প্রজা—এদের জাতি ও পদমর্যাদা হিসাবে বসবার ব্যবস্থা থাকবে। এই হচ্ছে এখানকার সভায় বসবার চিরপ্রচলিত প্রথা। নূতন কিছুই করা হয় নি।'

রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে বললেন, 'এমন একটা শুভ উৎসবেও আমাদের মিলনে এত বাধা, এত ভেদবুদ্ধি থাকবে কেন? দেখুন, আমার অনুরোধ, এই সব আসন উঠিয়ে দিন। আজকের দিনে এই উৎসবে আমরা সবাই একাসনে বসব। সেইটাই হবে আজকের এই শুভ উৎসবের সার্থকতা।'

সদর নায়েব খুবই আশ্চর্য হলেন। এত বড় সম্ভ্রান্ত অভিজাত তরুণ যুবক নিজের জমিদারিতে এসে যে এইরকম প্রস্তাব করতে পারেন, একথা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। কিন্তু তাঁকে তো জমিদারি চাল বজায় রেখে চলতে হবে, বিশেষত স্বয়ং জমিদারের উপস্থিতিতে সে সম্ভ্রম সাড়ে-ষোল আনা বজায় রাখতেই হবে। তাই তিনি একটু জোরের সঙ্গেই বললেন, 'এটা হচ্ছে জমিদারের একটা বিশিষ্ট আনুষ্ঠানিক দরবার। এখানে উচ্চ-নিচ, মানী-অমানী,

ব্রাহ্মণ, শূদ্র, মুসলমান একসঙ্গে বসবে কেমন করে? এই প্রাচীন রীতি তো বদলাবার কোনও উপায় নেই।'

রবীন্দ্রনাথ তখন বললেন, 'না না, তা হতেই পারে না। এটা আমাদের সকলের মিলন-সভা, এটা জমিদারি দরবার নয়। আমি বলছি, এসব আসন তুলে নিন।'

সদর নায়েব এসব কথাগুলো তরুণ জমিদারের ভাবাবেগ মনে করে বললেন, 'প্রিন্সের* আমলে, মহর্ষিদেবের আমলে যা হয় নি—আমি এত বয়স অবধি নায়েবি করে যা কখনও দেখি নি, তা তো হতে পারে না।'

পুণ্যাহের শুভক্ষণ প্রায় এসে পড়েছে। এমন সময়ে এ কী অভাবনীয় কাণ্ড! প্রজারা, জোতদারেরা সবাই একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। আমলা-বাবুরা অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সদর নায়েব আবার রবীন্দ্রনাথকে আসন গ্রহণ করতে বিনীতভাবে অনুরোধ করলেন। কিন্তু কিছুতেই রবীন্দ্রনাথ সে অনুরোধ রক্ষা করলেন না। তিনি স্থিরকণ্ঠে বললেন, 'না, আমি বসব না—কিছুতেই বসব না। এমন একটা উৎসবে কখনই এত বড় বিভেদ সৃষ্টি হতে দেব না। সাধারণ প্রজারা কি আজ অপমানিত হবার জন্যই এই শুভ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছে? আপনি এসব সরিয়ে নিন, সব একাসন করে দিন।'

সদর নায়েব তবু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এতদিনকার প্রাচীন প্রথা, —জমিদারি-সম্ভ্রম আজ একেবারে একদিনে নষ্ট হয়ে যাবে?

রবীন্দ্রনাথ এবারে কিছু উগ্রমূর্তি হয়েই বললেন, 'এ কখনও হতে পারবে না, সবার একাসন করে দিন—এই আমার হুকুম।'

সদর নায়েব নিরুপায় হয়ে সরে গেলেন। ভাবলেন একটু পরেই তরুণ জমিদারের ভাববিলাসিতা কেটে যাবে। বহু প্রজা, জোতদার, তরুণ জমিদার রবীন্দ্রনাথের অপরূপ রূপ আর মুখের মিষ্টি কথা শুনবার জন্য সে বারে নানা স্থান থেকে এসেছিলেন। তাঁরা ভিড় করে গোলমাল করতে লাগলেন। তরুণ জমিদারও যে তাঁর হুকুম তামিল না করিয়ে ছাড়বেন, এরকম ধারণাও কারও ছিল না—কিন্তু এতদিনকার প্রাচীন প্রথা!

রবীন্দ্রনাথ সদর নায়েবকে পুনরায় ডাকলেন। কিন্তু তিনি এসেই বললেন, তিনি সেদিনই চাকরিতে ইস্তফা দিতে চান। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য আমলারাও

* রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথকে ইউরোপের সম্ভ্রান্ত সমাজ 'Prince' বলেই ডাকতেন। তাই এদেশেও লোকে তাঁকে প্রিন্স দ্বারকানাথ বলত।

এসে জানালেন যে, তাঁরা ঠাকুরবাবুর চাকরি করে জাত-মান খোয়াতে কিছুতেই রাজি নন।

এইবারে রবীন্দ্রনাথ যথার্থ নিরুপায় হয়ে পড়লেন। তিনি জলদমন্দ্র কণ্ঠে সমস্ত আমলা ও প্রজাদের সম্বোধন করে বললেন, 'আজ এমন একটা উৎসবের দিনেও কি আমরা একত্র মিলিত হবার সুযোগ হারাব? এটা যদি সত্যিই উৎসব-সভা হয়, তবে এখানে এসেও আমরা পরস্পরে ভেদ সৃষ্টি করে আমাদের মধুর সম্পর্কটা নষ্ট করে দেব? না, তা হবে না। তোমরা আমার কথা শোন, সব চেয়ার সরিয়ে নাও। এস আমরা সবাই আজ একাসনে বসে আলাপ পরিচয় করি,—উৎসব করি। এস, সব সরিয়ে নাও।'

বিচিত্র ভোজবাজির মত কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রকাণ্ড হলঘরের চেয়ার, চৌকি ইত্যাদি অপসারিত হল। সমস্ত হলঘরে প্রকাণ্ড ফরাস পাতা হল, কেবল জমিদারবাবুর জন্য মধ্যস্থলে জরি ও ভেলভেটের কাজ-করা একটা গালিচা ও তাকিয়া দেওয়া হল।

রবীন্দ্রনাথ সবার আগে গিয়ে বসলেন। তিনি উচ্চহাস্যে হলঘর মুখরিত করে বললেন, 'সদর নায়েব মশাইকে ডাক, তোমরা সবাই এস, সবাই এখানে বস। এস আমরা সবাই পুণ্যাহের উৎসব করি।'

উৎসব সুসম্পন্ন হল। প্রজারা সেদিন কাতারে কাতারে কাছারিতে ভেঙে পড়েছিল। সেদিন ছোটবড় সমস্ত প্রজা রবীন্দ্রনাথের অপরূপ দেবমূর্তি দেখে আর তাঁর অমৃতকণ্ঠের বাণী শুনে তৃপ্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

সেইদিন থেকে পুণ্যাহ-সভায় তীব্র শ্রেণীভেদের ব্যবস্থা উঠে গেল। সেই-দিন থেকে পুণ্যাহ-সভায় প্রকাণ্ড ফরাস, আর জমিদারবাবুর বসবার জন্য গালিচা ও তাকিয়ার প্রবর্তন হয়েছে।

কানকাটা মোকদ্দমা

রবীন্দ্রনাথ সে সময়ে জমিদারি দেখাশুনা করতেন পদ্মার উপরে বোটে বাস করে। জমিদার হিসাবে তিনি পদ্মাতীরের অনেক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছেন দিনের পর দিন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'নৌকাডুবি' এবং কয়েকটি ছোট

গল্পের উপর পদ্মা নদীর ঐ সব স্মৃতির ছবি প্রত্যক্ষ দেখা যায়। সেই রকম একটা ব্যাপারের উল্লেখ করেছেন তিনি ১৩৪৪ সালের আশ্বিনের প্রবাসী পত্রিকাতে 'প্রচলিত দণ্ডনীতি' নামক প্রবন্ধে। ব্যাপারখানার আসল বিবরণটা বড় মজার এবং ঘটনাটা আমি জানি।

পদ্মায় প্রতি বছর শীতের গোড়ায় ইলিশ মাছ ধরবার এক বিরাট ব্যাপার হত, হয়তো এখনও হয়। ইলিশ মাছ ধরবার ঐ মরসুম উপলক্ষে প্রায় চার-পাঁচশো জেলে তাদের নৌকা নিয়ে দু-তিন দলে ভাগাভাগি হয়ে পদ্মার বুকে দেড় মাইল দু মাইল লম্বালম্বি বিরাট জাল ফেলে রাখে। প্রায় ১৫।১৬ ঘণ্টা পরে ঐ বিরাট জাল টেনে একটা নির্দিষ্ট ঘাটে গুটোতে থাকলে হাজার হাজার চকচকে রূপোর টাকার মত ইলিশ মাছ জালে লাফাতে থাকে। ঐ অসংখ্য ইলিশ তিন-চারখানা বড় নৌকায় বোঝাই করে নানান জায়গায় চালান দেওয়া হয়।

পদ্মাতীরের জমিদারি ঠাকুরবাবুদের, কিন্তু পদ্মার জলকরের মালিক আমলাসদরপুরের জমিদার গোপীসুন্দরী দাসী। গোপীসুন্দরীর জলকরের নায়েব ঐ জলকর আদায় করতেন, তদারক করতেন এবং জেলেদের উপর জুলুম করতেন। তিনি তাঁর বোটে করে ঘুরতেন, সঙ্গে থাকত বন্দুক ও কয়েকজন বরকন্দাজ। ইলিশ মাছের মরসুমেই তাঁর অত্যাচার চরমে উঠত। প্রতি নৌকা থেকে আট-দশটা করে ইলিশ তিনি জবরদস্ত আদায় করতেন। গরিব জেলেরা ভয়ে কোন কথা কইত না। কিন্তু সেবারে তাদের সহের সীমা অতিক্রম করায় নায়েবের বন্দুক ও লেঠেলের ভয়ে চুপ করে না থেকে তারা দলবদ্ধ হয়ে ঐ নায়েবের একটা কান কেটে দিল, আর লেঠেলদের মেরে তাড়িয়ে দিল।

রবীন্দ্রনাথ বোটে থেকে সব খবরই রাখেন। রোজই দেখেন, অসংখ্য জেলেডিঙি নানা গ্রাম থেকে কোশাকালি কোলের কাছে ভিড় করছে। মাঝিদের আলাপ-আলোচনায় বুঝলেন, এবারে নায়েবের সঙ্গে গোলমাল হয়েছে। গোপীসুন্দরীর নায়েব আইন বাঁচিয়ে ঠাকুরবাবুদের জমিদারিতে পা দেন না, পদ্মার উপরে বোটে বসেই জেলেদের উপর অত্যাচার করেন। জেলেদের নালিশ রবীন্দ্রনাথের কানে আসত, কিন্তু আইন অনুসারে কোন স্থায়ী প্রতিকার তিনি করতে পারেন নি।

সেদিন গভীর রাত্রে রবীন্দ্রনাথের বোটে প্রায় দুশো জেলে এসে হাজির।

তারা বলল, তারা এবারে প্রতিশোধ নিয়েছে। কিন্তু তাদের নামে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং দারোগা পুলিসে তাদের দু-তিনখানা গ্রাম ছেয়ে গেছে। পুলিস মেয়েদের উপরেও অত্যাচার করছে। তারা গাঁ ছেড়ে পালাবার আগে বাবুমশায়ের কাছে তাদের বিপদ জানাতে এসেছে।

সে সময়ে আমার জ্যাঠামশাই তারকনাথ অধিকারী পাবনা কোর্টের নাম-করা উকিল ও ঠাকুরবাবুদের আমমোক্তার ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাদের হাতে চিঠি লিখে তারকবাবুর কাছে পাঠালেন, পুলিসি নির্যাতন নিবারণের উদ্দেশ্যে। সে সময়ে তারকবাবু পাবনা ফৌজদারি কোর্টের শ্রেষ্ঠ উকিল। আমলাসদরপুরের জমিদার পক্ষে ছিলেন বোধ হয় পাবনার খ্যাতনামা উকিল রণজিৎ লাহিড়ী মশাই। বিরাট মামলা। লোকে লোকারণ্য এজলাশ। ত্রিশ-চল্লিশজন আসামি আর ঐ সংখ্যক সাক্ষী-সাবুদ; দর্শকরাও উত্তেজিত। ঐ কৌতূহলী মামলাকে ইংরেজি শিক্ষিতেরা বলতেন 'ইয়ার কাটিং মামলা'। ফরিয়াদি পক্ষের উকিল তারকবাবুর জেরায় বাদী পক্ষের সাক্ষী-সাবুদ জেরবার হয়ে গেল। কজনে কান কেটেছে, কি দিয়ে কেটেছে, কোন্ কোন্ আসামি কান কেটেছে— ইত্যাদি। সাক্ষীদের সব জবানবন্দি ভণ্ডুল হয়ে গেল। আসামিরা বেকসুর খালাস পেয়ে গেল। ইংরাজের আইন, উপযুক্ত প্রমাণের অভাব।

তারকবাবু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। দুজনে খুব আইনের কথা হল। তারকবাবু পুলিসি নির্যাতনের বিষয় হাকিমকে বেশ কড়াভাবে বুঝিয়েছেন, তাঁকে রবীন্দ্রনাথ খুব প্রশংসা করলেন। এই মামলার ফলে জলকর মহালের অত্যাচার চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। গোপীসুন্দরীর কানকাটা-নায়েব অপদস্থ হয়ে গোপনে চাকরি ছেড়ে বিদায় হলেন।

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উপন্যাস 'গোরা'র কাহিনীতেও প্রজাদের উপর ইংরেজ সরকারের এই রকম অত্যাচারের যে বর্ণনা আছে তার প্রত্যক্ষ অভি-জ্ঞতা মনে হয় কবি শিলাইদহের জমিদারি থেকেই পেয়েছেন। এই মোকদ্দমা জনসাধারণের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য ও হাসির খোরাক জুগিয়েছিল। জেলেদের নায়ক ছিল বুদ্ধিশ্বর হালদার। হালদার মশাই-এর চেহারাটা এখনও আমার চোখে ভাসছে।

পাণ্টি হাট

স্বদেশী আন্দোলনের (১৯০৫ সাল) অনেক আগেই স্বাদেশিকতা ও দেশ-গঠনের নানা চিন্তা রবীন্দ্রনাথের কবিমনকে আকৃষ্ট করেছিল। উনত্রিশ-ত্রিশ বৎসর বয়সে জমিদারির ভার হাতে পেয়ে তিনি পল্লীবাংলার যে রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন তারই উজ্জ্বল অভিব্যক্তি তাঁর বহু কবিতায় বিশেষত 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় ঘটেছে। পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনে সভাপতি হিসাবে দেশ-সংগঠন কার্যের জন্য নেতাদের নিকট তিনি গঠনমূলক আবেদন জানিয়েছিলেন।

স্মৃতির তলা থেকে এই সময়কার কর্মযোগী তরুণ কবি-জমিদারের জমিদারি জীবনের একটা চিত্র তুলে ধরছি।

রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক জমিদারির একটা বড় মহাল ছিল পাণ্টি ও বনগ্রাম। পাণ্টির হাট ছিল বিখ্যাত, সাধারণ হাট তো বটেই, তার উপরেও কাপড়-হাট, সুতাহাট আর গোহাট। পাণ্টির কাপড় ও সুতা-হাট তাঁর উৎসাহ ও মনোযোগ বেশি রকম আকৃষ্ট করেছিল। পাণ্টি হাটের চাদর, কাপড়, গামছা সেকালে সারা বাংলায় খুব প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি এই হাটের উন্নতির জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। সে সময়ে আমাদের দেশে কাপড়ের কল ছিল না, দেশের তাঁতিদের তৈরি কাপড়-চাদর লোকে আদর করত না, বিলিতি কাপড়-চাদরে দেশ ছেয়ে গিয়েছিল। লজ্জা নিবারণের ব্যাপারে দেশ ছিল পরমুখাপেক্ষী। তাই দেশের বস্ত্র-শিল্পের উন্নতি, কুটীর-শিল্প হিসাবে যতখানি উন্নত হতে পারে কলকারখানা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত, সেদিকে তাঁর প্রচণ্ড উৎসাহ ছিল। তিনি প্রায়ই পাণ্টি হাটে যেতেন তাঁর বজরায় এবং সেখানে ভাল তাঁতিদের পুরস্কার দেওয়ার, তাঁতের সরঞ্জাম কিনবার জন্য অর্থ সাহায্য করার, এবং তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রির ব্যবস্থা করতেন। কলিকাতায় ঠাকুর-পরিবারে ও তাঁর বন্ধুবান্ধব-দের মধ্যে তিনি পাণ্টিচাদর ব্যাপকভাবে প্রচলন করেছিলেন, নানাস্থানে ঐ সমস্তের পাইকারি বিক্রির ব্যবস্থাও করেছিলেন। সে সময় কুমারখালি রেল-স্টেশনে প্রতি হাটবারে (শুক্রবার) চাদর সুতা ইত্যাদির ক্রেতা ও বিক্রেতাদের অসম্ভব ভিড় হত। পাণ্টির মাল কুমারখালি হয়ে সারা বাংলা দেশে চলত।

পাণ্টি হাট ছিল গোরাই নদীর শাখা ডাকুয়া (ডাকাতিয়া) নদীর তীরে মস্ত বন্দর। রবীন্দ্রনাথ বোটে যাতায়াত করতেন। গোরাই ব্রীজের ধাক্কায়

একবার তাঁর বোট কী রকম বিপদে পড়েছিল তার বর্ণনা আছে 'ছিন্নপত্রে' (শিলাইদহ থেকে লেখা ১৮৯২ সালের ২০শে জুলাই-এর চমৎকার চিঠিখানিতে। ৬৭ নং পত্র)। তিনি পাণ্ঠি হাট নিয়ে কী রকম মেতেছিলেন তার নিদর্শন আমি দেখেছি শিলাইদহ সদর কাছারির 'পাণ্ঠি ফাইলের' বিচিত্র নকশা চিঠিপত্র ও রকমারি পরিকল্পনায়।

সে সময়টায় কিছুদিন কুষ্টিয়ার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন একজন সাহেব। আবার কুষ্টিয়ার রেলস্টেশনের স্টেশন-মাস্টার ছিলেন যুদ্ধফেরত একজন খোঁড়া ইংরেজ, বেশ সদালাপী; আমি তাঁকে দেখেছি। যুদ্ধে তিনি একখানা পা হারিয়েছিলেন।

কুষ্টিয়ার ইউরোপীয়ান ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথের উপরে খুব বিরক্ত ছিলেন, কারণ কবি-জমিদার নাকি অনেক ডাকাতকে মাইনে দিয়ে এস্টেটে বরকন্দাজ পদে নিযুক্ত করে গ্রামের যুবকদের লাঠি বর্শা ইত্যাদির ব্যবহার শেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। পাণ্ঠি হাটের জন্য তাঁর উৎসাহটাও সাহেব ভাল চোখে দেখতেন না, কারণ বিলিতি কাপড়ের প্রচলন বেশ কিছুটা কমে এসেছিল। তবু সাহেব প্রকাশ্যে বাধা দিতে পারতেন না। পরে তিনিই আবার শিলাইদহে গিয়ে তরুণ জমিদারের নানা সংগঠন কাজে ও কবি-জমিদারের সঙ্গে আলাপে মনে মনে তৃপ্তি লাভ করতেন। সে সময়ে আধুনিক জমিদারদের মত কবি হাকিম-হুকুমের বড় তোয়াক্কা করতেন না, তবে ভদ্রতা ও খাতির রক্ষা করতেন।

তখন জেলা ও মহকুমা হাকিমদের নিজ নিজ এলাকায় নিয়মিত পরিদর্শনের (Inspection Tour) নিয়ম ছিল। কুষ্টিয়ার সাহেব-হাকিম একবার পাণ্ঠি হাট পরিদর্শন করে খুব খুশি হয়েছিলেন। সেখানে পাণ্ঠি হাটের মুসলমান ইজারাদারের (তার নামটা মনে নেই) সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। লোকটা খুব মজার মজার কথা বলত। ইংরাজিতে 'মাই লর্ড', 'ইয়োর অনার', 'কাইগুলি' ইত্যাদি বলে সাহেবকে মুগ্ধ করেছিল। তার এক ভাই কুষ্টিয়ার কোর্টে মোক্তারি করত। ঐ ইজারাদার কবির নানা কাহিনী সাহেবকে শুনাত। এতে সাহেব মনে মনে দস্তুরমত রবীন্দ্রভক্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং একবার নিজে পাণ্ঠি হাট থেকে ২৫।৩০ টাকার চাদর কিনে এনেছিলেন নিজের ব্যবহারের জন্য। এদিকে মহকুমার চুরি ডাকাতির সংখ্যা অনেক কম হওয়ায় সাহেব-হাকিম মনে মনে তরুণ জমিদারের উপর খুব শ্রদ্ধান্বিত হয়ে পড়েন।

স্বাধীন গুণগ্রাহী খাস বিলাতি হাকিম। কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুরবংশের

অনেক কথা শোনেন। হঠাৎ একদিন এক চিঠি লিখে চাপরাসি পাঠিয়ে সাহেব তাঁর কুষ্টিয়ার বাংলোতে তরুণ কবিকে নিমন্ত্রণ করে বসলেন। কবির সম্বর্ধনার জন্য নিজ বাংলাতে বেশ কিছু আয়োজনও করে ফেললেন।

চিঠি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ অবাক হলেন এবং বোধ হয় তাঁর আভিজাত্যবোধও জেগে উঠল। তিনি ঐ চিঠির জবাবে লিখলেন যে তিনি ঐ দিন বিশেষ জরুরি কাজে কুষ্টিয়ার স্টেশন হয়ে কলিকাতা চলে যাচ্ছেন, তাই সাহেবের সাদর আমন্ত্রণ রক্ষা করতে না পেরে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত। মনে রাখা দরকার, সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের জগৎ-জোড়া খ্যাতি হয় নি, তিনি তখন একজন কবি ও সাধারণ জমিদার মাত্র।

সাহেব হাকিম কিন্তু নাছোড়বান্দা। ঐ দিন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বোটে কুষ্টিয়া স্টেশনে পৌঁছিবামাত্র দেখেন যে নদীর ঘাটে স্টেশনের কাছে বিরাট জনতা, এমন কি স্টেশনে প্ল্যাটফরমেও অসংখ্য লোক-সমাবেশ। স্বয়ং সাহেব-হাকিম সদলবলে সরকারি আমলাদের নিয়ে ফুলের তোড়া মালা ইত্যাদি নিয়ে সেখানে উপস্থিত। খোঁড়া সাহেব স্টেশনমাস্টারও লাঠি ভর দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছেন। কুষ্টিয়ার সরকারি কর্মচারিগণ বাদেও উকিল মোক্তার জমিদার ইত্যাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ বহু কষ্টে স্টেশনে এসে পৌঁছুলেন। স্টেশনে এত বড় জনতা কি জন্য তা বুঝতে পারলেন না।

ডাউন চিটাগাং মেল স্টেশনে এল। ট্রেনের যাত্রীরাও স্টেশনে ও চারিদিকে অসম্ভব ভিড় দেখে ট্রেন থেকে নেমে পড়লেন। রবীন্দ্রনাথ স্টেশনে পৌঁছে সকলের সঙ্গে করমর্দন করে সাহেব হাকিমের দেওয়া মালা পরলেন। সবার সঙ্গে সামান্য আলাপ-পরিচয় করলেন। প্রায় ১৫।২০ মিনিট দেরি হল ট্রেন ছাড়তে। সাহেব-হাকিম একটু অন্তরঙ্গ আলাপ-পরিচয়ের জন্য কবির সঙ্গে পোড়াদহ স্টেশন পর্যন্ত এসে কবিকে এগিয়ে দিলেন।

রবীন্দ্রনাথের বড় সাধের পাণ্টি হাট দশ পনেরো বছর পরে এস্টেটের আমলাদের অব্যবস্থায় ও কুমারখালির তিলি জমিদারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভেঙে যাবার উপক্রম হয়েছিল এবং তা নিয়ে মামলামোকদ্দমাও চলেছিল। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, তাঁর আমলাদের অত বড় একটা হাট চালাবার মত যোগ্যতার অভাব। তিনি ঐ মামলার নিষ্পত্তি করে দেন ও কুমারখালির ফটিক মজুমদার তাঁর ঐ বহু পরিশ্রমের কাপড় ও সুতাহাটার মালিক হওয়ায় সন্তুষ্ট হন ; তাঁদের সেরকাঁদির জোতের আদায়পত্রের ভারও তিনি ফটিক মজুমদারকে অর্পণ

করেন। ঐ সেরকাঁদি মৌজার লভ্যাংশ শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়ে প্রতি-বৎসর পাঠান হত। সেই সময় থেকে পান্টির কাপড় ও সুতাহাটা বিরাট আকারে বসালেন ফটিক মজুমদার নিজে কুমারখালি সহরে। রবীন্দ্রনাথের সংগঠন-শক্তি ছিল অসাধারণ। তাঁর নিজের হাতে গড়া পান্টি হাট উন্নত হচ্ছে জেনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তাঁর পান্টির সুতাহাটা তাঁর হাতছাড়া হলেও তিনি বিন্দুমাত্র দুঃখিত হন নি।

* পান্টীর পাশেই গোরাই নদীর তীরে একটা বড় মহাল। এর মুনাফা ছিল প্রায় তিন শ' টাকা।

অবিস্মরণীয় কাহিনী

শিলাইদহে সদর কাছারির খাজাঞ্চি স্বর্গীয় হরমোহন নন্দী তেইশ বছর বয়সে এস্টেটের কাজে যোগদান করেন। সুদীর্ঘ সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত খাজাঞ্চিগিরি করে পেন্‌সন পেতেন। তাঁর মৃত্যু হয় ৭৬ বছর বয়সে, সম্ভবত ১৩২৮ সালে। তাঁর ছেলে, আমার বাল্যবন্ধু, রমণীমোহন নন্দী পিতার পদাধিষ্ঠিত হন। আমার পিতৃবন্ধু হরমোহন নন্দী আমায় খুব স্নেহ করতেন এবং অবসর পেলেই আমাকে অনেক পুরোনো কালের সত্য কাহিনী বলতেন। আমি তখন ৩১ বছরের যুবক। তাঁর কথিত সেই সব কাহিনী কিছু লিখেছি, কিন্তু একটি কাহিনী প্রামাণিকতার অভাবে হয়ত পাঠক পাঠিকার বিশ্বাসযোগ্য হবে কিনা সন্দেহে এ পর্যন্ত প্রকাশ করতে সাহসী হই নি। আজ জীবন-সায়াহ্নে এসে সে পুরানো সত্য কাহিনী বিশেষ মূল্যবান মনে করে, আমার নিজের বিশ্বাসকে সম্বল করে প্রকাশ করছি।

সুরেন্দ্রনাথের অভিষেক

রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা ভারতের প্রথম সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথও পৈতৃক জমিদারির মালিক ছিলেন। তাঁর একমাত্র পুত্র কলিকাতা হিন্দুস্থান সমবায় ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (খুড়া রবীন্দ্রনাথের চেয়ে এগারো বছরের ছোট) বিলাতে সুশিক্ষিত শিল্পরসিক অর্থনীতিবিদ বৈষয়িক ব্যক্তি ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরবংশের একজন উজ্জ্বল রত্ন, কিন্তু তাঁর পরিচয় আজ প্রায় অজ্ঞাত। পিতা সত্যেন্দ্রনাথ জজিয়তি থেকে অবসর গ্রহণের পর (এবং পূর্বেও) পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তির কোন খোঁজখবর রাখতেন না, কারণ তিনি মোটা টাকা পেন্‌সন পেয়ে প্রথমে বোম্বাই প্রদেশে ও পরে রাঁচি মোরাবাদি পাহাড়ে সস্ত্রীক বাস করতেন এবং জমিদারির মালিক হয়েও জমিদারি থেকে এক পয়সাও নিতেন না, বরং একমাত্র পুত্রের উপরেই নির্ভর করতেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন নিজ পুত্র রথীন্দ্রনাথকে (আমেরিকা থেকে ফেরার পরে) জমিদারির কাজ শিক্ষার জন্য শিলাইদহে নিয়ে যান, তখন যুবক সুরেন্দ্রনাথকেও (রথীন্দ্রনাথের চেয়ে ১৬ বৎসরের বড়) শিলাইদহে নিয়ে যান ঐ উদ্দেশ্যে। এইখানে বলে রাখি, যখন রবীন্দ্রনাথ ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে শিলাইদহ অঞ্চলে পাট, ভুষো মাল ও আখমাড়াই কলের ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হন তখন সুরেন্দ্রনাথও ঐ অব্যবসায়ী ব্যবসায়ে কর্ণধার হতে গিয়ে বানচাল হয়ে যান, কারণ তখন তিনি কলিকাতায় হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্সের ভাবনায় মত্ত (দ্রঃ যজ্ঞেশ্বরের সিদ্ধিলাভ কাহিনী)। যা হক, এবারেও কর্তব্যবোধে রবীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথকে শিলাইদহে আনলেন পুত্র রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে জমিদারির শিক্ষানবিশি করতে। দুই ভাই শিলাইদহেই থাকেন ; কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ নানা কাজে প্রায়ই কলিকাতা ছুটাছুটি করতেন, অথচ রথীন্দ্রনাথ সর্বদাই আপিস-কাছারি নিয়ে ব্যস্ত। প্রজাসাধারণের মনে কেমন একটা সন্দেহ হল যে সুরেন্দ্রনাথের ব্যাপারটা লোক-দেখানো কৌশল মাত্র। মনুষ্যচরিত্রাভিজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ ভাবটা টের পেলেন। সত্যই সুরেন্দ্রনাথের হাতে দুই জমিদারির পরিচালনের ভার দেওয়া হয়েছিল ; এ বিষয়ে প্রামাণিক কাগজ পেয়েছি।

খাজাঞ্চিবাবু বললেন—হঠাৎ একদিন কুঠিবাড়িতে একটা উৎসবের আয়োজনের মত মনে হল। ব্যাপারটা ম্যানেজারবাবু ভিন্ন আর কেউ বুঝতে পারলেন না। ষোল বেহারার বড় পালকিটা বের হল, কুষ্টিয়া থেকে ব্যাগ্-পাইপের দল আনা হল, সদর কাছারি সাজাবার হুকুম হল। খুব ভোরে সুরেনবাবু স্নান করে গরদের ধুতি পাঞ্জাবি চাদর পরে ফুলের মালা গলায় দিয়ে সুসজ্জিত পালকিতে চেপে বসলেন। বিশ-ত্রিশ জন বরকন্দাজ ও বাদ্য-ভাণ্ডসহ সুরেনবাবুকে নিয়ে পালকি চলল গ্রামের অধিষ্ঠাতা দেববিগ্রহ গোপীনাথ মন্দিরে। তিনি গোপীনাথের আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন। গ্রামের কেন্দ্রস্থলে গোপীনাথ মন্দির, গ্রামময় হৈ চৈ পড়ে গেল। ব্যাপার কি? শেষ পর্যন্ত বোঝা গেল সুরেনবাবুর অভিষেক!

এইখানে প্রসঙ্গত কিছু কথা বলা আবশ্যক। শিলাইদহ ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির অধিষ্ঠাতা দেববিগ্রহ গোপীনাথজির সেবাপূজা পরিচালিত করতেন ঠাকুর-জমিদার, সেবাইত সূত্রে। হিন্দু সম্প্রদায়ের ধনী-নির্ধন সকল গৃহস্থের এই সুপ্রাচীন প্রথা ছিল যে, বিবাহ ও অন্নপ্রাশন (বিজয়াদশমীর দিনও বটে) উপলক্ষে বর-কনে এবং শিশু পুত্র বা কন্যা গোপীনাথ ঠাকুরের মন্দিরে শোভা

যাত্রা করে গিয়ে দেবতার নির্মাল্যআশীর্বাদী গ্রহণ করে বিবাহযাত্রা করবে বা অন্ন মুখে দেবে। সে প্রথা এখনও চলছে। ঠাকুর-পরিবার ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী হলেও গ্রামীণ ঐ প্রাচীন প্রচলিত ঐতিহ্য সংস্কার বা প্রথা মান্য করতেন প্রজাদের মতই। রবীন্দ্রনাথ গোপীনাথ মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতেন জুতো বাইরে রেখে, খালি পায়ে। এলম্‌হার্স্ট সাহেব জুতো ছেড়ে গোপীনাথ মন্দিরের কাজ দেখতেন। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ নববধূসহ শিলাইদহে এসে প্রথমেই গোপীনাথের আশীর্বাদ গ্রহণ করেছিলেন, এ ঘটনা আমরা দেখেছি। প্রণামী ছিল একটাকা বা আট আনা, আশীর্বাদী ছিল, চরণামৃত গ্রহণ ও 'লাল্‌চি' (হিন্দুদের পূজায় লাগে শিবের 'জোড়') মাথায় বেঁধে বিগ্রহ প্রণাম করা। এ কাজটা পুরোহিতরা করে দিতেন। নিত্য ভোগের জন্য ধনীরা পৃথক ভাবেও টাকা দিতেন।

সুরেন্দ্রনাথ পালকি চেপে শোভাযাত্রায় সারা গ্রাম সচকিত করে সদর কাছারিতে এলেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে আগে থেকেই তাঁর প্রতীক্ষা করছিলেন। ম্যানেজারবাবু মাল্যদান ও প্রণাম' করে অন্যান্য আমলাগণসহ সুরেন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানালেন, রবীন্দ্রনাথ ভাইপোকে কপালে চন্দন ও ধানদূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। দুজনেই কুঠিবাড়িতে পালকি চেপে চলে গেলেন। অভিনব অনুষ্ঠানটিতে কোন আড়ম্বর ছিল না। কোন ভোজ হল না। তবে ছোট বড় প্রত্যেক আমলার বাড়িতে একটা করে ইলিশ মাছ আর এক কাত্‌রা (ভাঁড়) দই দেওয়া হল, বরকন্দাজরা ভোজ খেল।

সুরেন্দ্রনাথই (সত্যেন্দ্রনাথের জীবিত কালে) শেষ জমিদারি পার্টিসনে (১৩২৩) শিলাইদহ জমিদারির ও রবীন্দ্রনাথ কালীগ্রাম জামিদারির মালিক হন। ভাইপো সুরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কৈশোর ও যৌবনের পরম সুহৃদ ও অন্তরঙ্গ কর্মীবন্ধু ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের জীবনী এই ক্ষুদ্র পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। 'বিসর্জন' নাটক রবীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথকেই কবিতায় উৎসর্গ করেন— 'তোরি হাতে বাঁধা খাতা, তারি শ-খানেক পাতা, অক্ষরেতে ফেলিয়াছি ঢেকে'…আবার যৌবনে নাসিক থেকে হিন্দী-বাংলায় মিশিয়ে সুরেনবাবুকে চিঠি লেখেন (জুন, ১৮৮৬)—

কলকত্তামে চলা গয়ো রে সুরেনবাবু মেরা,
সুরেনবাবু, আসল্‌ বাবু সকল বাবুকো সেরা।

সুরেন্দ্রনাথ 'বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ' মাত্র একখানি বাংলা বই লিখে

গেছেন। রবীন্দ্রনাথের বহু গান, কবিতা ও উপন্যাসের ইংরাজি অনুবাদ করেছেন। তাঁর আরও কিছু সংকলন বই এখন দুষ্প্রাপ্য।

শিলাইদহে রাখিবন্ধন উৎসব

আমি তখন স্থানীয় ইস্কুলের ছাত্র, বয়স বোধহয় দশ-এগারো। সালটা ঠিক বলতে পারব না। রবীন্দ্রনাথ একবার শিলাইদহে 'রাখিবন্ধন উৎসব' করেন। তখন গ্রামের ফণী চৌধুরী, মুকুন্দ কর্মকার, ভবানী আচার্য, অচিন্ত্য ও অনাদি অধিকারী, স্বরেন ঘোষ, অজিত নন্দী, জটা মজুমদার, প্রফুল্ল (বুদেদা) মজুমদার, অমূল্য শিকদার, ধীরেন অধিকারী (অনুদা) প্রভৃতি গ্রামের 'সিনিয়র ব্যাচ', আর আমরা খগেন অধিকারী, প্রফুল্ল আচার্য প্রভৃতি 'জুনিয়র ব্যাচ'—আমরা বৈশাখ ও কার্তিক পুণ্যমাসে নগর-সংকীর্তন বের করি, 'আমার সোনার বাংলা' ইত্যাদি স্বদেশী গান করি। সেবারে মহাসমারোহে রাখিবন্ধন উৎসবের আয়োজন। বিরাট গানের দল, খোল-করতাল বাদেও হারমোনিয়ম ও ফ্লুট ইত্যাদি সহ 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানে সারা গ্রাম প্রকম্পিত, সঙ্গে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি,'ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই' বলে হাতে হাতে রাঙা রাখিবন্ধন। সব বাড়িতে রান্না নিষেধ, লাল নিশান আর ফুলের মালার ছড়াছড়ি। সবার কাঁধে গামছা, বিরাট গানের দল বাজার ও হাট পরিক্রমা করে পদ্মাতীরে হানিফের ঘাটে বোটে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিত হব, তাঁর গান ও বক্তৃতা শুনব আর বাঁধব রাঙা রাখি তাঁর হাতে সবাই মিলে।

পাউডার, বেলোয়ারি চুড়ি আর বিলিতি কাপড় আমাদের আক্রমণের লক্ষ্য। খোরসেদপুর বাজারে কয়েক বস্তা পাউডার গোপীনাথ দিঘিতে ফেলে দেওয়া হল, কাচের চুড়ি ভেঙে ছড়ান হল। তারপর গ্রাম কাঁপিয়ে কীর্তনের দল চলল শিলাইদহ কুঠির হাটে। তখন শিলাইদহ কুঠির হাট বেশ বড় গঞ্জ। হাটে গিয়ে অন্য সব কৃত্য সেরে নবদ্বীপ চাকীমশায়ের গদিতে পাওয়া গেল একগাদা লাট্টুমার্কা বিলিতি কাপড়। সেগুলো জোর করে টেনে বের করে পুড়িয়ে পদ্মার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হল, চাকীমশায়ের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও।

আমাদের দল তখন চলল হানিফের ঘাটে। রবীন্দ্রনাথ বোট থেকে নেমে হাসিমুখে 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' গানটি গাইলেন, আমাদের মুকুন্দ দাদাদের দল পাছ-দোহার গাইলেন। 'বন্দে মাতরম্'-এর সঙ্গে সহস্র কণ্ঠে 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গান সেই শরতের সোনার রোদে পদ্মাতীর প্রকম্পিত করে তুলল। গ্রামের সমস্ত মেয়ে সেদিন এই উৎসবের জন্য পদ্মা-তীরে স্নানের জন্য সমবেত; তাঁদের কলকণ্ঠের হুলুধ্বনিতে পদ্মানদী শিউরে কেঁপে উঠল। গ্রামের হিন্দু-মুসলমান, ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি, চাষি-ভদ্র হাজারে হাজারে হানিফের ঘাটে ও চরে ভিড় করেছে, বহু ডিঙি ও পানসি নৌকায় পদ্মার জল দেখা যাচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথ বললেন, আমাদের সোনার বাংলাকে কার সাধ্য ভেঙে দু ভাগ করবে। হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই এক ঠাঁই বলে বক্তৃতা দিলেন; আমরা তাঁর দু হাতে এক গাদা রাঙা রাখি বেঁধে দিলাম। ইতিমধ্যে মারমুখো চাকীমশাই হাজির, সঙ্গে সঙ্গে নালিশ,—তাঁর অনেক টাকার কাপড় পোড়ান হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ খুব উত্তেজিত হয়ে আমাদের কাজের নিন্দা করলেন, 'দেশের লোককে কাপড় পরাবার ক্ষমতা নেই, তাদের লজ্জা নিবারণের বস্ত্র পোড়ান মূর্খতা! দেশে এত তাঁতি জোলা থাকতে ম্যাঞ্চেস্টারের মুখ চেয়ে থাকতে তোমাদের লজ্জা করে না? ঘরে ঘরে তাঁত চালাও, কিসের অভাব আমাদের? কলের তাঁত বসাও, কেউ বিলিতি কাপড় আমদানি করবে না। চাকীমশাই তোমাদের গুরুজন, তাঁর কাছে এই অন্যায়ের জন্য ক্ষমা চাও।' তাই করা হল। দাদারা খুব খুশি। সেইবারেই গ্রামের পুরানো থিয়েটারের সিন ড্রেস, যা কাছারির বারান্দায় বাঁধা ছিল সেগুলো আমাদের প্রার্থনামত আমাদের দেওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল এবং গ্রামে 'বঙ্গলক্ষ্মী নাট্যসমাজ' নামে নাটকের দল গড়বার বিরাট ব্যবস্থা হল।

জোড়াসাঁকো নয়

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু, শিল্পী সুরেন কর ও মুকুল দে ১৯১৫/১ ফেব্রুয়ারি [র. জী. ২ / পৃ ৪০৩] সালে শিলাইদহে গিয়েছিলেন পদ্মাতীরে শিল্পচর্চা

করতে। তাঁরা তিনজন থাকতেন চিত্রা বোটে নিজেদের তুলি কলম নিয়ে আর রবীন্দ্রনাথ থাকতেন তাঁর পদ্মাবোটে হানিফ চাচার ঘাটে। নন্দবাবুরা অনেক ছবি এঁকেছিলেন সে বারে। নন্দবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় শান্তিনিকেতনে ১৯৪৪ সালে, তখন আমি শান্তিনিকেতনের কর্মী। তিনি আমার কয়েকখানা বই-এর জন্য অনেকগুলি স্কেচ ও ছবি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দিয়েছিলেন। সেগুলি আমার বই ক'খানার অনেক কাহিনী অপূর্বভাবে পরিস্ফুট করেছে। তিনি নিজের দেখা কয়েকটি কাহিনীও বলেছিলেন, তা আমি গ্রন্থস্থ করেছি। নন্দবাবু শিলাইদহের গ্রাম, পদ্মা ও প্রজাদের নানা দৃশ্যে, আচার-ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, 'বীরভূমের নীরস কঙ্করময় গাছপালাহীন রুক্ষতার সঙ্গে পূর্ববঙ্গের নদীতীরের শিলাইদহের মনোরম শ্যামশ্রীর তুলনা হয় না।'

তাঁরা ছিলেন বোধ হয় একমাসের উপর। ঐ পর্বে শান্তিনিকেতনের অনেক কর্মী, অজিত চক্রবর্তী, জগদানন্দবাবু প্রভৃতিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আনন্দলোক শিলাইদহে আমন্ত্রণ করে আনতেন শিলাইদহের সৌন্দর্য উপভোগের জন্য। নন্দবাবু বলেছিলেন, 'সন্ধ্যাবেলায় আমাদের জলখাবারের জন্য প্রায় প্রত্যহ গোপীনাথ মন্দির থেকে শীতলীপ্রসাদ আসত। ক্ষীর, ছানা, সন্দেশ, কলা, নারকেলকোরা, তরমুজ, মুগডাল ভেজা ইত্যাদি খেয়ে আমাদের শরীর বেশ তাজা হয়ে উঠেছিল। টাট্‌কা ইলিশমাছ প্রায় প্রত্যহ খেতাম; কাছিমের ডিমও বরকন্দাজরা এনে দিত। বোট থেকে তীরে নামাওঠার জন্য দুখানা তক্তা পাশাপাশি সাজিয়ে দেওয়া হত। অনভ্যাসবশত নামতে উঠতে আমাদের পা টিকটিক করত। তাই দেখে একদিন গুরুদেব হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'এ কিন্তু সহরে জোড়াসাঁকো নয় পাড়াগেঁয়ে নদীর জোড়া সাঁকো—সাবধানে নামাওঠা করো।' তখন তাঁকে আমরা পেয়েছিলাম ঘরের মানুষের মত। হাসি-ঠাট্টা গল্প-গুজব, গান-কবিতা অনর্গল চলত। তখন কবি-প্রিয়া পরলোকে, তাই আমাদের খাওয়াদাওয়ার অসুবিধার জন্য কবি অনুযোগ করতেন। কিন্তু আমাদের আহারের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য ছিল খুবই। কিন্তু তিনি নিজে খুব মিতাহারী ছিলেন। নিজে খেতেন মাগুর বা কইমাছের ঝোল ভাত, বুনোরা এনে দিত। ফটিক ফরাস তাঁর রান্না করত। গুরুদেবের বোটে প্রায়ই প্রজাদের খুব ভিড় হত, মহালেও ঘুরতেন। রাত্রে প্রায়ই (বিশেষ, জোছনা রাত) চরে বেড়াতেন, আমরাও মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গী হতাম। ঐ ছবি আমি এঁকেছি

একখানা। আমলাবাবুরা প্রায়ই আমাদের খবরদারি করতেন, অনেক আখ পাঠিয়ে দিতেন, ওখানকার আখ এত মিষ্টি আর নরম যে এমন কোথাও দেখি নি।

গোপীনাথ দেবের সেই পুরানো রথের আটখানা কাঠের তৈরি পুতুল (কৃষ্ণলীলা) ওখানে নষ্ট হচ্ছে। ওগুলো শান্তিনিকিতনে আনার জন্য তিনি আমায় বিশেষ অনুরোধ করেন। আমি শেষবার বাড়ি গিয়ে দেখি— উই পোকায় সবগুলো সাবাড় করে দিয়েছে।'

একদিন নন্দবাবু বললেন, বিশ্বভারতী তাঁর অবসর মঞ্জুর করলে তিনি দু-একমাস পদ্মাতীরে বাস করতে অভিলাষী। মাঝারি গোছের একখানা পানসি ভাড়া করলে বেশ হবে। আমি সানন্দে অনুমোদন করেছিলাম। কিন্তু তাঁর আশা পূর্ণ হল না, কারণ তখন বিশ্বভারতী তাঁর অবসর মঞ্জুর করল না, অন্যদিকে শিলাইদহও পাকিস্তানভুক্ত হয়ে গেল। শিলাইদহে আঁকা তাঁর আরও অনেক ছবি ছিল, আমাকে দিতেও চেয়েছিলেন, কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেল না।

চুঁয়াপাড়ার নায়েব

প্রমথ চৌধুরী মশাইকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানা চিঠিতে (চিঠিপত্র-পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৭) চুঁয়াপাড়ার প্রজাদের বিষয় বলেছেন। চিঠিখানা প্রজা-দরদি রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের আন্তরিক বেদনায় পরিপূর্ণ। এই চুঁয়া-পাড়া মহালটি শিলাইদহ (বিরাহিমপুর) জমিদারির অন্তর্গত, এখানে একটি বড় কাছারি ছিল। আমি এই কাছারিতে একবার পরিদর্শনের (তুমার) জন্য একমাস ছিলাম। মহালটি কুষ্টিয়া সহরের খুব কাছে, মাঝে গোরাই নদী। এখানে থাকবার সময়ে নিকটবর্তী শুকদেবপুর গ্রামের একজন খুব প্রতিপত্তিশালী প্রজার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। ভদ্রলোকটি একাধারে তালুকদার, ডাক্তার, আবার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, আমাদের অধীনেও তাঁর দুটি বড় জোত ছিল। তিনি পুরানো কালের গল্প বলতেন। তার মধ্যে একটি কাহিনী আমার বিস্মৃতির তলা থেকে কুড়িয়ে এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

সে সময়ে পাশাপাশি পদ্মা ও গোরাই নদীর অবস্থিতির জন্য এই ডিহিটা খুব বড় লাভের সম্পত্তি ছিল। তখনকার নায়েব ছিলেন শিলাইদহের একজন সুচতুর প্রৌঢ় ভদ্রলোক। নায়েবটি ছিলেন ধুরন্ধর চাণক্য-মার্কা; রবীন্দ্রনাথ তখন সবেমাত্র জমিদারির ভার নিয়েছেন, বয়সে তরুণ। মাসিক সংক্রান্তি চালান (প্রতি মাসের মাসকাবারে যে পরিমাণ টাকা সদর কাছারিতে ইরসাল বা পাঠাবার রীতি ছিল) বাবদ তিন বা সাড়ে তিন হাজার টাকা কাছারিতে মজুত হয়েছে। চুঁয়াপাড়া কাছারিটা কাঁচাবাড়ি, মেঝে সানবাঁধান নয়। কাছারি ঘরে নায়েবের তক্তপোষের পাশে লোহার সিন্দুকে টাকাকড়ি রাখা হত। চালান পাঠাবার ঠিক আগের রাত্রে সেই লোহার সিন্দুক ভেঙে ঐ টাকা উধাও অর্থাৎ ডাকাতি হয়ে খোয়া গিয়েছে বলে নায়েবমশাই জরুরি রিপোর্ট পাঠালেন শিলাইদহ সদর কাছারিতে, এদিকে কুষ্টিয়া থানাতেও খবর দিয়েছেন ভোরেই।

কাছারি ঘরের কাঁচা মেঝেতে সিঁদ কেটে লোহার সিন্ধুক ভেঙে অতগুলি টাকা ডাকাতি! সেকালে নোটের বেশি প্রচলন হয় নি। চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল। ম্যানেজার রবীন্দ্রনাথকে এই দুঃসংবাদ জানালেন এবং বললেন, এর মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। রবীন্দ্রনাথ কুষ্টিয়া ম্যাজিস্ট্রেটকে বিষয়টা ভালভাবে তদন্তের জন্য অনুরোধ করে জরুরি চিঠি পাঠালেন ঘোড়-সোয়ার মারফত।

যথাকালে বড় দারোগা এসে তদন্ত করলেন। নায়েব প্রমাণাদি সব উপস্থিত করলেন। দারোগা নায়েবের চাতুরি ধরে ফেললেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল, কিন্তু টাকা পাওয়া গেল না। সেদিনই পুলিস বিকালে অনুসন্ধানে খোঁজ পেল যে, দূরে পদ্মার মধ্যে ধানবোঝাই একটি নৌকার পাটাতনের তলায় টাকা লুকিয়ে রাখা সম্ভব। পুলিস সদলবলে সেই নৌকা আটক করবার আগেই সে নৌকা যেন হাওয়ায় উধাও হয়ে গেল। পুলিস তবুও চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু টাকা পাওয়া গেল না কিছুতেই। প্রৌঢ় নায়েব খুব কাঁদাকাটি করতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথ দয়াপরবশ হয়ে মামলা-মোকদ্দমা না করে তাঁকে ছেড়ে দেবার জন্য পুলিসকে অনুরোধ করায় নায়েব মুক্তি পেলেন, কিন্তু তাঁর চাকরির জবাব হয়ে গেল।

সেকেলে জমিদারি আমলাদের এই রকম অনেক কীর্তি-কাহিনী শোনা যায়। তাঁদের অনেকে বিলাসী জমিদারদের হাতের মুঠোর মধ্যে রাখতেন

বেমালুম অপরাধ এড়িয়ে। ঐ নায়েব মশাই এই ব্যাপারের এক মাসের মধ্যেই মারা গেলেন। তিনি বেশ কিছু সম্পত্তি রেখে যান। চুঁয়াপাড়ার প্রজারা একবার তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল ; সেবারে জমিদার-পক্ষ তাঁকে সাবধান করে দিয়ে বহাল রেখেছিলেন।

শিলাইদহে শেষবার

১৩২৮ সালের ৮ই চৈত্র রবীন্দ্রনাথ শেষবার তাঁর সাধের জমিদারি ও সাহিত্য-সাধনার তীর্থস্থান পদ্মাপ্রবাহচুম্বিত শিলাইদহে যান তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ আমন্ত্রণে। ঠাকুর-পরিবারের বৈষয়িক পার্টিসন অনুসারে সে সময় সুরেন্দ্রনাথই শিলাইদহের জমিদার। রবীন্দ্রনাথ তার মালিক ছিলেন না। তাঁর জমিদারি পৃথক হয়েছিল কালীগ্রামে, উত্তরবঙ্গের রাজসাহী জেলায়। কঠিন বাস্তবতার ভূমিতে তিনি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শিলাইদহে বিস্তীর্ণ চরঅঞ্চলে প্রজাবিদ্রোহের অবসান করা। জমিদারির ভাবনা-চিন্তা তখন কবি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। তখন তিনি বিশ্বকবি, দেশবিদেশের সম্মান ও শ্রদ্ধার মুকুট তাঁর মাথায়, ভারতবর্ষের বহু গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যভার তাঁর উপরে। কবির সঙ্গে গিয়েছিলেন দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ।

শিলাইদহ চরের প্রজা ইসমাইল মোল্লা (মালিথা) বিদ্রোহী প্রজাদের নায়ক। চরঅঞ্চলের প্রায় দুশো ঘর প্রজা ইসমাইলের নেতৃত্বে ঠাকুর জমিদারের ম্যানেজারের সঙ্গে তাদের স্বার্থ নিয়ে লড়ছিল, কয়েকটা ছোটখাট মোকদ্দমাও হয়েছিল তার ফলে। তাদের বক্তব্য—তাদের অনেকদিনের ভোগদখলি চরের জমি যা পদ্মার প্লাবনে শিকস্তি হয়ে যেত সেই জমি তাদের প্রাপ্য। ম্যানেজার তাদের বিরোধী। তাঁর আপত্তি, আইনমতে সেসব জমি জমিদার-পক্ষ নতুন করে বন্দোবস্ত করতে পারেন এবং করেছেন। এই বিরোধ ধূমায়িত হয়েছিল ছ-সাত বছর ধরে। জমিদার হিসাবে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়। তিনি অনেকবার আপোষ-নিষ্পত্তি করে দেন ; কিন্তু সে আপোষ-নিষ্পত্তি বিশেষ ফলপ্রসূ হয় না। তখন ইসমাইল মোল্লা চরের মুসলমান প্রজাদের দলবদ্ধ করে নানা ছুতায় জমিদার পক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করে। চর-মহালের প্রজাদের মধ্যে একটা শক্তিশালী বিদ্রোহী প্রজার দল গড়ে ওঠে। মীমাংসার পথ ক্রমেই জটিল হয়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ এইবারে তাঁর বহুকালের পুরানো জমিদারি পরিচালনার অভিজ্ঞতার নূতন করে পরিচয় দেন। সে যেন এক সেশনের বিচারপর্ব। কুঠি-বাড়ির দরবার কক্ষে প্রজা-পক্ষ ও আমলা-পক্ষ নিজ নিজ কাগজপত্র নকশার সাহায্যে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করেন। দুইদিনে প্রায় পাঁচ-ছয় ঘণ্টা উভয় পক্ষের সওয়াল জবাব চলার পর রবীন্দ্রনাথ সরেজমিনে বিরোধের অবস্থাটা পরি-দর্শন করে তাঁর শেষ বক্তব্য জানাবেন, হুকুম দিলেন। আমি সে সময়ে ঠাকুর-বাবুদের চাকরি করি এবং এই বিচারের সময় উপস্থিত ছিলাম।

প্রায় সুদীর্ঘ কুড়ি বছর পরে শিলাইদহের প্রজাদের অতিপ্রিয় 'বাবুমশাই' চর দেখতে আসবেন। এখন তিনি শুধু শিলাইদহের বাবুমশাই নন, তিনি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী, সারা বিশ্বে সম্মানিত বিরাট পুরুষ। গর্বে আনন্দে প্রজারা দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটল পদ্মার ধারে, শিলাইদহ খেয়াঘাটে, চরের নানাস্থানে—কোন্ পথে দীর্ঘ বিশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথকে নিজের চোখে দেখবার সৌভাগ্য হবে তারই চেষ্টায়। বিরাট জনতা, কেউ জানে না, কোন্ পথে তিনি চরঘোষপুর আর কোশাখালি চরে পৌছুবেন। পাড়ায় পাড়ায় পদ্মার নানান ঘাটে বিরাট জনতা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছে। হঠাৎ জানা গেল বাবুমশাই শিলাইদহ খেয়াঘাট পার হয়ে পালকিতে প্রথমে কোশাখালি, ভৈরবপাড়া ছাড়িয়ে চরঘোষপুর পৌছুবেন। শিলাইদহে এমন বিশাল জনতা আমি তো এর আগে কখনও দেখি নি। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ খেয়াঘাটে পৌছে দেখতে পেলেন—গোলমালে হাতঘড়িটা কুঠিবাড়িতে ফেলে এসেছেন। তৎক্ষণাৎ সাইকেলে বরকন্দাজ ছুটল কুঠিবাড়িতে। দেখা গেল, এণ্ড্রুজ সাহেব গুরুদেবের ঘড়ি নিয়ে ছুটছেন শিলাইদহ খেয়াঘাটে, প্রাণপণে দৌড়োচ্ছেন, শেষে খেয়াঘাটে পৌছে স্বহস্তে গুরুদেবের হাতে ঘড়িটি বেঁধে নিশ্চিন্ত হয়ে হাসতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথ হেসে উঠলেন সাহেবের কাণ্ড দেখে। আমরা সবাই আপনভোলা মহাপ্রাণ এণ্ড্রুজ সাহেবের অপূর্ব ব্যবহারে মুগ্ধ হলাম। সাহেব কুঠিবাড়িতে ফিরে গিয়ে লেখাপড়ায় মন দিলেন।

ভোর সাতটা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত চর পরিদর্শন করে এসে কবি পরের দিন সকালে তাঁর রায় দিলেন। তিনি যে রায় দিয়েছিলেন সেই রকম ভাবেই পরবর্তীকালে বেঙ্গল টেন্যান্সি এ্যাক্ট-এর সংশোধন হয়েছিল। পর পর চার বছরের টানা খাজনা আর. জমি সুনির্দিষ্ট করবার জন্য আমিন-খরচা দিলে তদন্তে যে জমি প্রকাশ পাবে সেই জমিই প্রজাকে দেওয়া হবে। এইভাবে

শিকস্তি জমিও নকশার সাহায্যে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। তবে কোন জমি নালিশের পর ডিক্রিজারিতে জমিদারের খাসে এলে এবং অন্যের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়ে গেলে আইনের খাতিরে সে জমি দেওয়া হবে না, অন্য বন্দোবস্তি জমি



দু জন চাষি

তার পরিবর্তে প্রচলিত সেলামি ও খাজনা দিলে প্রজারা পাবে—এইরকম মীমাংসা করে দিলেন। প্রজারা যথেষ্ট সুবিচার পেয়েছিল, কিন্তু আমলাচক্রের কেরামতির ফলে এই সমস্যা পরে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল।

ইউরোপ ও আমেরিকার পল্লী- এবং চাষি-জীবন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। সেখানকার চাষিজীবনের অদ্ভুত অগ্রগতি কবির অনুভূতিতে আলোড়ন তুলেছিল। চাষি আর শ্রমিকের জীবনমান কতখানি উন্নত হলে তাদের হাতে সারা দেশের রাষ্ট্রশক্তি কী বিপুল সম্ভাবনার পরিচয় দিতে পারে —সে বিষয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁকে নূতন করে ভাবিয়ে তুলল সেদিন শিলাইদহের বিস্তীর্ণ চর এলাকার বালি আর পলিমাটিতে! তাঁর অনেক মন্তব্যই জমিদারের বিপক্ষে গেল। তখনই তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, বর্তমান অবস্থায় জমিদারির রথ আর চলতে পারে না। মামুলি শোষণ, আরামে, বিনা পরিশ্রমে হাজার হাজার মেহনতি মানুষের পরিশ্রমের ফল ভোগ করার দিন ফুরিয়ে এসেছে। নূতন চিন্তা, নূতন কর্মপদ্ধতি আবিষ্কার করছে এই বহুদিনের অখ্যাত শোষিত জনসাধারণ। সে ঢেউ এদেশেও লাগবে—এদেশেও অবহেলিত নিচের তলার মধ্যে তীব্র অসন্তোষ জেগে উঠছে। এদেশেও সেসব চিন্তা জেগেছে। এখনও মধ্যবিত্ত ও ধনীদের সাবধান হবার পথ খোলা আছে। তাঁরা বৃহৎ স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি না দিলে তাঁদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। মানুষের জীবনযাত্রায় বিজ্ঞান নূতন আলো দেখাচ্ছে। যারা অজ্ঞ, ঘৃণ্য, শোষিত, তারাও ভাবতে শিখছে। তিনি পাশ্চাত্য দেশের কৃষি ও কৃষি-শিক্ষার উন্নতি, কৃষি-চিন্তার কথা ঐ অনুষ্ঠানে অনুপম ভঙ্গিতে বলেছিলেন।

অনেক অপ্রিয় সত্য তাঁর মুখে আমরা শুনেছি। প্রজাদের দরখাস্তে আজ্ঞাধীন দীনহীন আশ্রিত প্রজা—এইরকম ভাষায় তিনি অসন্তুষ্ট হতেন, মানুষের ভিতরকার নারায়ণ কতখানি সঙ্কুচিত, কতখানি শোচনীয় অবস্থায় নেমে এসেছে—এই কথা বলে মনে মনে শিউরে উঠতেন। কোন প্রজা মামলাবাজি করে জমিদারের সঙ্গে লড়েছেন জানলে তিনি সেই প্রজার উপর অসন্তুষ্ট হতেন না, তিনি ধরে নিতেন এর একটা সঙ্গত কারণ অবশ্যই আছে। যৌবনকালে জমিদাররূপে প্রজাদের সঙ্গে আলাপ করতে করতে অনেক সময়ে তাঁকে বলতে শুনেছি—'তোমাদের কথা ভাবতে ভাবতেই আমার চুলদাড়ি সব সাদা হয়ে গেল—তোমরাই তো আমাদের হাত-পা।'

এই সময়ে অনেক ভদ্রমহিলার দেনা পরিশোধের ব্যাপারে তাঁর উপরে বিচারের ভার ছিল। ইনি এস্টেটের দেনা শোধ না করে ক্রমাগতই অনুগ্রহ চাইছেন—সে অনুগ্রহের শেষ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে—এই প্রসঙ্গে যা বলে-ছিলেন—সে কথাটা আমার আজও মনে আছে। বলেছিলেন—তোমরা

সবাই কি সুরেনকে কামধেনু পেয়েছ? তাকে ভালমানুষটি পেয়ে আর কত দোহন করবে? শেষে মহিলাটির পাকা ভদ্রাসন বাড়িটি তাঁকে ছেড়ে দিয়ে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি এস্টেটের দেনাশোধে জমা-খরচ করবার জন্য হুকুম দিয়েছিলেন, সে ব্যবস্থাতেও এস্টেট-পক্ষের ক্ষতির পরিমাণ কম হয় নাই।

এই সময়ে একদিন বন্ধু এণ্ড্রুজ সাহেবের সঙ্গে বিকালে গ্রামভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। যে সমস্ত রাস্তাঘাট বিশ-পঁচিশ বছর আগে তাঁর অতি পরিচিত ছিল, সেই সমস্ত স্থানের দুর্দশা দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। গ্রামের জঙ্গল, খানাডোবা দেখে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীনিকেতন পল্লীসংগঠনের আদর্শে সংস্কার করবার জন্য আলোচনা করেছিলেন। তাঁরই ব্যবস্থায় শিলাইদহের পাঁচজন যুবক (বৈদ্যনাথ ভৌমিক, বিজয়কুমার সরকার, অচিন্ত্য বসাক প্রভৃতি) সেই সময়েই শ্রীনিকেতন গিয়ে সেখানকার তাঁত, সতরঞ্চ বোনা প্রভৃতি এবং ব্রতী বালক সংগঠনের সমস্ত কাজ এস্টেটের খরচায় শিখে আসেন এবং শিলাইদহ কাছারিতে একটি পল্লীসংগঠন বিভাগ খোলার ব্যবস্থা হয়। শ্রীনিকেতন থেকে দুজন বিশেষজ্ঞ শিক্ষকও (যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও মনোমোহন ঘোষ) শিলাইদহে এসে ঐ বিভাগের কাজকর্ম আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে গিয়েই কালীমোহন ঘোষ ও এল. কে. এলম্‌হার্স্ট সাহেবকে শিলাইদহে পাঠিয়েছিলেন—গ্রামে নানাবিধ সংগঠন কার্যে জনসাধারণকে উৎসাহিত করবার জন্য। তখন পর্যন্ত তিনি যেন শিলাইদহকে নিজের জমিদারি বলেই মনে করতেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় যে সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে সময়ে শিলাইদহ জমিদারির একটি করে ছাত্রকে প্রতি বৎসর ফ্রি স্টুডেণ্ট হিসাবে শান্তিনিকেতনে পাঠাবার ব্যবস্থা ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রথম বৎসরের পরে এবিষয়ে আর কারও উৎসাহ দেখা যায় নি,—শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে জনসাধারণের বিরূপ মনোভাবের জন্য। শিলাইদহ জমিদারির অন্তর্গত তরফ সেরকাঁদি মৌজার সমস্ত উপস্বত্ব প্রায় ২০০৲ টাকা প্রতি বৎসর সেকালের শান্তিনিকেতনের খরচ নির্বাহের নিমিত্ত পাঠাবার জন্য মহর্ষিদেবের লিখিত নির্দেশ ছিল। সে নির্দেশ সেদিন পর্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছে। আমরা পূর্বে দেখেছি শান্তিনিকেতনে ১লা বৈশাখ নববর্ষ উৎসবের সময় প্রতি বৎসর নিয়মিতভাবে শিলাইদহ জমিদারি থেকে তরমুজ, কাঁকুড়, আম ইত্যাদি নানারকম ফল পাঠান হত। পদ্মার উপরে বসে রবীন্দ্রনাথ যে ভাবনা ভাবতেন

তাই শান্তিনিকেতনে একটা সৃষ্টির ক্ষেত্র তৈরি করতে সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন —একথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বলে গেছেন।

সেদিন রবীন্দ্রনাথ ও এণ্ড্রুজ সাহেব গ্রামভ্রমণে বেরিয়ে গোপীনাথ ঠাকুরের মন্দির, দিঘি, বাজার, কাছারিবাড়ি দেখে বাজারের পাশ দিয়ে আসছিলেন। তাঁদের পেছনে ম্যানেজার ও আমলাবর্গ বহু লোক অনুগমন করছিল। ঠিক সেই সময়ে গোপীনাথ দিঘিতে হাত পা ধুয়ে একজন বৃদ্ধ বেঁটে লোক পুকুরপাড়ে তার পানের বোঝা মাথায় চাপাবে, এমন সময় তার সামনেই রবীন্দ্রনাথের সবন্ধু আবির্ভাব। লোকটির সঙ্গে একটা ঘটি—দুধ কেনবার জন্য, একটা লাঠি, কাঁধে গামছা, মাথায় পানের বোঝা। সে একপাশে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাদের অতি-পরিচিত 'বাবুমশাইকে' দেখছে—এখন আর তিনি 'বাবুমশাই' নন, এখন বিশ্বজয়ী, বিশ্বের জয়মাল্য-পরিহিত বিরাট পুরুষ—তাদের সেই চিরপরিচিত জমিদার-বাবুমশাই। লোকটা দুটি চোখ বিস্ফারিত করে হাঁ করে চেয়ে রয়েছে। এমন সময়ে তার সামনেই এসে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'তোমার নাম কেতু ঢালি নয়?' লোকটি এবারে একেবারে আনন্দে উত্তেজনায় হাউমাউ করে কেঁদে বলল—'আজ্ঞে—বাবুমশাই—বাবুমশাই,—আমি সেই কেতু ঢালি! আজ মরবার আগে আমার কী সৌভাগ্য, আমাদের সেই বাবুমশাইকে দেখলাম। আমি মরি নি হুজুর! বাতে পঙ্গু।'

আশ্চর্য রবীন্দ্রনাথের স্মরণশক্তি! সেই বীর কেতু ঢালিকে তিনি আজও, পঁচিশ ত্রিশ বছর পরেও ভোলেন নাই। বাবুমশাই বললেন, 'তোমাকে আমি চিনেছি কেতু ঢালি। বেঁচে আছ? কেমন আছ? তোমাদের দেখতে পাব আশাও করতে পারি নি।' তাঁর কণ্ঠস্বরেও আনন্দবেদনা ভেঙে পড়ছে। কেতু ঢালি তার বাতের ব্যাধি, বার্ধক্য ইত্যাদির কথা বলল। রবীন্দ্রনাথ তখনই জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি পেন্‌সন পাচ্ছ তো?' সে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর পাঁচ টাকা'।

রবীন্দ্রনাথ তখন ইংরাজিতে সাহেবকে বলতে লাগলেন—এইসব বীর বিশ্বাসী সরল গ্রাম্য লেঠেল আমার কর্মচারী ছিল—এই বলে কেতু ঢালির যৌবনের অনেক কথা, অনেক বীরত্ব-কাহিনী মহা উৎসাহে সাহেবকে বললেন। সাহেবও তাঁর কথা শুনে শ্রদ্ধাপ্লুত চোখে কেতু ঢালির দিকে চেয়ে রইলেন। আমি ঐ দলে ছিলাম। এই কেতু ঢালির বিস্তারিত বিবরণ আমার 'কবিতীর্থের পাঁচালিতে' পাওয়া যাবে। মেছের সর্দার, হয়ধর সর্দার প্রভৃতি

সেকালের বিখ্যাত লেঠেল বরকন্দাজের খবরও রবীন্দ্রনাথ জেনে নিলেন।

পরের দিন অতি প্রত্যুষে কবি ভ্রমণে বের হলেন—শিলাইদহ কুঠিবাড়ির সামনে তরুচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন রাস্তা ধরে। তাঁর সঙ্গে ছিলাম আমি আর পূর্ণচন্দ্র বাগচি (ইনি বহুদিন পূর্বে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করেছিলেন এবং পরেও কিছুদিন সেখানকার আপিসে কাজ করেন) তাঁর পিছনে। প্রভাতের সোনালি আলোয় সামনের ঝোপে আর কাঁঠালগাছের ডালে কতকগুলি পাখি কিচির-মিচির করে খেলা করছিল। শালগাছের ডালেও কয়েকটা পাখি ডাকছিল। কবি মুগ্ধনেত্রে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পাখিদের কলগুঞ্জরণ শুনলেন। তার পরে আমাদের বললেন, 'এই পাখিদের নাম জানো—কী পাখি এরা বলতে পারো?' আমরা আন্দাজে পাখিদের কয়েকটা নাম বললাম। কবি হেসে বললেন, 'ঠিক হল না। কী সুন্দর পাখিগুলো! এরা যে তোমাদের প্রতিবেশী। এমন সুন্দর প্রতিবেশীদের নাম জানা উচিত।' এই বলে কবি পাখিদের নাম বললেন —এইসব পাখি অন্যদেশে দেখতে পাওয়া যায় না—বিশেষভাবে ভারতবর্ষের বাইরে এসব পাখি দেখতেই পাওয়া যায় না। কবি অনন্যসাধারণ ভাষায় পাখিদের কাহিনী বলতে বলতে দেখতে লাগলেন তাদের খেলা। একটুখানি নীরব থেকে মুগ্ধনেত্রে শুনতে লাগলেন তাদের কাকলি।

শিলাইদহ ছেড়ে আসবার আগের দিন আমরা স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ থেকে ও জমিদারির কর্মচারীদের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে এক জনসভায় অভিনন্দন জানাব বলে প্রস্তাব করলাম। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'আমার অতিথি, আমার বন্ধু এণ্ড্রুজ সাহেবকে তোমরা অভিনন্দিত করো, আমি তো বাপু তোমাদের ঘরের লোক। চাষিদের ডেকো সেই সভায়, আমি তাদের চিনিয়ে দেবো এই অপূর্ব মানুষটিকে।' রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন এক দিন পেছিয়ে গেল। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের উদ্দেশ্যে আমাকে একটি কবিতা লিখতে হল সেই রাত্রেই। সে কবিতাটি পরের দিন ভোরে কবিকে দেখালাম, তিনি একটু সংশোধন করবার জন্য হাতে পেন্সিল নিয়ে একটু ভেবে বললেন, 'মন্দ হয় নি, এটিই ছাপতে দাও।' তাঁর নিজের জন্যে যে দুখানা অভিনন্দন পত্র লেখা হয়েছিল, তা একটুও পড়লেন না, ভাঁজ করে ফেরত দিলেন।

প্রকাণ্ড সভা হল, বিরাট জনসমাগম হয়েছিল। সভায় স্থানাভাব হওয়ায় এণ্ড্রুজ সাহেব কিছুতে চেয়ারে বসতে রাজি নন। কবি তাঁকে জোর করে চেয়ারে বসিয়ে বললেন, 'ইনি আমার পরমবন্ধু সি. এফ. এণ্ড্রুজ, এঁকে তোমরা

চেনো না, ইনি সাহেব ভেবে তোমরা ভয় পেয়ো না, ইনি মাটির মানুষ, যীশুখৃস্টের প্রকৃত ভক্ত।' খৃস্টধর্ম, হিন্দুধর্ম ও মুসলমান ধর্মের মূলসত্যটি তিনি খুব সহজ ভাবে বুঝিয়ে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের বিশ্বমানবতা ও নিঃস্বার্থ সাধনার কথা চমৎকার করে বুঝিয়ে দিলেন। 'আমার বন্ধু আজ আমার অতিথি,' এই বলে বড় ফুলের মালাটি নিজে সাহেবের গলায় পরিয়ে দিলেন। ইংলণ্ডের কৃষিজীবন ও এলম্‌হার্স্ট সাহেবের জমিদারির গল্প বললেন। কুষ্টিয়া, কুমারখালি, খোকসা, জানিপুর, কৃষ্ণনগর, পাবনা থেকে অনেক ভদ্রলোক সভায় এসেছিলেন। তাঁদের অনেকের সঙ্গে সাহেবের পরিচয় করিয়ে দিলেন। এস্টেটের উকিল চন্দ্রময় সান্যালের পরিচয় দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'The Zemindars and the Pleaders now sail on the same boat. We suck the life-blood of our tenants and the pleaders, their clients—but our Chandramay is an exception.' এই রকম অনেক কথা বলে হাস্য-পরিহাস-রসিক কবি-জমিদার বহুকাল পরে প্রজাদের মধ্যে আনন্দের বন্যা এনেছিলেন। পরের দিন তাঁর নিজের অভিনন্দন-সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চাষ বাসের প্রণালী এবং কৃষিজীবন সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা অতি সহজভাবে গল্প করে বুঝিয়ে দিলেন এবং আমাদের দেশের জমিদার ও মধ্যস্বত্বাধিকারীদের যে কর্তব্য রয়েছে চাষিদের প্রতি, সে বিষয়ে জোর দিয়ে বললেন —এক দল শোষক, এক দল দালাল লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত চাষিকে পশুর পদবীতে নামিয়ে দিচ্ছে। আমাদের দেশের আইন পালটাবে কিনা জানি না, কিন্তু এই অবস্থা ক্রমাগত চলতে থাকলে আমাদের কোনমতেই মঙ্গল হবে না। জমিদার, জোতদার আর চাষি,--এই তিন রকমের স্বার্থভোগীদের হাত মেলাতে হবে—চালাকি চলবে না বেশিদিন। পৃথিবীর চেহারা বদলেছে—আরও বদলাবে—ফাঁকি বেশিদিন চলবে না। এখনও বাঁচবার পথ আছে, দেশের সরকার কিছু করবে না—কিন্তু নিজেদের করতেই হবে। বাঁচবার পথ, উন্নতির পথ এখনও খোলা আছে। নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে,—মামুলি ছেড়ে ভাবতে শেখো। নতুন আলো সব দেশে এসেছে—এদেশেও আসছে! স্বার্থে যারা অন্ধ তাদেরও চোখ মেলতে হবে। বাংলার মত নদীমাতৃক দেশে অন্নাভাব, দুর্ভিক্ষ আসবে কেন? কেন লোকে দুবেলা পেট ভরে খেতে পাবে না? দেশের সরকারের এইটে সবচেয়ে বড় কর্তব্য, কিন্তু তার মুখ চেয়ে থাকলে তো চলবে না।. তারা বিদেশী বণিক—তারা জমিদারির মুনাফা

লুটতে এসেছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীগুলো সবাই শিখে নাও। অন্যদেশে শস্যের ফলন যে উপায়ে বাড়ছে সেই উপায় হাতেকলমে শিখে নাও। এখনও জমিদাররা সাবধান হোন, দেশের দরিদ্র জনসাধারণের পাশে এসে দাঁড়ান। এরা না বাঁচলে তাঁরাও বাঁচবেন না। সবাই একযোগে কাজ করুন, চাষের কাজে, গ্রাম্যশিল্পের কাজে সমবায়-প্রথার সাহায্য নিন।

এই প্রসঙ্গে তিনি আর একটি কথা বলেছিলেন—এই কথার মধ্যে যে ভাবটি প্রকাশ পেয়েছিল সেই ভাবটি তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে—নদীর স্রোত ছিল, তাই লোকে তার জলে তৃষ্ণা দূর করেছে, কেন না সে জল বিশুদ্ধ। তার তীরে কত গ্রাম-নগর গড়ে উঠেছে, বাণিজ্যের সহায় হয়েছে। তার জলে স্নান করে সবাই তৃপ্ত, তার বাতাসে সবাই স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে—কিন্তু সে নদী স্রোত হারিয়ে বদ্ধজলায় পরিণত হল, শেওলা জমল, পচা পাঁকে ভরে গেল। সেই স্বাস্থ্যকর জীবন-দায়িনী নদী হয়ে দাঁড়াল স্পর্শের অযোগ্য। ঐ বদ্ধ জল খেয়ে হল কলেরা, তার জল গ্রহণের অযোগ্য। আমাদের ধর্ম ও সমাজ সেই রকম। নতুন চিন্তা নেই, সেই প্রাচীন ঋষিরা হাজার হাজার বছর আগে যা বলে গেছেন তার বহু পরিবর্তন হয়েছে—তাঁদের সেই নদীর খাতে জগতের নতুন চিন্তার স্রোত বইয়ে আনতে হবে। তারা বারংবার পথ বাতলে দিচ্ছে, আর আমরা মরবার পথ খুঁজে ফিরছি। বৃহৎ জগতের সঙ্গে মিলতে হবে, তাল রাখতে হবে গতির সঙ্গে —মানুষের নতুন চিন্তার স্রোতে চলতে হবে।

বিশ্বকবির মুখ থেকে বাংলার কোন্ এক প্রান্তরের চাষি ও জনসাধারণ কবির অনন্যসাধারণ ভাষায় কবিজনোচিত ভঙ্গিতে এই বাণী শুনল। অত বিশাল জনতা স্তব্ধ হয়ে এই বাণী শুনল—এই বাণী যাঁর কণ্ঠনিঃসৃত হল, তাঁকেও শেষবারের মত প্রাণ ভরে দেখে নিল। এই অনুষ্ঠানে কবিও খুব আনন্দ পেয়েছিলেন।

সেইবারেই আমি এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখেছিলাম, সে দৃশ্য জীবনে ভুলতে পারব না। কবির শিলাইদহ ত্যাগের কয়েকদিন আগে অতি প্রত্যূষে কবিকে আমার একটি বিশেষ জরুরি বিষয় জানাবার ছিল।

আমি জানি, কবি ব্রাহ্মমুহূর্তে জেগে উপাসনা করেন। তাই আমি রাত্রি প্রভাতের বহুপূর্বে উঠে নির্জন কুঠিবাড়ির তেতলার ঘরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলুম। তখনও সারা জগৎ নিদ্রামগ্ন। কবির শয়নকক্ষ শূন্য, স্নানের ঘরের

দরজা খোলা, বাহিরে খোলা ছাদে বেরুবার দরজাও খোলা। সাহস সঞ্চয় করে খোলা ছাদে গুনগুন গানের শব্দে এগিয়ে দেখি জ্যোতির্ময় মূর্তি। খালি গায়ে একটি পায়জামামাত্র পরিহিত কবি পায়চারি করছেন, হাত দুখানা বুকের উপর, উপরে অন্ধকার নীল আকাশ, তেতলার ছাদে পদ্মার উদার হাওয়ায় মাথার চুলগুলি উড়ছে। তখন সূর্যোদয় হয় নি, পূর্বদিগন্তে একটা জবাকুসুম-সঙ্কাশ আভামাত্র, আর সেই সূর্যোদয়কে আহ্বান জানাচ্ছেন—দীপ্ত কাঞ্চন-বর্ণ সূর্যতুল্য ঋষি। মনে হল—

ভেঙেছে দুয়ার এসেছে জ্যোতির্ময় !

অনাদি অতীত অনন্তরাতে কেন বসে চেয়ে রও

....

(কিংবদন্তী)

কল্যাণ রায়

অনেকদিনের প্রাচীন কাহিনী। যখন বাংলার শেষ স্বাধীন হিন্দুবীর রাজা সীতারাম রায় বাংলাদেশে স্বাধীন রাজ্য গড়েছিলেন, যখন বাংলামায়ের দুই যমজ ছেলে হিন্দু-মুসলমান তাদের স্বাধীন রাজ্যে পরমসুখে বাস করত; মোগল শাসনের ভাঙনের মুখে বাংলার সেই অতীব গৌরবময় অধ্যায়ের একটি লুপ্তপ্রায় কাহিনী।

রাজা ও রাজ্য-ভাঙাগড়ার যুগের এই রকম অনেক কাহিনী ইতিহাসের পাতায় স্থান পায় নি। কারণ বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতিকে ইতিহাসের মন্দিরে সংগ্রহ করে রাখবার রেওয়াজ সেকালে ছিল না। তাই সেকালের অনেক অজ্ঞাত ইতিহাস মহাকাল বেমালুম উদরস্থ করে নিয়েছেন। তবু যে সকল ঘটনার টুকরা ভাঙা মন্দিরের তলায় বা প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে গভীর জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল, সেগুলো আমাদের পূর্বপুরুষেরা মুখে মুখে গল্পের মত তাঁদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন। তার কতখানি সত্য, কতখানি বানান, তা বলা মুস্কিল। তবু তার প্রমাণগুলো এখনও বাংলার বুক থেকে একেবারে মুছে যায় নি। আমরা সেই মৌন-মূক অতীতকে ডেকে ঘুম ভাঙাচ্ছি—

কথা কও, কথা কও,
স্তব্ধ অতীত, হে গোপনচারী, অচেতন তুমি নও—
কথা কেন নাহি কও?

* * *

হে অতীত, তুমি গোপন হৃদয়ে
কথা কও, কথা কও।

সেই রাজা সীতারাম রায়ের আমলে নদীয়া জেলার উত্তর সীমানায় কীর্তিনাশা পদ্মার তীরবর্তী একখানা গ্রাম, নাম কল্যাণপুর। তার পাশাপাশি

শিলাইদহ। তখন শিলাইদহ নামে কোন গ্রাম ছিল না, ছিল খোরসেদপুর গ্রাম। খোরসেদ ফকির বলে একজন সুবিখ্যাত মুসলমান ফকিরের নামে এ গ্রামের নামকরণ হয়েছিল। কীর্তিনাশা পদ্মার কোন এক ছোট প্রত্যঙ্গের অর্থাৎ 'দহ'র নাম পরবর্তী কালে হয়েছিল 'শিলাইদহ' কারণ এই 'দহ' বা নদীর খাদের উপরেই ছিল নীলকর সাহেবদের পুরান কুঠি, যার সুন্দর বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন তাঁর 'ছেলেবেলা' নামে গ্রন্থখানিতে। ঐ নীলকুঠির মালিক বা কর্মচারীর নাম ছিল শেলীসাহেব। তাঁর নাম থেকেই শিলাইদহ বা 'শেলিদহ' নামের উৎপত্তি।

রবীন্দ্রনাথ যে দুটি সাহেবের গোর দেখেছিলেন, সে দুটিও দু-তিন বছর হল কীর্তিনাশা পদ্মা হজম করে ফেলেছে।

বাংলাদেশের কোন্ প্রান্তে অখ্যাত-অজ্ঞাত বিশাল পদ্মাতীরবর্তী এই শিলাইদহ গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ কবির অনন্যসাধারণ বিশাল সাহিত্য-সৃষ্টির কি অসীম প্রেরণা জুগিয়েছিল সে প্রসঙ্গে 'ছিন্নপত্রে'র প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় তাঁর মনোরাজ্যের দুয়ার খুলে গিয়েছিল। তাই শিলাইদহের অপরূপ বর্ণনায় তাঁর কবিমানসের যে অপূর্ব পরিচয় পাওয়া যায় তার মূল্য অপরিসীম। ১৮৮৮ সালে শিলাইদহ থেকে লিখছেন—

> শিলাইদহের অপর পারে একটা চরের সামনে আমাদের বোট লাগান আছে। প্রকাণ্ড চর, ধূ-ধূ করছে। কোথাও শেষ দেখা যায় না—কেবল মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় নদীর রেখা দেখা যায়—আবার অনেক সময় বালিকে নদী বলে ভ্রম হয়। গ্রাম নেই, লোক নেই, তরু নেই, তৃণ নেই—বৈচিত্র্যের মধ্যে জায়গায় জায়গায় ফাটল ধরা ভিজে কাল মাটি জায়গায় জায়গায় শুকনো সাদা বালি। পূর্বদিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখলে দেখা যায় উপরে অনন্ত নীলিমা আর নিচে অনন্ত পাণ্ডুরতা। আকাশ শূন্য এবং ধরণীও শূন্য, দরিদ্র শুষ্ক কঠিন শূন্যতা, আর উপরে অশরীরী উদার শূন্যতা।

আবার তাঁর জমিদারি পতিসরে বসেও সেই তাঁর চিরপরিচিত শিলাইদহ-ই তাঁর সমস্ত হৃদয়খানা জুড়ে বসে থাকত ; তাই লিখছেন ১৮৯৪ সালে—

> মনে আছে যখন শিলাইদহে কাছারি ক.র সন্ধ্যাবেলায় নৌকা করে নদী পার হতুম এবং রোজ আকাশে সন্ধ্যাতারা দেখতে পেতুম আমার ভারি একটা সান্ত্বনা বোধ হত। ঠিক মনে হত আমার নদীটি যেন আমার ঘর-সংসার এবং আমার সন্ধ্যাতারাটি আমার এই ঘরের গৃহলক্ষ্মী,—আমি কখন কাছারি

থেকে ফিরে আসব সেইজন্য সে উজ্জ্বল হয়ে সেজে বসে আছে। তার কাছ থেকে এমন একটি স্নেহস্পর্শ পেতুম। তখন নদীটি নিস্তব্ধ হয়ে থাকত, বাতাসটি ঠাণ্ডা, কোথাও কিছু শব্দ নেই, ভারি যেন একটা ঘনিষ্ঠতার ভাবে আমার সেই প্রশস্ত সংসারটি পরিপূর্ণ হয়ে থাকত। আমার সেই শিলাইদহে প্রতি সন্ধ্যায় নিস্তব্ধ অন্ধকারে নদী পার হওয়াটা খুব স্পষ্টভাবে প্রায়ই মনে পড়ে।

আবার এর এক চিঠিতে লিখছেন—

আমি প্রায় রোজই মনে করি, এই তারাময় আকাশের নিচে আবার কি কখন জন্মগ্রহণ করব! আর কি কখন এমন প্রশান্ত সন্ধ্যাবেলায় এই নিস্তব্ধ গোরাই নদীর উপর বাংলাদেশের এই সুন্দর একটি কোণে এমন নিশ্চিন্ত মুগ্ধ মনে জালিবোটের উপর বিছানা পেতে পড়ে থাকতে পারবো?

রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব পত্রসাহিত্যের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠা তাঁর 'চিরপরিচিত শিলাইদহের' এই গোপন অভিসারের ও মানসলীলার ছবিতে ভরপুর।

আমার বাবা বলতেন—আমাদের শিলাইদহে দুই 'ঠাকুর' আছেন। একজন গ্রামের উত্তরে পদ্মার তীরে রবি ঠাকুর। আর একজন, দক্ষিণে গোপীনাথ ঠাকুর। এখানে আমাদের গোপীনাথ ঠাকুরের কাহিনীটাই বলছি।

পদ্মাতীরের কল্যাণপুর গ্রামে কল্যাণ রায় ছিলেন জমিদার অথবা খুব একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি; যাঁর পুণ্যনামে ঐ গ্রামের নামকরণ হয়েছিল। কল্যাণপুর গ্রাম এই লেখকের পৈত্রিক সম্পত্তি (তালুক) ছিল। সে সব ইতিহাস, পুরান কাগজপত্র বেঁধে রেখে আমরা আসল কাহিনী শুরু করি।

কল্যাণ রায় জাতিতে ছিলেন তন্তুবায়। এজন্য তিনি তাঁতি কল্যাণ রায় নামে আজও ঐ অঞ্চলে সুবিখ্যাত হয়ে রয়েছেন। তাঁর ছিল অগাধ টাকা, প্রকাণ্ড পাকাবাড়ি, পদ্মারই তীরের উপর। তাঁর সে অট্টালিকা আজ পদ্মা তার নিজের অঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছে। তার ভগ্নাবশেষ এখনও কিছু কিছু দেখা যায় মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করলে।

কল্যাণ রায় ছিলেন পরম ভক্তিমান বৈষ্ণব। দেব-দ্বিজে তাঁ'র অচলা ভক্তি। তিনি সস্ত্রীক পরম নিষ্ঠার সঙ্গে আজীবন 'তৃণাদপি সুনীচেন' বৈষ্ণবের মত ধর্মাচরণ করেছেন।

এত ধন-সম্পত্তি থেকেও তাঁদের কোল জুড়ে গোপালের আবির্ভাব হল

না। কিন্তু তাঁদের প্রাণের সুগভীর বাৎসল্যের নবনী গ্রহণ করবার জন্য নারায়ণের আসন টলেছিল।

নিঃসন্তান কল্যাণ রায় সংসারে বীতরাগ হয়ে সস্ত্রীক বেরুলেন তীর্থ ভ্রমণে। পদ্মায় তাঁদের বজরা ভাসল। নদীপথে তিনি সস্ত্রীক চলে গেলেন কাশীধামে।

কাশীতে গিয়ে তাঁরা একজন ভাস্করের বাড়িতে অতিথি হলেন। ঐ ভাস্কর অনেক দেবদেবীর মূর্তি গড়িয়ে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। একদিন তাঁর বাড়িতেই কল্যাণ রায় গভীর রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন। সুন্দর এক কৃষ্ণ মূর্তি, হাতে মুরলী, মাথায় চূড়া, পায়ে নূপুর, গলায় বনমালা, বৃন্দাবনের গোপাল যেন তাঁর কাছে বাঁশি বাজাচ্ছেন। আর ঘুমোতে পারলেন না, রোমাঞ্চিত দেহে স্ত্রীকে জাগিয়ে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বললেন। তাঁর স্ত্রী বললেন, তিনিও ঠিক ঐ রকম স্বপ্ন দেখেছেন।

প্রভাত হবামাত্র তাঁরা ভাস্করকে তাঁদের স্বপ্নে-দেখা গোপালের রূপ বর্ণনা করে বললেন, ঐ রকম 'গোপবেশে বেণুকর' কৃষ্ণের ও রাধার মূর্তি গড়িয়ে দিতে হবে। ভাস্কর রাজি হলেন। তাঁরা মূর্তি তৈরির জন্য ভাস্করকে আগাম টাকা দিয়ে পরের দিন শ্রীক্ষেত্রে অর্থাৎ পুরীধামে জগন্নাথের শ্রীমুখ দর্শনের জন্য যাত্রা করলেন।

ভাস্কর কল্যাণ রায়ের বর্ণনার অনুরূপ অতি সুন্দর রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি গড়ে ফেললেন। সস্ত্রীক কল্যাণ রায় তখন শ্রীক্ষেত্রে। এমন সময় কাশীর কোন রাজার হঠাৎ রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহমূর্তি প্রতিষ্ঠার দরকার হয়ে পড়ল। তাঁর সময় আদৌ নেই। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার দিনক্ষণ এতই আকস্মিকভাবে আসন্ন হয়ে পড়েছে যে ঐ সামান্য সময়ের মধ্যে কোনও ভাস্করের পক্ষেই ঐ রকম দুইটি বিগ্রহ মূর্তি তৈরি করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ল। রাজা ভাস্করকে প্রথমে অনুরোধ করলেন, পরে ভয় দেখালেন। ভাস্কর ভয়ে-ভাবনায় একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। শেষে ভেবে-চিন্তে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে কল্যাণ রায়ের জন্য তিনি যে যুগল মূর্তি বহু পরিশ্রমে গড়েছিলেন তাই রাজাকে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। ঐ বিগ্রহ রাজা তাঁর মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করলেন।

এদিকে নির্দিষ্ট দিনে কল্যাণ রায় শ্রীক্ষেত্র থেকে সস্ত্রীক কাশীতে ভাস্করের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। ভাস্কর আগে থেকেই বুঝতে পেরে একদিন একরাত্রি পরিশ্রম করে তাঁদের জন্য এক যুগল মূর্তি তৈরি করে রাখলেন।

তাড়াতাড়িতে এ মূর্তি দুটি আগেকার আসল মূর্তির চেয়ে আকারে কিছুটা ছোট হল। কল্যাণ রায়-দম্পতি কিছুই টের পেলেন না। মূর্তি ছোট দেখে একটু মনক্ষুণ্ণ হলেও ঐ যুগল মূর্তি নিয়েই তাঁরা আবার নৌকাপথে গ্রামে ফিরলেন।

কল্যাণপুরে ফিরে তাঁরা এই রাধানাথ ও শ্রীরাধামূর্তি প্রতিষ্ঠা করে মহানন্দে বিগ্রহের পূজার্চনা করতে লাগলেন। ঠিক শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথদেবের পূজা পার্বণের বিধি অনুসারে রাস, দোল, রথযাত্রা, স্নানযাত্রা সমস্ত পার্বণোৎসবই করতে লাগলেন।

এদিকে কাশীতে ভয়ংকর ব্যাপার ঘটে গেল। কাশীর রাজা ঐ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করবার পরেই একরাত্রে স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নে যেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে তিরস্কার করছেন, 'তুই আমার পরমভক্ত কল্যাণ রায়-দম্পতিকে প্রতারণা করে আমাকে তোর মন্দিরে এনেছিস্। সেই তো তার মনোমত করে আমায় গড়েছিল। ভাল চাস্ তো ভক্তদম্পতির কাছে শীগ্‌গীর আমায় রেখে আয়।'

কাশীর রাজা রাত্রিপ্রভাতেই তাঁর মন্দিরের যুগল মূর্তি নৌকাতে করে জলপথে কল্যাণ রায়ের কল্যাণপুরে রেখে এলেন, আর অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কল্যাণ রায় দেখলেন, এই যুগল মূর্তিই যেন তাঁদের মনোমন্দিরের সেই রাধাকৃষ্ণ। এই যুগল বিগ্রহের নাম রাখলেন গোপীনাথ, গোপীরানী আর তাঁদের পূর্বপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ যুগলের নাম রেখেছিলেন রাধানাথ, রাধরানী। পূজাপদ্ধতি ঠিক আগের মতই রইল। দুইটি যুগল মূর্তি তাঁদের দুইটি মন্দির আলো করে রইল। তাঁরা বিগ্রহের পূজা-অর্চনায় সমস্ত মন ঢেলে দিলেন। তাঁদের সারাজীবনের অতৃপ্ত সন্তানবাৎসল্য এই দুই যুগল মূর্তিকে আশ্রয় করে পরিতৃপ্ত হল!

বছর কয়েক পরেই হঠাৎ কীর্তিনাশা প্রলয়ংকরী পদ্মা তাঁদের বিগ্রহ, মন্দির, অট্টালিকা সব গ্রাস করতে ধেয়ে এল। গ্রামকে গ্রাম রাক্ষসী পদ্মা হাঁ করে গিলে ফেলল। কল্যাণ রায়-দম্পতি তাঁদের অট্টালিকা, ধন দৌলত রত্নালংকার সব ছেড়ে পাগলের মত দুই যুগল বিগ্রহ কোলে করে ছুটলেন আশ্রয়ের জন্য। কোথায় আশ্রয়! কে তাঁদের ভক্তবৎসলকে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করবে।

ছুটতে ছুটতে ঘর্মাক্তদেহে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে তাঁরা এসে উপস্থিত হলেন

পার্শ্ববর্তী খোরসেদপুর গ্রামে এক প্রকাণ্ড বটগাছের তলায়। চারিদিকে রৌদ্র খাঁ-খাঁ করছে। তাঁরা শ্রান্ত ক্লান্তদেহে ঐ বটগাছের ছায়ায় কল্যাণ রায়ের বহির্বাসের উপর দুই যুগল বিগ্রহ রাখলেন! কল্যাণ রায়ের গৃহিণী যেন দেখতে পেলেন ঐ ভীষণ রৌদ্রে তাঁদের দুই যুগল বিগ্রহের গা দিয়ে ঘাম ঝরছে মুক্তার মত টপ্ টপ্ করে। তাই তিনি নিজের শাড়ির আঁচলে তাঁদের মুখ মুছিয়ে আঁচল দিয়ে হাওয়া করতে লাগলেন। আঁচলের হাওয়ায় বুঝি ভক্তদম্পতি ও তাঁদের ভক্তবৎসল জুড়িয়ে শান্ত হলেন।

ঐ জায়গায় খড়ের ঘর তুলে তাঁরা বিগ্রহের পূজার্চনা করতে লাগলেন। ঠিক এমনি সময়ে জমিদারি পরিদর্শন করবার জন্য রাজা সীতারাম রায় ঐ গ্রামের ঐখানে এসে উপস্থিত হলেন।

রাজা সীতারাম কল্যাণ রায়ের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ দেখে মুগ্ধ হলেন। আরও বেশি অবাক হলেন বিগ্রহের কাহিনী শুনে আর ঐ বৈষ্ণব-দম্পতির ভক্তি ও নিষ্ঠা দেখে। তিান ঐ বটগাছের কাছেই প্রকাণ্ড এক দীঘি খনন করে দিলেন আর দেবপূজার জন্য দুইটি মঠ, রন্ধনশালা, অতিথিশালা, পুরোহিত ও সেবক-নিবাস তৈরি করে দিলেন বহু টাকা খরচ করে। ঐ দীঘি এখনও আছে ; ঐ সুন্দর ও প্রকাণ্ড দীঘিটি 'গোপীনাথ-দীঘি' নামে আজও সুবিখ্যাত! শুধু তাই নয়। রাজা সীতারাম গোপীনাথ দেবের সেবা-পূজা নির্বাহের জন্য বাৎসরিক এক হাজার টাকার আয়ের দেবোত্তর সম্পত্তি উৎসর্গ করে দিলেন আর তৈরি করে দিলেন কাঠের সুন্দর প্রকাণ্ড রথ। ঐ কারুকার্যখচিত সুন্দর রথখানা আর নাই, তবে রথের কয়েকটা সুন্দর কাঠের মূর্তি এখন সেকালের প্রাচীন হিন্দু শিল্পের নিদর্শনরূপে দেখতে পাওয়া যায়।

কালে কল্যাণ রায়-দম্পতি বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন। এই সময়ে গোপীনাথদেবের সম্পত্তি এবং এই পরগণা (পরগণা বিরাহিমপুর ও মহম্মদসাহির কিছু অংশ) নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যবতী রানী ভবানীর রাজ্যভুক্ত হয়ে গেল। রানী ভবানী একদিন স্বপ্নে গোপীনাথ ও রাধানাথের দর্শন পেয়ে আদেশ পেয়েছিলেন 'আমরা একই বিগ্রহ, কিন্তু এখানে দুইটি যুগল মূর্তিতে দুইটি মঠে আছি। আমরা আর পৃথকভাবে দুই মন্দিরে থাকতে চাই না। তুমি আমাদের নিয়ে একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা কর।'

রানী ভবানী তাই নূতন শ্রীমন্দির তৈরি করলেন অতি সুন্দর কারুকার্যে শোভিত করে। দুই যুগল মূর্তি গোপীনাথ ও রাধানাথ সেই থেকে একত্রে

তাঁর তৈরি নূতন শ্রীমন্দিরে থাকতে লাগলেন। রাজা সীতারামের তৈরি দুটি মঠ সেই থেকে পরিত্যক্ত হল। ঐ দুটি মঠ এখনও হাড়-পাঁজর নিয়ে বিদীর্ণ বক্ষে নীরবে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে যেন বলছে—

তব মন্দির স্থির গম্ভীর, ভাঙা দেউলের দেবতা।

রানী ভবানীর তৈরি নূতন শ্রীমন্দির কোন্ সালে কোন্ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা এখনও ঐ মন্দিরের গায়ে খোদিত আছে। এর কিছুকাল পরে বৃদ্ধ কল্যাণ রায়-দম্পতি তাঁদের প্রাণের ঠাকুরের পদে লীন হয়ে গেলেন তখন রানী ভবানীর পুত্র রাজা রামজীবন সেবাইত রূপে গোপীনাথের সেবা, পূজা, উৎসবাদি চালাতে লাগলেন।

ক্রমে রাজা রামজীবনের জমিদারি নিলামে উঠলে বিরাহিমপুর পরগণা আর গোপীনাথদেবের দেবোত্তর সম্পত্তি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর খরিদ করে সেবাইত-সূত্রে কল্যাণ রায়ের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহদ্বয়ের পূজার্চনা চালাতে থাকেন। গোপীনাথের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী ঐ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। রবীন্দ্র-নাথের সময়েই এই প্রসিদ্ধ দেবমন্দির ও ভবনের সংস্কার করা হয়েছিল।

নদীয়া, ফরিদপুর, যশোর আর পাবনা জেলার অনেক অংশে আজও খোরসেদপুরের গোপীনাথ প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছেন। আজও গোপীনাথের স্নান-যাত্রার উৎসবে ঐ সব জেলার হাজার হাজার নর-নারী প্রতি বৎসর সমবেত হয়ে থাকেন। কিন্তু যিনি নিজের সর্বস্ব দিয়ে, সমস্ত জীবনের সাধনা দিয়ে প্রায় চারশো বছর পূর্বে এই শান্ত সুন্দর দেবমন্দির গড়ে গেছেন, সেই অতীত বাংলার সরল সহজ ভক্ত বৈষ্ণব কল্যাণ রায়ের কাহিনী কোন্ যুগান্তরের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে!*

ঠাকুরবাবুরা ব্রাহ্মসমাজের হলেও ঐ বাবদ বার্ষিক তিন হাজার টাকা দিতেন, বিগ্রহের বার্ষিক দেবোত্তরের আয় ছিল মাত্র এক হাজার টাকা। দীঘির ও মেলার আয় মন্দিরাদি মেরামতে খরচ হত। গোপীনাথের প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের কারুকার্যময় ইট দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ির সিংদরজা তৈরি করে দেন (নহবৎখানা সহ) এলমহার্স্ট সাহেবের প্ল্যান অনুসারে।

---

* পাবনা সহরে শালগাড়িয়া গ্রামে তাঁতি কল্যাণ রায়ের বংশধর এখনও কেউ কেউ আছেন বলে স্থানীয় লোকেরা অনুমান করেন। সেখানে তাঁতি কল্যাণ রায়ের সামান্য একটু দেবোত্তর সম্পত্তি অবশিষ্ট আছে শোনা যায়। এই সম্পত্তিটুকু বর্তমানে শালগাড়িয়ার জমিদার শ্রীতারকল্যাণ প্রামাণিকের তত্ত্বাবধানে।

কর্মচারী পুরোহিত ইত্যাদি বাদেও দৈনিক পনেরোজন অতিথিসেবার উপযোগী ভোগ রান্না হত। অতিথি সেবার জন্য রান্না বাড়ি, অতিথিশালা নূতন করে মেরামত করে দেওয়া হয়। গোপীনাথ-অঙ্গন এমন শান্ত সুন্দর শ্রীমণ্ডিত কদম্ব বৃক্ষে সুশোভিত ছায়াময় যে শিলাইদহের কোন দর্শকই এই শান্ত শ্রীঅঙ্গনে একটু বিশ্রাম সুখ সম্ভোগ না করে পারতেন না।

ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী হয়েও ঠাকুরবাবুরা স্থানীয় হিন্দু জনসাধারণের অধিষ্ঠাতা দেবতার সেবাপূজা অনুষ্ঠানাদির যথেষ্ট উন্নতি করেছিলেন। আজও প্রত্যহ প্রভাতে গোপীনাথের মঙ্গলারতি, দুপুরে ভোগারতি ও সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতির ঢোলের শব্দে কাঁশরের নিনাদে দেবতার আশীর্বাদ বহন করে আনে। বিবাহাদি প্রত্যেক অনুষ্ঠানে হিন্দু জনসাধারণ আজও গোপীনাথের চরণামৃত গ্রহণ করে থাকেন।

যুগল সা

অনেক দিন আগে যুগল সা নামে এক বিখ্যাত ধনী সওদাগর ছিলেন। কতদিন আগে, তা কেউ বলতে পারে না। ইনি পল্লীর বুকে যে কীর্তি রেখে গেছেন, তা এখনও বিলুপ্ত হয় নি। এঁর যে কাহিনী প্রচলিত আছে তার ঐতিহাসিক ভিত্তি অতি সামান্যই; শুধু প্রবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত রূপকথার গল্পের মত।

সেকালের সওদাগরদের মত তিনি ছিলেন বহু ধনরত্ন, দাসদাসীর মালিক। সপ্তডিঙা মধুকরের মত অনেক ছিল তাঁর বাণিজ্যতরী। সে সব বাণিজ্যতরণী সারা বাংলার নদ-নদী খাল বেয়ে নানা নগরে সহরে বন্দরে ঘুরে ভারে ভারে ধনরত্ন আহরণ করে আনত। আমাদের পুরাণের চাঁদ সদাগর, ধনপতি সদাগর, সায়বেনের মতই তিনি ছিলেন 'বণিকজাতি' বা বেনে।

যুগল সা ছিলেন নিষ্ঠাবান কালীসাধক। মা কালীর পুজো করে তাঁর আশীর্বাদ না নিয়ে কখনও বাণিজ্যে বেরোতেন না বা কোন বড় কাজে হাত দিতেন না। সংসারে তাঁর একমাত্র মায়াবন্ধন ছিলেন তাঁর মা। তিনি ছিলেন পরম মাতৃভক্ত ছেলে। মায়ের আদেশ তিনি মা কালীর আদেশের মতই পালন করতেন। তাঁর শিলাময়ী মা থাকতেন মন্দিরে; আর রক্তমাংসের

শরীর নিয়ে মা থাকতেন তাঁর প্রাসাদে সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী হয়ে। সেই মায়ের আদেশ ভাল হক আর মন্দ হক, তিনি সব সময়ে নির্বিচারে পালন করতেন। পরম মাতৃভক্ত সন্তান বলে সকলে তাঁকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি করত।

সেকালের পদ্মার তীরে তাঁর প্রকাণ্ড রাজবাড়ির মত অট্টালিকা, কালী-মন্দির, অতিথিশালা, নহবৎখানা ইত্যাদি নীল আকাশে মাথা উচু করে থাকত। গ্রামটির নাম ছিল কোটপাড়া। সে গ্রামটির চিহ্নমাত্রও নাই। কীর্তিনাশা রাক্ষসী পদ্মা তার সমস্ত কীর্তি সমেত গ্রামখানাকে তার লকলকে জিভ দিয়ে একেবারে পেটের মধ্যে পুরে নিয়েছে। মাঝে মাঝে ঐখানে প্রকাণ্ড চর পড়ে সেই নিশ্চিহ্ন সুদূর অতীতের সৌধকিরীটিনী গ্রামের স্মৃতিটি জাগিয়ে দেয়। সে কালের অনেক বৃদ্ধ ঐ চরে ঝড়-বাতাসের মধ্যে যুগল সার প্রেতমূর্তিকে অনেক সময়ে পায়চারি করতে দেখেছেন বলে গল্প করতেন।

মায়ের নিষেধ ছিল বলে যুগল সা বিবাহ করেন নাই। ব্যবসা-বাণিজ্যে যা উপার্জন করতেন সবই মা কালীর পূজায় আর মায়ের ব্রত-পাবণ দানধ্যানে ব্যয় করতেন। তবু তাঁর ধনরত্ন বেড়েই চলত দিনের পর দিন, যেন তিনি মায়ের বরে অক্ষয় ধনাগারের অধিকারী ছিলেন।

তখন যুগল সার মা বুড়ি হয়েছেন। তিনি একদিন ছেলেকে বললেন, 'বাবা, শুনতে পাই ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য তোর অগুনতি নাও আছে। তোর কত নাও আছে বল্।'

যুগল বললেন, 'মা, আমার যে কত নাও (নৌকা) আছে তার হিসেব নেই। আমার অগুনতি নাও।'

যুগলের মা কপালে চোখ তুলে বললেন, 'বটে! আচ্ছা একবার আমায় দেখা তো তোর কত নাও আছে।'

মাতৃভক্ত যুগল 'আচ্ছা মা, তোমাকে দেখাব' বলে হুকুম দিলেন, তাঁর প্রত্যেক নৌকার একজন করে মাল্লা এসে তাঁর মাকে একটি করে টাকা প্রণামী আর একখানি করে নৌকার বৈঠা সিংদরজার সামনে রেখে দেবে। হুকুম পেয়ে মাঝি-মাল্লারা এক এক নৌকা থেকে এসে হাজির হল।

যুগলের মা বৈঠকখানায় এসে খাটে বসলেন আর প্রত্যেক নৌকার একজন করে মাল্লা এসে তাঁকে প্রণাম করে একটি করে টাকা তাঁর খাটের সামনে আর একখানা করে বৈঠা সিংদরজার সামনে রেখে চলে গেল। সেদিন ভোর থেকে রাত প্রায় একটা পর্যন্ত এই রকম প্রণামী-পর্ব চলতে থাকল। যুগলের

মা চারি পাশে ছোট পাহাড়ের মত টাকার স্তূপে আড়াল হয়ে রইলেন আর সিংদরজার সামনে বৈঠার একটা পাহাড় গজিয়ে উঠল। যুগল মাকে হাত ধরে বাড়ির ছাদের উপর এনে বললেন, 'দেখলে তো মা। ঐ দেখ বৈঠার পাহাড়, আমার এত বড় বাড়ির চিলেকোঠা ছাড়িয়ে উঠেছে।'

যুগলের মা এতই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন যে তিনি বেশি কথা বলতে পারলেন না, শুধু বললেন—'এ্যাতো ?'

যেমনি ঐ কথাটুকু বলা, অমনি পদ্মার বুকে বিরাট গর্জন শোনা গেল। কেমন যেন ভোজবাজীর মত এক মুহূর্তে পদ্মার জল সমুদ্রের মত ফুলে উঠে যুগল সার অভ্রভেদী প্রাসাদখানা গ্রাস করতে ছুটে এল। একসঙ্গে শত বজ্রগর্জনের মত পদ্মার পাহাড়ের মত তরঙ্গ-ভঙ্গ, আর কাল আকাশে মেঘ গর্জে উঠল, বিদ্যুৎ চমকিয়ে কাল আকাশের বুক চৌচির করে দিল। বাড়ির সিংদরজায় বজ্রপাত হল, আর সঙ্গে সঙ্গে কালীমন্দিরে যুগলের রাজ-সংসারের অধিষ্ঠাত্রী মাকালী বিকট রবে অট্টহাস্য করে উঠলেন। নিমেষের মধ্যে যেন মহাপ্রলয় এসে যুগল সার অভ্রভেদী প্রাসাদ গ্রাস করে ফেলল। যুগল মাকে কাঁধে করে নিয়ে ঐ প্রলয় অন্ধকারে প্রাসাদ ছেড়ে গ্রামের দিকে ছুটলেন। অমনি পদ্মা ভীষণা রাক্ষসীর মত ধেয়ে এসে যুগল সার প্রকাণ্ড প্রাসাদ উদরস্থ করে ফেললে, কোন চিহ্ন মাত্র রাখলে না।

খানিক পরে আবার শান্ত পদ্মা বুকে জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি নিয়ে কলগান গেয়ে বইতে লাগল। যেখানে যুগল সার পাহাড়ের মত অট্টালিকা সগর্বে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে শুধু জল আর জল—অথৈ জল।

তারপরে যুগল সা কাঁদতে কাঁদতে সর্বস্ব হারিয়ে চলে এলেন (শিলাইদহ) কশবা গাঁয়ে। এসে এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে তাঁর বাণিজ্যতরীর লোক লস্করদের ডাকলেন। তারা যুগল সাকে হাজার হাজার টাকা এনে দিল গ্রামের মধ্যে নূতন বাড়ি, নূতন কালীমন্দির গড়বার জন্য। আবার যুগল সা প্রকাণ্ড এক অট্টালিকা গড়লেন, কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন, আর এক প্রকাণ্ড দীঘি খনন করলেন অট্টালিকার সামনে। আবার দু-তিন বছরের মধ্যে তাঁর প্রাসাদ দাস-দাসী, ধনরত্নে, মণিমুক্তায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

এইবারে যুগল সা হয়ে উঠলেন ভয়ানক কৃপণ। তাঁর মন কেবল ধনরত্ন সঞ্চয়ের দিকেই মেতে উঠল। মাকালীর পূজা করেন আর দেশ-বিদেশে বাণিজ্য করে ধনরত্ন আহরণ করে কোষাগার পরিপূর্ণ করেন। একদিন কৃষ্ণ-

পক্ষের অমাবস্যায় গভীর রাত্রে যখন যুগল সা কালীপূজা করছিলেন, তখন তাঁর বুড়িমা মারা গেলেন।

মাতৃভক্ত যুগল সা মাকে হারিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারে বন্ধ করে দিয়ে সর্বত্যাগী উদাসীনের মত দিনরাত কালীমন্দিরে পড়ে থাকতেন। ঘরসংসার, বিষয়-আসয় সব ছাড়লেন, ব্যবসা-বাণিজ্য সব নষ্ট হয়ে গেল। তিনি কেবল দিনরাত কালীমন্দিরের মধ্যে থাকতেন আর গভীর রাত্রে ঘুমন্ত গ্রামখানাকে সচকিত করে 'মা মা' বলে চীৎকার করতেন।

খরচ না করে ধনরত্ন অন্ধকার ঘরে বহুদিন একভাবে মজুৎ থাকলে সে ধনরত্ন 'দেউদে' হয়ে যায় অর্থাৎ যখ এসে সে ধন আগলে থাকে। তখন সে ধন 'যখের ধনে' পরিণত হয়। প্রকাণ্ড গোখরা সাপেরা যখের অনুচর রূপে সে ধনরত্ন পাহারা দেয়। সে ধনের গায়ে আর কেউ হাত দিতে পারে না। সর্বত্যাগী যুগলের কাছে তাঁর দেওয়ান এসে বললেন, 'আপনার ধনাগারের ধনরত্ন সব যখ হয়ে যাচ্ছে। এখন কি করব হুকুম দিন।'

যুগল নিজের প্রকাণ্ড দীঘি দেখিয়ে বললেন, 'বড় বড় পিতলের কলসিতে ধনরত্ন সব পুরে মুখ বেশ করে এঁটে ঐ দীঘির ঠিক মাঝখানে কলসিগুলোর গলায় শিকল বেঁধে রেখে দাও। টাকা পয়সা কিছু খরচ কর না।' এই বলে আবার তিনি মাকালীর সামনে ধ্যানস্থ হয়ে বসলেন।

দেওয়ানজি তাই করলেন। ঐ দীঘির ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটা লোহার স্তম্ভ পুতে তার সঙ্গে লোহার শিকল দিয়ে ধনরত্ন-পূর্ণ পেতলের ঘড়াগুলো বেঁধে রাখলেন। ধনাগার খুলে তিনি মা মনসার পূজা দিতেই চার-পাচটা ভয়ংকর অজগর সাপ ঐ অন্ধকার ঘর ছেড়ে দীঘির চারপাশে ভীষণ শব্দে ফোঁস্ ফোঁস্ করে গজরাতে লাগল। ঐ সব অজগর সাপেরা দীঘির চারি পাশে বাসা বাঁধল আর ভয়ংকর ফণা তুলে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কার সাধ্য ঐ দীঘির কাছে যায়।

তারপরে একদিন ঘোর অমাবস্যা রাত্রে যুগল সা মহাকালীর পূজার বিরাট আয়োজন করলেন। একশো ছাগ আর পঁচিশটি মহিষ মায়ের সামনে বলি দেওয়া হল। বলি শেষ হলে যুগল সা ঐ বলিদানের রক্ত সারা গায়ে মেখে পাগলের মত নাচতে লাগলেন। ঐ ছাগ আর মহিষের মুণ্ডগুলো মন্দিরের মধ্যে মা কালীর পায়ের কাছে স্তূপীকৃত করে রাখবার জন্য হুকুম দিলেন, আর ভীষণ রবে মা মা বলে চীৎকার করতে লাগলেন। তাঁর চেহারা

তখন রণোন্মত্ত দৈত্যের মত ভয়ংকর !

তারপর তাঁর লোকজন দাসদাসী, সবাইকে বললেন, 'তোমরা সব চলে যাও এখান থেকে। মায়ের মন্দির থেকে চারিদিকে এক রশির মধ্যে যেন একটিও জীবন্ত প্রাণী না থাকে। আমি এবারে মহাপুজোয় বসব।'

তাঁর আদেশ প্রতিপালিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘোর কৃষ্ণপক্ষের কালীবর্ণ আকাশ প্রকম্পিত করে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে পৃথিবীর বুক চৌচির হয়ে ফেটে গেল। সবাই লুকিয়ে প্রাণ বাঁচাল।

তার পরদিন গ্রামের সব লোক এসে দেখে—যুগল সার প্রকাণ্ড অট্টালিকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। কালীমন্দিরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কালীর ভগ্ন প্রতিমার পাশেই রাশি রাশি ফুলবেলপাতার মধ্যে কালীভক্ত যুগল সার মৃতদেহ পড়ে রয়েছে।

কোথায় সেই কালীভক্ত সদাগর যুগল সা ; কোথায় সেই তাঁর বিরাট কীর্তি ! এখনও তাঁর বিরাট দীঘি আর কালীমন্দিরের ধ্বংসস্তূপ গ্রামের বুকে বিরাট শ্মশানশয্যা তৈরি করে রেখেছে। সেখানে—

কত উৎসব হইল নীরব,
কত পূজা-নিশি বিগতা।
—শুধু চিরদিন বিরামবিহীন ভাঙা দেউলের দেবতা।

খোরসেদ ফকির

এপার ওপারে কূল দেখা যায় না। বিরাট জলরাশি নিয়ে ভীমা ভয়ংকরী পদ্মা চলেছেন কলগান গেয়ে আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত করে। তাঁর বুকে লক্ষ লক্ষ ঢেউ-এর উপর দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে সাঁ-সাঁ করে ছুটে চলেছে একখানি খেয়া নৌকা।

খেয়া নৌকার হাল শক্ত করে ধরে রেখেছে মাঝি। নৌকাভর্তি বহু দূর গ্রামের লোক খেয়া পার হচ্ছে। খেয়া নৌকার মালিক যাত্রীদের কাছ থেকে খেয়ার কড়ি আদায় করছে। একজন দীর্ঘশ্মশ্রু জটাজুটধারী ফকির রয়েছেন ঐ খেয়া নৌকার যাত্রী।

ঐ ফকিরের কাছে খেয়ার কড়ি চাইলে তিনি বললেন, 'বাবা আমি ফকির ; খোদাতালার আদেশে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই। আমার কাছে তো কড়িটড়ি কিছু নেই।' খেয়ার মালিক উঠল রেগে। সে বলল, 'ফকির হও আর যাই হও, খেয়ার কড়ি দিতেই হবে।'

বুড়ো ফকির শান্তভাবে বললেন, 'আমি ফকির, আমার তো কড়িটড়ি কিছু নেই বাবা।'

'ফকির টকির বুঝি না,—কড়ি না থাকে তো উঠলে কেন? নেমে যাও।'

ফকির আবার শান্তমুখে হাসলেন। অতলস্পর্শী মাঝপদ্মার বুকের উপর নৌকা থেকে নেমে যাবার কথায় একটু ভীত না হয়ে বললেন, 'আচ্ছা বাবা, নেমে যাচ্ছি।'

অমনি সেই সাগরের মত মাঝপদ্মায় জেগে উঠল প্রকাণ্ড এক চর। খেয়া নৌকাখানা ঐ চরে একেবারে আটকে গেল। কোথায় গেল চলে সাগর-প্রমাণ জলরাশি! তার বদলে বালির চরায় নৌকা আটকে একেবারে যেন ডাঙ্গায় উঠে পড়ল। জটাজূটধারী ফকির সেই রকম হাসিমুখে নৌকা থেকে ঐ হঠাৎ গজিয়ে-উঠা চরে নেমে পড়লেন। নৌকাশুদ্ধ মানুষ, নৌকার মালিক, মাঝি, সবাই অবাক—হঠাৎ সবাই যেন ভোজবাজি দেখে স্তম্ভিত!

নৌকার মালিক এসে ফকিরের পায়ে ধরলেন, 'জনাব, দয়া কর, আমায় মাফ্ কর। আমার এতবড় খেয়া নৌকা চড়ায় আটকিয়ে গেল। আমায় ক্ষমা কর, রক্ষা কর।'

ফকিরের মুখে সেই হাসি। তিনি বললেন, 'বাবা, তোমার নৌকা চলবেই, এতগুলো লোককে তুমি পারাপার করছ।' এই বলে তিনি একটু এগিয়ে গিয়ে চরের উপর তাঁর 'আশাসোটা' প্রতিষ্ঠা করে বসলেন। 'এইখানেই আমার আস্তানা হল। এই চরটা আমার বড় ভাল লেগেছে।' এই বলে তিনি মাথার উপর হাতখানা তুলে শান্ত পদ্মার তরঙ্গকে যেন একবার ইশারা করে ডাকলেন, আর খেয়া নৌকার গোলোই-এ হাত দিয়ে নৌকাখানাকে ঠেলা দিলেন। অমনি পদ্মার জল হু হু করে দৌড়ে এসে খেয়া নৌকাখানা মাথায় করে নিয়ে গেল। ফকির নীরবে নির্লিপ্তভাবে ঐ চরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ইতিমধ্যে নৌকার যাত্রীরা ফকিরের এই অলৌকিক কীর্তি দেখে ভয়ে ভক্তিতে অবাক হয়ে ঐ চরেই রয়ে গেল। নৌকাতে আর উঠল না। তারা সকলে ফকিরকে ভক্তিভরে সেলাম করে বলল, 'তুমি খোদার প্রিয় পাত্র।

তোমার কথা খোদাতালা ফেলতে পারেন না। আমরা তোমার শিষ্য হব, আমাদের তোমার নফর করে নাও।'

ঐ অজ্ঞাত ফকিরের নাম খোরসেদ ফকির।

তিনি বললেন, 'তোমাদের মঙ্গল হক। এইখানে আমি আমার আস্তানা বানাব। এই সুন্দর জায়গাটা আমার বড় ভাল লেগেছে। তোমরা তৈরি হয়ে এস, আমি তোমাদের দীক্ষা দেব।'

তারা বাড়ি থেকে স্নান করে পবিত্র হয়ে এল ফকিরের কাছে দীক্ষা নিতে। ফকির নমাজ পড়ে দেখেন তাঁর পায়ের কাছে একটি বটের চারা, একটি দেবদারুর চারা আর একটি অশ্বত্থের চারা পড়ে রয়েছে। তিনি হাত দিয়ে মাটি খুঁড়ে ঐ জনহীন চরের মধ্যে ঐ তিনটি চারা পুঁতলেন, যত্ন করে জল দিলেন। ঐ লোকগুলোকে দীক্ষা দিয়ে তিনি বললেন, 'পদ্মার কূলে এইখানে আমার "দরগা" হবে। এখানে সুন্দর একখানা গ্রামের পত্তন করব। তোমরা আমার শিষ্য হলে। আমি মক্কা থেকে একবার তীর্থপর্যটন করে আসি। আমার তীর্থপর্যটন শেষ হতে দশ বছর লাগবে। এইখানে আমার দরগা প্রতিষ্ঠিত করে গেলাম। তোমরা একে রক্ষা কর। আমি দশ বছর পরে আবার এইখানে এসে তোমাদের নিয়ে বাস করব। খোদা তোমাদের মঙ্গল করবেন!' এই বলে ফকির তীর্থভ্রমণে বেরুলেন।

ঠিক দশ বছর পরে খোরসেদ ফকির ঐ পদ্মাতীরস্থ দরগায় এসে দরগার চমৎকার দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। দলে দলে তাঁর শিষ্য এল। তারা বলল, এই সুন্দর গ্রাম আপনারই প্রতিষ্ঠিত বলে 'খোরসেদপুর' নামে পরিচিত হয়েছে।

ফকির দেখলেন সত্যিই তাঁর পোতা বট, অশ্বত্থ আর দেবদারু গাছ বেশ বড় হয়েছে। আরও অনেক গাছ ঐ দরগাটিকে শ্যামশোভায় শোভিত করেছে; শিষ্যেরা দরগার জন্য একটা খড়ের ঘর বানিয়েছে, নিজেরাও ঐ নূতন গ্রামে কয়েকখানা সুন্দর বাড়ি বেঁধেছে। কলনাদিনী পদ্মার তীরেই ছবির মত একখানা সুন্দর গ্রামের পত্তন হয়েছে দেখে ফকির অত্যন্ত প্রীত হয়ে বললেন, 'আমি এখন থেকে এইখানেই বাস করব। এই শান্ত সুন্দর গ্রামখানির এই দরগাতে বসে আল্লাকে ডাকব।'

শিষ্যেরা ফকিরের জন্য একখানি কুটির বেঁধে দিল। কুটিরের পাশে একটা সুন্দর বাগান করে তাতে আম, কাঁঠাল, নারকেল, সুপারি গাছ বসিয়ে

দিল ; কুটিরের সামনে একটা ফুলের বাগান করে দিল আর পাশেই একটি প্রকাণ্ড পুকুর খনন করে দিল। এমনি করে খোরসেদপুর গ্রামটি জন্ম নিল। কতকাল পূর্বে, তা কেউ বলতে পারে না। সেই প্রকাণ্ড পুকুরটি এখন 'পদ্মপুকুর' নামে সুপরিচিত।

ফকির তাঁর দরগাতে বসে মনের আনন্দে শিষ্যদের নিয়ে ধর্মালোচনা, নমাজ ইত্যাদি করতে লাগলেন। ক্রমে হিন্দু-মুসলমান অনেক লোক এসে ঐ খোরসেদপুরে তাদের বাড়িঘর তৈরি করে বাস করতে লাগল। এইভাবে বহুদিন কাটল।

একবার খুব ভয়ানক প্লাবন এল। বর্ষায় পদ্মার জল খোরসেদপুর গ্রামখানাকে যেন ধুয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে গেল। কিন্তু কারও বিশেষ কোন ক্ষতি হল না। ফকির সারা দিনরাত তাঁর সাধন ভজন নিয়ে দরগায় থাকেন। একজন মুসলমান শিষ্যকে তিনি তাঁর প্রধান সেবক মনোনীত করে তাঁকে দরগার 'খাদেম' করে দিলেন। বছরের পর বছর কেটে গেল, ফকির অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন।

একদিন অতি সুন্দর চাঁদনি রাতে বৃদ্ধ ফকির পরিপূর্ণ চন্দ্রালোকে কলনাদিনী পদ্মার শোভা আর গ্রামখানার শ্যামলশ্রী দেখে মুগ্ধ হয়ে কোরান থেকে ঈশ্বরের মহিমা গান করে জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিটা কাটিয়ে দিলেন। পরের দিন ভোরে তাঁর শিষ্যেরা দরগায় এসে দেখল, ফকির সেখানে নেই। সকলে বহু অনুসন্ধানেও তাঁকে খুঁজে পেল না।

শিষ্যেরা কেউ বলল, তিনি পদ্মার স্রোতের সঙ্গে মিশে কোথায় অন্তর্ধান করেছেন ; কেউ বলল তিনি পূর্ণিমার চন্দ্রের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। তাঁর শূন্য দরগা পড়ে রইল, যেন পুরাকালের কোন ঋষির তপোবন। প্রকাণ্ড বট, অশ্বত্থ, দেবদারু, তেঁতুল, নিম প্রভৃতি বনস্পতিদের ছায়ায় শান্ত স্নিগ্ধ নির্জন সুন্দর ঋষির তপোবন বহুদূর থেকে পদ্মাপারের লোকদের আকর্ষণ করে আনল। ক্রমে খোরসেদপুর বহু হিন্দু মুসলমানের বসতিতে পরিপূর্ণ একখানা সমৃদ্ধ গ্রামে পরিণত হল খোরসেদ ফকিরের দরগাকে কেন্দ্র করে।

ফকির হিন্দু-মুসলমান সবাইকে শিষ্য করতেন। একথা শুনলে অনেকেই একটা গালগল্প মনে করবেন, কিন্তু একথা অতিরঞ্জিত নয়। হিন্দু-মুসলমান সবাই নিজ নিজ ধর্মানুসারে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করত তাঁর উদার ধর্মমতে আকৃষ্ট হয়ে।

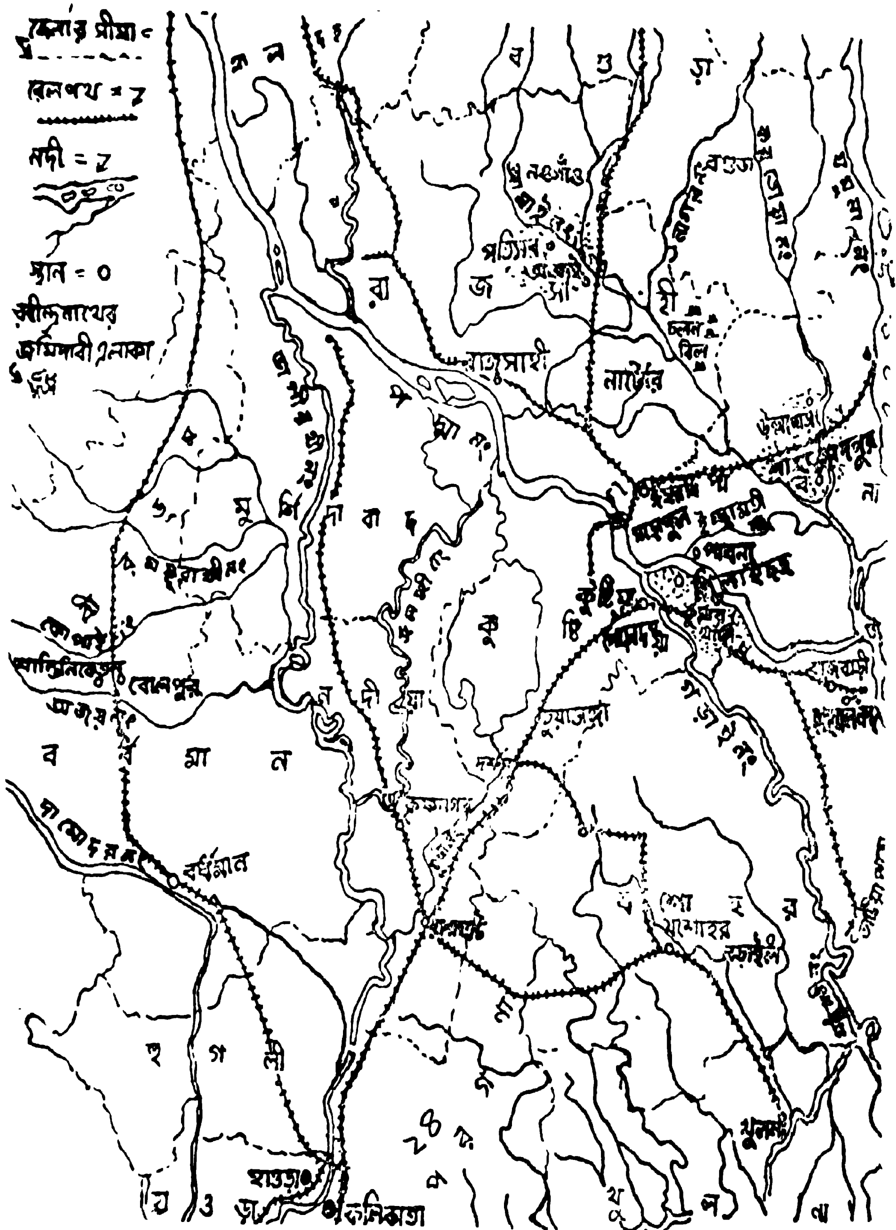
বহুকাল ধরেই তাঁর দরগায় গ্রামের হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীরা মিলে তাঁর জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান করত, মানত করত, শিরনি দিত। হিন্দু-মুসলমান সবাই তাদের গাছের প্রথম ফলটি, গাই-এর প্রথম দোয়া দুধটুকু স্নান করে পবিত্র ভাবে এনে তাঁর দরগায় নিবেদন করত। তারা বিশ্বাস করত ফকিরের দয়ায় তাদের গাছ প্রচুর ফলবান হবে, গাই দুগ্ধবতী হবে।

১৩১৪ সালে রবীন্দ্রনাথ ফকিরের দরগার শান্ত স্নিগ্ধ সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ঐ দরগার উপরে একটি সুন্দর পাকা বেদী তৈরি করে খোরসেদ ফকিরের স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন।

কোন একখানি অতি প্রাচীন পাঁচালিতে পড়েছি—

'খোরসেদপুর,* গ্রাম অতি দূর
যেথায় বসতি গোপীকানাথ,
রানী ভবানী ও সীতারাম রাজা,
পূত মহর্ষি চরণপাত।

* শিলাইদহ অঞ্চলের প্রকৃত নাম—খোরসেদপুর, কশবা হামিরহাট—এ তিনটি মৌজা বা গ্রাম সরকারি Settlement দলিলপত্রে প্রচলিত। নীলকরদের কুঠিই মাত্র সেকালে 'শিলাইদহ' বলে অভিহিত ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের সাহিত্য সাধনার তীর্থস্থানরূপে শিলাইদহের নাম এতই প্রসিদ্ধ করে তুলেছেন যে গ্রামের বা মৌজার আসল নামগুলি যেন একদম বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। পোস্টাফিসের নাম পর্যন্ত শিলাইদহ।



শান্তিনিকেতন ও ঠাকুর এস্টেট

(শিলাইদহ, সাহাজাদপুর, পতিসর)

ওঁ মৈত্রী

কল্যাণীয়েষু

শিলাইদহে আমার জীবনযাত্রার যে লীলা চাঞ্চল্যের কথা প্রকাশ করেছ তাহা পড়িয়া দেখিলাম। আমার সেই সময়কার মনোভাবের কথা কেহই ঠিকমত জানিবে না। এবং আমি অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন ছিলাম বলিয়াই তাহা সম্ভব হইয়াছিল। আর আমি এখনকার মত নিরাশ্রয় — আমার বাসা ভাঙিয়াছে। লোকের উপর তখনকার সময়ের দাবীও এমন বিস্তৃত ছিলনা — আর বেশি মানুষের সঙ্গের দাবী তাহার উৎকট তেমন প্রবল। আজকাল আমার নিভৃত শুশ্রূষা আমার মনে একান্ত আবশ্যক ছিল আজই তাহা দুর্লভ হইয়াছে। ইতি ২৫ শ্রাবণ ১৩৩৫

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি

জগতে আনন্দযজ্ঞে
আমার নিমন্ত্রণ।
ধন্য হল ধন্য হল ~~[illegible]~~
মানব জীবন।

নয়ন আমার রূপের পুরে
সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে
শ্রবণ আমার ~~[illegible]~~ গভীর সুরে
হয়েছে মগন।
তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ বাজাই আমি বাঁশি —
গানে গানে গেঁথে বেড়াই
প্রাণের কান্না হাসি।
এখন সময় হয়েছে কি,
সভায় গিয়ে তোমায় দেখি?
জয়ধ্বনি শুনিয়ে যাব
এ মোর নিবেদন।

৩০শে
আশ্বিন
শিলাইদা

চ র ণ রে খা ত ব যে প থে দি লে লে খি

....

কবির শিলাইদহ বাস

কবিজীবনে শিলাইদহ অবিস্মরণীয় স্থান। জমিদারি কার্যোপলক্ষে এবং পল্লীপ্রকৃতির আকর্ষণে তিনি বার বার শিলাইদহে গেছেন। কবির শিলাইদহ-গমনাগমন-পঞ্জি লেখক প্রস্তুত করেছিলেন, তা পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত করেছেন অরবিন্দ ভট্টাচার্য। —প্রকাশক।

১৮৭৬। বয়স ১৫

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে শিলাইদহ গমন। বিশ্বনাথ শিকারির সঙ্গে শিলাইদহের জঙ্গলে বাঘ শিকারের বর্ণনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ।—ছেলেবেলা, ১৩৭৫ মুদ্রণ পৃ ৬২-৬৮

[৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কর্মচারী যশোরের বেণীমাধব রায়চৌধুরীর কন্যা মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে (বয়স ১১) কবির (বয়স ২২) বিবাহ হয় জোড়াসাঁকো বাড়িতে।]

১৮৮৮। বয়স ২৭

নভেম্বর মাসের শেষদিকে কিছু দিনের জন্য সপরিবারে শিলাইদহে নৌকাবাস, সঙ্গী ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ।—ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ৩; ছিন্নপত্র, পত্র ১০ অনুযায়ী চিঠির তারিখ নভেম্বর ১৮৮৯। তদনুযায়ী কবির বয়স ২৮

১৮৯০। বয়স ২৯

শিলাইদহে গমন। শিলাইদহ সদর কাছারির পুণ্যাহ উৎসবে প্রথম যোগদান। সেখান থেকে সাজাদপুর গমন। প্রজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ও নানাবিধ আলোচনা।

জুন মাসে পুনরায় শিলাইদহ গমন, চর ভ্রমণ, পদ্মায় ভ্রমণ, প্রজাদের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়।

১৮৯১। বয়স ৩০

জমিদারি পরিদর্শনের ভার নিয়ে জানুয়ারি মাসে শিলাইদহ, সাজাদপুর ও আত্রাই নদীতীরে কালীগ্রামে (পতিসর) বাস—প্রায় চার মাস কাল।

জমিদারির বিধিব্যবস্থা দর্শন ও পরীক্ষা, প্রজাদের সঙ্গে আলাপ। সেপ্টেম্বরে কটকের জমিদারি পরিদর্শনান্তে অক্টোবরে পুনরায় কালীগ্রাম (পতিসর), সাজাদপুর ও শিলাইদহ ভ্রমণ।—ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ৯-২৬, ৩১-৩৬

১৮৯২। বয়স ৩১

জমিদারির নানা কাজে জানুয়ারি থেকে এপ্রিলের মধ্যে বার বার শিলাইদহ গমন, চাষিদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়, জমিদারি সেরেস্তার সংস্কার-প্রচেষ্টা। জুলাই-এ আবার শিলাইদহ গমন, পদ্মায় ভ্রমণ, গোয়ালন্দ, সাজাদপুর কাছারি, রামপুর-বোয়ালিয়া গমন, নাটোর গিয়ে বন্ধু লোকেন পালিত ও নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা। এই সময়ে জমিদারির বিখ্যাত গঙ্গ পাল্টি থেকে ফেরার পথে কবির বোট গোড়াই ব্রীজে ধাক্কা খায় এবং সঙ্কট সৃষ্টি হয়। ডিসেম্বর পর্যন্ত কবি এই এলাকায় ছিলেন।—ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ৩৭-৪২, ৫৩-৭৫

১৮৯৩। বয়স ৩২

বলেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে কটকের জমিদারি ভ্রমণান্তে মে মাসে কালীগ্রাম ও শিলাইদহ গমন। জমিদারি সম্বন্ধে নানা চিন্তা। শিলাইদহ জমিদারির কাজে শৈলেশ মজুমদার ও চন্দ্রময় সান্যালকে নিয়োগ। এই সময় নানা মামলা-মোকদ্দমার ঝঞ্ঝাট এসে পড়ে।—ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ৯৩-৯৮, ১০১-১১০

১৮৯৪। বয়স ৩৩

ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি প্রথমে কালীগ্রামে (পতিসর) পরে শিলাইদহ গমন, জমিদারি সেরেস্তার নানাবিধ সংস্কার, পল্লী উন্নয়নের নানা পরিকল্পনা। এই সময়ে মামলা-মোকদ্দমার ঝামেলায় কবিকে বিব্রত হতে হয়। ঐ সময়ে যাতায়াতের পথে রানাঘাটের তৎকালীন মহকুমা হাকিম কবি নবীনচন্দ্র সেনের আতিথ্য কবি গ্রহণ করেন (২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪)। 'তিনি যখন গাড়ি হইতে নামিলেন, দেখিলাম, সেই ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের নবযুবকের আজ পরিণত যৌবন। কি শান্ত, কি সুন্দর, কি প্রতিভান্বিত দীর্ঘাবয়ব!'—আমার জীবন, পৃ ৫

রবীন্দ্রনাথ সদ্যরচিত 'এসো এসো ফিরে এসো, বঁধু হে ফিরে এসো' গানটি নবীনচন্দ্রকে শোনান।—রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সং, পৃ ৪০৬,।—ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ১১৩-১৩০, ১৩৮-১৫৭, ১৭৮-১৮৪

১৮৯৫। বয়স ৩৪

ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে শিলাইদহ গমন, একটানা প্রায় দু মাস অবস্থিতি, সারা বছরটার অধিকাংশ সময়ই জমিদারিতে কাটে। বলেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে, কুষ্টিয়ার ব্যবসায়ে যোগদান—পাটের কারবার, আখ-মাড়াই কল সংগ্রহ, শিলাইদহেও ব্যবসায়ের একটি কেন্দ্র স্থাপন। তাঁত শিল্পের প্রসারের উদ্দেশ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরামর্শে শিলাইদহ কাছারির প্রাঙ্গণে তাঁতের কারখানা স্থাপন। এর আগে জমিদারির অন্তর্গত পাণ্টির হাটে সুতো ও কাপড়ের হাট স্থাপন।—ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ১৮৬-২০০, ২১২-২১৪, ২১৬-২২১, ২২৪-২৫০

১৮৯৬। বয়স ৩৫

'মহর্ষির বয়স তখন আশির কাছাকাছি, মৃত্যুর পূর্বে সকলের যথাযথ প্রাপ্য যথোচিতভাবে বণ্টন ও সুব্যবস্থিত করিবার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। তদনুসারে গগনেন্দ্রনাথদের জমিদারি পৃথক করিয়া দেওয়া হইল; সাজাদপুর জমিদারি তাঁহাদের অংশে পড়িল। জমিদারি সংক্রান্ত কার্য বন্দোবস্ত করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুর চলিলেন, এই পরগণার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ এইখান হইতে চুকিল।'—রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সং, পৃ ৪৪৬

সাজাদপুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ছিল, এই পরগণা হস্তচ্যুত হওয়ায় কবির মনে খুবই আঘাত লেগেছিল। ('যাত্রী', 'তৃণ', 'স্বার্থ', 'শান্তিমন্ত্র', 'শুশ্রূষা' কবিতা)

১৮৯৭। বয়স ৩৬

জুন মাসের মাঝামাঝি শিলাইদহ গমন। বৈষয়িক ঝঞ্ঝাট ও ঝামেলা দূর হলে পর কবি জমিদারি ব্যবস্থার (শিলাইদহ ও কালীগ্রাম) সংস্কারের জন্য নতুনভাবে বিধিবদ্ধ নিয়মাবলি প্রণয়ন করেন। চরমহালের (শিলাইদহ) শাসন সংরক্ষণের জন্য দুজন আমিনের নিয়োগ হল। ইতিপূর্বে প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ জগদানন্দ রায় শিলাইদহ কাছারিতে নিযুক্ত হয়েছেন। এই সময়ে নিযুক্ত হলেন পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জমিদারি ব্যবস্থা আমূল সংশোধনের উদ্দেশ্যে এই সময় কবি শিক্ষিত ভদ্রসন্তানদের উপযুক্ত কর্মে নিয়োগের ব্যবস্থা করেন।

১৮৯৮। বয়স ৩৭

'ঢাকা হইতে ফিরিয়া শিলাইদহে স্ত্রীর পত্র পাইলেন।' এই পত্রের উত্তর শিলাইদহ থেকে লিখিত।—চিঠিপত্র ১, পত্র, ১৬ জুন ১৮৯৮,—রবীন্দ্রজীবনী, ১ম, ৪র্থ সং, পৃ ৪৬৬

১৮৯৯। বয়স ৩৮

মে মাসের প্রথম থেকে কবি-জমিদার সপরিবারে শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে এসে সংসার পাতলেন (রবীন্দ্রজীবনী, ১ম, ৪র্থ সং, পৃ ৪৮৩), উদ্দেশ্য জমিদারির আমূল সংস্কারসাধন এবং সেই সঙ্গে পল্লীসংগঠনের পরিকল্পনাগুলি কার্যে রূপায়ণ। অন্যদিকে পল্লী পরিবেশের মধ্যে পুত্রকন্যাদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যও কবির ছিল—এজন্য গৃহবিদ্যালয় গঠিত হল, শিক্ষক হলেন পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব, জগদানন্দ রায় ও লরেন্স সাহেব। এইভাবে শিলাইদহ বাসের আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল, তা হল পল্লীপ্রকৃতির সান্নিধ্যে ব্যক্তিজীবনে প্রশান্তি ও নবোদ্যম লাভ।

২২ আগস্ট (৬ ভাদ্র ১৩০৬) কলিকাতায় বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু। কুষ্টিয়ার ব্যবসা বিপন্ন।—চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ, পত্র ২, ৩; চিঠিপত্র ৮ম, পত্র ৭২-৭৫, ৭৭-৭৯

১৯০০। বয়স ৩৯

ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি বলেন্দ্রনাথের স্ত্রী সুশীতলাকে নিয়ে শিলাইদহ গমন। ক্রমাগত লোকসানের জন্য কুষ্টিয়ার ব্যবসা বন্ধ হল, এ জন্য তারকনাথ পালিতের নিকট কবি প্রায় সত্তর হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন—এই ঋণ শোধ হয় ১৯১৭-য়।

মার্চ মাসে কর্ণেল মহিম ঠাকুর, যতীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ কবির বন্ধুবর্গ শিলাইদহে আসেন। —চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ, পত্র ৪; চিঠিপত্র ৮ম, পত্র ১০০-১০৩, ১১৮-১২০, ১২২, ১২৭, ১২৮, ১৩০-১৩৩

১৯০১। বয়স ৪০

জুন মাসের শেষে শিলাইদহে। শিলাইদহ সদর কাছারির শুভ পুণ্যাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত। জমিদারির কাজ পুরোদমে চলছে, কবিও ব্যস্ত। এই সময়ে কবিপত্নী অসুস্থ হয়ে পড়েন।—চিঠিপত্র ১ম, পত্র ২৭, ২৯; চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ, পত্র ১১, ১৩; চিঠিপত্র ৮ম, পত্র ১৩৪

[১৯০১, ১৫ জুন কবি বিহারীলালের পুত্র শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার বিবাহ।
১৯০১, ২২ ডিসেম্বর (৭ পৌষ) শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।]

১৯০২। বয়স ৪১

শিলাইদহ থেকে পীড়িতা স্ত্রীকে প্রথমে শান্তিনিকেতনে, পরে কলিকাতায় নেওয়া হয়। ২৩ নভেম্বর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ২৯ বৎসর বয়সে কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু।

১৯০৩। বয়স ৪২

সেপ্টেম্বর মাসে কন্যা রেনুকার মৃত্যুর পরই পদ্মাতীরে শিলাইদহে বাস।

১৯০৪। বয়স ৪৩

১ ফেব্রুয়ারি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষাতাপস অধ্যাপক সতীশচন্দ্র রায়ের অকালমৃত্যু। ফেব্রুয়ারিতে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় অস্থায়ীভাবে শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। ২৮ মে বিদ্যালয় পুনরায় শান্তিনিকেতনে স্থানান্তরিত।

এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সময়ের অনেকটাই কবি শিলাইদহে অতিবাহিত করেন। এই সময়ে জমিদারির কাজে আরও কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তির নিয়োগ এবং কয়েকজন দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মচারীর অপসারণ।

১৯০৫। বয়স ৪৪

নভেম্বরে শিলাইদহ গমন। কালীগ্রামে (পতিসর) ও শিলাইদহে কৃষকদের হিতার্থে কৃষিব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা। গ্রামোন্নতির নানাবিধ পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যারম্ভ। কুষ্টিয়াতে বয়নবিদ্যালয় স্থাপন।
[১৯০৫, ২৯ জানুয়ারি জোড়াসাঁকো ভবনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু।]

১৯০৬। বয়স ৪৫

প্রকৃতির সান্নিধ্যলাভের জন্য শিলাইদহে আগমন—কলিকাতায় তখন রাজনৈতিক উত্তেজনা, কবি এই উত্তালতা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। কৃষিবিদ্যা এবং গো-পালন শিক্ষার উদ্দেশ্যে রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষ মজুমদার রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ও ব্যবস্থায় আমেরিকায় গেলেন।

পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ, কুমিল্লা ও আগরতলায় কয়েকদিন অবস্থান।

১৯০৭ । বয়স ৪৬

[৬ জুন কনিষ্ঠা কন্যা মীরার বিবাহ, জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—বিবাহের পরেই জামাতাকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে আমেরিকায় প্রেরণ। ২৪ নভেম্বর ৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৪, মুঙ্গেরে কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু (বয়স ১১)।]

ডিসেম্বরের প্রথমে বেলা, মীরাকে নিয়ে শিলাইদহ গমন। প্রায় চার মাস বিচ্ছিন্নভাবে শিলাইদহে অবস্থিতি—জমিদারির নানা কাজে ব্যাপৃত।

১৯০৮ । বয়স ৪৭

জানুয়ারিতে শিলাইদহ থেকে কলিকাতায়—মাঘোৎসবে 'দুঃখ-ধর্ম' ভাষণ দান—আবার শিলাইদহে প্রত্যাগমন। জমিদারিতে 'পল্লীগঠন কার্যের দৃষ্টান্ত' দেখাবার প্রচেষ্টা—এই প্রচেষ্টায় কালীমোহন ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন তরুণ কবির সহায় হন। অক্টোবরে কবির পুনরায় শিলাইদহে অবস্থিতি—জমিদারিতে মণ্ডলীপ্রথা প্রবর্তন—পুরোনো ব্যবস্থার পরিবর্তে এই ব্যবস্থা চালু করতে গিয়ে কবি বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন।

১৯০৯ । বয়স ৪৮

সাড়ে তিন বৎসর আমেরিকায় অবস্থিতির পর কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী রথীন্দ্রনাথ সেপ্টেম্বরে কলিকাতায় ফিরে আসেন, এই মাসেই কবির পুত্রসহ জমিদারি পরিদর্শন, নৌকা যোগে পদ্মাবক্ষে বিচরণ। অক্টোবরে শিলাইদহে রাখিবন্ধনের উৎসব উদ্‌যাপন।

গীতাঞ্জলির গান রচনার যুগ।

শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে রথীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ সম্বন্ধে হাতে কলমে কাজ শুরু করলেন।

১৯১০ । বয়স ৪৯

[২৭ জানুয়ারি রথীন্দ্রনাথের বিবাহ, বধূ প্রতিমাদেবী।
অগস্ট মাসে গীতাঞ্জলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় (১৩১৭)।]

সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রায় তিন মাসের জন্য কবির শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে এবং 'পদ্মা' বোটে অবস্থিতি।

১৯১১। বয়স ৫০

বর্ষাকালে কিছুদিনের জন্য শিলাইদহে অবস্থিতি। শরৎকালে (সেপ্টেম্বরে) অসুস্থতার জন্য বিদেশ যাওয়ার জল্পনা-কল্পনা কার্যকর না হওয়ায় বিষণ্ণ কবি শিলাইদহে পদ্মাবক্ষে বিশ্রামের জন্য আসেন এবং নভেম্বরের মাঝামাঝি শান্তিনিকেতনে ফিরে যান।

১৯১২। বয়স ৫১

১৯ মার্চ কলিকাতা বন্দর থেকে বিদেশ যাত্রার আয়োজন। কবি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় যাত্রা স্থগিত, কবির সঙ্গী ডাঃ দ্বিজেন্দ্র মৈত্র একাই বিদেশ গেলেন। কবি এলেন তাঁর কাঙ্ক্ষিত ভূমি শিলাইদহে। প্রায় মাসাধিককাল শিলাইদহে বাস। গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদকার্য চলছে।

[২৪ মে বিলাত যাত্রার জন্য (তৃতীয়বার বিদেশ ভ্রমণ) রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীকে নিয়ে বোম্বাই-এর পথে কলিকাতা ত্যাগ, ১৬ জুন লণ্ডনে পৌঁছান। Song Offerings-এর পাণ্ডুলিপি বন্ধু শিল্পী রোদেনস্টাইনের হস্তে অর্পণ।]

১৯১৩ নভেম্বর নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তির সংবাদ শান্তিনিকেতনে পৌঁছায়।

১৯১৪। বয়স ৫৩

ফেব্রুয়ারিতে শিলাইদহে। জমিদারিতে মণ্ডলী প্রথা প্রায় অচল দেখে কবি ব্যথিত। অগস্টে পুনরায় শিলাইদহে।

১৯১৫। বয়স ৫৪

ফেব্রুয়ারিতে শিলাইদহে আগমন, সঙ্গী শিল্পী নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর, মুকুল দে। প্রায় পক্ষকাল অবস্থিতি। নভেম্বরে আবার শিলাইদহে—জমিদারিতে পল্লী উন্নয়ন প্রচেষ্টা—চিকিৎসা, প্রাথমিক শিক্ষা, পূর্তকাজ, ঋণদান ব্যবস্থা, সালিশি বিচার—এই পঞ্চবিধ কর্মসূচী গ্রহণ, অতুল সেন প্রমুখ যুবকদের এই সব কাজে আত্মনিয়োগ।

১৯১৬। বয়স ৫৫

ফেব্রুয়ারিতে, উত্তরবঙ্গের জমিদারিতে (কালীগ্রাম, পতিসর) গমন—কলেরার প্রকোপ নিবারণ-প্রচেষ্টা। শিলাইদহে পুনরায় পল্লীহিতকর কর্মপ্রচেষ্টা।

[মে : চতুর্থবার বিদেশে—এই যাত্রায় প্রথমে জাপানে, তারপরে আমেরিকায় গমন।]

১৯২১-১৯২২। বয়স ৬০

১৯২১-এর ২৮ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতন থেকে কলিকাতা হয়ে শিলাইদহে—উদ্দেশ্য পদ্মার আতিথ্য গ্রহণ— 'আমি নদী ভালোবাসি। কেন বলব? আমরা যে ডাঙার উপর বাস করি, সে ডাঙা তো নড়ে না··· নদীর জল দিনরাত্রি চলে, তার একটা বাণী আছে।'—ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪৫, ২২ পৌষ ১৩২৯। এই সময়ে সাত দিন, ৫ জানুয়ারি ১৯২২ পর্যন্ত কবি শিলাইদহে বাস করেন।

১৯২২। বয়স ৬১

১৯২১-এর ২৮ ডিসেম্বর কলিকাতা থেকে শিলাইদহ গমন এবং ৫ জানুয়ারি ১৯২২ শিলাইদহ থেকে শান্তিনিকেতন গমন। পুনরায় মার্চ ১৯২২ শিলাইদহ গমন।

কবির ইচ্ছা ছিল লেভি সাহেবের সঙ্গে নেপাল যাবেন, কিন্তু আত্মীয়বন্ধুদের কাছ থেকে বাধা পান। '···লেভিরা (১৮ মার্চ) নেপাল যাত্রা করিলে কবিও শিলাইদহে চলিয়া গেলেন। সেখানে কুঠিবাড়িতেই উঠিলেন।'

—রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড, ২য় সং, পৃ ১২০

'আগে পদ্মা কাছে ছিল— এখন নদী বহুদূরে সরে গেছে।'—ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪৬

'শিলাইদা ঘুরে এলুম—পদ্মা তাকে পরিত্যাগ করেচে—তাই মনে হল বীণা আছে, তা'র তার নেই। তার না থাকুক, তবু অনেককালের অনেক গানের স্মৃতি আছে। ভাল লাগ্‌ল, সেই সঙ্গে মনটা কেমন উদাস হল।'—চিঠিপত্র ৫, পৃ ৩৮ (প্রথম প্রকাশ)

এই-ই কবির শিলাইদহে শেষ গমন, ১৫ দিন অবস্থিতি (৮ চৈত্র-২৩ চৈত্র)। কবির সঙ্গী ছিলেন ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও এণ্ড্রুজ সাহেব। এবারের শিলাইদহ গমন ও ভ্রমণ নানাভাবে শিলাইদহের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

কবির শেষ জমিদারি-ভ্রমণ : পতিসরে

১৯৩৭। বয়স ৭৬

'......কবির জমিদারিতে যাওয়া স্থির হইল। প্রজাদের ইচ্ছা 'পুণ্যাহ' দিনে সেখানে 'বাবুমশায়' উপস্থিত হন। কবিরও ইচ্ছা শেষবারের মতো বহুদিনের সুখদুঃখের স্মৃতি-জড়িত স্থান দেখিয়া আসেন।......

১০ শ্রাবণ রাত্রি এগারোটার সময় শিয়ালদহ হইতে ট্রেনে রওনা হইয়া পরদিন মধ্যরাত্রিতে পতিসর পৌঁছিলেন। ১২ শ্রাবণ পুণ্যাহ।'

'একজন বৃদ্ধ মুসলমান কবিকে বলিলেন, "আমরা তো হুজুর বুড়ো হয়েছি, আমরাও চল্‌তি পথে; বড়ই দুঃখ হয়, প্রজা-মনিবের এমন মধুর সম্বন্ধের ধারা বুঝি ভবিষ্যতে বন্ধ হয়ে যায়।"

—রবীন্দ্রজীবনী ৪ খণ্ড, ২য় সং, পৃ ১০১, ১০২

২৬ জুলাই-এ যাত্রা। এই যাত্রায় কবির সঙ্গী ছিলেন সুধাকান্ত রায় চৌধুরী। [দ্র. চিঠিপত্র ৯, পৃ. ৩৩৭—পতিসর ভ্রমণের ইঙ্গিত ১৩ অগস্ট ১৯৩৭-এ শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লেখা চিঠিতে আছে।]

কবির জীবনে, শিলাইদহের আকর্ষণ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। শিলাইদহ তাঁর কাছে কেবল জমিদারি মাত্র ছিল না। এই স্থানের আকাশ-বাতাস, নরনারী কবির হৃদয়ে চিরদিনই বাঁশি বাজিয়েছে। পারিবারিক ভাগ বাঁটোয়ারায় শিলাইদহের পরিচালন-দায়িত্ব কবির হস্তচ্যুত হওয়ায় তাঁর মনের গভীরে শেষ দিন পর্যন্ত এক অপ্রকাশ্য বেদনাবোধ জাগরূক ছিল। তাঁর এই মানসিক অবস্থা তাঁর পারিবারিক পার্শ্বচররা নানা ইঙ্গিতে বুঝতে পারতেন। কালীগ্রামে শেষবার (জুলাই ১৯৩৭) কবি ঘুরে এসেছেন অসুস্থ শরীর নিয়ে, ভ্রমণান্তে ফিরেছেন শান্তিনিকেতনে। উত্তরায়ণের বারান্দায় একদিন কবি আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হয়ে বসে আছেন। আত্মীয়পরিজন কবিকে তাঁর ভ্রমণ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করছেন। কবি কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে বসে রয়েছেন, দৃষ্টি যেন স্মৃতির রাজ্যে নিবদ্ধ, একটি প্রশ্নেরও তিনি জবাব দিচ্ছেন না। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপন মনে বলে উঠলেন—আর একবার শিলাইদহে গেলে বড়...... । আর কথা শেষ করতে পারলেন না। এ ঘটনার সাক্ষী ঠাকুর এস্টেটের পুরাতন কর্মচারী শ্রীঅন্নদাকুমার মজুমদার (বাড়ি শিলাইদহে)।

কবির শিলাইদহে অবস্থিতির সুস্পষ্ট তারিখ

শিলাইদহ থেকে লেখা চিঠি (পুস্তক-আকারে এ পর্যন্ত প্রকাশিত) অনুযায়ী

অরবিন্দ ভট্টাচার্য-সংগৃহীত—প্রকাশক।

ছিন্নপত্রাবলী

[সঙ্কেত—তির্যক রেখার আগে পত্র সংখ্যা, পরে চিঠির তারিখ উল্লিখিত হয়েছে।]

৩/২ ডিসেম্বর ১৮৮৮*
৩১/১ অক্টোবর ১৮৯১
৩২/২০ আশ্বিন ১২৯৮
৩৩/২৯ আশ্বিন ১২৯৮
৩৪/২ কার্তিক ১২৯৮
৩৫/৩ কার্তিক ১২৯৮
৩৬/৬ অগ্রহায়ণ ১২৯৮
৩৭/৪ জানুয়ারি ১৮৯২
৩৮/৬ জানুয়ারি ১৮৯২
৩৯/৯ জানুয়ারি ১৮৯২
৪০/১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯২
৪১/৭ এপ্রিল ১৮৯২
৪২/৮ এপ্রিল ১৮৯২
৫৩/১২ জুন ১৮৯২
৫৪/জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯
৫৫/২ আষাঢ় ১২৯৯
৫৬/১৬ জুন ১৮৯২
৫৭/৪ আষাঢ় ১২৯৯
৫৯/২২ জুন ১৮৯২
৬৭/২০ জুলাই ১৮৯২
৬৮/২১ জুলাই ১৮৯২
৬৯/৩ ভাদ্র ১২৯৯
৭০/২০ অগস্ট ১৮৯২
৭৪/৯ ডিসেম্বর ১৮৯২
৭৫/১৮ ডিসেম্বর ১৮৯২
৯৩/২ মে ১৮৯৩
৯৪/৮ মে ১৮৯৩
৯৫/১০ মে ১৮৯৩
৯৬/১১ মে ১৮৯৩
৯৭/১৩ মে ১৮৯৩
৯৮/১৬ মে ১৮৯৩
১০১/২ জুলাই ১৮৯৩
১০২/৩ জুলাই ১৮৯৩
১০৩/৪ জুলাই ১৮৯৩
১২১/২৪ জুন ১৮৯৪
১২২/২৬ জুন ১৮৯৪
১২৩/২৭ জুন ১৮৯৪
১২৪/ [২৮ জুন ১৮৯৪]
১২৫/৩০ জুন ১৮৯৪
১২৬/৫ জুলাই ১৮৯৪
১২৭/৬ জুলাই ১৮৯৪
১৩৮/৪ অগস্ট ১৮৯৪
১৩৯/৫ অগস্ট ১৮৯৪
১৪০/৮ অগস্ট ১৮৯৪
১৪১/৯ অগস্ট ? ১৮৯৪
১৪২/১০ অগস্ট ১৮৯৪

* 'ছিন্ন পত্র'-এর ১০নং পত্র অনুযায়ী তারিখ নভেম্বর ১৮৮৯

১৪৩/১২ অগস্ট ১৮৯৪
১৪৪/১৩ অগস্ট ১৮৯৪
১৪৫/১৬ অগস্ট ১৮৯৪
১৪৬/১৯ অগস্ট ১৮৯৪
১৭৮/২৫ নভেম্বর ১৮৯৪
১৭৯/২৮ নভেম্বর ১৮৯৪
১৮০/৬ ডিসেম্বর ১৮৯৪
১৮১/৭ ডিসেম্বর ১৮৯৪
১৮২/১১ ডিসেম্বর ১৮৯৪
১৮৩/১২ ডিসেম্বর ১৮৯৪
১৮৪/১৪ ডিসেম্বর ১৮৯৪
১৮৬/৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫
১৮৭/[১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫]
১৮৮/১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫
১৮৯/১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫
১৯০/১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫
১৯১/২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫
১৯২/২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫
১৯৩/১৬ ফাল্গুন ১৩০১
১৯৪/২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫
১৯৫/১ মার্চ ১৮৯৫
১৯৬/৬ মার্চ ১৮৯৫
১৯৭/৭ মার্চ ১৮৯৫
১৯৮/৮ মার্চ ১৮৯৫

১৯৯/১০ মার্চ ১৮৯৫
২০০/১১ মার্চ ১৮৯৫
২২১/১০ জুলাই ১৮৯৫
২২৪/১৪ অগস্ট ১৮৯৫
২২৫/১৮ অগস্ট ১৮৯৫
২২৬/২০ অগস্ট ১৮৯৫
২২৭/২৩ অগস্ট ১৮৯৫
২২৮/২৪ অগস্ট ১৮৯৫
২২৯/২০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫
২৩০/২১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫
২৩১/২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫
২৩২/২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫
২৩৩/৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫
২৩৪/৪ অক্টোবর ১৮৯৫
২৩৫/৪ অক্টোবর ১৮৯৫
২৩৮/১০ অক্টোবর ১৮৯৫
২৩৯/১৫ অক্টোবর ১৮৯৫
২৪০/১৬ অক্টোবর ১৮৯৫
২৪৮/শিলাইদহ জলপথে ৮ ডিসেম্বর ১৮৯৫
২৫০/১২ ডিসেম্বর ১৮৯৫
২৫১/১৪ ডিসেম্বর ১৮৯৫
১৫২/১৫ ডিসেম্বর ১৮৯৫

চিঠিপত্র ১ম

১১/২০ জুলাই ১৮৯২
১৪/জুন-জুলাই ১৮৯৩
১৬/জুন ১৮৯৮

১২/শিলাইদহ-নদীপথে [১৮৯২ সোমবার]
১৫/[পদ্মাতীরে ?] ৭ জুলাই ১৮৯৩
২৭/১৯০১

২৯/[জুন ?] ১৯০১ ৩০/জুন ১৯০১
৩১/১৯০১ ৩২/কুষ্টিয়া শিলাইদহের পথে ১৯০১
৩৬/১৯০১

চিঠিপত্র ২য়

পৃ ৩৩, জুলাই ১৮, ১৯১৫

চিঠিপত্র ৩য়

১/২৩ আষাঢ় ১৩১৭

চিঠিপত্র ৪র্থ

১, পৃ ১/চৈত্র ১৩১৮ ২০, পৃ ৬০/২৩ ভাদ্র ১৩২২
২২, পৃ ৬৫/অগ্রহায়ণ ১৩২২

চিঠিপত্র ৫ম

২, পৃ ১৩৫/জুন ৩, ১৮৯১ ৩, পৃ ১৩৬/জুন ২১, ১৮৯০
৮, পৃ ১৫৩/তারিখহীন ১০, পৃ ১৫৬/শিলাইদহ [?]
১১, পৃ ১৫৮/ডিসেম্বর ১৫, ১৮৯২ ১২, পৃ ১৫৯/ডিসেম্বর ১৯, ১৮৯২
৪৬, পৃ ২০৭/ফেব্রুয়ারি ৪, ১৯১৬

চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ

২, পৃ ৩/জুন ১৮, ১৮৯৯ ৩, পৃ ৫/জুন ২৪, ১৮৯৯
৪, পৃ ৭/সেপ্টেম্বর ১৯০০ ১১, পৃ ২৬/মে ২১ ১৯০১
১৩, পৃ ৩০/[শিলাইদহ ?] ৩ জুলাই ১৯০১ ২৪, পৃ ৫৫/জানুয়ারি ৮, ১৯০৮

চিঠিপত্র ৭ম

৭, পৃ ১৪/জুলাই ২২, ১৯০৮ ৮, পৃ ১৭/অক্টোবর ২৪, ১৯০৮
১০, পৃ ২১/জুলাই ১২, ১৯০৯ ১১, পৃ ২২/জুলাই ২৬, ১৯০৯
১৬, পৃ ৩৪/জুলাই ১৩, ১৯১০ ১৯, পৃ ৩৯/জুন ৮, ১৯১১

২০, পৃ ৪১/জুন ১১, ১৯১১
২১, পৃ ৪৩/জুন ২৩, ১৯১১
২৪, পৃ ৪০/ফেব্রুয়ারি ২২, ১৯১২
২৫, পৃ ৪৯/মার্চ ৫, ১৯১১
২৭, পৃ ৫৩/মার্চ ২৭, ১৯১২
২৮, পৃ ৫৪/এপ্রিল ৭, ১৯১২
২৯, পৃ ৫৫/মে ১৩, ১৯১২
৭৯, পৃ ১০৯/ফেব্রুয়ারি ২৮, ১৯১২
৫, পৃ ১৪১/জুলাই ২৫, ১৯০৮
২২, পৃ ১৬৮/ফেব্রুয়ারি ১৯, ১৯১২

চিঠিপত্র ৮ম

৭২/১৮ জুন ১৮৯৯
৭৩/২১ জুন ১৮৯৯
৭৪/২৪ জুন ১৮৯৯
৭৫/২ জুলাই ১৮৯৯
৭৬/[শিলাইদহ ?] তারিখহীন
৭৭/৫ জুলাই ১৮৯৯
৭৮/২৭ জুলাই ১৮৯৯
৭৯/৩১ জুলাই ১৮৯৯
৮৪/বুধবার (তারিখহীন)
১০০/১১ মে ১৯০০
১০১/১৪ জুন ১৯০০
১০২/২০ জুন ১৯০০
১০৩/২২ জুন ১৯০০
১১৮/৮ অগস্ট ১৯০০
১১৯/১০ অগস্ট ১৯০০
১২০/১২ অগস্ট ১৯০০
১২১/১৫ অগস্ট ১৯০০
১২২/১৭ অগস্ট ১৯০০

[১২৩-১২৬ চিঠিগুলি শিলাইদহ থেকে লেখা বলেই মনে হয়। ১৩৬-১৫৩ চিঠিগুলি শিলাইদহ এলাকাতেই লিখিত বলে মনে হয়।]

১২৭/২১ সেপ্টেম্বর ১৯০০
১২৮/২৮ সেপ্টেম্বর ১৯০০
১২৯/৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০০
১৩০/২ অক্টোবর ১৯০০
১৩১/৫ অক্টোবর ১৯০০
১৩২/৫ অক্টোবর ১৯০০
১৩৩/৯ অক্টোবর ১৯০০
১৩৪/১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০১
১৫/১ মে ১৯০১

চিঠিপত্র ১০ম

৯/মে ১৯০২
১৯/ফেব্রুয়ারি ১৯০৪
২০-২১/মার্চ ১৯০৪
৩৭/১৯০৭

ভানুসিংহের পত্রাবলী

৪৬ নং, ২২ চৈত্র ১৩২৮

স্মৃতি

[মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত চিঠি]

১/তারিখহীন — ২/১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০২

৩/রবিবার — ৪/২৮ অগ্রহায়ণ

৫/১৮ ফাল্গুন ১৩১০ — ৬/৯ চৈত্র ১৩১০

৭/১৯ চৈত্র ১৩১০ — ৮/৮ কার্তিক ১৩১৩

৯/২৮ ভাদ্র ১৩১৪ — ১০/২৪ মাঘ ১৩১৪

১১/১ কার্তিক ১৩১৭ — ১২/২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

১৩/২০ মাঘ ১৩২২

শিলাইদহে রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জি [কালানুক্রমিক]

শিলাইদহে রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জি প্রস্তুত করেছিলেন লেখক স্বয়ং, কিন্তু নানা দিক থেকে অসম্পূর্ণ ছিল। আমাদের অনুরোধে এবং লেখকের সম্মতিক্রমে অরবিন্দ ভট্টাচার্য এই পঞ্জি বিন্যস্ত করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি মূলত ব্যবহার করেছেন শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড, ৪র্থ সং ; ২য় খণ্ড, ৩য় সং ; ৩য় খণ্ড, ২য় সং এবং রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জি ১ম সং ; রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র ১—১০। এই কাজের জন্য যে পরিমাণ সময় প্রয়োজন ছিল তা পাওয়া যায় নি এবং গ্রন্থাদি ও পত্র-পত্রিকা যে পরিমাণে দেখা দরকার ছিল তাও দেখা হয় নি, সুতরাং এই পঞ্জি সমৃদ্ধতর হওয়ার অবকাশ রইল। এ বিষয়ে পাঠকবর্গের সহায়তাও কাম্য —প্রকাশক

১৮৯০

অনঙ্গ আশ্রম (জুন ১৮৯০)—পরে 'চিত্রাঙ্গদা' রূপে প্রকাশিত।

১৮৯১

পঞ্চভূতের ডায়ারি (জানুয়ারি ১৮৯১)—পরে পঞ্চভূত রূপে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

'সাধনা' পত্রিকার উদ্যোগ পর্ব, য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি সাধনার প্রথম সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে থাকে।

১৮৯২

সোনার তরী (কবিতা)—ফাল্গুন ১২৯৮, কবিতাটি প্রায় দেড় বৎসর পরে সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (আষাঢ় ১৩০০)।

বিম্ববতী—ফাল্গুন ১২৯৮

রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে—চৈত্র ১২৯৮

গোড়ায় গলদ (প্রহসন)—আষাঢ় ১২৯৯

? বৈষ্ণব কবিতা —১৮ আষাঢ় ১২৯৯

? দুই পাখি —১৯ আষাঢ় ১২৯৯ [সাজাদপুর]

? আকাশের চাঁদ —২২ আষাঢ় ১২৯৯ [বিরাহিমপুরের পথে]

মানসসুন্দরী—১৮ ডিসেম্বর ১৮৯২

? সমুদ্রের প্রতি

১৮৯৩

'সাধনা'র জন্য পঞ্চভূতের ডায়ারির বিভিন্ন রচনা লেখা চলছে।

সমুদ্রের প্রতি ; হৃদয়-যমুনা—১২ আষাঢ় ১৩০০ ; ব্যর্থ যৌবন—১৬ আষাঢ় ১৩০০ ; ভরা ভাদরে—২৭ আষাঢ় ১৩০০ ; প্রত্যাখ্যান—২৭ আষাঢ় ১৩০০ ;

গানভঙ্গ—২৪ আষাঢ় ১৩০০

পুরস্কার—শ্রাবণ ১৩০০

? বিদায় অভিশাপ (কাব্যনাট্য)—পতিসর

বসুন্ধরা—২৬ কার্তিক ১৩০০

শাস্তি—গল্প

একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প

সমাপ্তি

ইংরেজ ও ভারতবাসী (প্রবন্ধ)

১৮৯৪

মেঘ ও রৌদ্র (গল্প)—২৭ জুন ১৮৯৪

ঐ গল্পে ব্যবহৃত গান 'বঁধু হে ফিরে এসো'

অন্তর্যামী—সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

লোকসাহিত্য রচনার আয়োজন্

১৮৯৫

ঠাকুরদা	—	জ্যৈষ্ঠ	১৩০২
ক্ষুধিত পাষাণ	—	শ্রাবণ	১৩০২
ব্রাহ্মণ	—	৭ ফাল্গুন	১৩০১
পুরাতন ভৃত্য	—	১২ ,,	১৩০১

৫ আশ্বিন ১৩০২ থেকে ১ কার্তিক ১৩০২ পর্যন্ত সময়ে নিম্নলিখিত গানগুলি রচিত হয়:

৫ আশ্বিন	—	ওলো সই···আমার ইচ্ছা করে	—	গীতবিতান	৩০৪
৬ ,,	—	মধুর মধুর ধ্বনি বাজে	—	,,	৫৪৭
৪-৯ ,,	—	বিশ্ববীণা রবে বিশ্বজন মোহিছে	—	,,	৪২৭
৮ ,,	—	বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে	—	,,	৬৮
১২ ,,	—	কে দিল আবার আঘাত	—	,,	৩৩১
১৩ ,,	—	এসো গো নূতন জীবন	—	,,	৫৪৭
১৪ ,,	—	পুষ্পবনে পুষ্প নাহি	—	,,	৩২৬
১৫ ,,	—	আহা জাগি পোহালো বিভাবরী	—	,,	৩২৫
১৮ ,,	—	তোমার গোপন কথাটি	—	,,	২৯৭
২৩ ,,	—	চিত্ত পিপাসিত রে	—	,,	২৭১
২৫ ,,	—	আমি চিনি গো চিনি তোমারে	—	,,	৩০৬
২৯ ,,	—	আমরা লক্ষীছাড়ার দল	—	,,	৫৯৩
১ কার্তিক	—	ওগো ভাগ্যদেবী পিতামহী	—	,,	৫৯৯

১৮৯৬

উর্বশী কবিতাটি ২৩ অগ্রহায়ণ ১৩০২ শিলাইদহ-জলপথে রচিত

স্বর্গ হইতে বিদায়	—	২৪	অগ্রহায়ণ	১৩০২
দিন শেষে	—	২৮	,,	,,
সান্ত্বনা	—	২৯	,,	,,
শেষ উপহার	—	১	পৌষ	,,
জীবনদেবতা	—	২৯	মাঘ	,,
রাত্রে ও প্রভাতে	—	১	ফাল্গুন	,,
১৪০০ সাল	—	২	,,	,,

....

কবির শিলাইদহ বাস

কবিজীবনে শিলাইদহ অবিস্মরণীয় স্থান। জমিদারি কার্যোপলক্ষে এবং পল্লীপ্রকৃতির আকর্ষণে তিনি বার বার শিলাইদহে গেছেন। কবির শিলাইদহ-গমনাগমন-পঞ্জি লেখক প্রস্তুত করেছিলেন, তা পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত করেছেন অরবিন্দ ভট্টাচার্য। —প্রকাশক।

১৮৭৬। বয়স ১৫

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে শিলাইদহ গমন। বিশ্বনাথ শিকারির সঙ্গে শিলাইদহের জঙ্গলে বাঘ শিকারের বর্ণনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ।—ছেলেবেলা, ১৩৭৫ মুদ্রণ পৃ ৬২-৬৮

[৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কর্মচারী যশোরের বেণীমাধব রায়চৌধুরীর কন্যা মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে (বয়স ১১) কবির (বয়স ২২) বিবাহ হয় জোড়াসাঁকো বাড়িতে।]

১৮৮৮। বয়স ২৭

নভেম্বর মাসের শেষদিকে কিছু দিনের জন্য সপরিবারে শিলাইদহে নৌকাবাস, সঙ্গী ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ।—ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ৩; ছিন্নপত্র, পত্র ১০ অনুযায়ী চিঠির তারিখ নভেম্বর ১৮৮৯। তদনুযায়ী কবির বয়স ২৮

১৮৯০। বয়স ২৯

শিলাইদহে গমন। শিলাইদহ সদর কাছারির পুণ্যাহ উৎসবে প্রথম যোগদান। সেখান থেকে সাজাদপুর গমন। প্রজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ও নানাবিধ আলোচনা।

জুন মাসে পুনরায় শিলাইদহ গমন, চর ভ্রমণ, পদ্মায় ভ্রমণ, প্রজাদের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়।

১৮৯১। বয়স ৩০

জমিদারি পরিদর্শনের ভার নিয়ে জানুয়ারি মাসে শিলাইদহ, সাজাদপুর ও আত্রাই নদীতীরে কালীগ্রামে (পতিসর) বাস—প্রায় চার মাস কাল।

জমিদারির বিধিব্যবস্থা দর্শন ও পরীক্ষা, প্রজাদের সঙ্গে আলাপ। সেপ্টেম্বরে কটকের জমিদারি পরিদর্শনান্তে অক্টোবরে পুনরায় কালীগ্রাম (পতিসর), সাজাদপুর ও শিলাইদহ ভ্রমণ।—ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ৯-২৬, ৩১-৩৬

১৮৯২। বয়স ৩১

জমিদারির নানা কাজে জানুয়ারি থেকে এপ্রিলের মধ্যে বার বার শিলাইদহ গমন, চাষিদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়, জমিদারি সেরেস্তার সংস্কার-প্রচেষ্টা। জুলাই-এ আবার শিলাইদহ গমন, পদ্মায় ভ্রমণ, গোয়ালন্দ, সাজাদপুর কাছারি, রামপুর-বোয়ালিয়া গমন, নাটোর গিয়ে বন্ধু লোকেন পালিত ও নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা। এই সময়ে জমিদারির বিখ্যাত গঞ্জ পান্টি থেকে ফেরার পথে কবির বোট গোড়াই ব্রীজে ধাক্কা খায় এবং সঙ্কট সৃষ্টি হয়। ডিসেম্বর পর্যন্ত কবি এই এলাকায় ছিলেন।—ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ৩৭-৪২, ৫৩-৭৫

১৮৯৩। বয়স ৩২

বলেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে কটকের জমিদারি ভ্রমণান্তে মে মাসে কালীগ্রাম ও শিলাইদহ গমন। জমিদারি সম্বন্ধে নানা চিন্তা। শিলাইদহ জমিদারির কাজে শৈলেশ মজুমদার ও চন্দ্রময় সান্যালকে নিয়োগ। এই সময় নানা মামলা-মোকদ্দমার ঝঞ্ঝাট এসে পড়ে।—ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ৯৩-৯৮, ১০১-১১০

১৮৯৪। বয়স ৩৩

ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি প্রথমে কালীগ্রামে (পতিসর) পরে শিলাইদহ গমন, জমিদারি সেরেস্তার নানাবিধ সংস্কার, পল্লী উন্নয়নের নানা পরিকল্পনা। এই সময়ে মামলা-মোকদ্দমার ঝামেলায় কবিকে বিব্রত হতে হয়। ঐ সময়ে যাতায়াতের পথে রানাঘাটের তৎকালীন মহকুমা হাকিম কবি নবীনচন্দ্র সেনের আতিথ্য কবি গ্রহণ করেন (২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪)। 'তিনি যখন গাড়ি হইতে নামিলেন, দেখিলাম, সেই ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের নবযুবকের আজ পরিণত যৌবন। কি শান্ত, কি সুন্দর, কি প্রতিভান্বিত দীর্ঘাবয়ব!'—আমার জীবন, পৃ ৫

রবীন্দ্রনাথ সদ্যরচিত 'এসো এসো ফিরে এসো, বঁধু হে ফিরে এসো' গানটি নবীনচন্দ্রকে শোনান।—রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সং, পৃ ৪০৬।—ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ১১৩-১৩০, ১৩৮-১৫৭, ১৭৮-১৮৪

১৮৯৫। বয়স ৩৪

ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে শিলাইদহ গমন, একটানা প্রায় দু মাস অবস্থিতি, সারা বছরটার অধিকাংশ সময়ই জমিদারিতে কাটে। বলেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে, কুষ্টিয়ার ব্যবসায়ে যোগদান—পাটের কারবার, আখ-মাড়াই কল সংগ্রহ, শিলাইদহেও ব্যবসায়ের একটি কেন্দ্র স্থাপন। তাঁত শিল্পের প্রসারের উদ্দেশ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরামর্শে শিলাইদহ কাছারির প্রাঙ্গণে তাঁতের কারখানা স্থাপন। এর আগে জমিদারির অন্তর্গত পাণ্টির হাটে সুতো ও কাপড়ের হাট স্থাপন।—ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ১৮৬-২০০, ২১২-২১৪, ২১৬-২২১, ২২৪-২৫০

১৮৯৬। বয়স ৩৫

'মহর্ষির বয়স তখন আশির কাছাকাছি, মৃত্যুর পূর্বে সকলের যথাযথ প্রাপ্য যথোচিতভাবে বণ্টন ও সুব্যবস্থিত করিবার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। তদনুসারে গগনেন্দ্রনাথদের জমিদারি পৃথক করিয়া দেওয়া হইল; সাজাদপুর জমিদারি তাঁহাদের অংশে পড়িল। জমিদারি সংক্রান্ত কার্য বন্দোবস্ত করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুর চলিলেন, এই পরগণার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ এইখান হইতে চুকিল।'—রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সং, পৃ ৪৪৬

সাজাদপুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ছিল, এই পরগণা হস্তচ্যুত হওয়ায় কবির মনে খুবই আঘাত লেগেছিল। ('যাত্রী', 'তৃণ', 'স্বার্থ', 'শান্তিমন্ত্র', 'শুশ্রূষা' কবিতা)

১৮৯৭। বয়স ৩৬

জুন মাসের মাঝামাঝি শিলাইদহ গমন। বৈষয়িক ঝঞ্ঝাট ও ঝামেলা দূর হলে পর কবি জমিদারি ব্যবস্থার (শিলাইদহ ও কালীগ্রাম) সংস্কারের জন্য নতুনভাবে বিধিবদ্ধ নিয়মাবলি প্রণয়ন করেন। চরমহালের (শিলাইদহ) শাসন সংরক্ষণের জন্য দুজন আমিনের নিয়োগ হল। ইতিপূর্বে প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ জগদানন্দ রায় শিলাইদহ কাছারিতে নিযুক্ত হয়েছেন। এই সময়ে নিযুক্ত হলেন পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জমিদারি ব্যবস্থা আমূল সংশোধনের উদ্দেশ্যে এই সময় কবি শিক্ষিত ভদ্রসন্তানদের উপযুক্ত কর্মে নিয়োগের ব্যবস্থা করেন।

১৮৯৮। বয়স ৩৭

'ঢাকা হইতে ফিরিয়া শিলাইদহে স্ত্রীর পত্র পাইলেন।' এই পত্রের উত্তর শিলাইদহ থেকে লিখিত। —চিঠিপত্র ১, পত্র, ১৬ জুন ১৮৯৮,—রবীন্দ্রজীবনী, ১ম, ৪র্থ সং, পৃ ৪৬৬

১৮৯৯। বয়স ৩৮

মে মাসের প্রথম থেকে কবি-জমিদার সপরিবারে শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে এসে সংসার পাতলেন (রবীন্দ্রজীবনী, ১ম, ৪র্থ সং, পৃ ৪৮৩), উদ্দেশ্য জমিদারির আমূল সংস্কারসাধন এবং সেই সঙ্গে পল্লীসংগঠনের পরিকল্পনাগুলি কার্যে রূপায়ণ। অন্যদিকে পল্লী পরিবেশের মধ্যে পুত্রকন্যাদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যও কবির ছিল—এজন্য গৃহবিদ্যালয় গঠিত হল, শিক্ষক হলেন পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব, জগদানন্দ রায় ও লরেন্স সাহেব। এইভাবে শিলাইদহ বাসের আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল, তা হল পল্লীপ্রকৃতির সান্নিধ্যে ব্যক্তিজীবনে প্রশান্তি ও নবোদ্যম লাভ।

২২ আগস্ট (৬ ভাদ্র ১৩০৬) কলিকাতায় বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু। কুষ্টিয়ার ব্যবসা বিপন্ন।—চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ, পত্র ২, ৩; চিঠিপত্র ৮ম, পত্র ৭২-৭৫, ৭৭-৭৯

১৯০০। বয়স ৩৯

ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি বলেন্দ্রনাথের স্ত্রী সুশীতলাকে নিয়ে শিলাইদহ গমন। ক্রমাগত লোকসানের জন্য কুষ্টিয়ার ব্যবসা বন্ধ হল, এ জন্য তারকনাথ পালিতের নিকট কবি প্রায় সত্তর হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন—এই ঋণ শোধ হয় ১৯১৭-য়।

মার্চ মাসে কর্ণেল মহিম ঠাকুর, যতীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ কবির বন্ধুবর্গ শিলাইদহে আসেন। —চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ, পত্র ৪; চিঠিপত্র ৮ম, পত্র ১০০-১০৩, ১১৮-১২০, ১২২, ১২৭, ১২৮, ১৩০-১৩৩

১৯০১। বয়স ৪০

জুন মাসের শেষে শিলাইদহে। শিলাইদহ সদর কাছারির শুভ পুণ্যাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত। জমিদারির কাজ পুরোদমে চলছে, কবিও ব্যস্ত। এই সময়ে কবিপত্নী অসুস্থ হয়ে পড়েন।—চিঠিপত্র ১ম, পত্র ২৭, ২৯; চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ, পত্র ১১, ১৩; চিঠিপত্র ৮ম, পত্র ১৩৪

[১৯০১, ১৫ জুন কবি বিহারীলালের পুত্র শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার বিবাহ।
১৯০১, ২২ ডিসেম্বর (৭ পৌষ) শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।]

১৯০২। বয়স ৪১

শিলাইদহ থেকে পীড়িতা স্ত্রীকে প্রথমে শান্তিনিকেতনে, পরে কলিকাতায় নেওয়া হয়। ২৩ নভেম্বর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ২৯ বৎসর বয়সে কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু।

১৯০৩। বয়স ৪২

সেপ্টেম্বর মাসে কন্যা রেনুকার মৃত্যুর পরই পদ্মাতীরে শিলাইদহে বাস।

১৯০৪। বয়স ৪৩

১ ফেব্রুয়ারি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষাতাপস অধ্যাপক সতীশচন্দ্র রায়ের অকালমৃত্যু। ফেব্রুয়ারিতে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় অস্থায়ীভাবে শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। ২৮ মে বিদ্যালয় পুনরায় শান্তিনিকেতনে স্থানান্তরিত।

এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সময়ের অনেকটাই কবি শিলাইদহে অতিবাহিত করেন। এই সময়ে জমিদারির কাজে আরও কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তির নিয়োগ এবং কয়েকজন দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মচারীর অপসারণ।

১৯০৫। বয়স ৪৪

নভেম্বরে শিলাইদহ গমন। কালীগ্রামে (পতিসর) ও শিলাইদহে কৃষকদের হিতার্থে কৃষিব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা। গ্রামোন্নতির নানাবিধ পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যারম্ভ। কুষ্টিয়াতে বয়নবিদ্যালয় স্থাপন।

[১৯০৫, ২৯ জানুয়ারি জোড়াসাঁকো ভবনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু।]

১৯০৬। বয়স ৪৫

প্রকৃতির সান্নিধ্যলাভের জন্য শিলাইদহে আগমন—কলিকাতায় তখন রাজনৈতিক উত্তেজনা, কবি এই উত্তালতা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। কৃষিবিদ্যা এবং গো-পালন শিক্ষার উদ্দেশ্যে রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষ মজুমদার রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ও ব্যবস্থায় আমেরিকায় গেলেন।

পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ, কুমিল্লা ও আগরতলায় কয়েকদিন অবস্থান।

১৯০৭ । বয়স ৪৬

[৬ জুন কনিষ্ঠা কন্যা মীরার বিবাহ, জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—বিবাহের পরেই জামাতাকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে আমেরিকায় প্রেরণ। ২৪ নভেম্বর ৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৪, মুঙ্গেরে কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু (বয়স ১১)।]

ডিসেম্বরের প্রথমে বেলা, মীরাকে নিয়ে শিলাইদহ গমন। প্রায় চার মাস বিচ্ছিন্নভাবে শিলাইদহে অবস্থিতি—জমিদারির নানা কাজে ব্যাপৃত।

১৯০৮ । বয়স ৪৭

জানুয়ারিতে শিলাইদহ থেকে কলিকাতায়—মাঘোৎসবে 'দুঃখ-ধর্ম' ভাষণ দান—আবার শিলাইদহে প্রত্যাগমন। জমিদারিতে 'পল্লীগঠন কার্যের দৃষ্টান্ত' দেখাবার প্রচেষ্টা—এই প্রচেষ্টায় কালীমোহন ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন তরুণ কবির সহায় হন। অক্টোবরে কবির পুনরায় শিলাইদহে অবস্থিতি—জমিদারিতে মণ্ডলীপ্রথা প্রবর্তন—পুরোনো ব্যবস্থার পরিবর্তে এই ব্যবস্থা চালু করতে গিয়ে কবি বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন।

১৯০৯ । বয়স ৪৮

সাড়ে তিন বৎসর আমেরিকায় অবস্থিতির পর কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী রথীন্দ্রনাথ সেপ্টেম্বরে কলিকাতায় ফিরে আসেন, এই মাসেই কবির পুত্রসহ জমিদারি পরিদর্শন, নৌকা যোগে পদ্মাবক্ষে বিচরণ। অক্টোবরে শিলাইদহে রাখিবন্ধনের উৎসব উদ্‌যাপন।

গীতাঞ্জলির গান রচনার যুগ।

শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে রথীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ সম্বন্ধে হাতে কলমে কাজ শুরু করলেন।

১৯১০ । বয়স ৪৯

[২৭ জানুয়ারি রথীন্দ্রনাথের বিবাহ, বধূ প্রতিমাদেবী।

অগস্ট মাসে গীতাঞ্জলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় (১৩১৭)।]

সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রায় তিন মাসের জন্য কবির শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে এবং 'পদ্মা' বোটে অবস্থিতি।

১৯১১। বয়স ৫০

বর্ষাকালে কিছুদিনের জন্য শিলাইদহে অবস্থিতি। শরৎকালে (সেপ্টেম্বরে) অসুস্থতার জন্য বিদেশ যাওয়ার জল্পনা-কল্পনা কার্যকর না হওয়ায় বিষণ্ণ কবি শিলাইদহে পদ্মাবক্ষে বিশ্রামের জন্য আসেন এবং নভেম্বরের মাঝামাঝি শান্তিনিকেতনে ফিরে যান।

১৯১২। বয়স ৫১

১৯ মার্চ কলিকাতা বন্দর থেকে বিদেশ যাত্রার আয়োজন। কবি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় যাত্রা স্থগিত, কবির সঙ্গী ডাঃ দ্বিজেন্দ্র মৈত্র একাই বিদেশ গেলেন। কবি এলেন তাঁর কাঙ্ক্ষিত ভূমি শিলাইদহে। প্রায় মাসাধিককাল শিলাইদহে বাস। গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদকার্য চলছে।

[২৪ মে বিলাত যাত্রার জন্য (তৃতীয়বার বিদেশ ভ্রমণ) রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীকে নিয়ে বোম্বাই-এর পথে কলিকাতা ত্যাগ, ১৬ জুন লণ্ডনে পৌঁছান। Song Offerings-এর পাণ্ডুলিপি বন্ধু শিল্পী রোদেনস্টাইনের হস্তে অর্পণ।]

১৯১৩ নভেম্বর নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তির সংবাদ শান্তিনিকেতনে পৌঁছায়।

১৯১৪। বয়স ৫৩

ফেব্রুয়ারিতে শিলাইদহে। জমিদারিতে মণ্ডলী প্রথা প্রায় অচল দেখে কবি ব্যথিত। অগস্টে পুনরায় শিলাইদহে।

১৯১৫। বয়স ৫৪

ফেব্রুয়ারিতে শিলাইদহে আগমন, সঙ্গী শিল্পী নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর, মুকুল দে। প্রায় পক্ষকাল অবস্থিতি। নভেম্বরে আবার শিলাইদহে —জমিদারিতে পল্লী উন্নয়ন প্রচেষ্টা—চিকিৎসা, প্রাথমিক শিক্ষা, পূর্তকাজ, ঋণদান ব্যবস্থা, সালিশি বিচার—এই পঞ্চবিধ কর্মসূচী গ্রহণ, অতুল সেন প্রমুখ যুবকদের এই সব কাজে আত্মনিয়োগ।

১৯১৬। বয়স ৫৫

ফেব্রুয়ারিতে, উত্তরবঙ্গের জমিদারিতে (কালীগ্রাম, পতিসর) গমন— কলেরার প্রকোপ নিবারণ-প্রচেষ্টা। শিলাইদহে পুনরায় পল্লীহিতকর কর্মপ্রচেষ্টা।

[মে : চতুর্থবার বিদেশে—এই যাত্রায় প্রথমে জাপানে, তারপরে আমেরিকায় গমন।]

১৯২১-১৯২২। বয়স ৬০

১৯২১-এর ২৮ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতন থেকে কলিকাতা হয়ে শিলাইদহে—উদ্দেশ্য পদ্মার আতিথ্য গ্রহণ— 'আমি নদী ভালোবাসি। কেন বলব ? আমরা যে ডাঙার উপর বাস করি, সে ডাঙা তো নড়ে না··· নদীর জল দিনরাত্রি চলে, তার একটা বাণী আছে।'—ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪৫, ২২ পৌষ ১৩২৯। এই সময়ে সাত দিন, ৫ জানুয়ারি ১৯২২ পর্যন্ত কবি শিলাইদহে বাস করেন।

১৯২২। বয়স ৬১

১৯২১-এর ২৮ ডিসেম্বর কলিকাতা থেকে শিলাইদহ গমন এবং ৫ জানুয়ারি ১৯২২ শিলাইদহ থেকে শান্তিনিকেতন গমন। পুনরায় মার্চ ১৯২২ শিলাইদহ গমন।

কবির ইচ্ছা ছিল লেভি সাহেবের সঙ্গে নেপাল যাবেন, কিন্তু আত্মীয়বন্ধুদের কাছ থেকে বাধা পান। '···লেভিরা (১৮ মার্চ) নেপাল যাত্রা করিলে কবিও শিলাইদহে চলিয়া গেলেন। সেখানে কুঠিবাড়িতেই উঠিলেন।'

—রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড, ২য় সং, পৃ ১২০

'আগে পদ্মা কাছে ছিল— এখন নদী বহুদূরে সরে গেছে।'—ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪৬

'শিলাইদা ঘুরে এলুম—পদ্মা তাকে পরিত্যাগ করেচে—তাই মনে হল বীণা আছে, তা'র তার নেই। তার না থাকুক, তবু অনেককালের অনেক গানের স্মৃতি আছে। ভাল লাগ্‌ল, সেই সঙ্গে মনটা কেমন উদাস হল।'—চিঠিপত্র ৫, পৃ ৩৮ (প্রথম প্রকাশ)

এই-ই কবির শিলাইদহে শেষ গমন, ১৫ দিন অবস্থিতি (৮ চৈত্র-২৩ চৈত্র)। কবির সঙ্গী ছিলেন ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও এণ্ড্রুজ সাহেব। এবারের শিলাইদহ গমন ও ভ্রমণ নানাভাবে শিলাইদহের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

কবির শেষ জমিদারি-ভ্রমণ : পতিসরে

১৯৩৭। বয়স ৭৬

'……কবির জমিদারিতে যাওয়া স্থির হইল। প্রজাদের ইচ্ছা 'পুণ্যাহ' দিনে সেখানে 'বাবুমশায়' উপস্থিত হন। কবিরও ইচ্ছা শেষবারের মতো বহুদিনের সুখদুঃখের স্মৃতি-জড়িত স্থান দেখিয়া আসেন।……

১০ শ্রাবণ রাত্রি এগারোটার সময় শিয়ালদহ হইতে ট্রেনে রওনা হইয়া পরদিন মধ্যরাত্রিতে পতিসর পৌঁছিলেন। ১২ শ্রাবণ পুণ্যাহ।'

'একজন বৃদ্ধ মুসলমান কবিকে বলিলেন, "আমরা তো হুজুর বুড়ো হয়েছি, আমরাও চল্‌তি পথে; বড়ই দুঃখ হয়, প্রজা-মনিবের এমন মধুর সম্বন্ধের ধারা বুঝি ভবিষ্যতে বন্ধ হয়ে যায়।"'

—রবীন্দ্রজীবনী ৪ খণ্ড, ২য় সং, পৃ ১০১, ১০২

২৬ জুলাই-এ যাত্রা। এই যাত্রায় কবির সঙ্গী ছিলেন সুধাকান্ত রায় চৌধুরী। [দ্র. চিঠিপত্র ৯, পৃ. ৩৩৭—পতিসর ভ্রমণের ইঙ্গিত ১৩ অগস্ট ১৯৩৭-এ শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লেখা চিঠিতে আছে।]

কবির জীবনে, শিলাইদহের আকর্ষণ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। শিলাইদহ তাঁর কাছে কেবল জমিদারি মাত্র ছিল না। এই স্থানের আকাশ-বাতাস, নরনারী কবির হৃদয়ে চিরদিনই বাঁশি বাজিয়েছে। পারিবারিক ভাগ বাঁটোয়ারায় শিলাইদহের পরিচালন-দায়িত্ব কবির হস্তচ্যুত হওয়ায় তাঁর মনের গভীরে শেষ দিন পর্যন্ত এক অপ্রকাশ্য বেদনাবোধ জাগরূক ছিল। তাঁর এই মানসিক অবস্থা তাঁর পারিবারিক পার্শ্বচররা নানা ইঙ্গিতে বুঝতে পারতেন। কালীগ্রামে শেষবার (জুলাই ১৯৩৭) কবি ঘুরে এসেছেন অসুস্থ শরীর নিয়ে, ভ্রমণান্তে ফিরেছেন শান্তিনিকেতনে। উত্তরায়ণের বারান্দায় একদিন কবি আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হয়ে বসে আছেন। আত্মীয়পরিজন কবিকে তাঁর ভ্রমণ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করছেন। কবি কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে বসে রয়েছেন, দৃষ্টি যেন স্মৃতির রাজ্যে নিবদ্ধ, একটি প্রশ্নেরও তিনি জবাব দিচ্ছেন না। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপন মনে বলে উঠলেন—আর একবার শিলাইদহে গেলে বড়……। আর কথা শেষ করতে পারলেন না। এ ঘটনার সাক্ষী ঠাকুর এস্টেটের পুরাতন কর্মচারী শ্রীঅন্নদাকুমার মজুমদার (বাড়ি শিলাইদহে)।

কবির শিলাইদহে অবস্থিতির সুস্পষ্ট তারিখ

শিলাইদহ থেকে লেখা চিঠি (পুস্তক-আকারে এ পর্যন্ত প্রকাশিত) অনুযায়ী

অরবিন্দ ভট্টাচার্য-সংগৃহীত—প্রকাশক।

ছিন্নপত্রাবলী

[সঙ্কেত—তির্যক রেখার আগে পত্র সংখ্যা, পরে চিঠির তারিখ উল্লিখিত হয়েছে।]

৩/২ ডিসেম্বর ১৮৮৮*
৩১/১ অক্টোবর ১৮৯১
৩২/২০ আশ্বিন ১২৯৮
৩৩/২৯ আশ্বিন ১২৯৮
৩৪/২ কার্তিক ১২৯৮
৩৫/৩ কার্তিক ১২৯৮
৩৬/৬ অগ্রহায়ণ ১২৯৮
৩৭/৪ জানুয়ারি ১৮৯২
৩৮/৬ জানুয়ারি ১৮৯২
৩৯/৯ জানুয়ারি ১৮৯২
৪০/১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯২
৪১/৭ এপ্রিল ১৮৯২
৪২/৮ এপ্রিল ১৮৯২
৫৩/১২ জুন ১৮৯২
৫৪/জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯
৫৫/২ আষাঢ় ১২৯৯
৫৬/১৬ জুন ১৮৯২
৫৭/৪ আষাঢ় ১২৯৯
৫৯/২২ জুন ১৮৯২
৬৭/২০ জুলাই ১৮৯২
৬৮/২১ জুলাই ১৮৯২
৬৯/৩ ভাদ্র ১২৯৯
৭০/২০ অগস্ট ১৮৯২
৭৪/৯ ডিসেম্বর ১৮৯২
৭৫/১৮ ডিসেম্বর ১৮৯২
৯৩/২ মে ১৮৯৩
৯৪/৮ মে ১৮৯৩
৯৫/১০ মে ১৮৯৩
৯৬/১১ মে ১৮৯৩
৯৭/১৩ মে ১৮৯৩
৯৮/১৬ মে ১৮৯৩
১০১/২ জুলাই ১৮৯৩
১০২/৩ জুলাই ১৮৯৩
১০৩/৪ জুলাই ১৮৯৩
১২১/২৪ জুন ১৮৯৪
১২২/২৬ জুন ১৮৯৪
১২৩/২৭ জুন ১৮৯৪
১২৪/ [২৮ জুন ১৮৯৪]
১২৫/৩০ জুন ১৮৯৪
১২৬/৫ জুলাই ১৮৯৪
১২৭/৬ জুলাই ১৮৯৪
১৩৮/৪ অগস্ট ১৮৯৪
১৩৯/৫ অগস্ট ১৮৯৪
১৪০/৮ অগস্ট ১৮৯৪
১৪১/৯ অগস্ট ? ১৮৯৪
১৪২/১০ অগস্ট ১৮৯৪

---

* 'ছিন্ন পত্র'-এর ১০নং পত্র অনুযায়ী তারিখ নভেম্বর ১৮৮৯

১৪৩/১২ অগস্ট ১৮৯৪
১৪৪/১৩ অগস্ট ১৮৯৪
১৪৫/১৬ অগস্ট ১৮৯৪
১৪৬/১৯ অগস্ট ১৮৯৪
১৭৮/২৫ নভেম্বর ১৮৯৪
১৭৯/২৮ নভেম্বর ১৮৯৪
১৮০/৬ ডিসেম্বর ১৮৯৪
১৮১/৭ ডিসেম্বর ১৮৯৪
১৮২/১১ ডিসেম্বর ১৮৯৪
১৮৩/১২ ডিসেম্বর ১৮৯৪
১৮৪/১৪ ডিসেম্বর ১৮৯৪
১৮৬/৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫
১৮৭/[১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫]
১৮৮/১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫
১৮৯/১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫
১৯০/১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫
১৯১/২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫
১৯২/২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫
১৯৩/১৬ ফাল্গুন ১৩০১
১৯৪/২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫
১৯৫/১ মার্চ ১৮৯৫
১৯৬/৬ মার্চ ১৮৯৫
১৯৭/৭ মার্চ ১৮৯৫
১৯৮/৮ মার্চ ১৮৯৫
১৯৯/১০ মার্চ ১৮৯৫
২০০/১১ মার্চ ১৮৯৫
২২১/১০ জুলাই ১৮৯৫
২২৪/১৪ অগস্ট ১৮৯৫
২২৫/১৮ অগস্ট ১৮৯৫
২২৬/২০ অগস্ট ১৮৯৫
২২৭/২৩ অগস্ট ১৮৯৫
২২৮/২৪ অগস্ট ১৮৯৫
২২৯/২০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫
২৩০/২১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫
২৩১/২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫
২৩২/২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫
২৩৩/৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫
২৩৪/৪ অক্টোবর ১৮৯৫
২৩৫/৪ অক্টোবর ১৮৯৫
২৩৮/১০ অক্টোবর ১৮৯৫
২৩৯/১৫ অক্টোবর ১৮৯৫
২৪০/১৬ অক্টোবর ১৮৯৫
২৪৮/শিলাইদহ জলপথে ৮ ডিসেম্বর ১৮৯৫
২৫০/১২ ডিসেম্বর ১৮৯৫
২৫১/১৪ ডিসেম্বর ১৮৯৫
১৫২/১৫ ডিসেম্বর ১৮৯৫

চিঠিপত্র ১ম

১১/২০ জুলাই ১৮৯২
১২/শিলাইদহ-নদীপথে [১৮৯২ সোমবার]
?১৪/জুন-জুলাই ১৮৯৩
১৫/[পদ্মাতীরে ?] ৭ জুলাই ১৮৯৩
১৬/জুন ১৮৯৮
২৭/১৯০১

২৯/[জুন ?] ১৯০১ ৩০/জুন ১৯০১
৩১/১৯০১ ৩২/কুষ্টিয়া শিলাইদহের পথে ১৯০১
৩৬/১৯০১

চিঠিপত্র ২য়

পৃ ৩৩, জুলাই ১৮, ১৯১৫

চিঠিপত্র ৩য়

১/২৩ আষাঢ় ১৩১৭

চিঠিপত্র ৪র্থ

১, পৃ ১/চৈত্র ১৩১৮ ২০, পৃ ৬০/২৩ ভাদ্র ১৩২২
২২, পৃ ৬৫/অগ্রহায়ণ ১৩২২

চিঠিপত্র ৫ম

২, পৃ ১৩৫/জুন ৩, ১৮৯০ ৩, পৃ ১৩৬/জুন ২১, ১৮৯০
৮, পৃ ১৫৩/তারিখহীন ১০, পৃ ১৫৬/শিলাইদহ [?]
১১, পৃ ১৫৮/ডিসেম্বর ১৫, ১৮৯২ ১২, পৃ ১৫৯/ডিসেম্বর ১৯, ১৮৯২
৪৬, পৃ ২০৭/ফেব্রুয়ারি ৪, ১৯১৬

চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ

২, পৃ ৩/জুন ১৮, ১৮৯৯ ৩, পৃ ৫/জুন ২৪, ১৮৯৯
৪, পৃ ৭/সেপ্টেম্বর ১৯০০ ১১, পৃ ২৬/মে ২১ ১৯০১
১৩, পৃ ৩০/[শিলাইদহ ?] ৩ জুলাই ১৯০১ ২৪, পৃ ৫৫/জানুয়ারি ৮, ১৯০৮

চিঠিপত্র ৭ম

৭, পৃ ১৪/জুলাই ২২, ১৯০৮ ৮, পৃ ১৭/অক্টোবর ২৪, ১৯০৮
১০, পৃ ২১/জুলাই ১২, ১৯০৯ ১১, পৃ ২২/জুলাই ২৬, ১৯০৯
১৬, পৃ ৩৪/জুলাই ১৩, ১৯১০ ১৯, পৃ ৩৯/জুন ৮, ১৯১১

২০, পৃ ৪১/জুন ১১, ১৯১১
২১, পৃ ৪৩/জুন ২৩, ১৯১১
২৪, পৃ ৪৭/ফেব্রুয়ারি ২২, ১৯১২
২৫, পৃ ৪৯/মার্চ ৫, ১৯১১
২৭, পৃ ৫৩/মার্চ ২৭, ১৯১২
২৮, পৃ ৫৪/এপ্রিল ৭, ১৯১২
২৯, পৃ ৫৫/মে ১৩, ১৯১২
৭৯, পৃ ১০৯/ফেব্রুয়ারি ২৮, ১৯১২
৫, পৃ ১৪১/জুলাই ২৫, ১৯০৮
২২, পৃ ১৬৮/ফেব্রুয়ারি ১৯, ১৯১২

চিঠিপত্র ৮ম

৭২/১৮ জুন ১৮৯৯
৭৩/২১ জুন ১৮৯৯
৭৪/২৪ জুন ১৮৯৯
৭৫/২ জুলাই ১৮৯৯
৭৬/[শিলাইদহ ?] তারিখহীন
৭৭/৫ জুলাই ১৮৯৯
৭৮/২৭ জুলাই ১৮৯৯
৭৯/৩১ জুলাই ১৮৯৯
৮৪/বুধবার (তারিখহীন)
১০০/১১ মে ১৯০০
১০১/১৪ জুন ১৯০০
১০২/২০ জুন ১৯০০
১০৩/২২ জুন ১৯০০
১১৮/৮ অগস্ট ১৯০০
১১৯/১০ অগস্ট ১৯০০
১২০/১২ অগস্ট ১৯০০
১২১/১৫ অগস্ট ১৯০০
১২২/১৭ অগস্ট ১৯০০

[১২৩-১২৬ চিঠিগুলি শিলাইদহ থেকে লেখা বলেই মনে হয়। ১৩৬-১৫৩ চিঠিগুলি শিলাইদহ এলাকাতেই লিখিত বলে মনে হয়।]

১২৭/২১ সেপ্টেম্বর ১৯০০
১২৮/২৮ সেপ্টেম্বর ১৯০০
১২৯/৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০০
১৩০/২ অক্টোবর ১৯০০
১৩১/৫ অক্টোবর ১৯০০
১৩২/৫ অক্টোবর ১৯০০
১৩৩/৯ অক্টোবর ১৯০০
১৩৪/১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০১
১৫/১ মে ১৯০১

চিঠিপত্র ১০ম

৯/মে ১৯০২
১৯/ফেব্রুয়ারি ১৯০৪
২০-২১/মার্চ ১৯০৪
৩৭/১৯০৭

ভানুসিংহের পত্রাবলী

৪৬ নং, ২২ চৈত্র ১৩২৮

স্মৃতি

[মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত চিঠি]

১/তারিখহীন ২/১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০২
৩/রবিবার ৪/২৮ অগ্রহায়ণ
৫/১৮ ফাল্গুন ১৩১০ ৬/৯ চৈত্র১৩১০
৭/১৯ চৈত্র ১৩১০ ৮/৮ কার্তিক ১৩১৩
৯/২৮ ভাদ্র ১৩১৪ ১০/২৪ মাঘ ১৩১৪
১১/১ কার্তিক ১৩১৭ ১২/২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮
১৩/২০ মাঘ ১৩২২

শিলাইদহে রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জি [কালানুক্রমিক]

শিলাইদহে রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জি প্রস্তুত করেছিলেন লেখক স্বয়ং, কিন্তু নানা দিক থেকে অসম্পূর্ণ ছিল। আমাদের অনুরোধে এবং লেখকের সম্মতিক্রমে অরবিন্দ ভট্টাচার্য এই পঞ্জি বিন্যস্ত করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি মূলত ব্যবহার করেছেন শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের **রবীন্দ্রজীবনী** ১ম খণ্ড, ৪র্থ সং; ২য় খণ্ড, ৩য় সং; ৩য় খণ্ড, ২য় সং এবং **রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জি** ১ম সং; **রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র** ১—১০। এই কাজের জন্য যে পরিমাণ সময় প্রয়োজন ছিল তা পাওয়া যায় নি এবং গ্রন্থাদি ও পত্র-পত্রিকা যে পরিমাণে দেখা দরকার ছিল তাও দেখা হয় নি, সুতরাং এই পঞ্জি সমৃদ্ধতর হওয়ার অবকাশ রইল। এ বিষয়ে পাঠকবর্গের সহায়তাও কাম্য —প্রকাশক

১৮৯০

অনঙ্গ আশ্রম (জুন ১৮৯০)—পরে 'চিত্রাঙ্গদা' রূপে প্রকাশিত।

১৮৯১

পঞ্চভূতের ডায়ারি (জানুয়ারি ১৮৯১)—পরে পঞ্চভূত রূপে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

'সাধনা' পত্রিকার উদ্যোগ পর্ব, য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি সাধনার প্রথম সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে থাকে।

১৮৯২

সোনার তরী (কবিতা)—ফাল্গুন ১২৯৮, কবিতাটি প্রায় দেড় বৎসর পরে সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (আষাঢ় ১৩০০)।

বিম্ববতী—ফাল্গুন ১২৯৮

রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে—চৈত্র ১২৯৮

গোড়ায় গলদ (প্রহসন)—আষাঢ় ১২৯৯

? বৈষ্ণব কবিতা —১৮ আষাঢ় ১২৯৯

? দুই পাখি —১৯ আষাঢ় ১২৯৯ [সাজাদপুর]

? আকাশের চাঁদ —২২ আষাঢ় ১২৯৯ [বিরাহিমপুরের পথে]

মানসসুন্দরী—১৮ ডিসেম্বর ১৮৯২

? সমুদ্রের প্রতি

১৮৯৩

'সাধনা'র জন্য পঞ্চভূতের ডায়ারির বিভিন্ন রচনা লেখা চলছে।

সমুদ্রের প্রতি ; হৃদয়-যমুনা—১২ আষাঢ় ১৩০০ ; ব্যর্থ যৌবন—১৬ আষাঢ় ১৩০০ ; ভরা ভাদরে—২৭ আষাঢ় ১৩০০ ; প্রত্যাখ্যান—২৭ আষাঢ় ১৩০০ ; গানভঙ্গ—২৪ আষাঢ় ১৩০০

পুরস্কার—শ্রাবণ ১৩০০

? বিদায় অভিশাপ (কাব্যনাট্য)—পতিসর

বসুন্ধরা—২৬ কার্তিক ১৩০০

শাস্তি—গল্প

একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প

সমাপ্তি

ইংরেজ ও ভারতবাসী (প্রবন্ধ)

১৮৯৪

মেঘ ও রৌদ্র (গল্প)—২৭ জুন ১৮৯৪

ঐ গল্পে ব্যবহৃত গান 'বঁধু হে ফিরে এসো'

অন্তর্যামী—সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

লোকসাহিত্য রচনার আয়োজন

১৮৯৫

ঠাকুরদা	—	জ্যৈষ্ঠ	১৩০২
ক্ষুধিত পাষাণ	—	শ্রাবণ	১৩০২
ব্রাহ্মণ	—	৭ ফাল্গুন	১৩০১
পুরাতন ভৃত্য	—	১২ ,,	১৩০১

৫ আশ্বিন ১৩০২ থেকে ১ কার্তিক ১৩০২ পর্যন্ত সময়ে নিম্নলিখিত গানগুলি রচিত হয়:

৫ আশ্বিন	—	ওলো সই···আমার ইচ্ছা করে	—	গীতবিতান	৩০৪
৬ ,,	—	মধুর মধুর ধ্বনি বাজে	—	,,	৫৪৭
৪-৯ ,,	—	বিশ্ববীণা রবে বিশ্বজন মোহিছে	—	,,	৪২৭
৮ ,,	—	বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে	—	,,	৬৮
১২ ,,	—	কে দিল আবার আঘাত	—	,,	৩৩১
১৩ ,,	—	এসো গো নূতন জীবন	—	,,	৫৪৭
১৪ ,,	—	পুষ্পবনে পুষ্প নাহি	—	,,	৩২৬
১৫ ,,	—	আহা জাগি পোহালো বিভাবরী	—	,,	৩২৫
১৮ ,,	—	তোমার গোপন কথাটি	—	,,	২৯৭
২৩ ,,	—	চিত্ত পিপাসিত রে	—	,,	২৭১
২৫ ,,	—	আমি চিনি গো চিনি তোমারে	—	,,	৩০৬
২৯ ,,	—	আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল	—	,,	৫৯৩
১ কার্তিক	—	ওগো ভাগ্যদেবী পিতামহী	—	,,	৫৯৯

১৮৯৬

উর্বশী কবিতাটি ২৩ অগ্রহায়ণ ১৩০২ শিলাইদহ-জলপথে রচিত

স্বর্গ হইতে বিদায়	—	২৪	অগ্রহায়ণ	১৩০২
দিন শেষে	—	২৮	,,	,,
সান্ত্বনা	—	২৯	,,	,,
শেষ উপহার	—	১	পৌষ	,,
জীবনদেবতা	—	২৯	মাঘ	,,
রাত্রে ও প্রভাতে	—	১	ফাল্গুন	,,
১৪০০ সাল	—	২	,,	,,

নবীন তন্ত্রী — }
দুরাকাঙ্ক্ষা — } ৪ ফাল্গুন ১৩০২
প্রৌঢ় — ৭ ” ”
ধূলি — ১৫ ” ”
সিন্ধুপারে — ২০ ” ”

উৎসর্গ (আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জ বনে)—১৩ চৈত্র ১৩০২—চৈতালি কাব্যের অন্তর্গত

গীতহীন —১৩ চৈত্র ” — ” ”
স্বপ্ন —১৪ চৈত্র ” — ” ”
আশার সীমা, দেবতার বিদায়, পুণ্যের হিসাব, বৈরাগ্য —১৪ চৈত্র ” — ” ”
মধ্যাহ্ন, পল্লীগ্রামে, সামান্য লোক, দুর্লভ জন্ম, কর্ম, বন ও রাজ্য, সভ্যতার প্রতি, বন, তপোবন, পদ্মা —২৫ চৈত্র ” — ” ”
স্নেহগ্রাস, বঙ্গমাতা, দুই উপমা, অভিমান, পরবেশ —২৬ চৈত্র ” — ” ”
নদীযাত্রা, মৃত্যুমাধুরী, স্মৃতি, বিলয় — ৭ শ্রাবণ ১৩০৩

১৮৯৭

পসারিণী (কল্পনা) —২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪
বৃথা গেয়েছি বহু গান — ২৮ ভাদ্র ১৩০৪। গীতবিতান ৮৯৩
কেন বাজাও কাঁকন কনকন
নব বিরহ গান — ৬ আশ্বিন ”। কল্পনা কাব্যের অন্তর্গত
কেন যামিনী না যেতে জাগালে না
[লজ্জিতা] ৭ ”
বিদায়, হতভাগ্যের গান ৭ ”

১৮৯৮

মাতার আহ্বান, আশা, বঙ্গলক্ষ্মী }
এবং ‘সে আমার জননী রে’ গান } — আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩০৫
বিদ্যাসাগর-স্মৃতিসভার জন্য ভাষণ রচনা — শ্রাবণ ১৩০৫

বিনোদিনী তথা চোখের বালি রচনা চলছে।

কণিকা কাব্য উৎসর্গ [শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ
রায়চৌধুরী মহাশয়কে] ৪ অগ্রহায়ণ ১৩০৬

পূজারিণী	১৮	আশ্বিন	১৩০৬ —'কথা' কাব্যের অন্তর্গত
অভিসার	১৯	"	"
পরিশোধ	২৩	"	"
বিসর্জন	২৪	"	"
সামান্য ক্ষতি	২৫	"	"
নগরলক্ষ্মী	২৭	"	"
স্পর্শমণি	২৯	"	"
মানী	১	কার্তিক	"
প্রার্থনাতীত দান	২	"	"
রাজবিচার	৪	"	"
শেষ ভিক্ষা	৬	"	"
নকল গড়	৭	"	"
হোরিখেলা	৯	"	"
বন্দীবীর	৩০	"	"
পণরক্ষা	৩	অগ্রহায়ণ	"

১৮৯৯

'গল্পগুচ্ছ' প্রকাশের আয়োজন — অগ্রহায়ণ ১৩০৬

১৯০০

'কাহিনী' কাব্য প্রকাশ — ফাল্গুন ১৩০৬

কর্ণকুন্তী-সংবাদ — ১৫ ফাল্গুন ১৩০৬

একটি সনেট [পরবর্তী কালে 'বসন্তের দান' নামে
'পূরবী' কাব্য গ্রন্থে গৃহীত] পুনর্লিখিত—২৯ বৈশাখ ১৩০৭

ক্ষণিকার অনেকগুলি কবিতা রচিত হয়েছে বৈশাখ ১৩০৭ এর মধ্যে, চিরকুমার সভা-র প্রথম কয়টি পরিচ্ছেদ ঐ সময়ে রচিত

চিরায়মানা — ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

উদ্ধার (গল্প) — শ্রাবণ ১৩০৭

দুর্বুদ্ধি " — ভাদ্র "

ফেল " — আশ্বিন "

সদর অন্দর " — আষাঢ় "

শুভদৃষ্টি " — আশ্বিন "

তৈলাক্ত শিরে তৈল সেক (প্রবন্ধ) ? শ্রাবণ ১৩০৭

চুম্বক কৌশল ভাদ্র "

'গোলমালের মধ্যে গোটা ৯০ নৈবেদ্য লিখেছি' —চিঠিপত্র ৮, পত্র ১৩৫

নষ্টনীড় (গল্প) — চৈত্র ১৩০৭

খেয়া

১৯০১

বঙ্গদর্শন নব পর্যায়ের সম্পাদনা আষাঢ় ১৩০৮

মেঘদূত প্রবন্ধ ['বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থে 'নব বর্ষা'] শ্রাবণ ১৩০৮

১৯০৬

মিলন, বিচ্ছেদ, বিকাশ, সীমা, ভার,

টিকা (গান) — ২৩-২৬ মাঘ ১৩১২

আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি (বিকাশ)

এক মনে তোর এক তারাতে (সীমা)

তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার (ভার)

১৯০৭

গোরা উপন্যাস [লেখা চলছে]—অগ্রহায়ণ ১৩১৪

অন্তর মম বিকশিত কর —২৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৪

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে

তুমি নব নব রূপে

মাঘোৎসবের ভাষণ 'দুঃখ'

১৯০৮

যজ্ঞভঙ্গ প্রবন্ধ — প্রবাসীতে প্রকাশিত, মাঘ ১৩১৪

আজ ধানের ক্ষেতে [গীতাঞ্জলি ৮] শ্রাবণ ১৩১৫
আনন্দের সাগর হতে [... ৯] " "
তোমার সোনার থালায় [... ১০] " "
গোরা লেখা চলছে—আশ্বিন ১৩১৫

১৯০৯

'এই আষাঢ় (১৩১৬) মাসে গীতাঞ্জলির গানের প্রথম ধারা নামিল।'
(শান্তিনিকেতনে এই ধারা নামে)।

গায়ে আমার পুলক লাগে — ২৫ আশ্বিন ১৩১৬
প্রভু আজি তোমার দক্ষিণ হাতে (রাখী সঙ্গীত) — ২৭ আশ্বিন ১৩১৬
জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ — ৩০ আশ্বিন ১৩১৬

১৯১০

গীতাঞ্জলি ৪১-৪৪ ১৯-৩০ আশ্বিন ১৩১৬
গীতাঞ্জলি ১১২-১২২ —২২-২৯ আষাঢ় ১৩১৭
'রাজা' নাটক আশ্বিনের শেষ ভাগ ১৩১৭
[রাজা নাটকের পঁচিশটি গান এই সময়ে লেখা]
অচলায়তন — ১৫ আষাঢ় ১৩১৮
জীবনস্মৃতির খসড়ার পরিমার্জনা — শ্রাবণ ১৩১৮

১৯১২

গীতিমাল্যের গান ও কবিতার ধারা :
ভাগ্যে আমি পথ হারালেম কাজের মাঝে
নাম হারা এই নদীর ধারে
কে গো তুমি বিদেশী
ওগো পথিক দিনের শেষে
এই দুয়ারটি খোলা
এই যে এরা আঙিনাতে এসেছে জুটি :— কবিতাগুলি ১৫ চৈত্র-৩০ চৈত্রের (১৩১৮) মধ্যে লিখিত
আমি হাল ছাড়লে তবে তুমি হাল ধরবে জানি — ১৭ চৈত্র ১৩১৮

আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ	—	১৭ চৈত্র ১৩১৮	
কোলাহল তো বারণ হল এবার কথা কানে কানে	—	১৮ ”	”
এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী	—	২৬ ”	”
যেদিন ফুটল কমল কিছুই জানি নাই	—	২৬ ”	”
এখনো ঘোর ভাঙে না তোর যে	—	২৭ ”	”
ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো	—	২৮ ”	”
তুমি একটু কেবল বসতে দিও কাছে	—	২৯ ”	”
এবার তোরা যাবার বেলাতে সবাই জয়ধ্বনি কর্	—	৩০ ”	”

ইংরেজিতে নিজের গানের ও কবিতার তর্জমা

১৯১৩

গীতিমাল্যের ৫৬-৬৩ পর্যন্ত গান — ১২-১৫ ফাল্গুন ১৩২০

১৯১৪

বলাকা ২২-৩৩ পর্যন্ত কবিতা — মাঘ ১৩২১

১৯১৫

‘চতুরঙ্গ’-এর শ্রীবিলাস অংশ। দ্র. পিতৃস্মৃতি ২য় সং, পৃ ২৭৯-২৮১

‘...গল্পটাতে শিলাইদহের গন্ধ খুব। সেখানকার ভাঙা নীলকুঠি, বালির চর প্রভৃতির বর্ণনা চমৎকার।’ —তদেব, পৃ ২৮০

‘ঘরে-বাইরে’ লেখা চলছে।

নূতন বসন [বলাকা ৩৮] পদ্মা ১২ অগ্রহায়ণ, ১৩২২

শেক্সপীয়র [” ৩৯] শিলাইদহ ১৩ অগ্রহায়ণ, ১৩২২

বলাকা ৪০-৪৩ — ফাল্গুন ১৩২২

শিক্ষার বাহন [প্রবন্ধ]

১৯১৬

ভাবনা নিয়ে মরিস্ কেন খেপে	[বলাকা ৪৩]
যৌবন রে তুই কি রবি সুখের খাঁচাতে	[” ৪৪]
এই ক্ষণে মোর হৃদয় প্রান্তে	[” ৪০]
যে কথা বলিতে চাই	[” ৪১]

১৯২২

পূর্বাচলের পানে তাকাই অস্তাচলের ধারে আসি	—১০ চৈত্র ১৩২৮			—	গীতবিতান	৫২৯
আসা-যাওয়ার পথের ধারে	—১১	”	”	—	”	২৭৭
কার যেন ঐ মনের বেদন	—১২	”	”	—	”	৫০৩
নিদ্রাহারা রাতের এ গান	—১৩	”	”	—	”	২৭৫
এক ফাগুনের গান সে আমার	—১৪	”	”	—	”	৫২৩

ছোটগল্প প্রসঙ্গে

'সাধনা'র যুগে প্রধানত শিলাইদহে কাটিয়েছি। কলকাতা থেকে বলুর ফরমাস আসত, গল্প চাই।— রবিচ্ছবি, ১ম সং, পৃ ৭৪।

সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের গল্পের তালিকা— খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, অগ্রহায়ণ ১১৯৮; সম্পত্তিসমর্পণ, পৌষ ১২৯৮; দালিয়া, মাঘ ১২৯৮; কঙ্কাল, ফাল্গুন ১২৯৮; মুক্তির উপায়, চৈত্র ১২৯৮; ত্যাগ, বৈশাখ ১২৯৯; একরাত্রি, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯; একটা আষাঢ়ে গল্প, আষাঢ় ১২৯৯; জীবিত ও মৃত, শ্রাবণ ১২৯৯; স্বর্ণমৃগ, ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯; রীতিমত নভেল, ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯; জয়পরাজয়, কার্তিক ১২৯৯; কাবুলিওয়ালা, অগ্রহায়ণ ১২৯৯; সুভা, মাঘ ১২৯৯; মহামায়া, ফাল্গুন ১২৯৯; দানপ্রতিদান, চৈত্র ১২৯৯; সম্পাদক, বৈশাখ ১৩০০; মধ্যবর্তিনী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০০; অসম্ভব কথা, আষাঢ় ১৩০০; শাস্তি, শ্রাবণ ১৩০০; একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প, ভাদ্র ১৩০০, সমাপ্তি, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০০; সমস্যাপূরণ, অগ্রহায়ণ ১৩০০; খাতা, (তারিখ নেই); অনধিকার প্রবেশ, শ্রাবণ ১৩০১; মেঘ ও রৌদ্র, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১; প্রায়শ্চিত্ত, অগ্রহায়ণ ১৩০১; বিচারক, ১৩০১; নিশীথে, মাঘ ১৩০১; আপদ, ফাল্গুন ১৩০১; দিদি, চৈত্র ১৩০১; মানভঞ্জন, বৈশাখ ১৩০২; ঠাকুরদা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০২; প্রতিহিংসা, আষাঢ় ১৩০২; ক্ষুধিত পাষাণ, শ্রাবণ ১৩০২; অতিথি, ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২;

—দ্র. গল্পগুচ্ছ, ৪র্থ খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৭৬, পৃ ১০৩৬-৩৮

কবির পদ্মাপ্রবাহিনী শিলাইদহের স্মৃতিচারণ

শিলাইদহ-জীবন এবং ঐ অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কশূন্য হয়ে শান্তিনিকেতনে ও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ত্রিশ বছর বাসকালেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর বড় সাধের মানসসুন্দরী পদ্মা, শিলাইদহ, জমিদারি, প্রজা, পল্লীসংগঠন, বৈষয়িক কর্ম ও সংগ্রামময় জীবনের স্মৃতি ভুলতে পারেন নি। তাঁর পরবর্তীকালের কর্মবহুল বিশ্বসম্মানিত বিশ্বকবির জীবনেও ঐ সুদূরে ফেলে আসা পল্লীস্মৃতি অহরহ তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। তাঁর বিচিত্র বিশাল কাব্য-সাহিত্যে তার প্রমাণ সুপ্রচুর। তারই কিছু উদাহরণ এখানে সঙ্কলন করছি। এ সঙ্কলন অসম্পূর্ণ, কারণ গবেষকসুলভ নিপুণ অধ্যবসায়সহ বিরাট রবীন্দ্র সাহিত্য পর্যালোচনা আমার সাধ্যায়ত্ত নয়। আবার কপিরাইট আইন ও অন্যান্য নানা কারণেও তা সম্ভব নয়। রচনার পূর্ণ উদ্ধৃতি সেই সমস্ত কারণে দেওয়া সম্ভব হল না, আংশিক উদ্ধৃতি দেওয়া হল মাত্র। এই পর্বে কবি-কর্মীর বিচিত্র জীবনসাধনার মর্ম ও রসোপলব্ধির জন্য পাঠক-পাঠিকা ঐ আংশিক উদ্ধৃতির পূর্ণ রচনাগুলি পাঠ করলে উপকৃত হবেন।

এ বিষয়ে প্রখ্যাত রবীন্দ্রকাব্য-সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁর 'কাব্যপরিক্রমা'র পৃ ১২৩ গ্রন্থে বলেছেন—

> রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রত্যেক অবস্থার সঙ্গে সেই সেই অবস্থায় রচিত তাঁহার কাব্যের এমন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ যে, তাঁহার কাব্যকে সম্পূর্ণভাবে বুঝিবার জন্য তাঁহার জীবনের কথা কিছু কিছু জানা দরকার হয়। পৃথিবীতে বোধ হয় আর কোনো কবির জীবন নিজ কাব্যের ধারাকে এমন একান্তভাবে অনুসরণ করিয়া চলে নাই। কবির জীবনের বড় বড় পরিবর্তনগুলি প্রথমে কাব্যের মধ্য দিয়া নিগূঢ় ইঙ্গিতমাত্রে প্রতিফলিত হইয়া শেষে জীবনের ঘটনারূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

সোনার তরী থেকে আরম্ভ করে জন্মদিনে পর্যন্ত প্রায় অধিকাংশ কাব্যে কবির শিলাইদহ-জীবনের আনন্দ-বেদনার এই অসম্পূর্ণ সঙ্কলনটি পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দিলাম। এ বাদে বহু কবিতার গভীর মানবিক তাৎপর্য বাহুল্যভয়ে উল্লেখ করতে বিরত রইলাম।

সোনার তরী— (১৮৯৪ খ্রী.)	'গগনে গরজে মেঘ' 'একখানি ছোট ক্ষেত আমি একলা'-নদী ও জীবনতত্ত্ব বিশ্লেষণে চাষিজীবনের চিত্র। (১২৯৮ ফাল্গুন) আরো কবিতা,—মানসসুন্দরী, বসুন্ধরা; রবীন্দ্র-কাব্যের শ্রেষ্ঠ ফসল।
নদী— (১৮৯৬ খ্রী.)	(১৩০২) ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথের বিবাহে উপহার, কবিতাটিতে আছে পদ্মার বর্ণনা।
চিত্রা (১৮৯৬ খ্রী.)	'পূর্ণিমা' কবিতাটি বোটে বসে রচিত (দ্রঃ ছিন্নপত্র, ১২ ডিসেম্বর ১৮৯৫ সালে)। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতা রামপুর-বোয়ালিয়ায় রচিত হলেও শিলাদহ অঞ্চলের শোষিত, অবহেলিত, দরিদ্র, পর-মুখাপেক্ষী গ্রাম্য হতভাগ্য প্রজাদের বাস্তব জীবন-চিত্র এতে আছে, জমিদারির বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত কবিতা।
ক্ষণিকা— (১৯০০ খ্রী.)	'বসেছে আজ রথের তলায় স্নানযাত্রার মেলা' (শিলাইদহে গোপীনাথদেবের স্নানযাত্রা ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭) কবিতা—কৃতার্থ, মেঘমুক্ত, যৌবন বিদায়, কৃষ্ণকলি ইত্যাদি, কবিতা ('কালো মেয়ের কালো হরিণচোখ)।
নৈবেদ্য— (১৯০১ খ্রী.)	৭৩ নং, আমি ভালোবাসি দেব এই বাংলার···আষাঢ়, ১৩০৮ ৭৪ নং, এ নদীর কলধ্বনি যেথায় বাজে না···ইত্যাদি।
খেয়া— (১৯০৬ খ্রী.)	আমার নাই বা হ'ল পারে যাওয়া···(২৮ আষাঢ়, ১৩১৩) তুমি এপার ওপার কর কে গো ওগো খেয়ার নেয়ে, ইত্যাদি।
শিশু—(১৯০৯খ্রী.)	নৌকাযাত্রা, মাঝি, বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।
গীতাঞ্জলি— (১৯১০ খ্রী.)	নদী পারের এই আষাঢ়ের প্রভাতখানি (১১৩), আর নাই রে বেলা, নামল ছায়া ধরণীতে (২৬) ইত্যাদি।
চৈতালি— (১৯১২ খ্রী.)	ইছামতী নদী (শিলাইদহের উত্তরে পদ্মার শাখা)। শুশ্রূষা, নদীযাত্রা, পদ্মা (হে পদ্মা আমার) পল্লীগ্রাম, বিদায় (২৫ চৈত্র, ১৩০২)।
উৎসর্গ— (১৯১৪ খ্রী.)	আমি যারে ভালোবাসি সে ছিল এই গাঁয়ে (৩৪); ওরে পদ্মা ওরে মোর রাক্ষসী।
ছিন্নপত্রাবলী—	এই গ্রন্থের ২৫২টি পত্রের মধ্যে ১০৮ খানা পত্রই শিলাইদহ থেকে লেখা। এবং পতিসরে ও কলকাতায় বসেও

শিলাইদহ স্মৃতি মনে গুঞ্জরিত হচ্ছে (পত্র নং ১১১, ১১৮)।

গীতিমাল্য— ১৬—ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী…
(১৯১৪ খ্রী.) ১৩—এই যে এরা আঙিনাতে এসেছে জুটি…
৯—নামহারা এই নদীর পারে…(১৯ চৈত্র, ১৩১৮)
গীতিমাল্যের এক চতুর্থাংশ কবিতা শিলাইদহে রচিত।

শিশু-ভোলানাথ—ইছামতী কবিতা। শিলাইদহের পদ্মার শাখা ইছামতী
(১৯২২ খ্রী.) নদীর আনন্দময় স্মৃতি মনে পড়ছে, সেই ঘর, সেই গ্রাম, সেই মাঠ কবিতাটির উপজীব্য।

বলাকা— (৮)—হে বিরাট নদী অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল (এলাহা-
(১৯১৬ খ্রী.) বাদ, ১৩২১)

(৪১) যে কথা বলিতে চাই বলা হয় নাই
শূন্য প্রান্তরের গান বাজে ওই একা একা ছায়া বটে,
নদীর এপারে ঢালু তটে চাষি করিতেছে চাষ ;
উড়ে চলিয়াছে হাঁস ওপারের জনশূন্য বালুতীর তলে। * *
যে আনন্দ বেদনায় এ জীবন বারে বারে করেছে উদাস
হৃদয় খুঁজিছে আজি তাহারি প্রকাশ। (পদ্মা ৮ ফাল্গুন, ১৩২২)

(৩২) আজ এই দিনের শেষে।
বলাকার অনেক কবিতা শিলাইদহে রচিত।

পূরবী— আনমনা—আনমনা গো আনমনা * *
(১৯২৫ খ্রী.) জনশূন্য তটের পানে ফিরছে হাঁসের দল
স্বচ্ছনদীর জল, আকাশ পানে রইবে পেতে কান…
(১৮ অক্টোবর ১৯২৪—আণ্ডেস জাহাজে, মহাসমুদ্রে রচিত, শিলাইদহ-স্মৃতি।

কাহিনী—(কথা ও কাহিনীর অংশ)
(১৯৩০ খ্রী.) 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় শিলাইদহ গ্রামের বর্ণনা।

বীথিকা— 'নাট্যশেষ'—অতীত জীবনের কর্মব্রতের স্মৃতিরোমন্থন।
(১৯৩০ খ্রী.) (২) জনশূন্য ভাঙা আজি বৃদ্ধ বটচ্ছায়ায় তলে…(আষাঢ়, ১৩৪২)

পরিশেষ— সিঙ্গাপুর বন্দরে ৪ শ্রাবণ ১৩৩৪ সালে রচিত—'আহ্বান'
(১৯৩২ খ্রী.) কবিতার শেষাংশ—

ডেকেছ তুমি মানুষ হেথা পীড়িত অপমানে,
আলোক যেথা নিবিয়া আসে শঙ্কাতুর প্রাণে,
আমারে চাহি ডঙ্কা তব বেজেছে সেইখানে
বন্দী যেথা কাঁদিছে কারাগারে। * * *

ঐ কাব্যে 'বিচিত্রা' কবিতায় বহু সংঘাতময় অতীতের বিচিত্র জীবনের স্মৃতি কাহিনী—

* জীবনধারা অকূলে ছোটে,
দুঃখে সুখে তুফান ওঠে
আমারে নিয়ে দিয়েছ তাকে খেয়া
বিচিত্রা হে ; বিচিত্রা,
কালো গগনে ডেকেছে ঘন দেয়া। * (৭ বৈশাখ, ১৩৩৪)

পুনশ্চ— আঠাত্তর বৎসর-বয়স্ক কবি বৃদ্ধকালে শান্তিনিকেতনে বসে
(১৯৩২ খ্রী.) তাঁর যৌবনের প্রেয়সী পদ্মাকে স্মরণ করছেন—

পদ্মা কোথায় চলেছে দূর আকাশের তলায়।
মনে মনে দেখি তাকে * *

'কোপাই' নামক দীর্ঘ অনন্য সুন্দর কবিতা। যৌবনে 'পদ্মা' আর বার্ধক্যে মরা নদী 'কোপাই'। সম্পূর্ণ কবিতা পঠিতব্য।

বিচিত্রিতা— 'ছায়সঙ্গিনী' কবিতা— একদিন জীবনের প্রথম ফাল্গুনী
(১৯৩৩ খ্রী.) এসেছিল, তুমি তারি পদধ্বনি
শুনি…

কবি যেখানেই থাকুন, সেই পদ্মা, সেই শিলাইদহ যেন ছায়াসঙ্গিনীরূপে তাঁকে অনুসরণ করছে।

পত্রপুট— (৪ নং) একদিন আষাঢ়ে নাম্‌ল বাঁশবনের মর্মরঝরা
(১৯৩৬ খ্রী ডালে…

(৯) হেঁকে উঠল ঝড়, লাগল প্রচণ্ড তাড়া…(চৈত্র, ১৩৪০)
(পদ্মাবোটের ঝড়ের ভীষণ-মধুর স্মৃতির জাগরণ)
(১৫) ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত * *

কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে
যে নদীর নেই কোনো দ্বিধা
পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙে ফেল্‌তে * *

(১৮ বৈশাখ, ১৩৪৩)

শিলাইদহ বাসের ফলে গগন হরকরা, বোষ্টমী, প্রভৃতি মরমি সাধকদের অপূর্ব বলিষ্ঠ মানবতার মহাবাণীর জ্বলন্ত স্মৃতি। এই দীর্ঘ অনবদ্য কবিতা সম্পূর্ণ পঠিতব্য।

ছড়ার ছবি— (১৯৩৭ খ্রী.) কবি আলমোড়ায় বসে সুদূরের প্রেয়সী পদ্মাকে স্মরণ করেছেন—

"আমার নৌকা বাঁধা ছিল পদ্মানদীর পারে···(পদ্মায়, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪)

নৌকা বেঁধে কোথায় গেল, যা ভাই মাঝি ডাক্‌তে,

(জলযাত্রা)

দেখ্‌রে চেয়ে, নাম্‌ল বুঝি ঝড়—(ঝড়, ১২ জুন, ১৯৩৭), এই সঙ্গে 'রিক্ত' কবিতাও দ্রষ্টব্য।

খাপ্‌ছাড়া—বৃদ্ধকালে শিশুসুলভ কৌতূহলী চিত্র-বিচিত্র ছড়ায় কবির (১৯৩৭ খ্রী.) আদরিণী পদ্মা বাদ যায় নাই—

স্বপ্নে দেখি নৌকা আমার নদীর ঘাটে বাঁধা,
নদী কিম্বা আকাশ সেটা লাগল মনে ধাঁধা।

প্রান্তিক— (১৯৩৮ খ্রী.) ফেলে আসা যৌবনের সংসার রঙ্গভূমির আত্মসমীক্ষায়—

লব আমি মরমের কবিত্ব মর্যাদা,
জীবনের রঙ্গভূমে, এরি লাগি সেধেছিনু তান······

(২, ৫, ও ৭নং কবিতায় অতীত সংগ্রামী জীবনের স্মৃতি)

১০নং কবিতা—(৮-১২-৬৭)

সেঁজুতি— (১৯৩৮ খ্রী.) 'জন্মদিন' কবিতায় অতীতের সেই পদ্মাতীরের জীবনের গভীর আকাঙ্ক্ষা—(দ্বিতীয় 'জন্মদিন' কবিতা)

তাহারে ডাক দিয়েছিল পদ্মা নদীর ধারা,
কাঁপন লাগা বেণুর শিরে দেখেছে শুকতারা।

কাজল কালো মেঘের পুঞ্জ সজল সমীরণে,
নীল ছায়াটি বিছিয়েছিল তটের বনে বনে।

* * *

তাই দেখেছে চেয়ে চেয়ে অস্ত রবির রাগে,—
বলেছিল, এইতো ভালো লাগে।
সেই যে ভালোবাসাটি তার যাক্‌ না রেখে পিছে,
কীর্তি যা সে গেঁথেছিল হয় যদি হোক মিছে,
না রয় যদি নাই রহিল নাম—
এই মাটিতে রইল তাহার বিস্মিত প্রণাম।" (২২বৈশাখ, ১৩৪৮)

এই গ্রন্থের 'পরিচয়' ও 'পদ্মের নৌকা' 'ছাম্পান' দ্রষ্টব্য।

গল্পসল্প— শিশুদের জন্য রচিত। নিজ অভিজ্ঞতা-প্রসূত জমিদারির সেকেলে (১৯৪১ খ্রী.) 'ম্যানেজার বাবুর' সরস কৌতুক কাহিনী বলেছেন।

সানাই— 'মানসী' কবিতা : রচনা, মংপুতে, ৯ জুন, ১৯৩৯।
(১৯৪০ খ্রী.) মনে নেই, বুঝি হবে অগ্রহান মাস,
তখন তরণীবাস ছিল মোর পদ্মা বক্ষ-'পরে।
বামে বালুচরে শস্যশূন্য শুভ্রকায় না পাই অবধি।

* *

পূর্ণ যৌবনের বেগে
নিরুদ্দেশ বেদনার জোয়ার উঠেছে মনে জেগে
মানসীর মায়ামূর্তি বহি
ছন্দের বুনানি গেঁথে অদেখার সঙ্গে কথা কহি।

যৌবনে পদ্মাতীরে বজরায় 'মানসসুন্দরী' রচনার ইতিহাস বলছেন বৃদ্ধকালে, মংপু পাহাড়ে বসে। ঐ কাব্যগ্রন্থের অবশেষে কবিতায় যৌবনের জয়-পরাজয়ের স্মৃতি—

অনেকের মাঝে যারে কাছে দেখে হয় নাই দেখা,
একেলার ঘরে তারে একা—
চেয়ে দেখি, কথা কই যুগে যুগে, পাই তারে না পাওয়ার রূপে।

এই গ্রন্থের 'হঠাৎ' মিলন কবিতায় সাধারণ মানুষের সংসর্গের মধুর চিত্র পরিস্ফুট। (শান্তিনিকেতন, ৩ ডিসেম্বর, ১৮৩৮)।

রোগশয্যায়—বৃদ্ধকালে রুগ্নকবি জীবনের অন্তঃপুরের বার্তা বলছেন—
(১৯৪০ খ্রী.) আমার কীর্তিরে আমি করি না বিশ্বাস।
জানি, কাব্যসিন্ধু তারে নিয়ত তরঙ্গাঘাতে দিনে দিনে দিবে লুপ্ত করি, আমার বিশ্বাস আপনারে,—
দুইবেলা সেই পাত্র ভরি এ বিশ্বের নিত্যসুধা করিয়াছি পান,—
প্রতি মুহূর্তের ভালোবাসা তারি মাঝে হয়েছে সঞ্চিত। (২৬)

সহজ পাঠ— বৃদ্ধ শিশুর আসনে বসে শিশুদের বলছেন গ্রামের কাহিনী—
(১৯৩০ খ্রী.) কুমোরপাড়ায় গরুর গাড়ির, বোঝাই করা কলসী হাঁড়ি।

* * *

হাট বসেছে শুক্রবারে, বক্শিগঞ্জে পদ্মাপারে। * *

আরোগ্য— পল্লীবাংলার সাধারণ মানুষের প্রতি অসীম ভালোবাসা, গভীর
(১৯৪১ খ্রী.) মানবতার অনন্য সাধারণ বাণী। কবিতাটি দীর্ঘ—
ঘণ্টা বাজে দূরে। * * *
গ্রামগুলি গেঁথে গেঁথে মেঠো পথ চলে দূর পানে
নদীর পাড়ির 'পর দিয়ে। * *
গ্রামবাংলার রূপের অনন্যসাধারণ দীর্ঘ স্মৃতিমন্থন-জাত কবিতা।
ঐ গ্রন্থের ১৯নং কবিতা—'অলস সময় ধারা বেয়ে মন যথা শূন্য পানে চেয়ে…' বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মানবতার বাণী।

জন্মদিনে— ১৯নং কবিতায় বালো শিলাইদহে নীলকুঠিতে বাস, সামনে
(১৯৪১ খ্রী.) কীর্তিনাশা পদ্মাপ্রবাহিনী, রথতলায় টাটু ঘোড়ায় চড়ে ছোটা, সন্ধ্যাবেলা শিলাইদহ বুনাপাড়ার বিশ্বনাথ শিকারির বাঘ মারার গল্প শোনা ইত্যাদি; শেষে বলেছেন 'সেথা তার দেবলোক, স্বকল্পিত স্বর্গের কিনারা… 'ইচ্ছা সঞ্চরণ করে বল্গামুক্ত রথে'। (২১ জানুয়ারি, ১৯৪১)।
ঐ গ্রন্থের দশম কবিতায়—চরম মানবতার বাণী, নিজের দীর্ঘ জীবনের অকৃতার্থতার স্বীকৃতি ও মানুষের কবির প্রতি আহ্বান—
এসো কবি অখ্যাত জ‌নের, নির্বাক মনের।
মর্মের বেদনা যত করিয়া উদ্ধার—
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার—
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি—

রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।—এই অসামান্য কবিতাটি সম্পূর্ণ পাঠ্য। ২৮নং—নদীর পালিত এই জীবন আমার (২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১) ২৯নং তোমাদের জানি, তবু তোমরা যে দূরের মানুষ (৯ মার্চ, ১৯৪১)।

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া ভ্রমণকালে তাঁর শিলাইদহের জীবনের ও পল্লীসংগঠনের স্মৃতি রোমন্থন করছেন—

একদা আমি পদ্মার চরে বোট বেঁধে সাহিত্যচর্চা করেছিলুম। মনে ধারণা ছিল, লেখনী দিয়ে ভাবের খনি খনন করব, কারণ এই আমার একমাত্র কাজ, আর কোন কাজের আমি যোগ্যই নই। কিন্তু যখন এ কথা কাউকে বলে কয়ে বোঝাতে পারলুম না যে আমাদের স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষেত্র হবে কৃষিপল্লীতে, তার চর্চা আজ থেকেই শুরু করা চাই, তখন কিছুক্ষণের জন্য কলম কানে গুঁজে একথা আমাকে বল্‌তে হল,—আচ্ছা, আমিই একাজে লাগ্‌বো। এই সংকল্পে আমার সহায়তা করবার জন্য সেদিন একটি মাত্র লোক পেয়েছিলাম—সে হল—কালীমোহন ঘোষ। * *

বার্লিন, ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০॥ 'রাশিয়ার চিঠি'

জমিদারি-বিচিত্রার এইরকম চিন্তাভাবনা কবি বিভিন্ন রচনায়ও বক্তৃতায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর সারাজীবনে কাব্য ও কর্ম যেন সমান্তরাল ভাবে, এমন কি ওতপ্রোতভাবে একটা বিরাট বলিষ্ঠ সার্থকতার পথে প্রবাহিত হয়েছে। তাঁর প্রজা, জমিদারি, সংসার, বিদ্যালয়, বৈষয়িকতা, পল্লীসংগঠনাদি জীবনযুদ্ধে জয়-পরাজয়ের বলিষ্ঠ আত্মসমীক্ষার মাত্র কয়েকটি উদ্ধৃতি এখানে তুলে দিচ্ছি।

কবি সাতসট্টি বৎসর বয়সে জীবন-সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে আপন অসম্পূর্ণ কীর্তি-সৌধের পানে তাকিয়ে নিজের মনঃসমীক্ষা বিশ্লেষণ করছেন শ্রীমতী নির্মল-কুমারী মহলানবিশকে লিখিত ১৩৩৫ সালের ৯ই শ্রাবণ তারিখের পত্রে। এই গ্রন্থের ৬২ পৃষ্ঠায় লিখিত ১৩৪৬ সালের ১লা চৈত্র তারিখের ও ১৩৪৫ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ আমাকে লিখিত হাল আমলের দুখানা পত্র কবিজীবনের মর্ম কথা প্রকাশ করেছে।

...আজ চল্লিশ বছর হয়ে গেল আমার মনের মধ্যে একটা সংকল্পের সম্পূর্ণ ধ্যানমূর্তি জেগে উঠেছিল, ইংরেজিতে যাকে বলে vision। তখন বয়স ছিল

অল্প, মনের দৃষ্টিশক্তিতে একটুও চাল্‌শে পড়েনি। জীবনের লক্ষ্যকে বড়ো করে সমগ্র করে স্পষ্ট করে দেখতে পাবার আনন্দ যে কতখানি তা ঠিকমতো তোমরা বুঝতে পারবে কিনা জানিনে। সে আনন্দের পরিমাণ পাবে আবার ত্যাগের পরিমাপে। আমার শিলাইদা আমার সাহিত্য সাধনা, আমার সংসার—সমস্তকেই বঞ্চিত করে আমি বেরিয়ে এসেছিলুম। আমার ঋণের বোঝা ছিল প্রকাণ্ড, কাজের অভিজ্ঞতা ছিল নাস্তি। তার পরে সুদীর্ঘকাল এই দুস্তর অধ্যবসায়ে একলা পাড়ি দিয়েছিলুম। কাউকে দোষ দিই নি, কারো উপর দায় চাপাই নি, কারো কাছে ভিক্ষে চাই নি। তারি মাঝখানে সংসারের নানান দুঃখ গেল। কিন্তু সেই সময়টাতেই মনের ভিতর মহলে যেন সব আলোই জ্বলে উঠেছিল। সেটা বুঝতে পারবে যদি ভেবে দেখ তখনকার বঙ্গদর্শনে কী লিখেছি, তখনকার পার্টিশন আন্দোলনে কী দোলা লাগিয়েছি—মনের মধ্যে ভারতবর্ষের একটা নিত্যরূপ দেখা দিচ্ছে, অথচ তার সঙ্গে মানুষের বিশ্বরূপের বিরোধ নেই। পল্লীতে পল্লীতে নিজের চেষ্টায় স্বাতন্ত্র্যের কেন্দ্র স্থাপনের কল্পনা মনের মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছে—শিলাইদহে নিজেদের জমিদারির মধ্যে তার চেষ্টাও চল্‌ছে। আমার এই নানামুখী চেষ্টার মাঝখানে গভীর একটা তপস্যা ছিল—একেবারে ছিলুম সন্ন্যাসী, সত্যের অন্বেষণে এবং সত্যকে রূপ দেবার একান্ত সাধনায়। তখন বিপদ ছিল চারিদিকে এবং দারিদ্র্য ছিল ঘরের মধ্যে। সেদিনকার সেই ঢেউ থামল, কিন্তু আমার অন্তরের মধ্যে নিয়ত কর্ম চল্‌ছেই। মনকে টান্‌ছে মানুষের দিকে—বাইরের বড়ো রাস্তায়। 'ডাকঘর' লিখেছিলুম সেই কথাটা বলতে।……

এখন শরীর ক্লিষ্ট ক্লান্ত, মনের অনেকগুলো আলো নিভে গেছে—আমার সেদিনকার পরিচয়টাকে এখানকার প্রদোষান্ধকারে ভালো করে আর খুঁজে পাই নে। আমার সেদিনকার ধ্যানরূপের প্রতিবিম্ব আমার চারিদিকে কারো মধ্যে স্পষ্ট দেখা যায় না। বুঝতে পারি কাছের লোকের মধ্যে আমার প্রাণের অনুপ্রাণন ঠিকমতো ঘটে ওঠেনি।……

সেই যে সেদিন আমার জীবনের কেন্দ্রস্থল থেকে একটি উজ্জ্বল ধ্যান, নীহারিকার মাঝখানে নক্ষত্রের মতো অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল তাকে আবার দেখতে পাই এখানে যখন একলা বসে থাকি। চারিদিকে আর কোনো কথা থাকে না, কেবল থাকে আমার সেই অতীত কালের বাণী। তাকে

হারাতে, ভুলতে, ঝাপসা হতে দিতে ইচ্ছে করে না। জীবনের সত্যযুগ মাঝে মাঝে আসে, তখন নিজেকে সত্য করে পাই, তখনকার চিন্তা এবং কর্ম একটা ধ্যানকেন্দ্রকে ভাবকেন্দ্রকে আশ্রয় করে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সেই সত্যযুগের সঙ্গে সঙ্গে আসে কর্মযুগ—কর্মযুগে নানা মানুষ নানা কথা তুচ্ছতায় মনের আকাশকে কেবল যে আবিল করে তা নয়, উদ্যমকে ক্লান্ত করতে থাকে।··· যাদের ধ্যানরূপের দৃষ্টি নেই তাদের কাছে ধ্যানরূপের মূল্য নেই।···

আর একখানি চিঠি—৯ শ্রাবণ, ১৩৩৫—

মনে পড়ছে সেই শিলাইদহের কুঠি, তেতলার নিভৃত ঘরটি আমের বোলের গন্ধ আসছে বাতাসে—পশ্চিমের মাঠ পেরিয়ে বহুদূরে দেখা যাচ্ছে বালুচরের রেখা আর গুনটানা মাস্তুল। দিনগুলো অবকাশে ভরা—সেই অবকাশের উপর প্রজাপতির ঝাঁকের মতো উড়ে বেড়াচ্ছে রঙিন পাখাওয়ালা কত ভাবনা এবং কত বাণী। কর্মের দায়ও ছিল তারি সঙ্গে—আর হয়তো মনের গভীরে ছিল অনন্ত আকাঙ্ক্ষা, পরিচয়হীন বেদনা। সব নিয়ে ছিল যে আমার নিভৃত বিশ্ব, সে আজ চলে গিয়েছে বহুদূরে।* * আমার শিলাইদহের কুঠি, পদ্মার চর, সেখানকার দিগন্তবিস্তৃত ফসলখেত ও ছায়ানিবিড় গ্রাম ছিল সেই অভাবনীয়কে নিয়ে, যার মধ্যে আমার কল্পনার ডানা বাধা পায় নি। যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম কাজ আরম্ভ করেছিলুম, তখন সেই কাজের মধ্যে অনেকখানিই ছিল অভাবনীয়, কর্তব্যের সীমা তখন সুনির্দিষ্ট হয়ে কঠিন হয়ে ওঠে নি, আমার ইচ্ছা, আমার আশা, আমার সাধনা তার মধ্যে আমার সৃষ্টির ভূমিকাকে অপ্রত্যাশিতের দিকে প্রসারিত করে রেখেছিল—সেই ছিল আমার জীবনের লীলাভূমি—কাজে খেলায় প্রভেদ ছিল না। *

—৮ই এপ্রিল, ১৯৩২। কবির বয়স তখন চুয়াত্তর। পথে ও পথের প্রান্তে [জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ সাল] পৃ ১১৭-১১৯

পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লিখছেন ১৯১৫ সালের ১৮ই জুলাই—

কল্যাণীয়েষু—

রথী, শিলাইদহে এসেছি······। অনেকদিন পরে জলের ধারা ও সবুজ মাঠের সংস্রব ও নির্জন পেয়ে আমি যেন নিজের সত্যকে আবার ফিরে পেয়েছি, এইখানেই সুদীর্ঘ কাল থাকতে ইচ্ছা করছে। নিভৃত প্রকৃতির হাতের শুশ্রূষা আমার পক্ষে একান্ত দরকার,—সেই জন্যই জীবনের ও সংসারের সমস্ত জঞ্জাল ছিন্ন করে ফেলে সুদূরে পালাবার জন্যে ক্রমাগতই আমার মন এত ছটফট

করছিল। আমার পক্ষে কোনো অপরিমিত সুদূর দেশের শান্তি হয়তো নিরতিশয় আবশ্যক বলেই জাপান প্রভৃতিতে যাওয়ার প্রস্তাব এত বারম্বার নানা বাধা সত্ত্বেও ঘুরে ঘুরে আসছে।

—চিঠিপত্র, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ ৩৩

কলিকাতা হইতে দূরে নিভৃতে আমার একটি অজ্ঞাতবাসের আয়োজন আছে। আমার নিজ চর্যার দৌরাত্ম্য হইতে সেইখানে অন্তর্ধান করিয়া থাকি। সেখানকার লোকেরা এখনো আমার সম্বন্ধে কোনো একটা সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছে নাই;—তাহারা দেখিয়াছে—আমি ভোগী নই, পল্লীর রজনীকে কলিকাতার কলুষে আবিল করি না। আবার যোগীও নই, কারণ দূর হইতে আমার যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে ধনের লক্ষণ আছে। আমি পথিক নহি, পল্লীর রাস্তায় ঘুরি বটে, কিন্তু কোথাও পৌঁছিবার দিকে আমার কোনো লক্ষ্যই নাই। আমি যে গৃহী, এমন কথা বলাও শক্ত, কারণ ঘরের লোকের প্রমাণাভাব। * * * ১৩২১। আষাঢ়। 'বোষ্টমী' গল্প, গল্পগুচ্ছ তৃতীয় খণ্ড। (শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের পরোক্ষে-ব্যক্ত আত্মকথা।)

১৩৪৬ সালের ১৮ ফাল্গুন বাঁকুড়া জনসভায় কথিত অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ সদুঃখে বলেছেন—

** আমি পল্লীর পরিবেশ হারিয়েছি নিজে পরিচিত হয়ে। বাইরে বেরোনো আমার পক্ষে দায়, শরীরেও কুলোয় না। আমার পল্লীর ভালোবাসা বিস্তৃত করতে পারতুম, আরও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারতুম। কিন্তু সম্মানের দ্বারা আমি পরিবেষ্টিত, সে পরিবেষ্টন আর ভেদ করতে পারব না—আমার সেই শিলাইদহের জীবন হারিয়ে গেছে।

১৩৪৬-এ শিলাইদহে অনুষ্ঠিত পল্লী সাহিত্য সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে চিঠি দেওয়া হয়। তদুত্তরে কবি তাঁর হৃদয়মথিত শিলাইদহ-স্মৃতি ব্যক্ত করেন নিচের চিঠিখানিতে···

আমার যৌবনের ও প্রৌঢ় বয়সের সাহিত্য-রস-সাধনার তীর্থ স্থান ছিল পদ্মাপ্রবাহচুম্বিত শিলাইদহ পল্লীতে। সেখানে আমার যাত্রাপথ আজ আর সহজগম্য নয়, কিন্তু সেই পল্লীর স্নিগ্ধ আমন্ত্রণ সরস হয়ে আছে আজও আমার

নিভৃত স্মৃতিলোকে, সেই আমন্ত্রণের প্রত্যুত্তর অশ্রুতিগম্য করুণ-ধ্বনিতে আজও আমার মনে গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে, এই উপলক্ষে পল্লীবাসীদের আজ জানিয়ে রাখলুম। ১০ই চৈত্র, ১৩৪৬।

শিলাইদহ থেকে কবির লেখা শেষ চিঠি* : অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত

রচনাকাল ২৩ চৈত্র ১৯২৮

আমার এখানকার পালা সাঙ্গ হল। পুরানো শিলাইদহে সবই তেমনি আছে— বাড়ির দক্ষিণ দিকে শিমু বীথিকায় অবিশ্রাম মর্ম্মরধ্বনি চলচে, পুব দিকের আমবাগানে দুই কোকিলে সমস্ত দিন কুহুধ্বনির কবির লড়াই চলেইচে, চষা মাঠের মাঝে মাঝে গ্রামগুলি অবগুণ্ঠিতা গ্রামবধূর মত বেণুবনের ছায়ায় ঢাকা দাঁড়িয়ে আছে, পুকুর পাড়ে দুটো একটা গোরু আলস্যমন্থর ভাবে চ'রে বেড়াচ্চে, বাগানের পাঁচিলের ধারে নারকেল আর সুপারি গাছ ঠিক যেন শিশুর মত আকাশের দিকে কেবলি হাত নাড়চে,— আকাশের নীল স্তব্ধ আর পৃথিবীর সবুজ চঞ্চল, এই উভয়ের মধ্যে দিনরাত কেবলি রঙের ইশারা চলচে··· —সবই তেমনি আছে কেবল আমার চিরপরিচিত পদ্মা শিলাইদা ছেড়ে দূরে কোথায় চ'লে গেছে তার আর আর নাগাল পাবার জো নেই। আমার পক্ষে এই বিচ্ছেদটি সামান্য নয়— যেন অলকাপুরীতে ঐশ্বর্য্য সবই আছে কেবল স্বয়ং লক্ষ্মীই নেই—···

* আমাদের সন্ধানে এই চিঠিখানিই শিলাইদহ থেকে লেখা রবীন্দ্রনাথের শেষ চিঠি।

—প্রকাশক

জমিদারিতে মণ্ডলীপ্রথা

দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য কতকগুলি পল্লী নিয়ে এক-একটি মণ্ডলী স্থাপন করা দরকার, সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্মের ও অভাব-মোচনের ব্যবস্থা করে মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করে তুলতে পারে তবেই স্বায়ত্তশাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হয়ে উঠবে। নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক-স্থাপনের জন্য পল্লীবাসীদের শিক্ষা সাহায্য ও উৎসাহ দান করতে হবে। এমনি করে দেশের পল্লীগুলি আত্মনির্ভরশীল ও ব্যূহবদ্ধ হয়ে উঠলেই আমরা রক্ষা পাব। কিভাবে বিশিষ্ট পল্লীসমাজ গড়ে তুলতে হবে, এই হচ্ছে আমাদের প্রধান সমস্যা।...

—সমবায়নীতি. আশ্বিন ১৩৬৮ মু. পৃ ২২-২৩

জমিদারিতে 'মণ্ডলীপ্রথা' সম্বন্ধে কিছু তথ্য এই গ্রন্থে পূর্বেই দেওয়া হয়েছে*। তা সত্ত্বেও বিষয়টি সম্ভবত অস্পষ্টই রয়ে গেছে। বিষয়টি প্রাঞ্জল করার উদ্দেশ্যে বর্তমান লেখার অবতারণা।

প্রাচীন জমিদারি প্রথাকে একেবারে আনুপূর্বিক সংশোধন করে আধুনিক কালের উপযোগী প্রকৃত পল্লীস্বরাজ সংগঠনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যমরূপে পঞ্চায়েৎ প্রথাকে গড়বার দিকে রবীন্দ্রনাথের কঠোর নিষ্ঠা, অবিচলিত অধ্যবসায় ও অটুট সঙ্কল্প একটা অভিনব ব্যাপার, বিশেষত একটা পরাধীন জাতির পক্ষে তো বটেই। কবি তখন স্বয়ং একনিষ্ঠ কর্মযোগী। এ বিষয়ে প্রথমেই তাঁর একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি—

এখন আমার কাজ দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গেছে। আমাদের জমিদারির মধ্যে একটা কাজ পত্তন করে এসেছি। বিরাহিমপুর পরগণাকে (শিলাইদহ জমিদারি) পাঁচটা মণ্ডলে ভাগ করে প্রত্যেক মণ্ডলে একজন অধ্যক্ষ বসিয়ে এসেছি। এই অধ্যক্ষেরা সেখানে পল্লীসমাজ স্থাপনে নিযুক্ত। যাতে গ্রামের লোকে নিজেদের হিতসাধনে সচেষ্ট হয়ে ওঠে, রাস্তাঘাট সংস্কার করে,

* জমিদারি পরিচালনায়—পৃ ৭৫-৮২ ও কবি জমিদারের কৃতিত্ব—পৃ ১৭-৩৭।

জলকষ্ট দূর করে, শালিশের বিচারে বিবাদ নিষ্পত্তি করে, বিদ্যালয় স্থাপন করে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্মগোলা বসিয়ে—ইত্যাদি সর্বপ্রকারে গ্রাম্য সমাজের হিতে নিজেদের চেষ্টা নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয়, তারই ব্যবস্থা করা গিয়েছে। আমার প্রজাদের মধ্যে যারা মুসলমান তাদের মধ্যে বেশ কাজ অগ্রসর হচ্ছে—হিন্দু পল্লীতে বাধার অন্ত নেই।…
(বোলপুর। পত্রের তারিখ নাই) পল্লী-প্রকৃতি, পৃ ২২৮-২২৯।

অনুরূপ মর্মে কবির লিখিত প্রায় দশখানা মুদ্রিত পত্র দেখেছি। বাহুল্য-ভয়ে সেগুলির উদ্ধৃতি দিলাম না। পত্রগুলিতে মণ্ডলীপ্রথা সম্পর্কে তাঁর অসীম উৎসাহ, অবিচলিত সঙ্কল্প ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার জলন্ত উদাহরণ বিদ্যমান। মণ্ডলীপ্রথা বিষয়ে রবীন্দ্র-চিন্তার প্রামাণিক দলিলের অভাবে আমার ব্যক্তিগত স্মৃতির উপর নির্ভর করে লিখছি—

শিলাইদহে এই ব্যবস্থা চালু হয় সম্ভবত ১৩১৫ সালের গোড়ায়। তখন সবেমাত্র শিলাইদহের প্রবীন ম্যানেজার বামাচরণ বসু বিদায় নিয়েছেন আর বিপিনবিহারী বিশ্বাস, বি. এল. নিযুক্ত হয়েছেন। বিপিনবাবু রবীন্দ্রনাথের মনোনীত যোগ্যতম ম্যানেজার ; তাঁর কর্মদক্ষতা, উৎসাহ, উদ্যম ও পেশকার শরৎচন্দ্র সরকারের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কলাকৌশল রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনার প্রধান সহায় হয়েছিল। শিলাইদহের তখনকার আটটি ডিহি কাছারি ভেঙে (তখনও খোবড়াকোল জমিদারি কেনা হয় নি) শিলাইদহ সদর বাদে চারটি মণ্ডলী (বিভাগীয় কাছারি) গঠিত হল—

১. জানিপুর-বনগ্রাম—নায়েব, নলিনী চক্রবর্তী
২. কুমারখালি-পান্টি—নায়েব, ভূপেশচন্দ্র রায়
৩. কয়া-কালোয়া—নায়েব, রতিকান্ত দাস
৪. সদিরাজপুর-রাধাকান্তপুর (ঘোষপুর চরমহল)
—নায়েব, সতীশচন্দ্র ঘোষ

এদের কার্যপ্রণালীর আদর্শ রবীন্দ্রনাথের 'পল্লীসমাজ'-এর মত (দ্রঃ পল্লী-প্রকৃতি পৃ ২২২-২৬)। গ্রামসেবায় অভিজ্ঞ পূর্ববঙ্গের কয়েকজন নিষ্ঠাবান যুবককে কবি ঐ কার্যে সংগ্রহ করেন। আর্থিক ব্যবস্থাও 'পল্লীসমাজ'-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী। তার উপরেও প্রজাদের প্রদত্ত হাল-বকেয়া খাজনার উপরে টাকায় তিন পয়সা হিসাবে (১৫) আদায় হত। এর নাম শিলাইদহে 'কল্যাণবৃত্তি', কালীগ্রামে 'হিতৈষী-ফণ্ড'। এতে যে পরিমাণ

টাকা উঠত জমিদার সেই পরিমাণ টাকা দিতেন, প্রয়োজনবোধে অনেক সময়ে বেশিও দিতেন।

ম ণ্ড লী র গ ঠ ন : প্রতি মণ্ডলীতে মণ্ডলীর নায়েব বাদে চারজন—দুজন হিন্দু, দুজন মুসলমান সভ্য বা কর্মী নিযুক্ত হতেন ; কোন মণ্ডলীতে মুসলমান সভ্য থাকতেন একজন। প্রথমে সপ্তাহে দুবার, পরে একবার করে এঁরা মিলিত হয়ে কাজের ব্যবস্থা করতেন। এর ফলে সদর শিলাইদহ কাছারির গুরুত্ব কমে গেল, বিভাগীয় কাছারিগুলিতে অনেক সেরেস্তা গড়ে উঠল ; তার ফলে মুসলমান কর্মচারীর সংখ্যা বাড়ল। গতানুগতিক পল্লী-জমিদারির একটা সংগঠনী অভিনবত্ব আত্মপ্রকাশ করল। চাষি-প্রজারা উৎসাহিত হল। ঠাকুর এস্টেটের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। বাংলার কয়েকজন শিক্ষিত জমিদার এই আদর্শের অনুসরণে প্রবৃত্ত হলেন। প্রাচীন মামুলি-সর্বস্ব জমিদারি ব্যবস্থার বৈপ্লবিক সংস্কারে ছোট বড় প্রজাসাধারণ বেশ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। এ সময়ে চাষিদের ঋণদানের জন্য কৃষিব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হল কালীগ্রামে ও শিলাইদহ সদর কাছারিতে। তখন রবীন্দ্রনাথ সুদূর উড়িষ্যার কটকের ও পাবনা জেলার সাজাদপুর জমিদারির কাজ থেকে রেহাই পেয়েছেন, ফলে তাঁর সমস্ত চিন্তাভাবনা, উৎসাহ, উদ্যম, কর্ম-পরিচালনা শিলাইদহ ও কালীগ্রামে নিবদ্ধ। তিনি স্বয়ং ঐ দুই জমিদারিতে যাতায়াত করে সমস্ত সমস্যা তন্নতন্ন করে বিচার করেছেন, ব্যবস্থা করেছেন, আদেশ দিয়েছেন। কর্মচারীদের গুণানুসারে রদবদল করছেন, প্রয়োজনবোধে নূতন কর্মী নিয়োগ করেছেন।

দুই জমিদারিতে অনেক সংগঠনমূলক কাজ হল। শালিশি বিচার প্রবর্তনের ফলে প্রজাসাধারণের অভ্যাসগত অনেক মামলা-মোকদ্দমার আপোষ-নিষ্পত্তি হওয়ায় ঐ অঞ্চলের সবাই উপকৃত হল।* শিলাইদহ গ্রামের মধ্যে দুটি প্রধান রাস্তা, গোপীনাথ মন্দিরের সংস্কার, দাতব্য চিকিৎসালয়, কুষ্টিয়া-শিলাইদহ রাস্তা ইত্যাদি শিলাইদহের চেহারা বদলে দিল। জানিপুরে গোরাই নদীতীরে বিরাট গঞ্জ গড়ে উঠল, পাণ্টির সুতাহাটা গোহাটা ইত্যাদি জেঁকে উঠল, ব্যাপকভাবে তাঁত-বস্ত্র তৈরি হতে লাগল, শিলাইদহে দুবার বিরাট মেলা বসল, কয়েকটি ইস্কুল-মক্তব-মাদ্রাসা স্থাপিত হল গ্রাম ও চর-অঞ্চলে। কিন্তু এত উন্নতি, এত প্রত্যাশা সত্ত্বেও ক্রমে ক্রমে স্থানীয় অধিবাসীদের

* এই কাজে ঠাকুর এস্টেটের খ্যাতি দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল। দেওয়ানি ও ফৌজদারি-কোর্ট থেকে প্রতিমাসে ৬০।৭০টি মোকদ্দমা বিচারের জন্য আসত, আমি কাজে নিযুক্ত হয়ে তা দেখেছি।

সঙ্গে জমিদারির আমলাচক্রের মতান্তর উপস্থিত হল। প্রজাদের মধ্যে অর্ধ-শিক্ষিত ও অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা অধিক। তাঁরা এই আমলা-তন্ত্রের প্রাধান্যে খুশি হতে পারলেন না। আমলাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ জেগে উঠল (দ্রঃ জানকী রায়); ডাক্তারখানা নিয়েও বিরোধ সৃষ্টি হল। ফলে, শিলাইদহ জমিদারিতে মণ্ডলীপ্রথা টলটলায়মান। প্রবীন কর্মব্রতী ম্যানেজার বিপিন বিশ্বাস চাকরি ছেড়ে দিলেন। তখন কালীগ্রাম থেকে জানকীবাবু প্রথমে শিলাইদহের সেটলমেন্ট অফিসার ও পরে ম্যানেজার হলেন। মামাবাবু (রথীন্দ্রনাথের মাতুল) নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী তাঁর সহকারীরূপে কিছুদিন শিলাইদহে ছিলেন। জানকীবাবুর পরে ম্যানেজার হয়ে আসেন শান্তিনিকেতনের নিষ্ঠাবান কর্মী সন্তোষ মজুমদারের ভ্রাতা সুবোধ মজুমদার। তিনি দীর্ঘকাল থাকেন নি। তাঁর লতিকানাম্নী কন্যা কোন কর্মচারীর অসাবধানতায় বন্দুকের গুলিতে মারা যান। সেই দুর্ঘটনায় মর্মাহত সুবোধবাবু শিলাইদহ ছেড়ে জয়পুর স্টেটে (রাজপুতনা) ম্যানেজার হয়ে যান। তার পরে আসেন সত্যকুমার মজুমদার; এঁর পদ ছিল সেক্রেটারির। তাঁর পরে ঐ পদে আসেন অক্ষয়কুমার রায়, বাড়ি ঢাকা জেলার বজ্রযোগিনীতে। সুবোধবাবু ও অক্ষয়বাবু (অমৃতলাল রায়) শান্তিনিকেতনের শিক্ষক ছিলেন। সত্যকুমার বাবু কলকাতা হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানির সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। মাত্র পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে এতগুলি ম্যানেজার বদল ঘটেছিল, প্রথমে সুরেন্দ্রনাথ ও পরে প্রমথ চৌধুরী যখন ম্যানেজিং এজেন্ট কেবলমাত্র সেই সময়ে। কারণ, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তখন জমিদারির কাজে প্রাণমন ঢেলে দেওয়া সম্ভব ছিল না নানাকারণে।

এই রদবদল ছাড়া নূতন সুশিক্ষিত কর্মচারী নিয়োগ করেও জমিদারির ভগ্নরথ চালাবার চেষ্টা হল। শান্তিনিকেতনের কয়েকজন অধ্যাপকের সুশিক্ষিত আত্মীয়কে কর্মচারী মনোনীত করে পাঠান হল দুটি পরগণাতেই। এঁদের মধ্যে ছিলেন মুনীন্দ্র সর্বাধিকারী, যোগেশ সরস্বতী, হরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, হর্ষনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। এঁরা শিক্ষকতা কার্যে উপযুক্ত ও অভ্যস্ত। রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদের পূর্বেই শান্তিনিকেতন থেকে বদলি হয়ে শিলাইদহ গোপীনাথ বাটীর নায়েব ও স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক হয়ে এসে দেবমন্দিরের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করলেন। কিন্তু আমলাতন্ত্রের চক্রান্তে এঁরা সবাই শিলাইদহ ত্যাগ করলেন। মণ্ডলীপ্রথা প্রবর্তনের ফলে শান্তিনিকেতন

আর শিলাইদহ প্রভৃতি জমিদারি যেন পরস্পর-পরিপূরক হয়ে পড়ল।

জমিদার পক্ষের প্রজারঞ্জন-চেষ্টা ও গ্রাম-সংগঠনের কাজে ভদ্র প্রজারা বাধা-স্বরূপই ছিলেন, আমলাদের মধ্যে অনেকে এই বিরাট সংগঠনের মর্ম বুঝতে পারলেন না। শিলাইদহ কাছারি-প্রাঙ্গণ থেকে তাঁতের কারখানা উঠে গেল। শিলাইদহ ও কুষ্টিয়াতে পাট ও আখ মাড়াই কলের ব্যবসায়ে লোকসানের বোঝা স্বরূপ ত্রিশ হাজার টাকা আর্থিক সমস্যা-পীড়িত রবীন্দ্রনাথের ঘাড়ে চাপল। তবু তিনি নিষ্কাম যোগীর মত জমিদারি দেখছেন, শান্তিনিকেতনের দেহে রুধির সঞ্চার করছেন, অক্লান্তভাবে কাব্যসাহিত্য সৃষ্টি করে চলেছেন, দেশের কাজে সারাদেশে উল্কার মত ঘুরছেন। তাঁর অর্থভাগ্যে শনি। ওদিকে কালীগ্রামে এই কর্মব্রত পল্লী-কর্মী অতুল সেন প্রভৃতির প্রাণপণ পরিশ্রমে কতকটা সার্থকতার আভাস দিল। নানাকাজে আর্থিক দুর্গতি ভোগ করে রবীন্দ্রনাথ সমবায়প্রথার (পাতিসর সুতাহাটে) আশ্রয় নিলেন এবং তাও জনসাধারণের মানসিক অবনতির জন্য সফল হল না। ব্রিটিশ রাজত্বের আমলে প্রাইভেট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠায় অসম্ভবকে সম্ভব করলেন, কিন্তু সুপরিচালনার অভাবে ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য সফল হতে পারল না। আমানতকারীদের টাকার জন্য কড়া তাগিদ আসছে। তবু জীবনের রণক্ষেত্রে বিপন্ন রবীন্দ্রনাথ একাই যুদ্ধ চালাচ্ছেন। বহুযুগব্যাপী জীবন্মৃত অনগ্রসর দেশে তিনি যে বিরাট আলোড়ন এনে বিপন্ন হলেন, সে কাহিনী তাঁর জীবনচরিতে স্থান পায় নি।

জমিদারিতে মণ্ডলীপ্রথা প্রবর্তিত করে রবীন্দ্রনাথ যে যুগান্তকারী হিতৈষী বৃত্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, যোগ্য কর্মীর অভাবে তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল। প্রজাসাধারণ এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারলে এর ফলে গ্রাম বাংলার চেহারাই পালটে যেত। মণ্ডলীপ্রথার মধ্যে যে অচলায়তন ভাঙার প্রাণশক্তি ছিল তা প্রবাহিত হতে পারল না, এ বড় পরিতাপের কথা, লজ্জার কথা।

আমরা চাষ করি আনন্দে

সে সময়ে বিরাহিমপুর জমিদারিতে গতানুগতিক মামুলি প্রথায় স্থানীয় চাষিরা কৃষিকর্ম করত। আলুর চাষ তখন সেখানে প্রচলিত ছিল না; সবার ধারণা ছিল, এ জিনিসটা বিদেশী ফসল। কবিজমিদারের কাছে চাষিরা কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে অনেক উপদেশ শুনত। শিলাইদহের উত্তরেই বিশাল পদ্মার চর, মাটি বালিপ্রধান। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে নৈনিতাল আলুর চাষ করতে উদ্যোগী হলেন। চাষিরা একাজে সাহসী না হওয়ায় কবি নিজেই চাষের ব্যবস্থা করলেন কুঠিবাড়ির পার্শ্বস্থ জমিতে। বিলাতে কৃষিবিদ্যায় শিক্ষিত কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তখন কুষ্টিয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট; তখন তিনি কবির অন্তরঙ্গ বন্ধু, প্রায়ই শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের আতিথ্য গ্রহণ করতেন। দ্বিজেন্দ্রলালকে শিলাইদহে এনে কবি শিলাইদহে আলুর চাষ সম্বন্ধে যাবতীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সংগ্রহ করে তাঁর উপদেশানুযায়ী উৎকৃষ্ট নৈনিতাল আলুর বীজ আনালেন কয়েক হাজার টাকা খরচ করে এবং মাটি পরীক্ষা করিয়ে প্রয়োজনীয় সার দিয়ে কুঠিবাড়ির জমিতে চাষ দিলেন। কিন্তু প্রচুর অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয়েও আলুর চাষে কোন লাভ হল না। অথচ তাঁর দেখাদেখি দু-একজন চাষি তাঁর সেই আলুর চাষে নতুন জ্ঞান লাভ করে তাদের জমিতে প্রচুর নৈনিতাল আলু উৎপন্ন করল। অকৃতকার্য ক্ষতিগ্রস্ত রবীন্দ্রনাথ তবু স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে সরকারি কৃষিবিভাগ থেকে আলুর বীজ কিনে এনে প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। সেই সঙ্গে ভুট্টা, কপি, পাটনাই মটর, আখ ইত্যাদি চাষে প্রজারা উৎসাহিত হয়েছিল। মনে রাখা দরকার, সেসময়ে পুত্র রথীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে কৃষিবিদ্যা শিখে এসে জমিদারিতে কৃষি-সম্বন্ধীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে শুরু করেন। সময়টা ১৩০৬ সাল, কবির বয়স ৪৫ বৎসর।

রবীন্দ্রনাথের ঐ আলুর চাষ সম্বন্ধে ল্যাণ্ড রেকর্ডস অব এগ্রিকালচার আপিসের ১৮৯৯ সালের বাৎরিক রিপোর্টে যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তার অবিকল নকল— 'Experiment with Nainital Potatoes were made by Mr. Rabindrnath Tagore in the Tagore Estate at Shelidah in the Kusthia Sub-division. The crop was not satisfactory owing to the defective cultivation. One of Mr. Tagore's continents, however, working under more favour-

able circunstances obtained a bumper crop from a portion of the same seed, and success of the experiment is said to have induced several neighbourig Rayots to take the potato cultivation. Their experiments together with others introduced by Mr. Tagore on his farm will be continued."

সেই সময়ে শিলাইদহ অঞ্চলে 'ধলি', 'কাজ্‌লা' 'নাটা' নামক তিন রকম আখের চাষ প্রচলিত ছিল; সেই আখের গুড় তৈরি হত আখমাড়াই কলের সাহায্যে লব্ধ আখের রস থেকে। রবীন্দ্রনাথ আখমাড়াই কলও জমিদারিতে ব্যাপকভাবে প্রচলন করেন (দ্রঃ যজ্ঞেশ্বরের সিদ্ধিলাভ, পৃ ২৬৩)। সে সময়ে ঢাকা অঞ্চলে 'গাণ্ডারি' নামে এক শ্রেণীর আখের চাষ হত; তার রসে গুড়ের পরিমাণ বেশি পাওয়া যেত। রবীন্দ্রনাথ ঢাকা অঞ্চল থেকে 'গাণ্ডারি' আখ এনে শিলাইদহে প্রচলন করেন, এবং শুনেছি, বোলপুর অঞ্চলেও ঐ আখের চাষ প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন।

উক্ত বিবরণের আরও প্রমাণ পাওয়া যায় 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' প্রবন্ধে, পৃ ৩৯-৪০— 'শিলাইদহে কুঠিবাড়ির চারদিকে যে জমি ছিল, প্রজাদের মধ্যে নূতন ফসল প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে নানা পরীক্ষায় লেগেছিলাম। এই পরীক্ষাব্যাপারে সরকারি কৃষিবিভাগের বিশেষজ্ঞদের সহায়তা অত্যধিক পরিমাণেই মিলেছিল। তাঁদের আদিষ্ট উপাদানের তালিকা দেখে চিৎসুটরে যারা এগ্রিকালচারাল্ কলেজে পাশ করে নি, এমন-সব চাষিরা হেসেছিল; তাদেরই হাসিটা টিকেছিল শেষ পর্যন্ত। মরার লক্ষণ আসন্ন হলেও শ্রদ্ধাবান রোগীরা যেমন করে চিকিৎসকের সমস্ত উপদেশ অক্ষুণ্ণ রেখে পালন করে, পঞ্চাশ বিঘে জমিতে আলু চাষের পরীক্ষায় সরকারি কৃষি-তত্ত্বপ্রবীণদের নির্দেশ সেইরকম একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছি। তাঁরাও···পরিদর্শন কার্যে সর্বদাই যাতায়াত করেছেন। তারই বহু ব্যয়সাধ্য ব্যর্থতার প্রহসন নিয়ে বন্ধুবর জগদীশচন্দ্র আজও প্রায় মাঝে মাঝে হেসে থাকেন।' 'আমার চাষবাসের কাজও মন্দ চলিতেছে না। আমেরিকান ভুট্টার বীজ আনাইয়াছিলাম, তাহার গাছগুলো দ্রুতবেগে বাড়িয়া উঠিতেছে। মান্দ্রাজি সরু ধান রোপন করাইয়াছি তাহাতেও কোন অংশে নিরাশ হইবার কারণ দেখিতেছি না। দ্বিজেন্দ্রলাল বাবু সোমবারে সস্ত্রীক আমার শস্যক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করিতে আসিবেন।'—চিঠিপত্র, ষষ্ঠখণ্ড, পৃ ৬

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে লরেন্স সাহেবের অধ্যবসায়ে গুটিপোকার চাষ ব্যাপারেও কবির প্রচুর অর্থব্যয় নিষ্ফল হয়েছিল।

শিলাইদহের নিকট কুমারখালিতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলের রেশম ব্যবসায়ের একটি কেন্দ্র ছিল। বিদেশী বাজারে সেখানকার রেশমের বেশ চাহিদা ছিল। মহর্ষিদেব পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য জমিদারি-মধ্যস্থ কুমারখালির ঐ রেশমকুঠি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। এদেশের একটি প্রধান শিল্পের ঐ অপমৃত্যু রবীন্দ্রনাথের মনকে পীড়া দিত। ঐ সময়ে তাঁর বন্ধু রাজসাহীর উকিল প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রাজসাহীতে নানারকম গৃহশিল্পের আয়োজনে উৎসাহী ছিলেন। তিনি গোটাকতক রেশমের গুটি বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে উপহার দিয়েছিলেন তাঁর এ বিষয়ে উৎসাহ বর্ধনের উদ্দেশ্যে। সেই রেশম গুটিপোকার চাষের ভার নিয়েছিলেন কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক লরেন্স সাহেব (দ্রঃ লরেন্স সাহেব, পৃ ২৪১)। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'প্রচুর ব্যয় ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের পর মাল জমল বিস্তর, বিশেষজ্ঞেরা বললেন অতি উৎকৃষ্ট, এজাতের রেশমের এমন সাদা রঙ হয় না। প্রত্যক্ষ দেখতে পাওয়া গেল সফলতার রূপ—কেবল একটুখানি ত্রুটি রয়ে গেল। লরেন্স বাজার যাচাই করে জানলে, তখনকার দিনে এ মালের কাট্‌তি অল্প, তার দাম সামান্য।...তারপরে তাদের কী ঘট্‌ল তার কোন হিসেব আজ কোথাও নেই।"—আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, পৃ ৪১-৪৩

বিজ্ঞানী বন্ধু জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে নিবিড় ঘনিষ্ঠতার ফলে কাব্য কবিতা, ছোটগল্প, সংগীত প্রভৃতি নানা আলোচনার সঙ্গে এদেশের কৃষিকার্য সম্বন্ধেও কবিজমিদারের আলোচনা হত। তিনি মনে করতেন, জমিদারের সর্বপ্রধান ও প্রথম কর্তব্য জমিদারির মধ্যে চাষের উন্নতি ও চাষিজীবনের উন্নতি। সেই উদ্দেশ্যে নিজের পুত্র রথীন্দ্রনাথকে কৃষিবিদ্যায় আমেরিকা থেকে শিক্ষিত করে এনেছিলেন; কিন্তু, তাঁর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ নিজে কৃষিবিজ্ঞানী না হলেও কৃষির উন্নতি ও কৃষির পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এত উৎসাহী ও আগ্রহশীল ছিলেন যে পরবর্তীকালে তিনি ক্যানিংএ ডেনিয়াল হ্যামিলটন সাহেবের কৃষিক্ষেত্র ও গবেষণাগার নিজে গিয়ে দেখে আসেন ও হ্যামিলটন সাহেবকে শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। এল্‌মহার্স্ট সাহেব এবং কৃষিবিজ্ঞানী সন্তোষবিহারী বসুর সঙ্গে

তিনি বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করতেন। পুত্র ও জামাতাকে আমেরিকা থেকে এ বিষয়ে শিক্ষিত করে জমিদারিতে হাতে-কলমে কাজ করবার ব্যবস্থা করে দেন ও শিলাইদহ কুঠিবাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিমে ৬০ বিঘা জমি খাস করে নিয়ে চাষ-আবাদে প্রজাদের বৈজ্ঞানিক মতে শিক্ষিত করতে বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। পুত্র রথীন্দ্রনাথ মাছের সার-তৈরি পরীক্ষার জন্য কুঠিবাড়িতে চার গাড়ি ইলিশ মাছ কিনে এনে সার তৈরির আয়োজন করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর উৎসাহ-উদ্যম ও অজস্র অর্থব্যয় নানা প্রতিকূল অবস্থায় সার্থক হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের আমলের কয়েকজন বৃদ্ধ চাষি আমার খুব পরিচিত ছিলেন। আমি তাঁদের কাছে বাবুমশাইএর নানা গল্প শুনতাম ও প্রতি বৎসর গ্লোব নার্সারি থেকে কপি ইত্যাদির নানা রকম বীজ আনিয়ে দিতাম। তাঁরা আলু-চাষে সুদক্ষ ও দেশীপ্রথায় চাষে বহুদর্শী ও অভিজ্ঞ ছিলেন।

মহর্ষি দাতব্য চিকিৎসালয়

শিলাইদহের মহর্ষি দাতব্য চিকিৎসালয়ের কথা আমি পূর্বে প্রসঙ্গক্রমে লিখেছি। এই প্রতিষ্ঠানটি রবীন্দ্রনাথের একটি মহৎ ও অবিনশ্বর কীর্তি। আমাদের সময়ে কুষ্টিয়া মহকুমার মধ্যে এইটিই ছিল সবশ্রেষ্ঠ বৃহৎ বেসরকারি ডাক্তারখানা। এর পাকা বাড়ি ও ডাক্তারের কোয়ার্টার আজও আছে। শিলাইদহ কাছারিতে মহর্ষিদেবের আমলে ছিল একটা কবিরাজী ঔষধালয়, কবিরাজ ছিলেন খোসালচন্দ্র মজুমদার। খোসাল কবিরাজ মহাশয়ের বংশধর জনৈক কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে বছর দশেক আগে কলকাতা হ্যারিসন রোডে আমার আলাপ হয়। কবিরাজ খোসালচন্দ্রের বিষয় আমি এই গ্রন্থে একটি কাহিনীতে বলেছি।

খোসাল কবিরাজের পর হোমিওপ্যাথিক চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি প্রতিষ্ঠিত হয় একটি প্রকাণ্ড করোগেট টিনের বাড়িতে। তারপরে বর্তমান দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয় মহর্ষিদেবের পুণ্যনামে বেশ বড় একখানা পাকা 'L' আকৃতির ভবনে। ১৩২৪ সালের ১৭শে কার্তিক তারিখে প্রমথ

চৌধুরীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র (চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ড, ৬২নং পত্র) অনুসারে মনে হয় ঐ সালেই ঐ প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছিল। এই ডাক্তারখানা তৈরির খরচ বাবদ প্রজাদের কাছে চাঁদা তোলা হয়েছিল। যে প্রজা এককালীন ২৫ টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন তাঁর জমিজমার ড্যামেজ মাপের আদেশ বলবৎ করা হয় তাঁর পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে। এই টাকা বাদেও নাকি ঠাকুরবাবুদের দশ হাজার টাকা ঐ কাজে খরচ হয়েছিল। এই ডাক্তারখানা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্ত তারিখের অনবদ্য পত্রখানি উদ্ধৃতির লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না; ঐ পত্রখানি রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটি মহৎ প্রতিচ্ছবি—

কল্যাণীয়েষু,

তুমি দিন দশ পনেরো পরে যদি কলকাতায় যাও, তাহলে সেই সময়ে একবার রাজধানীতে হাজির হব। তখন একবার বিষয়কর্মের কথাটা চুকিয়ে দিয়ে আসব। ওর আলোচনাটা আমার একেবারেই মনঃপূত নয় বলেই ওটা আমার মনের মধ্যে এমন তোলপাড় করছে—ওটাকে সম্পূর্ণ নিকেশ করে দিয়ে স্বভাবে প্রত্যাবর্তন করতে চাই।

ডাক্তারের কথা লিখেছ, ওটা আলোচ্য বটে। কিন্তু যেহেতু ঐ একটা বড় খরচ যা আমরা নিজের স্বার্থে করি নে—প্রজাদের জন্য করি, এই কারণে ওটাতে হাত দিতে কিছুতে ইচ্ছা করে না। এই ডাক্তার ও ডাক্তারখানায় আমাদের জমিদারির এবং তার চতুষ্পার্শ্বের লোকের বিশেষ উপকার হয়েচে—এই কথা যখন শুনতে পাই তখন সকল অভাবের দুঃখের উপর ঐ সুখটাই বড় হয়ে ওঠে। বিরাহিমপুরে প্রজাহিতের এই একটিমাত্র কার্যে সফল হয়েছি। লজ্জা এই যে হাসপাতালের চাঁদা আদায় করে আজ পর্যন্ত তার একটি ইটও ভিতের উপর চড়ে নি। আমাদের যা কিছু দেনা রয়েচে, তা যদি আমাদের জমিদারির এই রকম কাজের জন্য হত, আমি এক মুহূর্তের জন্য শোক করতুম না—কেননা এই ঋণ অন্যদিকে এমনভাবে সেন্ট পার্সেন্ট সুদের উপরে শোধ হত যে হ্যাণ্ডনোট লিখে আনন্দ করতুম। আমার ত সব চেয়ে দুঃখ হয় এই জন্যে যে, প্রজাদের জন্যে লোকসান করবার পূর্ণ অধিকার আমার হাতে নেই, তা হলে আমি শান্তিনিকেতন ছেড়ে ওদের মধ্যে গিয়ে বসতুম—মনের সাধে বিষয় নষ্ট করতে করতে সুখে মরতুম। তাই অর্থ নষ্ট করবার যে সুবিধাটুকু এই জায়গায় তৈরি করতে পেরেচি, তাই নিয়ে অন্তিমকাল পর্যন্ত কেটে যাবে,—তার পরে যারা বিষয় ভোগ করচে তারা তার দায়ও ভোগ করবে,

তাতে এই বিশ্বজগতের কি আসে যায়, আর আমারি বা কি মাথাব্যথা। ইতি, ১৯ কার্ত্তিক, ১৩২৪

অর্থাভাবে ভাল ডাক্তার না পাওয়ায় প্রথমে শিলাইদহবাসী ডাক্তার সতীশচন্দ্র দত্তকে নিযুক্ত করা হয়, তিনি যতদিন সম্ভব আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে কাজ করেন এবং শেষে মালদহ জেলার চাঁচোল রাজ এস্টেটের প্রধান ডাক্তার পদে উপযুক্ত বেতনে চলে যান। তারপরে রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর আত্মীয় ললিতমোহন গাঙ্গুলী ডাক্তার হয়ে এসে চিকিৎসা-কার্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে পড়েন। শিলাইদহের আমলাচক্রের ষড়যন্ত্রে তাঁর অপসারণ হয়, তিনি কুষ্টিয়ায় গিয়ে প্র্যাকটিস্ শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ আমলাচক্রের অন্যায় হস্তক্ষেপের পথ রুদ্ধ করবার জন্য তখনকার এল. এম. এফ. পাশ ডাক্তার অঘোরলাল মজুমদারকে উপযুক্ত বেতনে ডাক্তার নিযুক্ত করেন। শুধু উপযুক্ত বেতন নয়, ডাক্তার অঘোরবাবু ভালো কোয়ার্টার পেলেন, স্বাধীন চিকিৎসার সুযোগ পেলেন এবং স্বাধীন চিকিৎসার সহায়ক হিসাবে বিনাব্যয়ে এস্টেটের একটি ঘোড়া ও সহিস পেলেন। দুজন পাশকরা কম্পাউণ্ডার (প্রথম—নিবারণচন্দ্র মজুমদার) নিযুক্ত হলেন। চিকিৎসাভবনের একটা অংশ indoor হাসপাতালে রূপান্তরিত করবার প্রবল ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথের ছিল, কিন্তু outdoor চিকিৎসার ব্যয়বাহুল্য হেতু সেটা সম্ভবপর হল না। তবু আমরা দেখেছি, পদ্মানদীর কোলে কুমিরে-ধরা একজন চাষির জীবনরক্ষার জন্য দুইমাসের জন্য হাসপাতালে indoor চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় এবং রোগী আরোগ্যলাভ করে। ডাক্তার অঘোরবাবু কোর্ট অব ওয়ার্ডসের আমলে ওখানকার চাকরি ছেড়ে নেপাল গভর্ণমেণ্টে চাকরি নিয়ে চলে যান।

এইখানে একটা তথ্য জানাচ্ছি,—ঐ সময়ে কুষ্টিয়া সহরে সরকারি মহকুমা হাসপাতাল ঠাকুর এস্টেট থেকে মাসিক ১২ টাকা সাহায্য পেত। কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ আসবামাত্র 'দানধ্যান' খতম হয়ে যায়, তবে মহর্ষি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনার ভার স্থানীয় ইউনিয়নবোর্ডের হাতে চলে যায়।

জমিদারিতে রবীন্দ্রনাথ : প্রত্যক্ষদর্শীদের চোখে

জমিদার রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে অনেক তথ্য এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এখানে বাংলার কয়েকজন বিশিষ্ট মনীষীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা উদ্‌ধৃত হল।

—প্রকাশক

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

…এখানে একটা সামান্য ঘটনার কথা বলি। জমিদারির একটা অংশ ছিল শিলাইদার কাছে কুষ্টিয়ার পাশে। পাঁচ ছয় বছর আগে আমরা একদিন কুষ্টিয়া স্টেশনে নেমে নৌকা করে হিজ্‌লাবট গ্রামে* যাচ্ছি। মাঝির বেশ বয়স হয়েছে। বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করায় বললে যে ঠাকুরবাবুদের জমিদারিতে। কৌতূহল হল, জিজ্ঞাসা করলুম রবীন্দ্রনাথকে কখনো দেখেছে কিনা। যেই কবির নাম করা, মাঝির মুখ উজ্জল হয়ে উঠল, বল্‌লে, 'হ্যাঁ দেখেছি বই কি। কতবার আমাদের গ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে দেখেছি! আহা! কী চেহারা! মানুষ তো নয়, দেবতা! সে রকম আর কখনো দেখব না। আর কী দয়া! যখনি ইচ্ছা, সরাসরি তাঁর কাছে চলে যেতুম, কেউ আমাদের ঠেকাতে পারত না। তাঁর হুকুম ছিল, সকলেই কাছে যেতে পারবে। আমাদের দুঃখের কথা যখনি যা বলেছি তখনি ব্যবস্থা করেছেন।'

এই সময় কবির একবার হিজ্‌লাবটে বেড়াতে যাওয়ার কথা হয়েছিল। এই খবর শুনে মাঝি বললে—'আহা আর একটিবার যদি তাঁকে দেখ্‌তে পেতুম্! কবে তিনি আসবেন? আমাদের যেন নিশ্চয় খবর দেওয়া হয়। আমরা সকলে এসে তাঁকে দেখে যাবো।' আশ্চর্য ব্যাপার! এই বুড়ো মুসলমান মাঝি চল্লিশ বছর আগে তাঁকে দেখেছিল, কখনো ভুলতে পারে নি। ওঁর কথা শুনে তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বারবার বললে,—'অমন মানুষ আর হয় না।'

* রবীন্দ্রনাথের জমিদারির পাশে গোরাই নদীর তীরে এই গ্রামে অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্রের পৈতৃক নিবাস। প্রশান্তচন্দ্রের স্ত্রী রানী মহলানবিশ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মশায়ের কন্যা। ঐ গ্রামে সপরিবারে প্রশান্তবাবু যাচ্ছিলেন।

কবিকে পরে এই মাঝির গল্প করায় খুব খুশি হলেন। বললেন—'ওরা সত্যিই আমাকে ভালোবাসতো। কম বয়সে যখন প্রথম জমিদারির কাজের ভার নিলুম, তখনকার একজন খুব বুড়ো মুসলমান প্রজার কথা মনে আছে; এক বছর ভাল ফসল হয় নি। প্রজারা খাজনা রেহাই পাওয়ার জন্যে এসেছে। আমি বুঝলুম, সত্যিই দুরবস্থা। যতটা সম্ভব খাজনা মাপ করতে বলে দিলুম। প্রজারা খুশি হল। কিন্তু এই বুড়ো মুসলমান প্রজা আমাকে এসে বললে— "এতো টাকা মাপ করেছ, কর্তামশায় তো তোমাকে বকবে না? তুমি ছেলেমানুষ। ভেবে দেখো, বুঝে সুঝে কাজ করো।" সে আমাকে এত ভালবাসতো যে আমার জন্য তার ভয় হল, পাছে আমার দাদারা আমাকে তিরস্কার করেন।'

—কবি কথা, কার্তিক-পৌষ, ২৩৫০ পৃঃ ১৫৪-১৫৫
বিশ্বভারতী পত্রিকা

মোহিতলাল মজুমদার

যাহারা রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বোলপুরে রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের অপর তীর্থভূমি এবং হয়ত আদি ও শ্রেষ্ঠ তীর্থ, শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথকে দেখিবার সৌভাগ্য আধুনিকদের কাহারো ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ।

…কুষ্টিয়ার নীচে যে গরাই নদী আছে, সেই নদী হইতে পদ্মা পর্যন্ত এক বিশাল চর, ইহার এক প্রান্তে কুষ্টিয়া এবং অপর প্রান্তে, পদ্মার ওপারে পাবনা বাজিতপুর এবং তাহার প্রায় মধ্যস্থলে শিলাইদহ গ্রাম; এই গ্রামেরও এক প্রান্তে পদ্মাগর্ভ হইতে প্রায় ৪/৫ মাইল দূরে, এবং প্লাবন-সীমার ঠিক মুখে উচ্চতর তটভূমির উপরে রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি এবং জমিদারী কাছারী প্রভৃতি তখনও দণ্ডায়মান।…

তখন ইংরাজী ১৯১৫/১৬ সালের শীতকাল। একদিন আমি আমার সেই চরের ক্যাম্প কুটীরে* বসিয়া সংবাদ পাইলাম—রবীন্দ্রনাথ আসিয়াছেন, শিলাইদহ হইতে কিছু দূরে পদ্মার চরে বোট বাঁধিয়াছেন। আমার বেশ

*. প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্য-সমালোচক মোহিতলাল প্রথম বয়সে সেটলমেণ্ট বিভাগের কাননগো ছিলেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ইনি শিলাইদহ কুঠিবাড়ি ও চর অঞ্চলে প্রায় তিনমাস ছিলেন।

একটু ভয় ও ভাবনা হইল,—আবিষ্টের মত কবি সন্নিধানে প্রবেশ করিলাম। …আমরা টেবিলের অপর প্রান্তে কবির ঠিক সামনা-সামনি বসিয়াছিলাম। ঘরের আর পাশে কয়েকখানি বেঞ্চির উপরে বিচিত্র দ্রব্যসম্ভার, যেন স্থান-সংকুলানের অভাবে এলোমেলোভাবে পড়িয়া আছে। সেইদিকে চাহিতেই কবি বলিতে লাগিলেন—'আমি কিছু দিন যাবৎ একটা বিষয়ে বড় উদ্বিগ্ন বোধ করিতেছি। বাংলার নিজস্ব "আর্ট-আইডিয়া" ক্রমেই বিদেশীয় প্রভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, আর কিছু দিন পরে আমাদের খাঁটি দেশীয় শিল্পের নিদর্শনগুলি লোপ পাইবে। তাই আমি এই সকল নমুনা সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি।'

চাহিয়া দেখিলাম, এক জায়গায় কয়েকটি মাটির ঘরের মডেল—তাহাদের খড়ের চালের বিবিধ স্টাইল—লক্ষণীয়; বুঝিলাম কবি ওই ঘর ছাওয়ার মধ্যেই যে শিল্পচাতুর্য আছে তাহাই বাঙালীর নিজস্ব বলিয়া গৌরব বোধ করেন। পাশেই কতকগুলি কাঁথা রহিয়াছে, তাহাদের সেই সূচীকর্ম সত্যই মহার্ঘ বলিয়া মনে হয়। স্মরণ হইতেছে, কতকগুলি 'শিকা'ও বোধ হয় ছিল, রজ্জু শিল্পের নিদর্শন বলিয়া তাহাও সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিল,—মোটা ব্রাউন পেপারের একটি তবক, সেগুলিতে আল্পনার নানা নক্সা অতি সরল স্থূল রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। এগুলির প্রতি কবির মমতা যেন কিছু অধিক; ইহাই বাংলার প্রকৃতিরূপা গৃহ-লক্ষ্মীদের স্বহস্তরচিত কারুসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।… আল্পনা-শিল্পকে ধরিয়া রাখিবার এই কৌশলটিও অভিনব বলিয়া মনে হইল। কবির প্রাণের ঐকান্তিক আগ্রহ যেন তাহাতে ব্যক্ত হইয়াছে।… এক জায়গায় একটি বড় শিশিতে কি যেন রহিয়াছে দেখিলাম; কৌতূহল হইল, ইহাও নিশ্চয় কোন এক শিল্পের নমুনা হইবে। তাহাই বটে, কিন্তু ইহা আর এক বস্তু—কারু অপেক্ষা করকৌশলই অধিক। প্রথমে বুঝিতে পারি নাই; যেন কতকগুলি সমান লম্বা সূত্রাকার পদার্থ—সূতাগুলি কিন্তু মোটা, কিন্তু একেবারে নিখুঁত-ভাবে সমান, কোথাও সরু-মোটা নাই। যখন শুনিলাম, এগুলি এক জাতীয় বড় সুপারী কাটিয়া তৈয়ারী করা হইয়াছে, তখন বিস্মিত হইতে হইল। শিশির গায়ে একটি লেবেলের উপর শিল্পীর নাম লেখা রহিয়াছে—'কুমারী হামিদা খাতুন'। কবি বলিলেন, ইনি পাবনারই এক জমিদার কন্যা,—তাঁহার ভক্ত শিষ্যা।…

ইহার পর চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম্য সমাজের দ্রুত অধঃপতন ও বিনাশের কথা আপনিই আসিয়া পড়িল ;—একটা হইতে আর একটা,—কথার কি শেষ আছে ! আমরা মাঝে মাঝে দুই একটি প্রশ্ন করিতেছি মাত্র, ইহার বেশি আবশ্যক হয় নাই। প্রথমেই পদ্মার চর ও নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী হিন্দুদিগের দ্রুত বংশলোপ কেন হইতেছে, তাহাই বলিতে লাগিলেন। এ অঞ্চলে পঁচিশ বৎসর পূর্বেও হিন্দুর সংখ্যা যাহা ছিল, আজ তাহা কি হইয়া দাঁড়াইয়াছে ! একটা বড় কারণ—ইহারা কন্যার অভাবে অধিক বয়সে বিবাহ করে এবং পত্নীর জননী-বয়স হইবার পূর্বেই বা অল্পকাল পরে মরিয়া যায়। ইহার একমাত্র প্রতিকার বিধবাদের আবার বিবাহ দেওয়া। তিনি তাহার যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। ··

কবি বড় দুঃখে এই সকল গল্প করিতে লাগিলেন—এ জাতির সম্বন্ধে স্পষ্ট হতাশা তাঁহার কথায় ও কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পাইতেছিল। ·· পদ্মাবক্ষে সেই বোটের মধ্যে বসিয়া রবীন্দ্রনাথের সেই সকল কথা শুনিতে শুনিতে মন যেন কেমন হইয়া গেল ; অনুভব করিলাম, চতুর্দিকে এই যে আসল বাংলাদেশ, তাহারই এক কেন্দ্রস্থলে বসিয়া সারা বাংলার হৃদ্‌পিণ্ড, বাঙালীর গভীরতম প্রাণ ও মন যাঁহার মধ্যে স্পন্দিত হইতেছে, সেই বাঙালী-শ্রেষ্ঠ কবি ও মনীষীর কণ্ঠে এই মুমূর্ষু জাতির আসন্ন মৃত্যু শোকগাথা শুনিতেছি। এ ভূমির এত শোভা, কিন্তু ভিতরে কি দারুণ ব্যাধি। ··· (আশ্বিন, ১৩৫২)

—পদ্মাবক্ষে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ পৃ ১৬৯—১৭৯
মোহিতলাল মজুমদার প্রণীত "কবিপ্রদক্ষিণ" গ্রন্থ।

মৈত্রেয়ী দেবী

···সকাল সাড়ে ন টা দশটায় খাওয়া হয়ে গেলে বসবার ঘরে এসে বসতেন একটা চৌকিতে, হাতে থাকত একটা বই বা কোনো মাসিকপত্র—রেডিওতে বাজত সুশ্রাব্য-অশ্রাব্য মেশান প্রোগ্রাম, কিছু শুনতেন, কিছু শুনতেন না।

'ইয়োরোপের সঙ্গীত শুনছিলুম গো আর্যে, কী আশ্চর্য এই যন্ত্রটা। কোন্ সুদূর থেকে কত রাজ্য পার হয়ে ভেসে আসছে এই সুরধ্বনি। ··· যেখানে এই গান গাওয়া হচ্ছে সেখানেও তো নানারকম ব্যাপার চলেছে, নানারকম ঘটনাপ্রবাহ। কত লোক আসছে যাচ্ছে—যে গান গাইছে তারও একটা

অস্তিত্ব আছে, কিন্তু সে সমস্তকে বাদ দিয়ে একটি সকল সম্পর্ক-রহিত নিরাসক্ত সুরের ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে। মনে পড়ে যখন বোটে বসে লিখতুম, চারিদিকে জল বয়ে চলেছে মৃদু কলধ্বনিতে, দূরে দেখা যায় বালির চর ধু-ধু করছে, আমি লিখেই চলেছি—লিখেই চলেছি "মানসী" (মানসসুন্দরী)। যখন শুরু করেছিলুম, তখন ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর, তারপর ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এলো আলো, আকাশ রঙীন করে অস্ত গেল সূর্য। একটি মাত্র চাকর বোটে থাকত আমার নীরব সঙ্গী, সে কখন নীরবে মিটমিটে প্রদীপ রেখে চলে গেল। আমি লিখেই চলেছি—মানসী। আজ কোনো কাজ নয়, সব ফেলে দিয়ে ছন্দে বন্ধ-গ্রন্থগীত এসো তুমি প্রিয়ে! কোথায় গেল সেই দিন। সেই পদ্মার চর ধু-ধু করে সোনালী বালি, সেই মিটমিটে শিখার ম্লান আলো, সব চিহ্ন ধুয়ে মুছে গেছে, শুধু আছে মানসী। তার যে পরিবেশ ছিল সে তো লুপ্ত হয়ে গেল—এমন কি তার থেকে সম্পূর্ণ বাদ পড়ে গেছে তার কবিও। চারিদিকের সমস্ত সূত্র তার ছিন্ন, সে শুধু একখানি সূত্রছিন্ন বাণী। তোমার এই রেডিওর গান শুনছি আর এই সব ভাবছি।

—মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, মৈত্রেয়ী দেবী, পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮

অন্নদাশঙ্কর রায়

সম্প্রতি আমি টলস্টয়ের জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবন মিলিয়ে দেখতে গিয়ে অনেক জায়গায় আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করলুম। যে মিলটি আমাকে বিশেষ ভাবে দোলা দিল, সেটি তাঁদের প্রয়াণের পরেই প্রাবন।··· অথচ টলস্টয়ের মতো রবীন্দ্রনাথও সারা জীবন সাধনা করেছিলেন যাতে এরকমটি পরে না হয়, করেছিলেন তাঁর নিজের সীমাটুকুর মধ্যে। শান্তিনিকেতনের কথা, রবীন্দ্র-সাহিত্যের কথা সকলেই জানেন। আমি আজ বলব জমিদারির কথা।

ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেবার আগে আমি যখন লণ্ডনে প্রোবেশনার, আমার এক বাঙালী বন্ধু আমাকে বললেন, 'ওহে তুমি তো দেশে ফিরে গিয়ে শাসক হবে। একটু খোঁজ নিও তো। রবীন্দ্রনাথ কি সত্যি একজন প্রজাপীড়ক জমিদার?' আমি তো অবাক! জানতে চাই কোথায় তিনি শুনলেন ও কথা। তিনি একটু মুচকি হেসে বললেন—'কাব্য পড়ে যেমন ভাবো কবি তেমন নয় গো।' মনে আঘাত লাগল। বন্ধু সান্ত্বনা দিলেন এই বলে যে, 'ভাখ, জমিদার মাত্রেই প্রজাপীড়ক। নইলে জমিদারি রাখা যায় না।'···

জমিদারের জন্য বিখ্যাত উত্তরবঙ্গ। বহু জমিদারের সঙ্গে আলাপ হল। ঘুরে ঘুরে দেখলুম তাঁদের জমিদারি। খেয়াল ছিল না যে রবীন্দ্রনাথের জমিদারিও আমার মহকুমায়। একদিন পতিসর থেকে আমন্ত্রণ করতে এলেন ঠাকুর-এস্টেটের এক প্রতিনিধি।... পতিসর পৌছিয়ে মনটা খুশিতে ভরে যায়। রবীন্দ্রনাথের পতিসর—তীর্থ-বিশেষ। পরবর্তীকালে রাজসাহী জেলার কালেক্টর রূপেও আরো কয়েকবার সেখানে যেতে হয়েছে; ... জমিদারি দেখার কাজ রবীন্দ্রনাথ অনেক কাল ছেড়ে দিয়েছিলেন, যখন থেকে তিনি আশ্রমবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে শান্তিনিকেতনে বাস করতে সুরু করেন। মাঝে মাঝে মহালে আসতেন। তাও বহুদিন থেকে বন্ধ। যাঁকে টানছে চীন থেকে পেরু, তাঁকে টানবে পতিসর শিলাইদা! ইতিমধ্যে এক সময় তাঁদের জমিদারি ভাগ হয়ে যায়। কবির ভাগে পড়ে পতিসর ও তার নিকটবর্তী-অঞ্চল। শিলাইদা তাঁর দাদা সত্যেন্দ্রনাথের ভাগে। আমি যখন কুষ্টিয়ার মহকুমাশাসক হয়ে শিলাইদা দেখতে যাই, তার আগে দেনার দায়ে সেখানকার জমিদারি বিকিয়ে গেছে। মালিক তখন ভাগ্যকুলের রায়রা।

পতিসরের যে দশা আমি দেখলুম তা পড়তি দশা। পাটের বাজার মন্দা, তাই চাষিদের হাতে টাকা নেই। জমিদারি কোনো রকমে চলছে; কিন্তু প্রজাদের অল্প সুদে কর্জ দেবার জন্য যে সব ব্যাঙ্ক স্থাপন করেছিলেন দরদী রবীন্দ্রনাথ তার বহু টাকা খাতকের ঘরে আটকে রয়েছে। অতি ক্লেশে চলছে কল্যাণবৃত্তি তহবিল। অন্য কোনো জমিদারিতে এর মতো কিছু দেখি নি। এটি রবীন্দ্রনাথের কীর্তি। এই তহবিলে প্রজারা দিত অর্ধেক চাঁদা, বাকিটা দিতেন জমিদার। সরকারী সাহায্য না নিয়ে নিজেদেরই অর্থে বিদ্যালয় ও ডাক্তারখানা চালানো প্রজা ও জমিদার উভয়ের পক্ষে গৌরবের বিষয় ছিল। ...জমিদার ও প্রজার পারস্পরিক সহযোগিতাই ছিল রবীন্দ্রনাথের আদর্শ। তিনি যখন প্রথম যৌবনে মহর্ষির আদেশে জমিদারির কাজ দেখতে বেরোন, তখন থেকেই এই আদর্শ ছিল তাঁর মানসে। শিলাইদায় গিয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন তাঁর জন্যে দরবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে, কিন্তু দরবারে মুসলমানদের আসন নিচে ফরাস পেতে আর হিন্দুদের আসন চেয়ারে বা বেঞ্চিতে। লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথের পিত্ত জলে যায়। তিনি জানতে চান এই বৈষম্য কেন। সকলের জন্যে একই প্রকার ব্যবস্থা হয় নি কেন।

এর উত্তরে শুনতে পান, 'এই তো বরাবর চলে আসছে, বাবুমশায়।

প্রিন্সের আমলেও এই রকম ব্যবস্থা ছিল, মহর্ষির আমলেও। হুজুর কি এই প্রাচীন ব্যবস্থা রদ করতে বলেন। তা হলে তো শাসন করা যাবে না।' রবীন্দ্রনাথ জানিয়ে দিলেন যে, অমন দরবারে তিনি যোগ দেবেন না। সবাইকে সমান শ্রদ্ধা দেখাতে হবে। তাই শেষ পর্যন্ত হল। তাঁর মুসলমান প্রজারা তখন থেকেই তাঁর বিশেষ অনুগত। এ ঘটনাটা শিলাইদার। আমার জন্মের পূর্বের। আমি এটা পড়েছি শিলাইদার এক জমিদারি কর্মচারির গ্রন্থে। কিন্তু এর পরে যেটার কথা বলছি, সেটা আমার চোখে দেখা।

রাজসাহীতে থাকতে হঠাৎ টেলিগ্রাম পেলুম, রবীন্দ্রনাথ এসেছেন পতিসরে, আমি যেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষৎ করি। তিনি সেই দিনই কলকাতা ফিরবেন। সময় একেবারেই ছিল না। ছুটলুম মোটরে করে নাটোর, তার পরে ট্রেন ধরে আত্রাই ঘাট।* রবীন্দ্রনাথ বল্‌লেন, 'ওই লোকগুলিকে দেখেছ? ওরা সমস্ত পথ পায়ে হেঁটে আমার সঙ্গে এসেছে। পতিসরে এ সময়ে আমার কথা ছিল না। ওরাই আমাকে শেষবারের মতো দেখ্‌তে চেয়েছিল, কতকাল দেখিনি।' তা তো চাইবেই। দুনিয়ার লোক দেখল, আর দেখতে পেলো না ওরাই! কবি বোধ হয় পনেরো বছর ও-মুখো হন নি। তাঁর বয়স তখন ছিয়াত্তর। স্বাস্থ্যেও ভাঙন ধরেছে। পতিসরে যাতায়াত তো চারটিখানি কথা নয়। তাঁর সেই হাউসবোটটিরও অন্তিম দশা ঘনিয়ে এসেছে। বোধহয় আদায়পত্র সুবিধের নয়।

'ওরা কী বল্‌ছে শুনবে?' রবীন্দ্রনাথ বল্‌তে থাক্‌লেন। 'বল্‌ছে, পয়গম্বরকে তো স্বচক্ষে দেখি নি, আপনাকে দেখেছি'।

পয়গম্বরকে আমিও কি স্বচক্ষে দেখেছি। কিন্তু গুরুদেবকে তাঁর সেই পরিপক্ক কেশমণ্ডিত পরিণত বয়সে কোনো এক পয়গম্বরের মতোই দেখতে। মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয় হয়ে এসেছিল। তিনি আমাদের মধ্যে থাক্‌লেও আমাদের একজন নন।...

ইয়া ইয়া দাড়িওয়ালা বুড়ো বুড়ো মুসলমান তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল শিশুজনের মতো। কলকাতাগামী ট্রেন এল। একমিনিট কি দুমিনিট থামল। গুরুদেবকে তুলে দেওয়া হল ধরাধরি করে। তাঁর প্রজাদের চোখে জল। শেষবারের মতো তাঁকে তারা সালাম্‌ করল। তিনি তো কেবল জমিদার নন। তিনি পয়গম্বরের কাছাকাছি যান। সেবার আমি তাঁর

* এই গ্রন্থের 'কালীগ্রামে শেষবার' কাহিনী দ্রষ্টব্য।

একমাত্র সহযাত্রী হয়ে নাটোর পর্যন্ত যাই। প্রধানত সাহিত্য নিয়ে আলোচনা। কিন্তু আমাকে তিনি সেইজন্যে ডেকে পাঠান নি। ছিল একটা বৈষয়িক অনুরোধ। নাটোরে ট্রেন থেকে নেমে তাঁকে বিদায় দিয়ে রাজসাহী ফিরে যেতেই আমার বৃদ্ধ মুসলমান জমাদার আমাকে ছেঁকে ধরল।—'হুজুর বাহাদুরের কোথায় যাওয়া হয়েছিল?' আমি বললুম। জানতুম না যে সে বুঝবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে!

এই লোকটি কালেক্টারদের কাছে তরুণ বয়স থেকে চাপরাশি-গিরি করে এসেছে। সরকারী কানুন এর জন্যে নয়। এর বয়সের আর সবাই কবে অবসর নিয়ে ভূত হয়ে গেছে। একে ছাড়ানোর সাহস কোনো কালেক্টরের হয় নি। আমি তো এর নাতির বয়সী। এ যে দয়া করে বেঁচে আছে এতেই আমার সম্মান।

শফি জমাদার আমাকে বকুনির সুরে বলল,—'আহা ঠাকুরবাবু এসেছিলেন। আমাকে কেন নিয়ে গেলেন না হুজুর? আমি তাঁকে দেখি নি কতকাল,— দেখে আসতুম।' 'তুমি তাঁকে দেখেছ।' আমি কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলুম, 'কবে'?

'সেই যে বার তিনি এসেছিলেন রাজসাহীতে। পালিত সাহেব* তখন এখানকার জজ সাহেব। জজ সাহেবের কুঠিতে ছিলেন! আহা ঠাকুরবাবু কী সুন্দর মানুষ! কী সুন্দর গান করেন! আমার এখনো মনে আছে।' তার মন চলে গেল কোন্ অতীতে! আমি হিসেব করে দেখলুম, সে বলছে চুয়াল্লিশ বছর আগেকার কথা, কবির বয়স যখন বত্রিশ। পদ্মার বুকে হাউসবোটে বাস করতেন। পরে শান্তিনিকেতনে এসে গুরুদেবকে আমি একথা বলেছিলাম। তিনি সকরুণভাবে বলেছিলেন, 'তখন আমার গানের গলা ছিল।'

আর একবার পতিসরে যেতে যেতে পথে এক জায়গায় হাতীর পিঠ থেকে নামি। হাতী জল খেতে যায়। সেই ফাঁকে আলাপ হল গ্রাম্য গৃহস্থের সঙ্গে। ঠাকুরবাবুদেরই হিন্দু প্রজা। সে আপনার থেকে শোনাতে আরম্ভ করলে তার ছেলেবেলার গল্প। 'বাবুমশায় এসেছিলেন পতিসরে। বোট থেকে নামলেন না। প্রজারা তাঁকে সেইখানে গিয়ে "ভেট্" দিয়ে এল। তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটেছিল—শ্রাদ্ধের ভেট্! প্রথম দিন তিনি গ্রহণ করলেন, কিছু বললেন না। পরের দিন আবার সবাইকে ডেকে পাঠালেন। তিনি বললেন, "আমার

* রবীন্দ্র-বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিত। সুবিখ্যাত তারকনাথ পালিতের পুত্র।

বাপের শ্রাদ্ধ! আমি নেবো তোদের কাছ থেকে ভেট্! ছি ছি!! কী লজ্জার কথা! যা—যা,—ফিরিয়ে নিয়ে যা।" এই বলে সব ফিরিয়ে দিলেন! প্রজারা তো হতভম্ব! কোনো জন্মে এমন জমিদার দেখি নি।'

পতিসরের চেয়ে শিলাইদা আমার ভালো লেগেছিল। ঠাকুরবাবুদের পরিত্যক্ত কুঠিবাড়িতে আমি কয়েক রাত ছিলুম।* তেতলার একখানা ঘর দেখিয়ে দিয়ে ওরা বললে, 'বাবুমশাই এই ঘরে বসে "গীতাঞ্জলি" লিখেছিলেন।' অনেক গল্পই শোনা গেল সেখানে। যদিও তিনি তখন আর সেখানকার জমিদার নন, (তখন শিলাইদহ ঠাকুর-এস্টেট্ হাইকোর্টের রিসিভারের শাসনাধীনে), তবু কেউ তাঁকে ভোলে নি, তাঁর স্থান আর কাউকে দেয় নি। তিনিই তখনো সেখানকার প্রিয়তম প্রভু। জমিদারি কাছারিতে পুরোনো কাগজপত্র তখনো কিছু কিছু ছিল। দেখ্‌তে চাইলুম—গুরুদেবের হাতে লেখা জমিদারি হুকুম! খান দুয়েক চিঠি ওরা আমাকে দেখায়। পড়ে দেখি—রবীন্দ্রনাথের আর একরূপ! কে বল্‌বে তিনি একজন কবি! উপমাবহুল অলঙ্কৃত গদ্য নয়; রাশভারি মেজাজে লেখা নীরস নিরাভরণ বৈষয়িক লিপি।

পুত্র রথীন্দ্রনাথকে তিনি কৃষিবিদ্যা শিখ্‌তে আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন। একবার তাঁর জন্যে শিলাইদার কাছে চর জমি কিনে ফার্ম করে দিতে চান। নোবেল প্রাইজের আগের পর্যায়ের কথা। বিশদ উপদেশ ছিল জমিদারির কর্মচারীদের প্রতি। ··· না, 'কাব্য পড়ে যেমন ভাবো কবি তেমন নয় গো।' সেই শিলাইদাতেই তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার খবর পাওয়া গেল। কবিতার টেকনিক্ নিয়ে নয়। মন কয়েক ইলিশ মাছ যোগাড় করে মাটিতে পুঁতেছিলেন। জমি সারবান হবে। গন্ধে মানুষ পাগল হয়ে যায় আর কি!

কুষ্টিয়া থাক্‌তে তাঁর সেই পাটের কারবারের একমাত্র স্মরণচিহ্ন নজরে পড়েছিল। একটা বাড়ির গায়ে লেখা ছিল—'টেগোর অ্যাণ্ড কোং।' ততদিনে তার হাত বদল হয়েছে। কারবার তো তিনি নিজেই গুটিয়ে নিয়ে শান্তিনিকেতনে চলে যান। নিজের শক্তির বা বুদ্ধির অভাব ছিল না। বিশ্বাসযোগ্য কর্মচারীরই অভাব। নইলে তাঁকে বিরাট এক দেনার দায়ে জড়িয়ে পড়ে শিলাইদার কর্মস্থল ত্যাগ করে শান্তিনিকেতনে তপোবন-বাস করতে হত না। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে বানপ্রস্থ নিতে হত না। তাঁর ইচ্ছা

* শিলাইদহের ম্যানেজারের অনুপস্থিতিতে এই গ্রন্থের লেখকই সপরিবারে অন্নদাশঙ্করকে অভ্যর্থনাদি করেছিলেন।

ছিল, তাঁর পুত্র তাঁর কর্মস্থলে বসে তাঁর কর্মধারা অনুসরণ করবেন। তাও ঘটে উঠল কৈ? নোবেল প্রাইজের পর সব ওলট পালট হয়ে যায়। এমন কি জমিদারির সদর কার্যালয় পর্যন্ত স্থানান্তরিত হয় শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথের জমিদারি আদর্শের প্রথম কথা ছিল—জমিদার হবেন না অনুপস্থিত উপস্বত্বভোগী, প্রজাদের ছেড়ে দেবেন না জমিদারির আমলাদের হাতে। শেষ পর্যন্ত আমলাতন্ত্রেরই জয় হল।

রাশিয়া বেড়াতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, তিনি যে জমিদার এর জন্যে তিনি লজ্জিত। টলস্টয় যেমন স্ত্রীর উপরে, রবীন্দ্রনাথ তেমনি পুত্রের উপরে জমিদারি চালানোর ভার ন্যস্ত করে হাত ধুয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু অমিয় চক্রবর্তী* যখন তাঁর কাছে নিবেদন করেন যে, যাবার আগে তিনি যেন তাঁর জমিদারি নেশনকে দান করে দিয়ে যান, তখন তিনি নারাজ হন। পুত্রকে তিনি বঞ্চিত করবেন না। কয়েক বছর পরে বঞ্চিত করল ইতিহাস। (১৯৬১)—

—"রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থের "তাঁর পরেই প্লাবন" প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত, পৃ ১-২১

নদী আপন বেগে পাগল পারা

রবীন্দ্রনাথ গানের রাজা। শিলাইদহ অঞ্চলে থাকা কালে তিনি কত গান রচনা করেছিলেন, তার বিবরণ দিতে পারবেন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিশেষজ্ঞগণ। তাই রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ সঙ্গীতশিষ্য শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ মশায়ের প্রবন্ধ থেকে উদ্ধার করেছি—

…গুরুদেব গ্রাম অঞ্চলের দেশী সঙ্গীতের সত্যিকার সংস্পর্শে এলেন রাজসাহী ও কুষ্টিয়া জেলার জমিদারী তদারকের ভার নেবার পর। ত্রিশ বৎসর বয়সে একাজের দায়িত্বভার নিয়ে সেখানকার নদীপথে ও গ্রাম অঞ্চলে ১০।১১ বছর বাস করেন। তাঁর সাংগীতিক জীবনের ইতিহাসে জমিদারীবাসের এই সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়েই লোকসঙ্গীতের সঙ্গে প্রাণের পরিচয় তাঁর ঘটে এবং পরবর্তী জীবনের গানে তা বৈচিত্র্য আনে, বিশেষ করে সেখানকার গ্রাম অঞ্চলের বাউলদের গান ও জীবন তাঁর মনে বিশেষ এক প্রেরণার সন্ধান দেয়।… জমিদারী তদারকের এই ১০।১১ বছরের মধ্যে পল্লীগানের প্রেরণায় গান লিখলেন মোট ২০টি—

১। তোমরা সবাই ভালো… বাউলের সুর

* কবির একান্ত-সচিব সাহিত্যিক, সুপণ্ডিত ও কবি।

২।	ক্ষ্যাপা তুই আছিস আপন···	বাউলের সুর
৩।	আমারে কে নিবি ভাই···	কীর্তনের সুর
৪।	খাঁচার পাখী ছিল সোনার···	,,
৫।	বড় বেদনার মতো···	,,
৬।	ওহে জীবনবল্লভ···	,,
৭।	ভালোবেসে সখী···	,,
৮।	আমি সংসারে মন দিয়েছিনু···	,,
৯।	বঁধু তোমায় করব রাজা···	বিভাস
১০।	আজি শরত তপনে···	যোগীয়া-বিভাস
১১।	নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে···	,,
১২।	ওলো সই ওলো সই···	বিভাস মিশ্র
১৩।	হৃদয়ের এ কূল, ও কূল দুকূল···	,,
১৪।	ওগো এত প্রেম আশা···	ঝিঁঝিট
১৫।	চাহিনা সুখে থাকিতে হে···	ঝিঁঝিট মিশ্র
১৬।	একবার তোরা মা বলিয়া ডাক···	ঝিঁঝিট
১৭।	এবার যমের দুয়ার খোলা পেয়ে···	মিশ্র
১৮।	তোমরা হাসিয়া বহিয়া যাও ··	”
১৯।	তোমার গোপন কথাটি···	”
২০।	আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে···	রামপ্রসাদী

* * *

১৩১২ সালে শুরু হল বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলন। তখন গুরুদেবের বয়স ৪৪-এর কাছাকাছি। পূর্বের গ্রামজীবনের প্রেরণা ও সংগ্রহকে এবারে তিনি বিশেষভাবে কাজে লাগালেন। অন্যান্য দেশী সুর ছাড়া কেবল বাউলদেরই সুর ও ঢংএ জাতীয় ভাব উদ্দীপক গান লিখলেন একসঙ্গে অনেকগুলি—

১। আমার সোনার বাংলা

২। এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে

৩। ও আমার দেশের মাটি

৪। ওরে তোরা নেই বা কথা বললি

৫। ঘরে মুখ মলিন দেখে

৬। ছি ছি চোখের জলে

৭। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক্

৮। যে আমায় পাগল বলে

৯। মা কি তুই পরের ঘরে—

১০। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে

* * *

প্রবন্ধ—রবীন্দ্র-সঙ্গীতে বাংলা দেশী সুরের প্রভাব, শান্তিদেব ঘোষ, দেশ পত্রিকা। ২১শে বৈশাখ ১৩৫৮ সাল। পৃ ২৯-৩০

'গীতবিতান' গ্রন্থখানি একটু সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে পড়লে রবীন্দ্রনাথের পদ্মা ও শিলাইদহ-জীবনের বিচিত্র সংগীত-সমারোহের তাৎপর্য বোঝা যাবে।

সংযোজন : কালীগ্রামে শেষবার

গ্রন্থের ২১২-২২২ পৃষ্ঠায় 'কালীগ্রামে শেষবার' কাহিনীটি আছে। কাহিনীটিতে মোঃ কফিলদ্দিন আকন্দ রাতোয়াল্‌ নামে জনৈক প্রজার দেওয়া মানপত্র মুদ্রিত হয়েছে—এ মানপত্র কবিকে দেওয়া হয়েছিল ব্যক্তিগতভাবে।

সম্প্রতি বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-ভবন সংগ্রহশালায় রক্ষিত কালীগ্রাম প্রজাসাধারণ-প্রদত্ত আনুষ্ঠানিক অভিনন্দন-পত্রখানি দেখার সুযোগ ঘটেছে। এই অভিনন্দন-পত্র সুমুদ্রিত এবং মূল্যবান একটি পেটিকায় সংরক্ষিত। উক্ত অভিনন্দন-পত্রের নকল এখানে দেওয়া হল। এই নকলের জন্য গ্রন্থকার বিশ্বভারতী-কর্তৃপক্ষের নিকট ঋণী।

অশেষগুণালঙ্কৃত পরমারাধ্য বিশ্বপূজ্য শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদার মহোদয়ের শ্রীশ্রীচরণকমলে

দেব!

যাঁহার সুমধুর নাম আপনার হৃদয়বীণায় ধ্বনিত হইয়া পৃথিবীকে আজ মোহিত করিয়া তুলিয়াছে, আমরা অবোধ হইলেও, সর্বপ্রথমে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিতেছি।

তাঁহার লীলা কি অপার—উদ্দেশ্য কি গভীর ও দুর্বোধ্য! কে জানিত জড়বাদী বর্তমান ইয়ুরোপ তাঁহার পতাকাবাহী একজন ভারতসন্তানের গলে আজ জয়মাল্য প্রদান করিবে? কে জানিত অতীত ভারতের সেই সামগানের এই নূতন ঝঙ্কারে ইয়ুরোপেরও মোহ দূর হইবে,—ইয়ুরোপ ভারতবর্ষের ঋষিত্ব স্বীকার করিবে?—কিন্তু তাঁহার রাজ্যে এমনিই হয়,—এমনিই তাঁহার উদ্দেশ্য একদিন আমাদের মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে।

তাঁহার অসীম করুণা হইতে কেহই বঞ্চিত হয় না। তবে সে করুণার কথা জানাইয়া দেয় কে?—কে মানুষের চোখ খুলিয়া দেখাইয়া দেয়, তোমরা পরিত্যক্ত নও, তোমরাও ভগবানের রাজ্যে বাস করিতেছ, জগৎজনিত বিমলানন্দ তোমাদেরও উপভোগ্য; অমঙ্গল কেবল মানসিক বিকার মাত্র। তাঁহাকে ছাড়িয়া যে সুখ তাহা কেবল অহংকারের আত্মপ্রীতি মাত্র। যাঁহারা

যুগের পর যুগ ধরিয়া এইরূপে সংসারে মানবমনের অন্ধকার দূর করিয়া আসিতেছেন, আপনার আসনও আজ তাঁহাদিগের মধ্যে,—আপনিও একজন বিশ্ব-পুরোহিত।

আমাদের কি সৌভাগ্য আমরা আপনার প্রজা,—আমাদের কি সুকৃতি, সেই মঙ্গলময়ের বর্তমান প্রচারকই আমাদের অভিভাবক।

আজ সুইডেন আপনাকে "নোবল পুরস্কার" দিল, রাজপ্রতিনিধি আপনাকে এসিয়ার রাজকবি বলিলেন, দেশের শিক্ষিতমণ্ডলী আপনার সম্বর্দ্ধনা করিয়া কৃতার্থ হইলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আপনাকে ডি. লিট. উপাধি দিয়া উপাধির সার্থকতা করিলেন; কিন্তু পিতঃ! আজ যখন বিশ্ব আসিয়া আপনার চরণে অর্ঘ্য প্রদান করিবার ছলে, আপনাকে লইয়া এই মহোৎসব করিতেছে, তখন আমরা কেন সেই উৎসব হইতে দূরে থাকি? তাই আমরাও আজ এই ক্ষুদ্র আয়োজন করিয়াছি। এখানে আমাদের দেয়,—ভক্তি; প্রাপ্য,—আত্মপ্রসাদ।

কিন্তু আমাদের কি উচিত আপনাকে কেবল ভক্তি প্রদর্শন করিয়া এবং আপনার সম্মানে আনন্দিত হইয়া নিশ্চিন্ত থাকি?—তাহা নহে। আমাদের এক বিশেষ কর্তব্য আছে। প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গগত ভূস্বামী মহোদয়গণের নিকট হইতে এ পর্য্যন্ত প্রজারূপে আমরা যে সকল স্নেহের অধিকার পাইয়া আসিয়াছি, পিতঃ! আশীর্বাদ করুন, আমরা যেন উহার অযোগ্য বলিয়া কখনও বিবেচিত না হই এবং আপনাদের আদর্শ চরিত্র সর্বদা সম্মুখে রাখিয়া তাহার আংশিক অনুসরণ করিয়াও জীবন ধন্য করিতে পারি।

পরিশেষে আমরা আপনার সমবেত সন্তানবৃন্দ কায়মনোবাক্যে ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি যেন আমাদের ভূপতিগণকে পরিজনসহ নিরাপদ সুদীর্ঘ জীবন এবং সর্ববিধ কল্যাণ প্রদান করত: চিরশান্তিতে রাখেন।

পতিসর — ভবদীয় স্নেহানুরক্ত

২৯ পৌষ, ১৩২০ — কালীগ্রাম পরগণার রাজভক্ত প্রজাবৃন্দ

আমরা এনেছি কাশের গুচ্ছ

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে শেষবার যান ১৩২৮ সালে (ইং ১৯২২), এবং ৮ই-২৩শে চৈত্র সেখানে অবস্থান করেন। এই যাত্রায় কবির সঙ্গী ছিলেন এণ্ড্রুজ সাহেব ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২১শে চৈত্র কবিকে এবং এণ্ড্রুজ সাহেবকে গ্রামবাসীরা ও জমিদারির কর্মচারীরা আনুষ্ঠানিকভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এই সম্বর্ধনা-সভায় কবিকে একাধিক মানপত্র দেওয়া হয়। শান্তিনিকেতনস্থ রবীন্দ্র-ভবনে একখানি মানপত্রের সন্ধান সম্প্রতি পাওয়া গেছে। এই মানপত্রের কবিতা রচনা করেছিলেন লেখক স্বয়ং। তখন তিনি বয়সে যুবক এবং ঠাকুরজমিদারির একজন কর্মচারী (সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তরফের সেরেস্তা)।

কবির শেষবার শিলাইদহ অবস্থানকালে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন বহু প্রজা—চৌদ্দ পনের মাইল দূর থেকেও চাষিপ্রজারা তাঁদের প্রাণপ্রিয় 'বাবুমশাই'-কে দেখতে এসেছিলেন—কেউ বা এসেছিলেন নজরানা দেওয়ার জন্য, কেউ দুটো কথা শোনবার জন্য। সময়াভাবহেতু কবি প্রত্যেক প্রজার কথা শুনে পরামর্শ দেওয়া সম্ভব নয় বিবেচনা করে তাঁদের লিখিত বক্তব্য দাখিল করতে বলেন। তেমন দুইখানি দরখাস্তের প্রতিলিপিও এখানে আমরা দিলাম। মূল দরখাস্ত শান্তি-নিকেতনস্থ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় এই সময়ে শিলাইদহ অঞ্চলের মুসলিম মহিলাদের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে একখানি নক্সি কাঁথা উপহার দেওয়া হয়, কাঁথাখানিও রবীন্দ্রভবনে বিশিষ্ট দ্রষ্টব্য হিসাবে স্থান পেয়েছে। — প্রকাশক

শিলাইদহের অধিবাসিবৃন্দের অভিনন্দন-পত্র

জগৎপূজ্য কবিসম্রাট শ্রীল শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহোদয় শ্রীচরণকমলেষু

নীরব এ পল্লীবৃন্দাবনে নীরব সে মুরলীর তান,
নীরব সে পদ্মার কল্লোল, মলয়ের হিল্লোলিত গান।
গাহে না বিহগ আর প্রভাতের আবাহনগীতি,—
তরুশিরে অরুণের রাগে নাহি আর সে উদার প্রীতি।

পল্লীর সারল্যে স্নেহে যে মাধুরী উঠিত বিকাশি'
সুকুমার শিশুমুখে ফুটিত যে স্বরগের হাসি—
নিভে গেছে একে একে। দেবালয়ে কাঁসরের স্বর,
নির্জন সন্ধ্যার বক্ষে বনানীর আকুল মর্মর—
সৃজন করেছে এক স্বপ্নময় সুতরল আবেশের গান
যুগব্যাপী আলসের বশে পল্লীদেহে নাহি যেন প্রাণ!
আজি কোন্ নব জাগরণে দিকে দিকে পড়ে গেছে সাড়া
ভেসে আসে সঙ্গীত-কল্লোল,—স্নিগ্ধ পল্লী আজি ঘুমহারা;
আবার এসেছে ফিরে এ পল্লীর আনন্দদুলাল,
দশদিক আকুলিয়া পত্রপুষ্পে সেজে ওঠে কদম্ব তমাল,
শাখে শাখে ডাকে পাখী। দাঁড়াইল পল্লী আজি উৎসব-সজ্জায়
কবীন্দ্রের চরণের তলে, অর্ঘ্য করে নতমুখী সেবিকার প্রায়।
ঐ দূরে উৎকণ্ঠিতা ব্যাকুল হৃদয়ে তব পদ্মা প্রসন্নসলিলা
অশ্রান্ত কল্লোল গানে আনমনে খেলিতেছে লহরীর লীলা
প্রিয়তম শুভ আগমনে। তব প্রাণপ্রিয় এই পল্লীনিকেতন
পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে তব কানে ঝঙ্কারিছে প্রাণের বেদন,
বিশ্বপ্রেমে জাগালে জগৎ : এ বিশ্বের আকুল আহ্বানে
অমৃত বিলায়ে দিয়ে মুক্তিমন্ত্রে জগতের জনে জনে জনে
এস এস যুগের দেবতা। ফিরে এস তোমার এ পল্লীকুঞ্জবনে
হে কবীন্দ্র অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যমূরতি, এস, বস, হৃদিপদ্মাসনে।
ফিরিয়াছে হৃদয়ের রাজা, পল্লীবাসী-ভক্তদল-গেহে—
ফিরিয়াছে বিরাট চেতনা। প্রাণের প্রেরণা শতদীর্ণ দেহে!
নাহি কোন পূজা-আয়োজন, ইচ্ছা হয় লুটাই চরণে,
মেগে লই চরণের ধূলি এক কণা, ধন্য হই জীবনে মরণে।
বিলাও গো মহাপ্রেম, ত্যাগমন্ত্র, বিশ্বকবি হে গুরু শিক্ষক,
জীবনের দীর্ঘপথ কর সুমঙ্গল, তুলে দাও প্রাণের কণ্টক।
এই পল্লীবৃন্দাবন আলোকিত করি, ওহে দেব, বিহর সতত,
চির বসন্তের শ্রীতে, মুরলীর কল-আলাপনে পূর্ণ কর এ পল্লী নিয়ত।
দেব তনুখানি আঁখি ভরি দেখি মিটে না গো নয়নের তৃষা,
ভক্তিভরে বিহ্বল পরাণ,—কি বলিব,—প্রাণে নাহি ভাষা।

এসো গো হৃদয়রাজ, এসো ঋষি, বাণীর অমর পুত্র, হে কবিসম্রাট ;
তীর্থ এ শিলাইদহ, ভক্তপ্রাণে আজি একি আনন্দ বিরাট !

খোরসেদপুর
শিলাইদহ, নদীয়া
২১শে চৈত্র, ১৩২৮

আজ্ঞানুবর্তী সেবক
খোরসেদপুরের অধিবাসিবৃন্দ

[সাধনা প্রেস, কুষ্টিয়া, অর্ডার নং ২৮৫/২০০]

রচনা-শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী, গ্রামবাসীদের পক্ষে পাঠ করেন সতীশচন্দ্র অধিকারী। স্থানীয় মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

শিলাইদহে শেষবার : কর্মচারিবৃন্দের নিবেদন

[আবেদনপত্র। এক]

যে জগৎবরেণ্য পুরুষশ্রেষ্ঠ কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ ও ভারতের অকৃত্রিম বন্ধু পরদুঃখকাতর ন্যায়নিষ্ঠ মহাযোগী মহামতি C. F. Andrews মহোদয়দিগের দর্শনলাভের জন্য পৃথিবীর সর্বস্থানে সবলোক নিরন্তর আকুল আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে এবং যাহাদের যশোভাতি সূর্যকিরণের ন্যায় জগতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত, আজ জগদীশ্বরের অনুগ্রহে বাংলার কোন এক প্রান্তস্থিত নিভৃত সামান্য পল্লীতে বাস করিয়াও আমাদের দীন বৎসল উচ্চমনা প্রজারঞ্জক জমিদার শ্রীল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুকম্পায় তাঁহাদের দর্শনলাভ করিয়া আমাদের নিজদিগকে ধন্য মনে করিতেছি।

কেবলমাত্র ধন্য নহে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে স্বনামখ্যাত মহাপুরুষদ্বয়ের অমূল্য উপদেশাবলী দ্বারা যাহাতে আমরা আমাদের দুঃখ ও অশান্তিময় চাকুরী-জীবনের কয়েকটি সমস্যা পূরণ করতঃ নিজেদের জীবনের সার্থকতা আনয়ন করিতে পারি, এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আজ আমরা ইহাদের পাদমূলে একত্র সমবেত হইয়াছি, ভরসা রাখি আমরা সে আশায় বঞ্চিত হইব না। বর্তমান ব্যবসা-বাণিজ্যের যুগে প্রায় প্রতি সভ্য দেশেই দাসত্বজীবন হেয় বলিয়া বিবেচিত হয়। আমরাও তাহাই মনে করিয়া থাকি ; তবু যে আমরা ইহাতে নিযুক্ত আছি, ইহার কারণ অন্নবস্ত্র-সমস্যা। অবশ্য ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা সে সমস্যার সমাধান হয় কিন্তু আমাদের শক্তি সুযোগ ও উপায়ের অভাবে

তাহা হইয়া উঠে না। ছোট বস্তুকে কি প্রকারে বড় করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়, অভাবের মধ্য দিয়াও একমাত্র আত্মনির্ভরতা ও সাহসের দ্বারা সচ্ছলতা আনা যায়, তাহা আমাদের জানা নাই। তাই আমরা এরূপ জীবন বহন করিতে বাধ্য হই।

২। আমাদের দেশে প্রজাবর্গ তাহাদের জমিদারকে অনেক সময় মহাজনের মতই উৎপীড়ক মনে করিয়া ভয় যদিও করে, বিশ্বাস একেবারেই করে না। এই অবিশ্বাসের ফলে প্রজা যে তাহাদের জমিদারের কর্মচারিগণকে সময় সময় শয়তানের দূত মনে করে না, এ কথা জোর করিয়া বলা চলে না। জমিদারের কর্মচারী হিসাবে প্রতি কার্যেই প্রজাদের সহিত আমাদের সম্পর্ক। জমিদারের ন্যায্য স্বার্থরক্ষা কর্মচারীদের পক্ষে সর্বতোভাবে কর্তব্য ; পক্ষান্তরে প্রজাপক্ষও তাহাদের আপনাপন ষোলআনা স্বার্থ বজায় রাখিতে যত্নবান,—সেইখানেই সংঘর্ষ অনিবার্য্য। কি করিলে উহাদের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অপেক্ষাকৃত সুখ ও শান্তি পাইতে পারি, তাহা জানা আবশ্যক।

৩। ইহার ফলে কেবলমাত্র কর্তব্যসম্পাদন ব্যতিরেকে অন্য প্রকার উন্নতিসাধনে আমাদের উৎসাহ ও চেষ্টা নিয়োজিত করিতে পারি না।

৪। এ দেশে সাধারণত অশিক্ষিত লোকই বেশী। এই অশিক্ষিত প্রজাদের ধারণা জমিদার যদিও কোন কোন বিষয়ে উপকার করিতে প্রস্তুত হন, সময় সময় তাহারা মনে করে ইহা বুঝি জমিদারের পক্ষেরই স্বার্থের অনুকূল হইবে। কর্মচারিপক্ষ বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও তাহারা বুঝিবে না ; ফলে রেষারেষিটা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং জমিদার, কর্মচারী ও প্রজাসাধারণ যাহাতে সকলেই সকলকে বুঝিয়া উঠিতে পারে, যাহাতে তিনটি সম্প্রদায়ই একসূত্রে বদ্ধ থাকিয়া একমনে সকলেই দেশের কাজ করে এইরূপ উপদেশ প্রার্থনা।

৫। আমাদের এই চাকুরী-জীবনেও কেবলমাত্র মনিবের উপর নির্ভর না করিয়া কোন্ পথ অবলম্বন করিলে নিজ নিজ আয় বৃদ্ধি করা যাইতে পারে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ।

৬। কর্মচারিগণ মধ্যে যাহাতে প্রীতির বন্ধন দৃঢ়তর হয় তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা। ইতি—

ভবদীয়

[তারিখ নেই] শিলাইদহ কাছারির কর্মচারিবৃন্দ।

রচনা—পেস্কার শরৎ সরকার, পাঠ করেন—হেড্ মুন্সি বিজয়ভূষণ রায়

শিলাইদহের প্রজাবৃন্দের প্রার্থনা

[আবেদন পত্র। দুই]

জগৎপূজ্য কবিসম্রাট শ্রীল শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহোদয় শ্রীচরণকমলেষু

আজ আমাদের কি আনন্দের দিন! বসন্তকালের পূর্ণিমার নিখুঁৎ চাঁদ আকাশের এক কোণে উঠিলে যেমন পৃথিবীর সব দিকটা আনন্দে উছলিয়া উঠে, আজও ঠিক সেই বসন্তকালে পূর্ণিমার চাঁদ এখানে উদিত হওয়াতে সব দিকটা যেন হাসিয়া উঠিয়াছে। ঐ কত কোকিলের কলকণ্ঠে আজ তাঁর যশ-গৌরব দিকে দিকে শুনতে পাচ্ছি। ফুলগন্ধভরা পাগল বাতাস তারই সৌরভ আজ এনে দিচ্ছে। তটিনীর কলতানে সমুদ্রের গর্জনে আজ তাঁরই বিজয় সঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে। অনন্ত আকাশপটে ঐ হাজার হাজার নক্ষত্রের অনিমেষ চোখে আজ তাঁরই আলো ফুটে উঠেছে। সমস্ত প্রকৃতি যেন আজ শতবেণু রবে গাইছে— "ধন্য হয়েছি মোরা তব আগমনে।"

সুন্দর একটি বাগান। তাতে আছে যুঁই, মালতী, জবা, সূর্যমুখী, বেলী, চামেলী ইত্যাদি. যেন বাগানটিকে সাজিয়ে রেখেছে! গোলাপ গাছের সুন্দর গোলাপটি তার সেই সর্ব্ব উচু স্থানটি নিয়ে আশেপাশের ফুলগুলির দিকে যেন করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে; মৃদুমন্দ বাতাসে তার সৌরভ বয়ে নিয়ে আশেপাশের ফুলগুলির গায়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে। আর তারা সব মাথা নাচিয়ে নাচিয়ে আনন্দ জানাচ্ছে। সেইরূপ এই বাগানের প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলের সৌরভে সকল দিকটাই যেন আমোদিত হচ্ছে।

অমৃত-বাহিনী গঙ্গানদী যেমন উচ্চ শিখর হইতে মর্ত্যে নামিয়া বাংলাদেশের অবস্থা একবার স্বচক্ষে দেখতে তার শুকনো বুকের মাঝখান দিয়ে বহু শাখা-প্রশাখা নিয়ে সমুদ্রে মিশিয়াছে, আর তার অমৃত সলিলে অবগাহন করিয়া একুলের ওকুলের ক্ষেত্রগুলি ভরাশস্যে হেসে উঠেছে এবং কতশত নরনারী জীবনে ধন্য হচ্ছে, সেইরূপ আমাদের এই যে চিরক্ষেত্রটি শিলাইতে আর একটি ভবানদী কোন এক উচ্চ শিখর হইতে মর্ত্যে নামিয়া অশ্রান্ত বহিয়া কত কষ্টের মাঝখান দিয়া আমাদের এখানে চলিয়া আসিয়াছেন। ইহার উৎস হচ্ছে আমাদের পিতৃস্নেহের মধ্যে, যে স্নেহটা রাজরাজেশ্বর হইতে দীনতম কৃষককে পর্যন্ত মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। তাই বলছি, আমাদের কি আনন্দের দিন! আমরা আজ এ ভবানদীর অমৃতসলিল পান করিয়া ধন্য হব।

শুনেছি, একদিন শ্রীকৃষ্ণের মোহনবাঁশির তানে যমুনার জল উজান বয়েছিল। এই কি সেই মোহনবাঁশি? যাহার সুমধুর তানে আমাদের এ চিত্তনদী উজান বইছে! এই কি আষাঢ় মাসের সেই বারিধারা, যাহা জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রপীড়িত শস্য গাছগুলির সজীবতা আনয়ন করছে! এই কি সেই মৃগনাভি কস্তুর যাহার সৌরভে চারিদিক আমোদিত হচ্ছে?

সমুদ্রমন্থন করিয়া একদিন দেবতারা অমৃত তুলিয়া অমর হইয়াছেন। আমরাও আজ আপনার জ্ঞানরূপ সমুদ্র ছেঁচিয়া তার মাঝখান থেকে অমৃতবাণী তুলিয়া মর্মে মর্মে গাঁথিয়া জীবনের কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হব। কিন্তু শত পরিতাপের বিষয়,—আমরা বিদ্যাহীন, বুদ্ধিহীন; সে অমৃত তুলিতে আমাদের উপযুক্ত আসবাবের অভাব। তবে আজ আপনার ন্যায় একজন নায়কের শুভাগমনে যে আনন্দটুকু পেয়েছি, তাই যতটুকু সাধ্য সাজাইয়া গুছাইয়া এই ক্ষুদ্র ঝুলিটি পূর্ণ করিয়া এই সোনার হাটের মধ্যে আনিয়া দিলাম, আপনার সুধামুখের সুধাবর্ষণ প্রার্থনা করিতে।

১। গৃহস্থেরা সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া মাঠে হাড় ভাঙা খাটুনি খাটে, তবু তাহাদিগকে দু'মুঠো ভাতের জন্য পরের দ্বারস্থ হইতে হয়। কিরূপে তাদের এই দুরবস্থা দূর হইতে পারে এই সভায় তাহার সৎ উপদেশ প্রার্থনা করে।

২। দেশ থেকে হাজার হাজার মণ শস্য সস্তাদরে বিদেশে চলিয়া যাচ্ছে, আর বিদেশ থেকে যা আসছে তাহা তাহাদিগকে অতিরিক্ত মূল্যে কিনিতে হচ্ছে। তার প্রতিকারের উপায় কি, এ সভায় তাহার সৎ উপদেশ প্রার্থনা করে।

৩। বর্ত্তমানে দেশের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে তাহাতে প্রত্যেকের কি কি করা কর্ত্তব্য এ সভায় তাহার সৎ উপদেশ প্রার্থনা করে।

৪। দেশের গরীবের ছেলে উপযুক্ত লেখাপড়া শিখে সহায় অভাবে জীবনে উন্নতির দিকে যাইতে পারে না জন্য ক্রমে ক্রমে অকর্মণ্য হয়ে যাচ্ছে। আমাদের কি করা কর্ত্তব্য এ সভায় তাহার সৎ উপদেশ প্রার্থনা করে।

অতএব প্রার্থনা,—অধীনগণের এই ক্ষুদ্র এ আকিঞ্চন গ্রহণ করিলে জীবনে ধন্য হইব। নিবেদন ইতি—১৩২৮।২১ চৈত্র

আপনার একান্ত অনুগত ক্ষুদ্র প্রজা
শ্রীজেহেরালী বিশ্বাস
সাং চর কালোয়া।

[রবীন্দ্রনাথের শেষ শিলাইদহ গমন উপলক্ষে মহর্ষি দাতব্যচিকিৎসালয়ের শিলাইদহবাসী প্রাক্তন ডাক্তার (মালদহ প্রবাসী) শ্রীসতীশচন্দ্র দত্তের বালক পুত্র শ্রীমান সরোজেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্র-সম্বর্ধনা সভায় স্বরচিত নিম্নলিখিত কবিতা পাঠ করে রবীন্দ্রনাথকে মাল্যভূষিত করেন।]

শিশুর প্রার্থনা

হে রাজেন্দ্র, কবিবর তুমি জগৎ বরেণ্য
লভেছ বিমল কীর্তি দীপ্তিমান চন্দ্রমৌলিভালে
অংশু যথা। বিশ্বজন হেরি মুগ্ধ—
ফিরে না নয়ন ও চারুচরণ হতে।
এসো দেব, হৃদিপদ্মাসনে, নয়নআসারে ছাপি—
কুসুমের দলে। গৃহ নাই, কোথা দিব স্থান?
জল নাহি করি অভিষেক। শক্তি নাহি করিতে ব্যজন।
যে ভাবে রয়েছি মোরা, কবির কোমল হৃদে
দিব নাকো ব্যথা, সে যে মহাসিন্ধুবৎ
আলোড়ন হলে মথিবে বিস্তর।
যে জ্যোতিতে জগৎ জাগালে, বিশ্বপ্রেমে ডুবুডুবু—
তাহারি করুণাকণা শিশুহৃদে ঢেলে দাও।

পঁচিশে বৈশাখ দিল ডাক

বর্তমান গ্রন্থের লেখক আবাল্য রবীন্দ্র-অনুরাগী। কবির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন-প্রবৃত্তি যেন তাঁর সহজাত। কবির যখন শিলাইদহ-বাসে ছেদ পড়েছে তখন লেখক পাঠিয়েছেন তাঁর প্রণতি—পঁচিশে বৈশাখে কবি-প্রণাম। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত দুখানি সচিত্র পাণ্ডুলিপি—একখানি ১৩৪৫-এর পঁচিশে বৈশাখ উপলক্ষে রচিত, অপরখানি রচিত হয় ১৩৪৬-এর পঁচিশে বৈশাখ—এখানে মুদ্রিত হল। ১৩৪৫-এর শ্রদ্ধার্ঘ্য পেয়ে কবি গ্রন্থকারকে একখানি চিঠি লেখেন। এখানে সুঅলঙ্কৃত পাণ্ডুলিপিদ্বয়ের কাব্যভাগ এবং কি রীতিতে পাণ্ডুলিপি অলঙ্কৃত হয়েছিল তার পরিচয় দেওয়া হল এবং রবীন্দ্রনাথের চিঠির নকলও দেওয়া হল। শ্রদ্ধার্ঘ্যমূলক পাণ্ডুলিপিদ্বয়ের আকার পুথির, তুলোট কাগজে লেখা। পাণ্ডুলিপিদ্বয় রবীন্দ্রভবনে মূল্যবান সংগ্রহ হিসাবে সুরক্ষিত আছে। —প্রকাশক

কবি-প্রণাম ! ১৩৪৫

কভার [অলংকরণ—প্রাকৃতিক দৃশ্য, সূর্যোদয়, পদ্মাবক্ষে]

(কভার পরপৃষ্ঠা সাদা)

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা—

ওঁ

অবজ্ঞাত পল্লী শিলাইদহ যাঁহার পদস্পর্শের গৌরবে
আজ জগদ্বাসীর তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে,—
শিলাইদহের গৌরব, মানব-জাতির গৌরব
বিশ্বকবি শ্রীযুক্তরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের
শুভ জন্মদিবসে শিলাইদহবাসীর ভক্তিঅর্ঘ্য।
২৫শে বৈশাখ, ১৩৪৫ সাল।

[বাঁদিকে অলংকরণ]

পর পৃষ্ঠা—

"আমার বসন্ত গান তোমার বসন্ত দিনে—
ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে,
হৃদয় স্পন্দনে তব ভ্রমর-গুঞ্জনে নব
পল্লব মর্মরে !
আজি হতে শতবর্ষ পরে !" —রবীন্দ্রনাথ

তৃতীয় পৃষ্ঠা— (অলংকরণ—সূর্যোদয়ের ছবি)

তোমার চরণে প্রণাম করি!
ভারত-আকাশে ওগো ভাস্কর, প্রণমি তোমারে দু'কর জুড়ি!
চিত্ত-সাগর বেলায় দাঁড়ায়ে ওগো বিবস্বান, অর্ঘ্য ধরি!
অঞ্জলি ভরা ভক্তি সলিলে
দীপ্ত সূর্য তোমায় বরি!!

পর পৃষ্ঠা— (অলংকরণ—পল্লী কুটিরের ছবি)

চিত্র পরিচয়: "ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়, ছোট ছোট গ্রামগুলি।"

—রবীন্দ্রনাথ

চতুর্থ পৃষ্ঠা—

পূর্ব গগনে দীপ্ত সবিতা, জাগিল সৃষ্টি তোমারে হেরি,
নদনদী বনে জাগে কলগান, গগনে বাজিল মেঘের ভেরী।
তব সহস্র কিরণ ধারায় ফোটে মালঞ্চ বনের বীথি,
তব তেজোরাশি মেঘে ও সলিলে জাগালো মেদুর বর্ষা গীতি।
শস্য পূর্ণা সুখদা বসুধা, মিটে জগতের চিত্তক্ষুধা।
সৃষ্টি, পুষ্টি, বৃদ্ধি দীপ্তি—সাগর মন্থে জাগিল সুধা!
ওগো তেজোময় জগৎ-সবিতা, দূর হ'তে তোমা প্রণাম করি,
দূর পল্লীর দীন বনবাসী,—বনফুল-মালা অর্ঘ্য ধরি!
ওগো রবীন্দ্র, প্রণাম করি।

[অলংকরণ—ধূপ দীপ শঙ্খ]

পর পৃষ্ঠা—

(অলংকরণ—পদ্মার দৃশ্য-স্কেচ)

চিত্র পরিচয়: "হে পদ্মা আমার!
তোমায় আমায় দেখা শত শতবার!" —রবীন্দ্রনাথ

পঞ্চম পৃষ্ঠা—

(অলংকরণ—দুটি প্রস্ফুটিত পদ্মফুল)

সেদিন উদিলে নব ভাস্কর, শিলাইদহের পদ্মাতীরে,
জবাকুসুম সঙ্কাশ ওগো জাগালে প্রভাত কানন ঘিরে।
শিলাইদহের সেদিন স্মরি—
ওগো আদিত্য, প্রণাম করি,

নব নব দিনে নব মধ্যাহ্ন তোমার আলোকে জন্ম লভি—
যুগ যুগ ধরি ভারত-তীর্থে আনো জাগরণ নূতন ছবি।
হে যুগস্রষ্টা, প্রণাম করি !
শিবময় হোক্ পন্থা তোমার, জ্ঞান-বিভূতি পড়ুক ঝরি !
চরণে তোমার প্রণাম করি !

শিলাইদহ (নদীয়া) ১৩৪৫ ॥ শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী

পর পৃষ্ঠা—

(অলংকরণ—মাঠের মধ্যে বটবৃক্ষ-স্কেচ)

চিত্র পরিচয় : "বেলা ধীরে যায় চলে—
ছায়া দীর্ঘতর করি অশ্বত্থের তলে।
মেঠোসুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তর মাঝে— !" —রবীন্দ্রনাথ

[ষষ্ঠ পৃষ্ঠা থেকে শিলাইদহ-প্রশস্তি—একই পুথিতে কবির নিকট প্রেরিত 'শিলাইদহ-প্রশস্তি' একাধিক সভা-সমিতিতে পঠিত হয়েছে।]

ষষ্ঠ পৃষ্ঠা—

(অলংকরণ—পদ্মের আল্পনা)

শি লা ই দ হ

বিশ্বকবির······চরণ প্রান্তে !"

পর পৃষ্ঠা—

(স্কেচ—মানুষের মুখ)

চিত্র পরিচয় : "অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু," —রবীন্দ্রনাথ

সপ্তম পৃষ্ঠা—

নমো নমো নমো জননী পল্লী, পদ্মা মেঘনা শিলাইদহ,
ঘন বনছায়ে শ্যামলা পল্লী,—হে দেবী, লক্ষ্মী, প্রণাম লহ !
—যদিও মা তুই দীনা কাঙালিনী, ধন জন বলে আজিকে হীন—
—যদিও মা তুই আজ ভিখারিনী—শ্মশান-শয়নে রয়েছ লীন,
—যদিও মা তোর জীর্ণ বক্ষে শকুনী গৃধিনী শিবার বাস—
—বোধন-আরতি মন্দিরে তোর নীরব হয়েছে বারোটি মাস,—
তবু তব নাম ভাবের পূজারী—স্বদেশে বিদেশে শুনেছে আজ,

—তোর সে মহিমা খুঁজে খুঁজে ফিরি তব ঘন বনবীথির মাঝ!
বিশ্বকবির ভাবের ভুবনে তোমার মুগ্ধ স্মৃতিটি জাগে
ভাবের পূজারী লয় তব নাম সম্ভ্রমে অনুরাগের ফাগে।
ধন্য পল্লী, যার কোলে বসি জগতের সেরা মনীষী কবি,
অমর তুলিতে আঁকিলা যাহার মহিমোজ্জ্বল মধুর ছবি।
ছিলে নাকি ওগো শ্মশানচারিণী পুষ্পিত নব মধু নিকুঞ্জ,
যেথায় কোকিল ঝঙ্কার দিল, শুনি অলিকুল ধরিল গুঞ্জ;—
এই কি গো সেই শিলাইদহ—বিশ্বকবির মানসরাজ্য,
মহামনীষার ভাববিভূতিরে দিলো যে মহান সাধনৈশ্বর্য!

পর পৃষ্ঠা—

ধনী নীলকর শেলীসাহেবের নাম অনুসারে 'শিলাইদহ',
কহ মা তোমার প্রাচীন কাহিনী,—কত পুরা স্মৃতি যতনে বহ—
'খোরসেদপুর' তব অন্য নাম,—ত্যাগী ফকিরের নামটি যুক্ত,
দৈব বলেতে স্থাপিলা পল্লী—পদ্মাগর্ভ হইতে মুক্ত।
তোমার বক্ষে 'যুগল সাহা' সে ধনী সদাগর লক্ষপতি,
স্থাপিলা হর্ম্য, কালীমন্দির—দেবদ্বিজসেবী, ধর্মে মতি,
আজ দেখি হায় পড়ে আছে সেই প্রাচীন ভগ্ন ইটের স্তূপ,
'যুগল সাহার পুকুর' রয়েছে—প্রেতভূমি যেন শ্মশান রূপ!
হায় সে কোথায় জগবরেণ্য বাণী কমলার মানসপুত্র,
ভারতখ্যাত ঠাকুর বংশ বাঁধিয়া মহিমা স্বর্ণসূত্র!
নাটোর-নৃপতি 'রামকৃষ্ণের' রাজ-অধিকারে অশনি পাত
বিরাহিমপুরে জমিদাররূপে আসিলেন 'প্রিন্স দ্বারকানাথ'।
প্রজারঞ্জন ব্রতের লাগিয়া সে মহাপুরুষ করিলা ঋণ
কোথা 'মহর্ষি'—সেই ঋণশোধে বিভব ত্যাজিয়া সাজিলা দীন!
সেই দীন শিরে মুকুট পরালো উত্তমর্ণ বণিকগণ,
ধর্মরাজ্যে রাজর্ষিরূপে পূজিলা যাঁহারে বঙ্গজন।

অষ্টম পৃষ্ঠা—

কার তটবাহী পদ্মার তীরে বিশ্বকবির তরণী বাঁধা,
গ্রীষ্মে, শরতে, শীতে, বরষায় কাহার মাধুরী বীণাতে সাধা!
ভারতের ঋষি, দেব বীণাকর 'মহামানবের সাগর তীরে',

'উদার ছন্দে পরমানন্দে' বন্দনাসুর গাহিলা ধীরে !
—এই সে পল্লী, যার পূততট পদ্মা সলিল করিত ধৌত,
কল কলভাষে যাহার বাতাস করিত হর্ষে পরিপ্লুত !
কোন্ সে পল্লী,—সুদূর অতীতে নাটোররাজের পরিপালিতা,
'রানী-ভবানীর' রাজ্যভুক্ত—সেই পূতস্মৃতি বিমণ্ডিতা !
কোথা 'গোপীনাথ' গ্রামের দেবতা, মন্দিরে বসি কত না যুগ,
এই জনহীন পল্লীভবনে ভোগারতি আজো হয় নি মূক !
প্রসাদ যাঁহার সুখেতে ভুঞ্জে, কতশত দীন আতুর অন্ধ,
গভীর নিশীথে অতিথি যেথায় দেখেনিকো দ্বার কখনো বন্ধ !
'তাঁতী কল্যাণ রায়ের' সেবিত ভক্তহিয়ার মাধুরী মাখা,
ভাঙা মন্দিরে আজিও রয়েছে 'রানী-ভবানীর' কীর্তি আঁকা !
কত যুগ ধরি কত ভকতের হিয়ার অর্ঘ্যে অর্চিত
নরনারায়ণ, তোমারি পল্লী আজি নরগণে বর্জিত !

পর পৃষ্ঠা—

কোথা সে প্রাচীন পল্লীসমাজ, লক্ষ হিন্দু মুসলমান,
স্বজাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ধর্মে কর্মে ভক্তিমান !
দুইশত ঘর ব্রাহ্মণ কোথা হিন্দুসমাজ গুরুর মতো,
সমাজের পতি নিজ আদর্শে সমাজ-শুচিতা রক্ষারত—
জেলে ও নাপিত, কামার, কুমার, তাঁতী, গোপ আর কর্মকার,
কত ক্ষত্রিয়, কত কায়স্থ শোভিত করেছে অঙ্গ কার—
কোথা ব্রাহ্মণ গুরুগৃহ-সম নিজ বাসভূমে স্থাপিয়া টোল,
শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায় ঝঙ্কৃত হত শত শিষ্যের কণ্ঠরোল।
জ্ঞান চর্চায় কত পণ্ডিত আপন প্রতিভা বিকাশ করি,
পল্লীভবনে জ্ঞানতপোবনে ঘৃতদীপ শিখা তুলিল ধরি।
পদ্মা গোরাই নদীসংগমে উর্মি নাচিত তা থৈ থৈ,
এখন সেথায় মরুভূর বালি,—সে সলিলরাশি লুকালো কৈ !
কোথায় বাঁধিত বাষ্পীয় যান পল্লীর পাদপদ্ম তলে,
'কুঠীর হাটের' গঞ্জে ভিড়িত পণ্য বহিয়া তরণীদলে।
হায় পদ্মার সে ভীম উর্মি নাচে নাকো আর উল্লাসে,
পুণ্য সলিলা পদ্মার তটে তপ্ত বালুকা নিঃশ্বাসে !

নবম পৃষ্ঠা—

ভেঙে নিল কত ছোট ছোট গ্রাম ভীষণা পদ্মা কীর্তিনাশা,
কত গৃহস্থ পদ্মা মায়েরে সঁপি দিল তার যতেক আশা,
ক্রোশেক দূরের কত বাড়িঘর ভীষণাবর্তে হইল লয়,
'কোটপাড়া' আর 'সদিরাজপুর' চিহ্ন মাত্র হইল ক্ষয়!
আশ্রয় নিলো ভাঙ্‌নিয়া কতো, চাষী গৃহস্থ তোমার কোলে,
তব অঙ্গন পূর্ণ হল মা লাখো ছেলে মেয়ে কণ্ঠরোলে।
পদ্মা তোমার সঙ্গিনী মা গো, কভু ভালোবাসে কভু বা হিংসে,
জলে স্থলে দুই মার কোলে হাসে ধনজনমান খ্যাতি ও বংশে!
আকাশে বাতাসে প্রাসাদে কুটিরে পল্লীহিয়ার শান্তি হাসে,
ধনী নির্ধন চাষী গৃহস্থ স্বর্গ মানিত পল্লীবাসে!
ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ,—পথ বাহি যায় ভাবুক গগন হরকরা,
মূর্খ পিওন, চিঠি বিলি করে, ভাবে গান গায় আত্মহারা।
'মনসাভাসান' গাহিয়া কাঁদালো রসিক গাহেনী 'আমীন সা',
দাড়িমুখো বুড়ো নিজেই সাজিত সতী বেহুলা ও মনসা।
মনোহর সাঁই, ভাটিয়াল গান, বাউলের তান বাতাসে কাঁপে,
একতারাসনে ভাববিহ্বল সাঁই দরদীর কণ্ঠ ছাপে।

পর পৃষ্ঠা—

পল্লীলক্ষ্মীসনে গো কোথায় কলালক্ষ্মীর লাস্য লীলা,
'শশী অধিকারী' কণ্ঠে কোথায় সুধাসংগীত নৃত্যশীলা,
নাট্যশালার জন্মসময়ে কোন্ গ্রামে সুখে নাট্যামোদী,
অভিনয় রসে মুগ্ধ করিত পল্লীর নরনারীর হৃদি!
'চারু অধিকারী' বৃকোদর বেশে রোষ ক্ষোভ ভরে কম্পমান,
পাঞ্চালীরূপে 'সীতা ভট্টরাজ' ডাকে শ্রীকৃষ্ণে অশ্রুম্লান,
কোথা সে রসিক 'গোঁসাই গোপাল', 'রামলাল' গাহে স্তবগান,
কবি-তরজার জয়ী 'রামগতি' বাড়ালো নিজের গ্রামের মান।
কোথা 'অধিকারী বংশধরেরা' গ্রামহিত উন্নতির তরে
স্থাপিলা বিদ্যালয়, পথ আদি,—গ্রামপ্রাধান্য লইলা করে,
তিনদিকে যার তিনটি শহর—'কুষ্টে', 'পাবনা', 'কুমারখালী',
ধনে জনে মানে যার অধিবাসী হয়েছিল কত শক্তিশালী!

যেথায় হিন্দু মুসলমানেরে দিতো সুখে প্রেম-আলিঙ্গন,
হরিনাম স্রোতে চিদানন্দ রসে ভেসে যেতো গৃহ প্রাঙ্গণ !
'স্নানযাত্রা' ও 'রথের মেলায়' কত দেশ হতে মিলিত ভক্ত,
একতাসূত্রে বাঁধা শতপ্রাণ,—গ্রামের স্বার্থ হৃদয়রক্ত।

দশম পৃষ্ঠা—

কোথা গেল আজ সেই মধুময় পল্লীগৃহের বৃন্দাবন,
শূন্য ভিটায় পরিণত হল সুখমেলা কত গৃহাঙ্গন !
কবিগুরু যার রূপের মাধুরী আঁকিলা কাব্যে অমর করি,
সেই 'হাটখোলা', 'নন্দীর গোলা' রয়েছে অতীত স্মৃতিটি ধরি
পূজা পার্বণে বাড়ি বাড়ি কোথা বাজিত কাঁসর শঙ্খ ঢাক,
'জন্দার বাড়ি' বড় মজ্‌লিসে আলাপন হত রাগিণী রাগ।
বারোমাস ধরি তেরো পার্বণে 'অধিকারী বাড়ি' নিমন্ত্রণ,
পুরুষ রমণী দলে দলে বসি করিত মধুর আপ্যায়ন !
'দেওয়ানপাড়া' ও 'কাচারীপাড়ায়' প্রজা জোদ্দার চাষীর মেলা,
'গোপীনাথ দিঘী' চঞ্চল হত পল্লীযুবার সাঁতার খেলা।
কোথা 'কুঠিবাড়ি' দর্শন করে বহু দূরবাসী পণ্ডিতে,
কবিতীর্থেরে কাহারা বাঁধিল শিলাইদহের গণ্ডিতে।
আশ্বিনে জোড়া দুর্গাপ্রতিমা পূজিত 'লখাই জামাদ্দার',
হিঁদু মোস্‌লেম্ সহোদর ভাই বুকজোড়া এই পল্লীমার।
'মুন্সীপাড়ার' জাতিভেদ-ভোলা সেই সুমধুর শিষ্টাচার,
সাধারণ হিতে সদা আগুয়ান বৃদ্ধ 'ইউসুফ্' ও 'আফ্‌সার'।

একাদশ পৃষ্ঠা—

কোথা কবিসম্রাট জমিদাররূপে হরিকীর্ত্তন শ্রবণে রত,
ব্রজের কোকিল গাহে 'শিবু সাহা' মধু ব্রজলীলা রসামৃত !
উৎসবে কোথা লাঠিয়াল মাঝে 'মানিক' 'মেছের সরদার',
কাচারীর মাঠে নানা কৌশলে ঘুরাতো দীর্ঘ হাতিয়ার।
গ্রামের কেন্দ্রে বারোয়ারী পূজা—'কাত্যায়নীর' প্রতিমা গড়ি,
'ষোড়শী' পূজার আমোদোৎসবে সারা গ্রামখানা ভাঙিত পড়ি।
কোথা জমিদার 'সুরেন্দ্রনাথ' নিলা ব্রত গ্রামসংগঠনে,
শ্মশানশয়নে মন্দির রচা—পর্যবসিত বৃথাশ্রমে !

আছে সেই গ্রাম, সেই পথঘাট, সেই গোপীনাথ ঠাকুরবাড়ি,
—সেই তো পদ্মা—'ঠাকুরবাবুর' সেই বিস্তীর্ণ জমিদারী!
পড়িয়া রয়েছে প্রাণহীন শব, শকুনি গৃধিনী শিবায় ঘেরা,
কে বলিবে আজ, ছিল শিলাইদহ কোনো কালে সব গ্রামের সেরা!
গেয়ো নাকো কবি পল্লীর গাথা,—থামাও তোমার ব্যর্থ বাঁশি,
কে শুনিবে আজ ওরে দীনহীন,—তোদের তুচ্ছ বেদনারাশি।
সহরের বুকে দেশনেতা, ধনী—ভারতোদ্ধার প্রমোদে রত,
ভারত বাহিরে ধ্বংস-প্রয়াসী, তোরা যে কুকুর-শৃগাল মতো!

—শচীন্দ্রনাথ অধিকারী

দ্বাদশ পৃষ্ঠা— (অলংকরণ—শিলাইদহ কুঠিবাড়ি-স্কেচ)
চিত্র পরিচয়. "কবিতীর্থেরে কাহারা বাঁধিল শিলাইদহের গণ্ডিতে।"
পর পৃষ্ঠা— (অলংকরণ—পদ্ম ফুল)
চিত্র পরিচয়: "চির নূতনেরে দিল ডাক পঁচিশে বৈশাখ।"—: ১৩৪৫

তুলোট কাগজে পুথির আকারে অলঙ্কৃত এই শ্রদ্ধার্ঘ্য-উপহারের উত্তরে গ্রন্থকারের নিকট রবীন্দ্রনাথের পত্র—

কল্যাণীয়েষু—

শিলাইদহে দীর্ঘকাল তোমাদের সঙ্গে যে আত্মীয়তাসূত্রে যুক্ত ছিলাম, আজো তোমাদের মন থেকে তা ছিন্ন হয়ে যায়নি—তারি প্রমাণ পাওয়া গেল তোমার সুন্দর চিঠিখানিতে। শ্রদ্ধার দান নানাস্থান থেকেই পেয়েছি। তোমাদের অর্ঘ্য সকলের চেয়ে মনকে স্পর্শ করেছে। অনেকবার শিলাইদহ দর্শন করে আসবার চেষ্টা করেছি,—কিন্তু সেই আমার চিরপরিচিত শিলাইদহ এখন আর সেদিনকার সেই আনন্দরূপে প্রতিষ্ঠিত নেই নিশ্চয় জেনে নিরস্ত হয়েছি। তোমরা আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো। ইতি, ৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫।

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি-প্রণাম : ১৩৪৬

কভার— (অলংকরণ—রামধনু)

যাঁহার পুণ্য নাম স্মরণে যুগযুগান্ত
শিলাইদহবাসী ধন্য ও কৃতার্থ,
ভারতের বিস্ময়, জগতের গৌরব, ভারতের বাণীমূর্তি
বিশ্বকবি শ্রীযুক্তরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের
উনআশীতম শুভ জন্মতিথি অনুষ্ঠানে—
শিলাইদহবাসীর
সভক্তি প্রণাম !

২৫শে বৈশাখ, ১৩৪৬ ॥ —শচীন্দ্রনাথ অধিকারী

প্রথম পৃষ্ঠা— (বর্ডারে অলঙ্করণ, মধ্যে প্রস্ফুটিত পদ্মফুল)

প্রণাম ! প্রণাম !

প্রাণের নতি জানায় পদে অনেক দূরের একটি গ্রাম—
হে কবি প্রণাম !
এই গ্রামের কুঞ্জে, পদ্মাতীরে এখনো যে আঁকা তোমার নাম !
ওগো, তোমায় সহস্র প্রণাম ! !
পদ্মাবুকে আজো ভাসে, তোমার সোনার তরণী সে,
পদ্মাচরেই বেঁধেছিলে তোমার স্বর্গধাম !
—আজ দূর থেকে প্রণাম !
আজো যেন সন্ধ্যা, সকাল, শরৎ হেমন্তে,
তোমার মূর্ত্তি ছবির মতো বর্ষা বসন্তে,—
নদীর তীরে, গ্রামের মাঠে, সোনার সাঁঝে নদীর ঘাটে,
আজো জাগে তপঃস্নিগ্ধ যেন ঋষির ছবি !
—সেই সে দৃষ্টি,—সেই সে কপোল,—সেই যেন আজ সবই ।

প্রজা বলে পুত্র বলে অনেক ভালোবাসা,
লক্ষ ছেলের দুঃখ দূরের কতই গভীর আশা ;—
কুঁড়ে ঘরের সেই দেবতা, তাঁর পায়ে আজ দু'টি কথা,—
হে দরদী ! দুঃখজয়ী ! জানাই আজি সঙ্গোপনে—
আঁধার ঘরে আরো আলো চাই যে তোমার জন্মদিনে।
শিলাইদহের নামের সাথে বিশ্বজয়ী নামটি তোমার
থাকুক্ গাঁথা সগৌরবে, যদিও তুমি দেবতা সবার।

শিলাইদহ (নদীয়া)
২৫শে বৈশাখ, ১৩৪৬

—শচীন্দ্রনাথ অধিকারী

এই শ্রদ্ধার্ঘের উত্তরে কোন চিঠি লেখক কবির কাছ থেকে পান নি

শিলাইদহ জমিদারির কর্মিগণের তালিকা

অঘোরলাল মজুমদার—শিলাইদহ মহর্ষি দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার। কোর্ট অব ওয়ার্ডসের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘদিন চাকরি করেন।

অক্ষয়কুমার রায়—শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক। পরে শিলাইদহের ম্যানেজার।

অজিতনাথ নন্দী—ঠাকুর এস্টেটের ল'অফিসার। পরে শিলাইদহ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট।

অনন্তলাল রায়—শিলাইদহবাসী—মহর্ষিদাতব্য চিকিৎসালয়ের কম্পাউণ্ডার, কমিক অভিনেতা।

অনঙ্গমোহন চক্রবর্তী—প্রথমে শিলাইদহ পল্লীসংগঠন-কর্মী, পরে মোটর বোট চালক ও শান্তিনিকেতনে মোটর ড্রাইভার। বোলপুরবাসী।

অন্নদাকুমার মজুমদার—শান্তিনিকেতন কলাভবনের প্রথম যুগের ছাত্র। পরে রবীন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথের হিসাবরক্ষক ও খাজাঞ্চি। শিলাইদহবাসী, বর্তমানে বোলপুরবাসী। এঁর একমাত্র পুত্র শ্রীঅশোক মজুমদার, এম. এ., বর্ধমান রাজ কলেজের অধ্যাপক।

অনাদিচরণ চৌধুরী—ঠাকুর এস্টেটের সার্ভে ইনস্পেকটর। পরে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর ধোবড়াকোল এস্টেটের ম্যানেজার।

অম্বাচরণ মৈত্র—শিলাইদহ সদর কাছারির আমিন।

আইমুদ্দিন বিশ্বাস—শিলাইদহ চরমহালের তহশীলদার।

আতুড়ী খাঁ—সদর কাছারির সার্ভেয়ার।

আশুতোষ মজুমদার—শিলাইদহবাসী। সদর কাছারির হেড মুনশি। কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যু। স্থানীয় স্কুল কমিটির সভ্য ছিলেন।

ইন্দুভূষণ নায়ক—সদর কাছারির হিসাবরক্ষক (Accountant) কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ আমলে চাকুরি ত্যাগ করেন; পুত্র সুধাংশুভূষণ নায়ক, বি. এস. সি., ঐ পদে কাজ করেন ও পরে শিক্ষকতা করেন।

এডওয়ার্ড সাহেব—কাহিনী দ্রষ্টব্য, পৃ: ৮৫—৮৯

কেদারনাথ অধিকারী—ঠাকুর এস্টেটের রাজসাহী মোকামের (কালীগ্রাম পরগণা) আমমোক্তার ও রেভিনিউ এজেন্ট। এঁর পুত্রকন্যাদের মধ্যে

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ অধিকারী—রেলের একজন উচ্চপদস্থ চাকুরে। ইনি ধানবাদ সহরে একটি 'অধিকারী পল্লী' সৃষ্টি করেছেন।

কেদারনাথ লাহিড়ী—কিছুকাল শিলাইদহের ম্যানেজার। পরে কলকাতা সদর আপিসের বিশিষ্ট কর্মচারী।

কেশবচন্দ্র বিশ্বাস—শিলাইদহের জমানবিশ।

খোসালচন্দ্র মজুমদার—কবিরাজ। (সর্বপ্রথম এস্টেটের ডাক্তারখানায় কবিরাজী চিকিৎসা প্রচলিত ছিল)। এঁর বংশধরেরা কলকাতায় কবিরাজী করেন।

গোপালচন্দ্র মজুমদার—শিলাইদহবাসী। মহর্ষিদেবের আমলের সদর কাছারির খাজাঞ্চি। এঁর পুত্র আশুতোষ, পৌত্র অন্নদাকুমার ঠাকুরবাবুদের কর্মচারী।

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—কলকাতা জোড়াসাঁকো ভবনে সমস্ত শরিকদের হিসাব-রক্ষক ও এজমালি খাজাঞ্চি। পরে রবীন্দ্রনাথের অংশের খাজাঞ্চি-রূপে শান্তিনিকেতনে যান, সেখানেই মৃত্যু। মহর্ষিদেবের আমলের খাজাঞ্চি যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র।

চন্দ্রময় সান্যাল—কাহিনী দ্রষ্টব্য, পৃ: ১৯১—১৯৬

জানকীনাথ রায়—'জানকী রায়' কাহিনী দ্রষ্টব্য, পৃ: ১৫০—১৬২

জয়নালউদ্দিন—চর বিভাগের আমিন।

জ্যোতিশচন্দ্র চক্রবর্তী—শিলাইদহবাসী। সদর কাছারির হেড মুনশি। অভিনেতা।

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—শিলাইদহের জমানবিশ (অস্থায়ী), প্রবীন সাহিত্যিক। কিছুদিন কাজের পর কলকাতা বাস করেন।

তারকনাথ অধিকারী—ঠাকুর এস্টেটের পাবনা মোকামের আমমোক্তার ও রেভিনিউ এজেন্ট, এঁর সম্বন্ধে অনেক তথ্য গ্রন্থের কাহিনীগুলিতে আছে।

দক্ষিণারঞ্জন মজুমদার—শিলাইদহে বিভিন্ন পদে কাজ করেন, শান্তিনিকেতনেও কাজ করেন। নাট্যামোদী। বর্তমান গ্রন্থের অনেক কাহিনীতে এঁর উল্লেখ আছে।

দ্বারিকানাথ বিশ্বাস—জানিপুরবাসী, মোকদ্দমা তদ্বির করেন—দ্র. 'জানকী-রায়' কাহিনী।

দুর্গানাথ গুহ—ঠাকুর এস্টেটের ল' অফিসার।

নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (মামাবাবু)—রথীন্দ্রনাথের মাতুল। শিলাইদহের সাবম্যানেজার, পরে কালীগ্রামের ম্যানেজার।

নলিনীকান্ত চক্রবর্তী—বিভাগীয় ম্যানেজার।

নলিনীকান্ত ভৌমিক—প্রথমে শান্তিনিকেতনের ছাত্র, পরে জমা-সেরেস্তার হেড্‌মোহরার।

নিবারণচন্দ্র মজুমদার—মহর্ষি দাতব্য চিকিৎসালয়ের হেড কম্পাউণ্ডার। এঁর যাত্রার দল ছিল।

পূর্ণচন্দ্র বাগচি—প্রথমে শান্তিনিকেতনের শিক্ষক, পরে শিলাইদহের সার্ভে-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট।

পূর্ণচন্দ্র দত্ত—সার্ভেয়ার, পরে চাঁচোল রাজ এস্টেটের সার্কল অফিসার। শিবনাথ দত্তের পুত্র।

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত—কবি। শিলাইদহ ও কালীগ্রামের বিভাগীয় ম্যানেজার।

নিতাই রায় (নিত্যানন্দ রায়)—রাজপুতবংশীয়। প্রথম জীবনে বরকন্দাজরূপে চাকুরিতে যোগ দেন, পরে প্রতিভাবলে নায়েবের পদে উন্নীত হন। চর মহালে নায়েবিপদে অধিষ্ঠানকালে পদ্মায় কোন নৌকাডুবিতে ভাগ্য পরিবর্তিত হয়। ধনী-জোদ্দার নিতাই রায় নামে প্রসিদ্ধ হন। বাড়ি মাজগ্রাম।

বামাচরণ বসু—সুশিক্ষিত প্রবীন ম্যানেজার, বৈষ্ণবশাস্ত্রাভিজ্ঞ। পরে কাশিম-বাজার-রাজ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর জমিদারির ম্যানেজার।

বামাচরণ ভট্টাচার্য—মহাফেজ (Record-keeper)। ইনি রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে ছড়া ও পল্লীগীতি প্রভৃতি সংগ্রহ করতেন। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত লালন ফকিরের বাউল গানের খাতা এঁর হাতে লেখা।

বসন্তকুমার সরকার—মোকদ্দমা-ইনস্পেক্টর। শিলাদহবাসী। লেখকের শ্বশুর।

বিপিনবিহারী বিশ্বাস—বি. এল., শিলাইদহের ম্যানেজার। অনেক জনহিতকর কাজ করেন, মণ্ডলীপ্রথা পরিচালনা করেন ও পরে কর্মত্যাগ করেন।

বিনোদবিহারী রায়—প্রথমে বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষক, পরে মহাফেজ। কোর্ট অব ওয়ার্ডস্‌ আমলে ক্যাশিয়ার। বাড়ি বরিশাল জেলায়, ৺সতীশ-চন্দ্র রায়ের আত্মীয়। এক পুত্র শ্রীবিজন ঘোষ রায় আনন্দবাজার পত্রিকার সাবএডিটার। স্বগ্রামে সম্প্রতি রাজাকরের গুলিতে এঁর মৃত্যু হয়েছে।

বীরেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী—বিভিন্ন পদে কাজ করেন ও পরে কালীগ্রামের ম্যানেজার হন ও বিভিন্ন জনহিতকর কর্মে নিযুক্ত থাকেন।

বীরেন্দ্রলাল রায়—কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর আমলে ঠাকুর এস্টেট ও কৃষ্ণনগর রাজ এস্টেটের জয়েণ্ট ম্যানেজার। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র।

ভূপেশচন্দ্র রায়—শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক, পরে শিলাইদহে বিভাগীয় ম্যানেজার। স্বর্গীয় অধ্যাপক সতীশচন্দ্র রায়ের ভ্রাতা।

মহিমচন্দ্র সরকার—'মুন্‌শিবাবু' কাহিনী দ্রষ্টব্য, পৃ ১৩৯-১৪৪।

মইজুদ্দিন বিশ্বাস—চরমহালের নায়েব।

মুনীন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী—শিলাইদহ ও কালীগ্রামের জমার পেস্কার, কবি।

যোগেন্দ্রনাথ নাগ (সরকার)—শিলাইদহের এক্‌জাইনবিশ। অভিনেতা।

যোগেশচন্দ্র সরস্বতী—শিলাইদহের জমানবিশ, পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের জামাতা।

রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রথমে শান্তিনিকেতনে পরে শিলাইদহে দেবোত্তর সম্পত্তির নায়েব ও মাইনর স্কুলের শিক্ষক। এঁর পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ লেখকের সহপাঠী ও প্রখ্যাত শিল্পী, পৌত্র শ্রীমান সোমেন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও সুসাহিত্যিক।

রমণীমোহন নন্দী—শিলাইদহের খাজাঞ্চি ও পরে দেবোত্তর সম্পত্তির নায়েব।

রতিকান্ত দাস—বিভাগীয় নায়েব, পরে চর-মহালের বিচক্ষণ নায়েব।

ললিতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—মহর্ষি দাতব্য চিকিৎসালয়ের জনপ্রিয় ডাক্তার। ইনি রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মীয়। আমলাতন্ত্রের চক্রান্তে এঁর চাকরি যায়। গ্রামের মধ্যে চিকিৎসা শুরু করেন। পরে কুষ্টিয়াবাসী হয়ে যান।

ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়—অ্যাডভোকেট, ঠাকুর এস্টেটের (কৃষ্ণনগরের) প্রবীণ উকিল।

শরৎচন্দ্র সরকার—পেস্কার (সেকেণ্ড অফিসার), রবীন্দ্রনাথের বিশ্বস্ত প্রিয়পাত্র। আজীবন চাকুরি করেন ও শিলাইদহে বাস করেন।

শিবনাথ দত্ত—শিলাইদহ দত্ত-পরিবারের কর্তা। খাজাঞ্চি। দক্ষতা ও বিশ্বস্ততার জন্য বাইশ বিঘা লাখেরাজ জমি পুরস্কার পান। জোদ্দার।

সতীশচন্দ্র দত্ত—মহর্ষি দাতব্য চিকিৎসালয়ের বিচক্ষণ ডাক্তার। সুসাহিত্যিক ও অভিনেতা। পরে চাঁচোল রাজ এস্টেটের মেডিক্যাল অফিসার ও বিখ্যাত

সমাজকর্মী। জ্যেষ্ঠপুত্র ডাঃ সরোজেন্দ্রনাথ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের শারীরবিজ্ঞানের অধ্যাপক ও সুকবি।

সতীশচন্দ্র সরকার—ডিহি-কাছারির নায়েব। প্রহসন-অভিনেতা।

সতীশচন্দ্র ঘোষ—প্রথমে সার্ভেয়ার, পরে বিভাগীয় ম্যানেজার। পার্টিসনের পরেই শিলাইদহের ম্যানেজার।

সত্যকুমার মজুমদার—হিন্দুস্থান ইন্স্যুয়োরেন্সের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। ইনি শিলাইদহ কাছারির 'সেক্রেটারি' পদে কাজ করেন।

সুবোধচন্দ্র মজুমদার—শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক; 'পঞ্চপ্রদীপ' গ্রন্থের লেখক। শিলাইদহের ম্যানেজার থাকাকালে এঁর কন্যা লতিকা জনৈক কর্মচারীর অসাবধানতায় বন্দুকের গুলিতে মারা যান। সুবোধবাবু শিলাইদহ ত্যাগ করে রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হন। ইনি শান্তিনিকেতনের সন্তোষ মজুমদারের আত্মীয়।

সুরেন্দ্রলাল মজুমদার—শিলাইদহে বিভিন্ন পদে কাজ করেন, কলকাতা ও শান্তিনিকেতন আপিসে দীর্ঘকাল সদর-মুন্সিপদে কাজ করেন, সুঅভিনেতা। বোলপুরে বাড়ি করেন। দুই পুত্র বিশ্বভারতী ও সরকারি খাদ্যবিভাগে চাকুরি করেন। পুত্র সত্যব্রত বি. এ., সুকবি, যৌবনে মৃত।

সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—সদর কাছারির জমা-সেরেস্তার মোহরার।

হরমোহন নন্দী—শিলাইদহ সদর কাছারির খাজাঞ্চি। বিচক্ষণ জোতদার। নির্দিষ্ট কাজ বাদেও ঐ অঞ্চলে ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ছিট-মহালের ভারপ্রাপ্ত। দীর্ঘকাল পেনসন পেয়েছেন।

হরিনাথ রায়—মহর্ষিদেবের আমলের নায়েব। নিঃসন্তান। শ্রীনিকেতনের কর্মী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়কে দত্তকপুত্র হিসাবে প্রতিপালন করেন।

হর্ষনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সদর কাছারির সার্ভেয়ার।

হরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়—সহকারী জমানবিশ। সুসাহিত্যিক। রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের উপসংহার 'নৌকাডুবির পরে' রচয়িতা। শান্তিনিকেতনেও শিক্ষকতা করেন। এঁর পুত্র সুকবি শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বর্তমানে কলিকাতাবাসী। হরেন্দ্রনারায়ণ শিলাইদহের সাহিত্যিকদের কাছ থেকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি পেয়েছিলেন।

হারাণচন্দ্র রায়—ইনি 'হারাণ পেশকার' নামে সমধিক পরিচিত। সাজাদপুরের পেশকার, বৃদ্ধ বয়সে অবসরপ্রাপ্ত।

হীরালাল সেন—বিপ্লবী। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ছিলেন। রাজরোষে পড়ায় রবীন্দ্রনাথ এঁকে প্রথমে শিলাইদহে ও পরে কালীগ্রামে জমানবিশের পদে বহাল করেন।

হৃদয়নাথ ভৌমিক—কয়া-নিবাস। আজীবন তহশীলদার। তিন পুত্র বৈদ্যনাথ, রমেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ—সকলেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত। কয়া কাছারি পূর্বে এঁর বাড়িতে বসত।

[দ্রঃ পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদানন্দ রায় প্রভৃতি একদা শিলাইদহ জমিদারির কর্মী ছিলেন। তাঁদের নাম এই তালিকায় দেওয়া হল না।]

সংযোজন : পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ও তৎকালীন অধিবাসিবৃন্দ

কুষ্টিয়া—মোহিনীমোহন চক্রবর্তী, কাপড়ের মিলের প্রতিষ্ঠাতা ; তাঁর পুত্রগণ গিরিজাপ্রসন্ন, রমাপ্রসন্ন ও জ্ঞানদাপ্রসন্ন চক্রবর্তী। গর্ডন সাহেব—রেলওয়ে ওভারসিয়ার, রেনউইক্ ও ফার্গুসন সাহেব—আখমাড়াই কলের মালিক ও পরিচালক। জগদ্বিখ্যাত আইনবিদ ড. রাধাবিনোদ পাল (আলামপুর)। মঃ কওসের আলি—ইট্-সুড়কি-কলমালিক ও কণ্ট্রাকটর। ডাক্তার গোকুলচন্দ্র মণ্ডল। তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমসার পাচন ও নিমসার প্রেসের মালিক। ক্ষিতীশচন্দ্র সান্যাল (অগ্নিযুগের বিপ্লবী)। ড. হরগোপাল বিশ্বাস (শুকদেবপুর)—বেঙ্গল কেমিক্যালের চীফ কেমিস্ট। হরেন্দ্রচন্দ্র ঘটক—ছাপাখানার মালিক (কুষ্টিয়ায় প্রথম) ও ব্যবসায়ী। দক্ষিণারঞ্জন আচার্য—জমিদার, ব্যাঙ্কার, বিদ্যোৎসাহী। এঁর পুত্র সরোজরঞ্জন আচার্য প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক, রাজনৈতিক কর্মী, পরে আনন্দবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক। গিরিজাশঙ্কর আচার্য—শিক্ষক, পুত্র বিভূতিভূষণ আচার্য শিক্ষক, দক্ষ অভিনেতা। মহতাব উদ্দিন আহমদ—কুষ্টিয়া জেলার পাবলিক প্রসিকিউটর, সুগায়ক। ডাক্তার বীরেন চক্রবর্তী—সাহিত্যামোদী। উপেন্দ্র ও হরেন্দ্রনাথ প্রামাণিক—উকিল, ব্যাঙ্কার। গোপীপদ চট্টোপাধ্যায়—প্রবীণ হেডমাস্টার। খগেন্দ্রনাথ মিত্র—প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক ও গবেষক। সরোজবন্ধু সান্যাল—প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক। জগবন্ধু পাল—ব্যবসায়ী, বিদ্যানুরাগী। বীরেন্দ্রনাথ পাল—

সরকারি কর্মচারী। দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বি. এল.—'দীপিকা' সম্পাদক ও উকিল

কয়া—ডাঃ হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, বসন্তকুমার অনাথবন্ধু ও ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় উকিল; ললিতকুমারের পৌত্র সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রাভিনেতা। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাযতীন) মাতুলালয় কয়ায়।

কুমারখালি—তান্ত্রিকসাধক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব। গ্রামবার্তা সম্পাদক সাধক কাঙাল হরিনাথ মজুমদার। সাহিত্যিক জলধর সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (পরে রাজসাহীবাসী, রবীন্দ্রবন্ধু)। কবি সাহাজি। মথুরামোহন কুণ্ডু—জমিদার ও ব্যাঙ্কার। পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী (যদু বয়রা) পুলিশ কমিশনার, কলিকাতা। রাধিকাপ্রসাদ সান্যাল, কলকাতা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট। ডাক্তার কুঞ্জলাল সান্যাল, প্রমথনাথ চক্রবর্তী, রজনী কুণ্ডু। প্রফুল্লকুমার সরকার (এলঙ্গী) আনন্দবাজার পত্রিকা-সম্পাদক। ভোলানাথ মজুমদার, কবি সাহিত্যিক, কাঙাল হরিনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র।

হিজ্‌লাবট—(গোরাই তীরে) অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, ডাঃ সত্যসখা মৈত্র।

লাহিনীপাড়া—কুষ্টিয়া সহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে মীর মোশারফ হোসেন, বিষাদ-সিন্ধু রচয়িতা কবি ও মোক্তার। বসন্তকুমার পাল, লেখক।

চাপড়া—ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও বিনয়লাল মজুমদার, হৃষিকেশ মজুমদার, শিক্ষাবিদ্। প্রিয়নাথ মৈত্র, প্রধান শিক্ষক।

ছেঁউড়িয়া—(গোরাই তীরে কুষ্টিয়া সহরের পূর্বে) মহাত্মা লালন ফকির ও তাঁর শিষ্যগণ। (বর্তমানে তাঁর দরগায় 'লালন-মন্দির' প্রতিষ্ঠিত)।

খোক্সা—প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক কাজি আবদুল ওদুদ (কণ্ঠগজরা)। মহর্ষিদেবের আমলের বর্ষীয়ান নায়েব ও জোদ্দার রজনী বসু। আশুতোষ ঘোষ কনট্রাকটর।

জানিপুর—প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া শিবনাথ সাহা (শিবু সাহা, কমলাপুর) শরৎচন্দ্র চৌধুরী, কবি ও সাহিত্যিক। মহাদেব সাহা, ব্যবসায়ী। চৈতন্য সাহা, এম. বি. ডাক্তার। সরোজরঞ্জন চৌধুরী, কবি।

পাবনা—যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র, শিলাইদহের জমিদার। রণজিৎ লাহিড়ী, এ্যাড্‌ভোকেট ও পাবনা এড্‌ওয়ার্ড কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ। বনমালী রায়চৌধুরী, রায়বাহাদুর; তারাসের জমিদার। জ্ঞানদাগোবিন্দ চৌধুরী,

জমিদার, তাঁতি-বন্ধ। তারকনাথ প্রামাণিক ব্যবসায়ী, শালগড়িয়া (কল্যাণ রায় দ্র. পৃ ৩৬৮-৩৭১) গিরীশচন্দ্র রায়, এ্যাডভোকেট। বিখ্যাত হোমিও-প্যাথিক ডাক্তার জগৎচন্দ্র রায়, ডাঃ গৌরীপ্রসন্ন রায়। পণ্ডিত গোপালচন্দ্র কাব্যতীর্থ, সপ্ততীর্থ, অধ্যক্ষ, পাবনা দর্শন-টোল (শিলাইদহের অধিবাসী)। প্রসিদ্ধ ধনী 'ট্যানা বাগ্‌চি'। আবদুল হামিদ—চর রামচন্দ্রপুরের জমিদার। তারকনাথ অধিকারী, লেখকের জ্যাঠামশায়। মেজর জেনারেল জে. এন. চৌধুরী।

দোগাছি—(পাবনার অদূরে পদ্মাতীরে) পঞ্চুবাবু, তিলি জমিদার, নাট্যামোদী।

হিমাইতপুর—(পদ্মাতীরে) ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সৎসঙ্গ-আশ্রম।

চরঘোষপুর—(শিলাইদহের উত্তরে) গবেষক লেখক অধ্যাপক মনসুর-উদ্দিন।

সুলতানপুর—(শিলাইদহের পশ্চিমে) সামসুদ্দিন আহমদ, লীগ আমলের মন্ত্রী ও এ্যাডভোকেট।

দয়ারামপুর—নাটোরের রাজার জমিদারি। এখানকার ঘোষবংশ বিখ্যাত। কেষ্ট ঘোষ।

হাসিমপুর—মুন্‌সি আবদুল গনি, জমিদার ও ব্যবসায়ী। কেদারনাথ রায় (কল্যাণপুর)।

হরিনারায়ণপুর—(কুষ্টিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম) প্রসিদ্ধ গবেষক, অধ্যাপক (রবীন্দ্র-ভারতী) রবীন্দ্র-পুরস্কারপ্রাপ্ত, 'বাংলার বাউল ও বাউলগান', 'রবীন্দ্র-কাব্যপরিক্রমা', 'রবীন্দ্র-নাট্যপরিক্রমা', 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ও ছোট গল্প' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা। ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ডি. ফিল., পি. এইচ. ডি। অনন্ত ভট্টাচার্য, কলিকাতা কর্পোরেশনের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, বর্তমানে বেলেঘাটা জোড়ামন্দিরের অধিবাসী।

ধলনগর—(গোরাই কালীনদীতীরে) বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ হেড মাস্টার বিহারী-লাল চক্রবর্তী। এখানে প্রাচীন নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

কালবেড়িয়া—অটলবিহারী সাহা, ধনী ব্যবসায়ী। গোষ্ঠবিহারী সাহা, শিক্ষক।

চৌরহাস—বিহারীলাল সেন, রেলওয়ে কনট্রাকটর। বিপ্রদাস সেন, ব্যবসায়ী।

শিলাইদহের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবন

কাব্য ও কর্মের সমাবেশে বিশাল বিপুল রবীন্দ্রমানস সাগরসংগমে মিশেছে তাঁর শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীতে; এখানে কবির 'ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ'। রবীন্দ্রমানসের উৎস পদ্মা-গোরাই-বিধৌত গ্রামীণ সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান শিলাইদহ অঞ্চলেও প্রবাহিত হয়েছে। এই শান্ত ধীর পরিবেশ থেকে তিনি কি রসাস্বাদন করেছিলেন, কি ধনে ধনী হয়েছিলেন, তার কিঞ্চিৎ আলোচনা হয় তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

শিলাইদহ অঞ্চল প্রাচীন বঙ্গসংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। এই গ্রামের অদূরে ছেঁউড়িয়া গ্রামে বঙ্গবিখ্যাত মরমি বাউল ফকির লালন সাহেবের আবির্ভাব হয়েছিল। এই গ্রামেই মরমি পল্লীকবি গগন হরকরা ও গোঁসাই গোপালের বাসস্থান, এই গ্রামের সন্নিকটে কুমারখালিতে সাধক, কাঙাল হরিনাথ মজুমদার, তান্ত্রিকাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, দধি মাস্টার (কবিগান গায়ক) বিষাদসিন্ধু-রচয়িতা মীর মোশারফ্ হোসেন (বাড়ি মোহিনীপাড়া) প্রভৃতি বঙ্গসংস্কৃতির ধারক ও বাহকগণের কর্মস্থল ছিল। সমসাময়িক সাহিত্যিক জলধর সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি এই অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। এই সমুদয় অঞ্চলটিই রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ জমিদারি-ভুক্ত ছিল। রবীন্দ্রনাথ যে প্রদীপটি এই পল্লীকুটিরে জ্বেলে রেখে গিয়েছিলেন, এই গ্রামে সেই প্রদীপের শিখা তাঁর উত্তরাধিকারিগণ বহুদিন পর্যন্ত অনির্বাণ রাখতে চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এইখানেই বৈষ্ণব, বাউল, সহজিয়া সাধক, ভাবুক ও মুসলমান দরবেশদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগ স্থাপন করবার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং নিজে বাউল গানের (রবি বাউল) অনুরাগী হয়েছিলেন। রবীন্দ্র বনস্পতির শিকড় এই পল্লী অঞ্চলের মাটির গভীরে অদৃশ্য হয়ে আছে; আজও শুকিয়ে যায় নি।

সুবিখ্যাত কীর্তনগায়ক শিবু সাহা (শিবনাথ সাহা) শিলাইদহ জমিদারির জানিপুরের প্রজা। শুধু কীর্তনগায়ক হিসেবে নয়, বৈষ্ণব শাস্ত্রেও ছিল তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। সে সময়কার ম্যানেজার বামাচরণ বসু ছিলেন সুশিক্ষিত বৈষ্ণব তত্ত্ব-রসিক। শিবু সা প্রায়ই আসতেন রবীন্দ্রনাথের কাছে নিমন্ত্রিত হয়ে

নিভৃতে বৈষ্ণবশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করবার ও পদাবলী কীর্তন শোনাবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ বন্ধুগণসহ শিবু সার কীর্তন শোনবার জন্য সদর কাছারির দক্ষিণস্থ প্রাঙ্গনে একটি সুন্দর কদম্ববৃক্ষের চারিদিকে গোলাকৃতি চাতাল তৈরি করেন। সেটি এখনও আছে। ঐটির তিন পাশে অনেকগুলি গন্ধরাজের গাছ ছিল। শিবু সাহাকে রবীন্দ্রনাথই কলকাতা সহরে সুপরিচিত করেছেন। গগনেন্দ্রনাথদের বাড়িতে, কাশিমবাজার ও নাটোরের রাজবাড়িতে শিবু সাহা কীর্তনগানে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে দিতেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও শিবু সার অনুরাগী হয়ে পড়েন এবং শিবু সা নবদ্বীপেও একজন শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়া বলে সুপরিচিত হয়েছিলেন। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন শিবু সার কীর্তন সম্বন্ধে সাময়িক পত্রাদিতে প্রবন্ধ লেখেন।

সদর কাছারিতে প্রতি বৎসর পুণ্যাহ উপলক্ষে শিবু সার কীর্তন ও লালন-সাহী ফকির সম্প্রদায়ের বাউল গান হত নিয়মিত। মথুর সা ও ত্রৈলোক্য-তারিণীর যাত্রাগানও আমরা পুণ্যাহ উপলক্ষে কয়েকবার শুনেছি। ঐ উপলক্ষে বরকন্দাজ ও ঐ অঞ্চলের লাঠিয়ালদের লাঠিখেলাও রবীন্দ্রনাথ আচার্য জগদীশ বসু ও মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে বসে দেখতেন। মেছের সর্দার, মধু মাল, কেতু ঢালি, আহাদালি, হয়ধর সর্দারেরা লাঠি-তলোয়ার-ঢাল-সড়কির খেলা দেখিয়ে দর্শকদের চমৎকৃত করে দিত। লাঠিখেলার তালে তালে ঢোল বাজানো হত। স্কুল ইনস্পেকটর অঘোরনাথ অধিকারী বেড়াতে আসতেন মাঝে মাঝে,। তাঁকে আমার দাদারা 'বিল্বমঙ্গল' অভিনয় দেখিয়েছেন। আমরা আমাদের আমলে (সম্ভবত ১৩৪৫ সালে) রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে কবির 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয় করেছিলাম মহাসমারোহে, আর একবার 'বৈকুণ্ঠের খাতা'।

দুঃখের বিষয়, সে সময়কার মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আনন্দোৎসবের কথা আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, কিন্তু গ্রামের যে কোন যাত্রা থিয়েটারে মুসলমান দর্শক-সংখ্যা থাকত প্রচুর। খোরসেদ ফকিরের ও দবিরের দরগায় বড় মেলা হত। সেখানে গ্রামের কীর্তনের দল উপস্থিত হলে কেউ আপত্তি করতেন না। হিন্দু-মুসলমানে এত সদ্ভাব ছিল যে, ভদ্র ও নমশূদ্র পাড়ায় চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী মহোৎসবে মুসলমানেরা দলে দলে যোগ দিতেন, আনন্দ করতেন। সত্য-নারায়ণ (সত্যপীর) পূজার 'মথিত' (সিন্নি) প্রসাদ খেতে তাঁরা আপত্তি করতেন না, পাঁচালিও শুনতেন। দাদাদের কাছে শুনেছি, মুসলমান লথাই

জমাদ্দারের বাড়িতে জোড়া দুর্গাপূজা হত, মুসলমান আমীন সার বিখ্যাত মনসা-ভাসানের দল ছিল, বুড়ো দাড়িমুখো আমীন সার ভাসান যাত্রার গান আমিও শুনেছি।

কলকাতায় সাধারণ রঙ্গ-রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পরেই শিলাইদহে যাত্রার দল নাট্যালয়ে রূপান্তরিত হয় ও 'প্রহ্লাদচরিত্র' অভিনয় হয়। গোপীনাথদেবের রাস ও দোলযাত্রায় প্রতি বৎসর গোপীনাথ-প্রাঙ্গণে শশী অধিকারী, মথুর সা প্রভৃতির যাত্রা, মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রা হত। কাত্যায়নী ও ষোড়শী (রাজরাজেশ্বরী) মেলার উৎসবাদির বিষয় আমি অন্যত্র উল্লেখ করেছি।

এই সম্পর্কে পরলোকগত প্রসিদ্ধ গবেষক, সুপণ্ডিত অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের রবীন্দ্র-পুরস্কার-প্রাপ্ত বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাংলার বাউল ও বাউলগান' থেকে কিছু অংশ পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দিচ্ছি—

'তারপর লালনের গান সংগ্রহের ও লালনসাহী ফকিরদের সংস্পর্শে আসিবার বিশেষ সুযোগ ঘটে শিলাইদহে নিখিল বঙ্গ পল্লীসাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে। কুষ্টিয়া অঞ্চল কেবল ভৌগোলিক সংস্থানের জন্যই নহে, অন্যান্য বিশেষ কারণেও নদীয়া, যশোহর, পাবনা, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলার কেন্দ্রস্থল।

'এই অঞ্চলের সমস্ত ফকির ও বৈষ্ণবদের এবং এইসব পল্লী-শিল্পীদের উৎসাহ ও প্রেরণা দিবার জন্য আমরা কয়েকজন মিলিত হইয়া ইহাদের সমাবেশের একটা ব্যবস্থা করি। কবিতীর্থ শিলাইদহ এই সমাবেশের স্থান নির্দিষ্ট হয় এবং নিখিল বঙ্গ পল্লী-সাহিত্য সম্মেলন নামে এক সম্মেলন আহূত হয় ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে। বাংলার নানাস্থান হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া সাহিত্যিকগণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন এবং সপ্তাহব্যাপী বাউল গান, কবি গান, জারি গান, মনসার ভাসান গান, গাজির গীত প্রভৃতি উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলাম আমি এবং সম্পাদক ছিলেন শিলাইদহবাসী সুসাহিত্যিক শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী। শচীন্দ্রবাবুর অদম্য উৎসাহ, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অপূর্ব সংগঠনশক্তিতে এই সম্মেলন এই অঞ্চলের একটি স্মরণীয় ঘটনা হইয়া রহিয়াছে। ইহার দীর্ঘ বিবরণ ও কতকগুলি ফটো ইং ৩১।৩।৪০ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।' * * *

—বাংলার বাউল ও বাউল গান, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২-৩

সাহিত্য সম্মেলন বাংলাদেশে বহুদিন থেকে প্রচলিত আছে, কিন্তু বঙ্গ-

সংস্কৃতির এই বিশিষ্ট অভিনব শাখার সম্মেলন ও উৎসব এই প্রথম। এর পরের বছরে স্বর্গীয় কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক অনুরূপ একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন তাঁর পল্লীভবনে। আমাদের এই উৎসব উপলক্ষে আমরা শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ প্রার্থনা করি এবং কবির যে অপূর্ব আশীর্বাণী পাই—তা 'কবির শিলাইদহ-স্মৃতি ও প্রশস্তি'তে উল্লিখিত হয়েছে। পরেও তাঁর জীবিতকাল পর্যন্ত এই দরিদ্র গ্রামবাসীরা পল্লীসংস্কৃতি সম্মেলনের ঐতিহ্য রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন নানা পল্লীসংগঠন কর্মোপলক্ষে—

১. কবির তিরোধানের পর বছরেই ১৯৪২ সালের ১৪ই মার্চ থেকে সপ্তাহব্যাপী বিরাট পল্লীসংগঠন, সম্মেলন, উৎসব ও প্রদর্শনী।

২. 'গ্রামোন্নতি সম্মেলন'—মহকুমাভিত্তিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি-বিষয়ক সম্মেলন ও উৎসব; ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান।

৩. স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি ও সমবায়-প্রদর্শনী ('গ্রামে ফেরো' নাট্যাভিনয় ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসে)।

রাখীবন্ধন উৎসবের সময়ে শিলাইদহ অঞ্চলের যে নাট্যসমাজ রবীন্দ্রনাথের দেওয়া 'বঙ্গলক্ষ্মী নাট্যসমাজ' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই নাট্যসমাজ পরবর্তী ত্রিশ-বত্রিশ বছরে চন্দ্রগুপ্ত, সাজাহান, জয়দেব, মেবার পতন, বলিদান, বিসর্জন, বৈকুণ্ঠের খাতা, বাঙালি, কৃতান্তের বঙ্গদর্শন, চণ্ডীদাস, প্রফুল্ল, জনা, মিশরকুমারী প্রভৃতি নানা ভাবধারার প্রায় চব্বিশখানি নাটকাভিনয় করে এতদঞ্চলে একটি আদর্শ নাট্যসংস্থায় পরিণত হয়েছিল। কুষ্টিয়া সহরের পরিমল রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা উৎসবেও এই সংস্থা অংশ গ্রহণ করেছিল।

আমাদের আমন্ত্রণে পদ্মার সঙ্গে গ্রাম্য ড্রেনের যোগাযোগ পরিদর্শনে আগ্রহান্বিত তৎকালের ডাইরেক্টর অব পাবলিক হেলথ, ডাক্তার সি. এ. বেনটলি ও সেচ-বিশেষজ্ঞ স্যর উইলিয়ম উইলকক্স শিলাইদহ দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু অন্যত্র জরুরি প্রয়োজনের তাগিদে তাঁদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না। পল্লীবন্ধু ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (নিখিল বঙ্গ সমবায় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক) দু'বার শিলাইদহে এসে আমাদের নানা ভাবে উৎসাহিত করেন। কলকাতা সরোজনলিনী নারীমঙ্গল-সমিতির একটি শাখা শিলাইদহে প্রতিষ্ঠিত হয়, স্থানীয় কাঁথাশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন সরবরাহ করে প্রথম ও আরও তিনটি পুরস্কার আমাদের মহিলাসমিতি লাভ করে এবং এখানকার তিনখানা কাঁথা বিলাতে পাঠান তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের পত্নী শ্রীমতী লীলা রায়। আমাদের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ প্রায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই শিলাইদহে উপস্থিত হয়ে আমাদের উৎসাহিত করেন।

ক্রমবর্ধমান পল্লীত্যাগের ফলে গ্রাম প্রায় লোকশূন্য হওয়ায় তার প্রতিকারের জন্য 'লোক-বসতি সংসদ' গঠন করে আনন্দবাজার পত্রিকায় ঐ মর্মে আবেদন প্রচার করে আগ্রহীদের জমির ব্যবস্থা করা হয়। সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এর কিছুকাল পরেই শিলাইদহ পাকিস্তানভুক্ত হওয়ায় কবিতীর্থের আকর্ষণ ক্ষীণ হয়ে যায়। আনন্দের কথা, বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার কবিতীর্থ শিলাইদহকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হয়েছেন।

পল্লীসাহিত্য সম্মেলন সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য

যুগান্তর, ১৯ চৈত্র ১৩৪৬

নিখিল বঙ্গ পল্লীসাহিত্য সম্মেলন

শিলাইদহে প্রথম অধিবেশন

কবিগুরুর কবিকুঞ্জ কুঠিবাড়ী সংরক্ষণ সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ।

বিগত ৯ই, ১০ই ও ১১ই চৈত্র মহাসমারোহে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধন-ক্ষেত্র শিলাইদহ পল্লীতে নিখিল বঙ্গ পল্লীসাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নির্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় সম্মেলনের পৌরোহিত্য করেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিমন্ত্রণ পত্রের উত্তরে নিম্নলিখিত আশীর্বাণী প্রেরণ করেন—

'আমার যৌবনের ও প্রৌঢ় বয়সের সাহিত্যরসসাধনার তীর্থস্থান ছিল পদ্মাপ্রবাহ-চুম্বিত শিলাইদহ পল্লীতে। সেখানে আমার যাত্রাপথ আজ আর সহজগম্য নয়। কিন্তু সেই পল্লীর স্নিগ্ধ আমন্ত্রণ সরস হয়ে আছে আজও আমার নিভৃত স্মৃতিলোকে, সেই আমন্ত্রণের প্রত্যুত্তর অশ্রুতিগম্য করুণ-ধ্বনিতে আজও আমার মনে গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে; সে কথা এই উপলক্ষে পল্লীবাসীদের আজ জানিয়ে রাখলাম।'

১০ই চৈত্র প্রাতে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে রচিত একটি সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে সভামণ্ডপ হইতে একটি শোভাযাত্রা কবিতীর্থ পরিক্রমায় বাহির হয় এবং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার পীঠস্থান কুঠিবাড়ীতে উপস্থিত হয়। তারপর শোভাযাত্রিগণ রবীন্দ্র-গৃহের সম্মুখে সবুজ ঘাসের উপর উপবেশন করিলে সুগায়ক শ্রীযুক্ত বামাচরণ কর্মকার কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা' গানটি গীত হয়। তারপর ত্রিতলের যে কক্ষে বসিয়া কবি তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থগুলি লিখিয়াছিলেন সেই স্থানে তাঁহার প্রতিকৃতি রক্ষিত হয় ও সমবেত সাহিত্যিক ও জনমণ্ডলী উহার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। তৎপর বেলা দুইটায় মূল সভার অধিবেশন হয়। বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় তাঁহার আসন গ্রহণ করেন। পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র চৌধুরী স্বরচিত একটি সুললিত কবিতায় সভাপতিকে অভিনন্দন ও আশীর্বাদ করেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁহার অভিভাষণে পল্লীসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এবং বাউল ও মুর্শিদ্যা গানের রূপ ও তত্ত্ব ও রসের হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন, সভায় অনেক প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ হয়। তন্মধ্যে কবি শচীন্দ্রমোহন সরকারের কবিতা 'বিশ্বতীর্থ' ও কবি সরোজরঞ্জন চৌধুরীর প্রবন্ধ 'রবীন্দ্র-কাব্যে শিলাইদহ', সুসাহিত্যিক পূর্ণচন্দ্র রায়ের বৈষ্ণব পদাবলী, পণ্ডিত অভিলাষচন্দ্র কাব্যতীর্থের বৈষ্ণব সাহিত্যে মধুর রস ও কথা-সাহিত্যিক যষ্ঠীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপ্রাসঙ্গিক' (?) প্রবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অর্ধঘণ্টাব্যাপী অভিভাষণে তাঁহার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করেন। তন্মধ্যে তিনি শিলাইদহকে পৃথিবীর কবি ও সাহিত্যিকের তীর্থস্থান বলিয়া বর্ণনা করেন এবং প্রতি বর্ষে যাহাতে এখানে এইরূপ অনুষ্ঠান হয় সেজন্য বাঙ্গলার প্রত্যেক লোককে সচেষ্ট হইতে বলেন। সভাপতি মহাশয় সভায় পঠিত কবিতা এবং প্রবন্ধসমূহের একটি মনোজ্ঞ সমালোচনা করেন।

সভাপতি মহাশয় অনিবার্য কারণে রাত্রেই চলিয়া যাওয়ায় প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় পরদিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ঐদিনের সভাতেও অনেক প্রবন্ধ ও কবিতা পঠিত হয়। সর্বশেষে সভাপতি মহাশয় বাংলার বাউল ও মুর্শিদ্যা গানের মরমী অংশের কথা উল্লেখ করেন ও উহার ভাবসম্পদের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অভ্যর্থনা-সমিতির

সহকারী সভাপতি মুন্‌সী নুরুদ্দিন আহমদ অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে সকলকে বিশেষ করিয়া স্বেচ্ছাসেবকগণকে ধন্যবাদ দান করার পর সভা ভঙ্গ হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সহকারী সভাপতি মহাশয়, সম্পাদক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ অধিকারী ও সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎ চৌধুরী মহাশয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে সুদূর পল্লীতে এইরূপ একটি সম্মেলন সম্ভব হইয়াছে। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়: (১) এই নিখিল বঙ্গ পল্লীসাহিত্য সম্মেলন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিকুঞ্জ 'শিলাইদহ কুঠিবাড়ী' যাহাতে জাতীয় সম্পদরূপে সংরক্ষিত হয় তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবার জন্য বঙ্গের সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানসমূহকে ও শিলাইদহ কুঠিবাড়ীর বর্তমান স্বত্বাধিকারী মহোদয়গণকে অনুরোধ করিতেছেন। (২) বঙ্গের স্বভাবকবি মরমী ভাবুক লালন ফকিরের কুষ্টিয়ার নিকটবর্তী ছেঁউড়িয়া গ্রামে যে সমাধিমন্দির আছে তাহা পুনর্নির্মাণ করিয়া তাহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার জন্য বাঙ্গলার জনসাধারণ ও সমস্ত সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানকে এই নিখিল বঙ্গ পল্লী-সাহিত্য সম্মেলন অনুরোধ করিতেছেন। (৩) বাঙ্গলাদেশের সাহিত্যিক-গণের আর্থিক দুরবস্থা নিখিল বঙ্গ পল্লীসাহিত্য সম্মেলনে দূরীকরণ-মানসে বাঙ্গালার সমস্ত সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন এবং এ বিষয়ে সত্বর যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদকে অনুরোধ করিতেছেন।

শিলাইদহের সামাজিক জীবন

রবীন্দ্রনাথ তাঁর যৌবনে যে সময়ে শিলাইদহে জমিদারি পরিচালনার পরিপূরক হিসাবে পল্লীসংগঠনের প্রাথমিক উদ্যোগ করেছিলেন (অর্থাৎ ইংরেজি ১৯০৭ থেকে ১৯১৭-১৮ সাল পর্যন্ত), শিলাইদহের সেই প্রাচীন সমাজ-জীবনের প্রামাণ্য বা অপ্রামাণ্য কোনও লিখিত বিবরণ নেই। প্রাচীন গ্রামবৃদ্ধদের অতীতের স্মৃতি, শ্রুতি ও কিংবদন্তীই তার একমাত্র প্রমাণযোগ্য ইতিহাস। আমার বিশেষ অনুসন্ধানে যতদূর জেনেছি, সেই বিবরণটাই এই অধ্যায়ে প্রকাশ করছি, ভবিষ্যতে কোন জিজ্ঞাসু আগ্রহী গবেষকের কিঞ্চিৎ সাহায্যের প্রত্যাশায়।

প্রাচীন খাজাঞ্চি হরমোহন নন্দী, আমার মা শরৎনলিনী দেবী আমার

জ্যেষ্ঠাগ্রজ স্থানীয় মধ্য ইংরাজি স্কুলের হেডমাস্টার সতীশচন্দ্র অধিকারী ও ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, আমার পিতার ছাত্র, মুন্সি নুরুউদ্দিন সাহেবের নিকট প্রাপ্ত উপকরণ-নির্ভর আমার এই তথ্য।

সে সময়ে শিলাইদহ অঞ্চলে (শিলাইদহ, খোরশেদপুর, কশবা, মাজগ্রাম হামির হাট, অঞ্চল) লোকবসতিপূর্ণ বহু সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। এর প্রায় ৪০।৫০ বছর পূর্বে ঐ অঞ্চলের অর্ধেকটা বিশাল কীর্তিনাশা পদ্মার গর্ভে বিলীন হয়ে যায়; স্থানটির নাম ছিল 'কোটপাড়া'। কোটপাড়া থেকেই বর্তমান সদিরাজপুর ও রাধাকান্তপুর দুটি বিশাল চরের উদ্ভব। কোটপাড়ার ভাঙ্গুনীয়া অধিবাসীরা সকলেই পরে শিলাইদহে বসতি স্থাপন করেন। গোপীনাথ মন্দিরকে কেন্দ্র করে, খোরসেদ ফকিরের দরগাহ ও নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ অঞ্চল নিয়ে শিলাইদহ গ্রামের উৎপত্তি, এর বিবরণ 'কিংবদন্তী' অধ্যায়ে দিয়েছি।

রবীন্দ্র-জীবনের শিলাইদহ পর্বে আমার পিতা সুরেন্দ্রনাথ অধিকারীর নামটি বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের সপরিবারে শিলাইদহ-বাসও তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। সে সময়ে আমার জ্যেঠামশাই তারকনাথ ও কেদারনাথ ওকালতি ব্যবসায়ে পাবনা ও রাজসাহীবাসী ছিলেন, নগেন্দ্রনাথও ঐ দুই সহরে মোক্তারি করতেন। এই অবস্থায় গ্রামের সুশিক্ষিত ভদ্রযুবক হিসাবে সমৃদ্ধ অধিকারী বংশের সন্তান আমার পিতৃদেবই প্রকৃতপক্ষে স্থায়িভাবে খাঁটি পল্লীবাসী সমাজপতি হিসাবে গ্রামে বাস করতেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন ইংরেজ গভর্ণমেন্টের পঞ্চায়েৎপ্রথায় গঠিত গ্রামীণ প্রেসিডেন্ট-পঞ্চায়েৎ, স্থানীয় মধ্য ইংরাজি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও হেডমাস্টার, অবিভক্ত অধিকারী পরিবারের সর্বময় কর্তা, নদীয়াজেলা কোর্টের জুরি ও জেলা-বোর্ডের অন্যতম সদস্য (তৎকালীন চেয়ারম্যান ছিলেন রায়বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায়—গ্রন্থকারের পিতার বিশিষ্ট বন্ধু।)

জমিদার রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংগঠন-পর্বের সূচনাতে সুরেন্দ্রনাথ অধিকারীর মত একজন গ্রামীণ প্রতিপত্তিশালী জনসেবক সমাজপতির নিবিড় সাহায্য ছিল, এটা খুবই স্বাভাবিক। সে সময়ে অধিকারী পরিবার নানা ভাবে ঠাকুর জমিদারের জনহিতকর কার্যে সহযোগিতা করতেন, এ বিষয়ে অনেক কাহিনী বর্তমান গ্রন্থে আছে। যতদিন কবির কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ শিলাইদহে ছিলেন, সে সময়টা আমার পিতৃদেব কুঠিবাড়িতে গিয়ে তাঁকে

পড়াতেন। শমীন্দ্রনাথ বয়সে আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড় ছিলেন। মায়ের মুখে শুনেছি, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই আমার নামকরণ করেছিলেন।

ঐ পর্বে গ্রামের অন্যান্য বিশিষ্ট অধিবাসী ছিলেন—১। যদুনাথ মজুমদার, দারোগা ও স্কুলের প্রেসিডেন্ট ২। কৈলাশচন্দ্র মজুমদার ও তাঁর ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার; প্রতাপবাবু কলকাতাবাসী পাটের আপিসের বড়বাবু ৩। গোপালচন্দ্র অধিকারী, গুরুগিরি ও যাজক-ব্রাহ্মণ জোতদার ৪। দীনু বক্সি (দীননাথ) নাটোর রাজসরকারের শিলাইদহ কাছারির বৃদ্ধ প্রাক্তন দেওয়ান। এঁর পাড়াকে এখনও দেওয়ানপাড়া বলা হয় ৫। মুন্সি ইউসুফ্ ও আক্সার উদ্দিন; এঁদের ছিল জলপাইগুড়ি ও ডুয়ার্স অঞ্চলে চা বাগানের অংশ ৬। শিবনাথ দত্ত, জোতদার ও প্রথম খাজাঞ্চি (পোদ্দার) ৭। গোপাল মজুমদার, খাজাঞ্চি। পূর্ণ স্বাধীন সুপরিচিত সমাজপতি হিসাবে আমার পিতৃদেবই এ অঞ্চলের নেতৃত্ব করতেন। তাই তাঁর সাহায্য রবীন্দ্রনাথের অপরিহার্য হয়েছিল। এ বিষয়ে কিছু বিবরণ আমি এই গ্রন্থে দিয়েছি—(দ্রঃ—স্বদেশী মেলা—পৃঃ ৮২-৮৫, অজ্ঞাতবাসের সঙ্গী—গগনচন্দ্র দাস ও রামগতি জোয়ারদার—পৃঃ ১.৯-২৫, জলেডোবা বৌ—'গ্রামের সমাজপতি' পৃঃ ২৯০ পৃঃ। বৃদ্ধ হরমোহন নন্দী খাজাঞ্চি বাবু, বাবার সমবয়সী—(দ্রঃ অবিস্মরণীয় কাহিনী পৃঃ ৩৪৯)।

তখনকার গ্রাম্য সমাজের দুটি বিবরণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচনায় লিপিবদ্ধ করছি—তখন এত বড় একটা বর্ধিষ্ণু গ্রামে ভালো রাস্তাঘাট ছিল না; ছিল গলি-জাতীয় সংকীর্ণ পথ। আচার্য জগদীশচন্দ্র, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ ও বন্ধু লোকেন পালিত সহ রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই গ্রাম-ভ্রমণে বেরুতেন। একদিন কুঠিবাড়িতে ম্যানেজারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কথাবার্তা কইছেন, সেখানে সে সময়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র উপস্থিত। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন—'রবিবাবু আপনাদের জমিদারির এমন সুন্দর গ্রামে ভালো রাস্তা নেই, বড় দুঃখের বিষয়'। কথাটা শুনে রবীন্দ্রনাথের কর্ণমূল আরক্ত হল, ম্যানেজারের দিকে চেয়ে বললেন—'গ্রামের রাস্তার ব্যাপারটা এখনো ফেলে রেখেছ?' অথচ রাস্তার ব্যাপারে যে সমস্যা দাঁড়িয়েছে তা তিনি জানেন। তখনই বলে উঠলেন—'গোপীনাথ মন্দির থেকে রাস্তাটা এ বছরেই হওয়া চাই,—যে করেই হোক।' (দ্রঃ জমিদারি পরিচালনা—পৃঃ ৭৯)

গ্রামের ও কুষ্টিয়া-শিলাইদহ রাস্তার জন্য ভূমি-সংগ্রহে বাবার সাহায্য না

পেলে ঐ রাস্তার কাজটা অসম্ভব হত। জেলাবোর্ড থেকে চারটি ইঁদারা জাহেদপুর, কাঁদাবাড়ি, কালোয়া ও জোয়ারপুরে তৈরি হয়েছিল বাবার চেষ্টায়, জমিদার-পক্ষ ও জেলাবোর্ডের অর্থে।

ম্যানেজার বামাচরণবাবু প্রবীণ বিচক্ষণ ব্যক্তি। গ্রাম্য রাস্তা যেখান থেকে শুরু হবে তার গোড়াতেই ছিল কৈলাশ মজুমদার মশাইদের বিরাট আমবাগান, ঐ আমবাগান মজুমদার মশাইরা ছাড়তে নারাজ। বামাচরণ বাবু কয়েকদিন পরে বিখ্যাত লেঠেল হয়ধর বরকন্দাজের নেতৃত্বে দশজন বুনা পড়েং (দিনমজুর) পাঠালেন ঐ আমবাগানে রাস্তার বাধাদানকারী ছয়টি আমগাছ ভূমিসাৎ করবার জন্য। যথারীতি বুনারা ঐখানে আমগাছে কুড়োল চালাচ্ছে—খট্ খট্ শব্দে আকৃষ্ট হয়ে কৈলাশ মজুমদার দুর্বাসা ঋষির মত এসে বাধা দিলেন, হয়ধর বরকন্দাজের সঙ্গে তর্ক করলেন, কোন ফল না পেয়ে শেষে স্বয়ং সদর কাছারিতে এসে হাজির ম্যানেজারবাবুর আপিসের সামনে। তাঁর ঐ রুদ্র মূর্তি দেখে বামাচরণবাবু চেয়ার ছেড়ে সবিনয়ে এসে কৈলাশ মজুমদারকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে, হাত জোড় করে হাসতে হাসতে বললেন, 'ঐ রাস্তায় আপনার পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে পদধূলি পড়বে আমাদের এত বড় সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করবেন মজুমদার মশাই ?' দুর্বাসা ঋষি ঐ কথা শুনে হো হো করে হেসে ফেললেন এবং গাছ কাটার দুঃখ ভুলে তামাক খেয়ে হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরলেন। যাঁরা শিলাইদহ গেছেন তাঁরা ঐ রাস্তা ও গোপালদিঘীর পাশে মাঠটি দেখেছেন। ঐ স্থানেই সুন্দর পরিবেশে আমরা আমাদের আমলে বড় বড় অনুষ্ঠান করেছি।

আর একটা বিবরণ। মাজগ্রামের প্রতিপত্তিশালী জোদ্দার নীলকমল রায় (পঞ্চানন রায়ের পিতা) দুর্গাপূজা করবেন বলে দুর্গাপ্রতিমার কাঠামো তৈরি করেন, শুধু রং দেওয়া বাকি ; ইতিমধ্যে হঠাৎ কি একটা কারণে ঐ পরিবারে অশৌচ হওয়ায় দুর্গাপূজা স্থগিত রেখে ঐ প্রতিমা জলে ফেলে দেওয়া হল। ব্যাপারটা ভয়ানক অশাস্ত্রীয়। আমাদের গ্রাম্যসমাজ তখন ঐ সমস্ত সামাজিক অন্যায় অনাচারের বিচার ও দণ্ডদান করে অর্থ গ্রহণ করতেন এবং ঐ অর্থ দ্বারা স্থানীয় জনহিতকর কাজ করতেন। এই ঘটনার কিছুদিন আগে আমার বাবা সন্ত পরলোকগমন করেছেন। গ্রাম্য সমাজপতি গোপালচন্দ্র অধিকারী রায় মশাইএর কাছ থেকে দুশো টাকা অর্থদণ্ড আদায় করলেন। তখনকার দিনে দুশো টাকা এখনকার দু হাজার টাকার

চেয়েও দামি। ঐ টাকা আদায় হয়েছে, এ খবর ম্যানেজার বামাচরণবাবু জানেন। গোপীনাথদেবের দোলমঞ্চের সম্মুখস্থ ডোবা ভরাট না হলে একটি রাস্তার কাজ ঠেকে আছে। টাকা চাই। জমিদারপক্ষ আর কত দেবেন? ম্যানেজারবাবু গোপাল অধিকারীকে ঐ টাকা দিতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু সে অনুরোধ রক্ষিত না হওয়ায় বরকন্দাজ পাঠিয়ে গোপাল অধিকারীকে সদর কাছারিতে ধরে আনলেন। ব্রাহ্মণসমাজের এই অপমানে সারা গ্রামে হৈ চৈ পড়ে গেল। আমার কাকা বিহারীলাল অধিকারী তখন গ্রাম্য সমাজপতি। তিনি কাছারিতে গিয়ে ম্যানেজারের কাছে এই অন্যায়ের প্রতিবিধানের দাবি করলেন। ম্যানেজার টাকার বিনিময়ে প্রতিবিধানের দাবি তুললেন। অগত্যা গোপাল অধিকারী ঐ টাকা ম্যানেজারবাবুকে দিতে বাধ্য হলেন। তখন ঐ রাস্তা প্রায় শেষ হয়ে গেছে তাই টাকাটা খরচ হল না দেখে, আমাদের থিয়েটারের সিনিয়ার দলপতি কালাব্রহ্ম সান্যাল ম্যানেজারবাবুকে অনুরোধ করে ঐ টাকায় থিয়েটারের স্টেজ মেরামত করলেন। সেই সেকেলে যুগ এখন বিস্মৃতির তলায় বিলীন।

আমার পিতা হুগলি কলেজ থেকে F. A. (First Arts) পাশ করে বি এ, পড়বার সময় নিমুনিয়ায় আক্রান্ত হন। তাই জ্যেঠামশাই তারকনাথ তাঁকে বাড়িতে এনে চিকিৎসায় সুস্থ করে পাবনা কোর্টে তাঁর চাকরির ব্যবস্থা করেন। সেই সময় গ্রামের ইস্কুল ছিল 'মডেল স্কুল'—অন্ত অঞ্চলের বৃদ্ধ হেডমাস্টার চন্দ্রকান্তবাবুর মৃত্যুর পরই বাবা স্বেচ্ছায় ঐ পদে যোগদান করেন। তখন কশবা বাজারে রমানাথ পোদ্দারের দোকানের সামনে বটগাছতলায় ইস্কুল বসত। বাবা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়কেই স্থায়ী ইস্কুল ঘরের জন্য অনুরোধ করায় ঠাকুর জমিদারের অর্থে গ্রামের কেন্দ্রে বিন্দা ধোপানির বাড়ির দক্ষিণে প্রকাণ্ড আটখানা খড়ের ঘর ইস্কুলের জন্য নির্মিত হল। গ্রামের কয়েকজন ছাত্র (আশুতোষ মজুমদার, নুরুউদ্দিন আহমদ) ঐ সময়ে ছাত্রবৃত্তি পেয়ে পাশ করেন।

গ্রামের প্রায় সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিই বাবার ছাত্র ছিলেন—তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১। মুন্সি নুরুউদ্দীন আহমদ ২। মৌলবি খোরসেদ আলি মণ্ডল (স্কুল ইন্সপেক্টর) ৩। বসন্তকুমার ভৌমিক, কলকাতা মার্টিন ইনস্টিটিউসনের শিক্ষক (দ্রঃ মুনশিবাবু, ছড়া, ৪৪ পৃঃ) ৪। পূর্ণচন্দ্র দত্ত (খাজাঞ্চি শিবনাথ দত্তের প্রথম পুত্র) ৫। বসন্তকুমার রায় (কাজিন বসন্ত),

পরে প্রতিমা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। এঁরা সকলেই আমাকে গুরুপুত্র বলে ডাকতেন। সে সময়ে আমাদের গ্রামে পাঁচালি, কবির গান, বাউল গানের ও যাত্রাগানের বেশ উপযুক্ত পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। বাবা পুরাতন যাত্রাদল ভেঙে সিন স্টেজ তৈরি করে যে থিয়েটারের দল গঠন করেন, সেকেলে ইংরাজি কায়দায় তার নাম ছিল খোকশাপুর জুভেনাইল অ্যামেচার পার্টি। সময়টা বঙ্গীয় নাট্যশালার আদিপর্ব। কলকাতায় স্বনামধন্য নট অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি বাবার বন্ধু ছিলেন। বাবা যখন অসুস্থ হয়ে কলকাতা শোভাবাজার অঞ্চলে কিছুকাল ছিলেন, তখন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি মহাশয় এসে তাঁকে দেখে যেতেন। আমি ছাত্রবয়সে মায়ের বাক্সে অর্ধেন্দুশেখরের লিখিত চিঠি দেখেছি। সে সব চিঠি নষ্ট হয়ে গেছে।

গ্রন্থের সূচনাতে গ্রামের সামাজিক জীবনের একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছি। রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই পর্বে গ্রামে ব্রাহ্মণ-বসতির সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, কোনও সামাজিক ভোজে 'ভরগাঁও নিমন্ত্রণ' করতে হলে বিরাট আয়োজন করতে হত। শিলাইদহ অঞ্চলে একমাত্র অধিকারী বাড়িতেই দুর্গাপূজা হত, তাই এই পূজার সমারোহ ও আকর্ষণ ছিল বিপুল। কড়িনাথ বসাকের (ভাণ্ডু রায়) বাড়ির এক বিধবা ঠাকরুণ কয়েক বছর দুর্গাপূজা করেছিলেন। সামাজিক দলাদলি ছিল পুরোমাত্রায়। বাবার মৃত্যুর পর আমার কাকা বিহারীলাল অধিকারী গ্রাম্য সমাজনেতা ছিলেন।

গোপীনাথদেবের দোলযাত্রার কালে একবার প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী দোলমঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে কীর্তন শুনছিলেন, এমন সময় হঠাৎ অধিকারী বাড়ির কোন বেপরোয়া যুবক তাঁদের গায়ে পিচকারিতে রং দেওয়ায় খুব হৈ চৈ হয়েছিল। সেই থেকে স্নান, দোল ও রাসের মেলায় রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর আত্মীয়গণ পাল্কি চেপে মেলা দেখতে আসতেন।

গ্রামে এ সময়ে হিন্দু-মুসলমানে কোন বিবাদ ছিল না। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ এই দুই সম্প্রদায়কে ভ্রাতৃভাবে বন্ধন করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন।

গ্রন্থ পরিচিতি ও অভিমত •

প্রস্তুনা : অরবিন্দ ভট্টাচার্য

....

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ অধিকারী রবীন্দ্র-পরিবেশে মানুষ হয়েছেন, কর্মসূত্রে প্রথম যৌবনে কবি-জমিদার রবীন্দ্রনাথের নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করেছেন। তাঁর বিশেষ পরিবেশগত অভিজ্ঞতায় তিনি রবীন্দ্রনাথকে যেমন ভাবে দেখেছেন ও পেয়েছেন তারই সুপরিণত ফল 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থখানি। এই গ্রন্থের প্রাক্‌রূপ লেখক-কৃত তিনখানি গ্রন্থে বিধৃত ছিল—সেই গ্রন্থত্রয় যথাক্রমে ১. সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ [প্রথম প্রকাশ ১৩৪৯ সাল]; ২. পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ [প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৫২]; এবং ৩. রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধানে [প্রথম প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৬]। এই গ্রন্থত্রয়ের উপকরণ বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে; বলা বাহুল্য সে সকল ছাড়াও এখানে কবি-জমিদার ও তাঁর জমিদারি-সংক্রান্ত বিচিত্র বিষয় স্থান লাভ করেছে।

১. সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ

'সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪৯ সালে (১৯৪৩ খ্রী), প্রথম থেকে পঞ্চম মুদ্রণ পর্যন্ত এ গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স লিমিটেড, স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা; ৩৮ নং জনসন রোড, ঢাকা। গ্রন্থখানির উৎসর্গ-পত্র নিম্নরূপ ছিল :

উৎসর্গ

পূজনীয় শিল্পাচার্য্য

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি. আই. ই. মহাশয়েষু

অলোকসামান্য লোকোত্তর পুরুষ রবীন্দ্রনাথকে আপনি যেমন জেনেছেন, তেমনটি বোধহয় আজ আর কেউ জানেন না। আপনি সে মহাপুরুষের আসল রূপটি অসামান্য শিল্পীর তুলিতে যেমনটি এঁকেছেন তারও তুলনা নেই। আমি একজন নগণ্য গ্রাম্য শিলাইদহবাসী। আমাদের দরিদ্র গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে 'বড়লোক' রবীন্দ্রনাথের যে আসল

রূপটি দেখেছি, তারই অপটু ছবি "সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ" পরম শ্রদ্ধা সহকারে আপনার করকমলে তুলে দিলুম।

শিলাইদহ (নদীয়া) বিনীত

২৫শে বৈশাখ ১৩৪৯ শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী

উৎসর্গ-পত্রের পরে প্রমথ চৌধুরী -লিখিত নিম্নলিখিত 'পরিচিতি' ছিল :

পরিচিতি

'সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথে'র লেখক শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী সাহিত্য-সমাজে সম্পূর্ণ অপরিচিত। তিনি ইতিপূর্বে কখনো কিছু লিখেছেন ব'লে আমি'ত জানিনে। আমি তাঁকে পাঠক-সমাজে পরিচিত করবার উদ্দেশ্যে এই ভূমিকা লিখছি।

শিলাইদহে ঠাকুরবাবুদের কুঠী-বাড়ী, কাছারি বাড়ী, ও ঠাকুর-বাড়ী ব্যতীত একটি ছোট ভদ্রপল্লী আছে। শচীন্দ্র অধিকারী এই শিলাইদহ গ্রামের অধিবাসী এবং অধিকারী-পরিবার ঠাকুর জমিদারদের সঙ্গে নানা রকমে সংশ্লিষ্ট। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা লিখেছেন, কিন্তু এ পুস্তিকায় জমিদার হিসেবে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কতকগুলি ছোট ছোট গল্প সন্নিবিষ্ট হয়েছে,—যা জানবার সুযোগ একমাত্র স্থানীয় লোকেরই হ'তে পারে। কবি রবীন্দ্রনাথ, দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষাচার্য্য রবীন্দ্রনাথ,—লেখক এ সব বিষয়ে একটি কথাও বলেন নি।— বলেছেন শুধু প্রজাদের সঙ্গে তাঁর সহৃদয় ব্যবহারের কতকগুলি কাহিনী, যার থেকে তাঁর প্রজা-বাৎসল্য ও কৌতুক-প্রিয়তা ফুটে উঠেছে। আবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ়তারও পরিচয় পাওয়া যায়,—পুণ্যাহ সম্বন্ধে তাঁর প্রবর্তিত নববিধানে। গল্পগুলি সবই সুলিখিত ও সুখপাঠ্য এবং এক হিসেবে বহুমূল্য, কারণ এতে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের একটি দিক লোকের সমুখে ধরা হয়েছে,—যা লেখক ভিন্ন অপর কারো পক্ষে জানবার সম্ভাবনা খুব কম।

এই বইখানি আমি সকলকে পড়তে অনুরোধ করি। কারণ ছোটখাট বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিসুলভ মহত্ত্ব ও সহজ মনুষ্যত্ব যেমন প্রকাশ পেয়েছে, অনেক বড় জীবনীতেও তা হয় না।

শান্তিনিকেতন শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

১লা জুলাই, ১৯৪২

অতঃপর লেখকের এই 'ভূমিকা' সন্নিবিষ্ট ছিল—

ভূমিকা

এই সত্য কাহিনীগুলোকে রবীন্দ্র-জীবনীর মধ্যে ঐতিহাসিক পারম্পর্য দিয়ে বিচার করলে ঠিক হবে না। একই কাহিনীর সময় বা পটভূমিকা পুরানো লোকদের কাছে কিছু কিছু বিভিন্ন রকমে শুনা যায়,—তবে আসল ঘটনাটা তাঁরা যা বলেন তা একই। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র জীবনের এই রকম আরও সরস সত্যকাহিনী নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে, সেগুলো যদি পরে সংগ্রহ করতে পারি, তবে প্রকাশ করবার ইচ্ছা রইল। এত বড় একজন মহামানবের বাস্তব জীবনের খাঁটি সত্যকার পরিচয় পাবার জন্য সকলেরই কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক, কারণ রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বিশ্বে সম্মানিত এবং অভিজাত ধনাঢ্য জমিদার ব'লেই সাধারণের কাছে পরিচিত ছিলেন। শ্রদ্ধেয় বাল্যবন্ধু রবীন্দ্র-সাহিত্যরসিক ডক্টর শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম. এ., পিএইচ. ডি. মহাশয় ছাপার অক্ষরে এই গল্প-সংগ্রহ প্রকাশ ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করেছেন। তাঁকে দুটো মৌখিক কৃতজ্ঞতা জানাবার চেষ্টা বৃথা। দারুণ অশান্তিময় পরিস্থিতির মধ্যে অনেক বাধা অতিক্রম করে প্রকাশকগণ বইখানা রসিকজনকে পরিবেশন করেছেন, সেজন্য তাঁদের আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শিলাইদহ (নদীয়া) শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী

২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৯

গ্রন্থখানির তৃতীয় মুদ্রণ আমাদের অবলম্বন, অন্য কোন মুদ্রণ আমরা পাই নি। এই মুদ্রণে দ্বিতীয় ও তৃতীয় 'সংস্করণ'-এর ভূমিকা যথাক্রমে :

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

মাত্র আট মাসের মধ্যেই এই বইএর প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হ'ল। এতে একটা কাহিনী যোগ করে দেওয়ায় বইএর আকার বেড়ে গেল, এ দুর্ম্মূল্যের দিনেও দাম যা বাড়ানো হ'ল তা অতি সামান্য।

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

মাত্র দুই বৎসরে এই বইএর দুইটি সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হ'ল। এতে আরো একটা কাহিনী প্রবন্ধাকারে

যোগ ক'রে দেওয়া গেল এবং কিছু পরিবর্ধনও করা গেল।

শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে ১৯১৬ সালে শিলাইদহে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই সময়কার আঁকা শিলাইদহের কয়েকজন অধিবাসীর ও নানা দৃশ্যের যে ছবিগুলো বিশ্বভারতী কলাভবনে সুরক্ষিত ছিল তারই পাচখানা ছবি তিনি এই বইতে ছাপতে অনুমতি দিয়েছেন। তাঁর স্নেহের ঋণ চিরস্মরণীয় হয়ে রইল।

তৃতীয় 'সংস্করণের' 'কথা-সূচী'—সূচনা, শিরোমণি মশাই, পুণ্যাহ সভা, গোলাপফুলের লোভ, লালা পাগলা, নিমাই ঠ্যাটা, ত্রিবেণী মাঝি, মৌলবী সাহেব, পলানের মা, মাধু বিশ্বাস, আনারসের মামলা, যজ্ঞেশ্বরের সিদ্ধিলাভ, পুরাতন ভৃত্য, ঝারি বিশ্বাসের ছেলে, চিতল মাছের পেটি, দুই বিঘা জমি; এবং 'চিত্র-সূচী'—কবিগুরু ও তাঁর পত্নী, শিলাইদহ কুঠী-বাড়ী, লালা পাগলা, নিমাই ঠ্যাটা, ঝড়ের পরে পদ্মা, মৌলবী সাহেব, মাধু বিশ্বাস, পদ্মার চর, কুষ্ঠে কুঠী-বাড়ী [লালা পাগলা থেকে মাধু বিশ্বাস পর্যন্ত স্কেচ ও ছবি নন্দলাল বসু-কৃত]।

গ্রন্থের পরিচায়িকা স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি একটি পৃষ্ঠায়—চিত্রসূচীর পরের পৃষ্ঠায়—ছিল; উদ্ধৃতিটি 'আমাদের এই মাটির মা,···এর সোনার শস্যক্ষেত্র, —এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখদুঃখময় ভালবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই সমস্ত দরিদ্র মর্ত্য-হৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে ক'রে এনে দিয়েছে। আমি এই পৃথিবীকে ভালবাসি,—স্বর্গের উপরে আড়ি ক'রে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর ভালবাসি।' গ্রন্থারম্ভে 'সূচনা' স্থান পেয়েছে। লেখক তাঁর অভিজ্ঞতায় রবীন্দ্রনাথকে যেমন করে বুঝেছেন 'সূচনা'য় তা ব্যক্ত করেছেন। সূচনাটি এখানে পুনর্মুদ্রিত হল—

সূচনা

রবীন্দ্রনাথ সার্থকনামা পুরুষ। সূর্যের মতই তিনি ফুলকে ফুটিয়ে, বনকে শ্যামল করে, ঊষর মাটিকে শস্যসম্ভারে সাজিয়ে, আকাশে ইন্দ্রধনু রচনা করে, নদনদীতে আকুল কলপ্রবাহ এনে, ভাববন্যায় দেশ-কাল-জাতির গণ্ডি ভাসিয়ে দিয়ে, প্রতিভার খরতাপে জড়কে জীবন্ত করে অস্তাচলে গেছেন। শতাব্দীর সূর্যাস্ত তাই এত গরিমাময়—মহিমাময়।

রবির কিরণ শুধু প্রাসাদচূড়ায়, পর্বতশৃঙ্গে, বিশাল তাল-তমালের মুকুটেই জ্যোতির্লোক সৃষ্টি করে নি, তাঁর কিরণ কৃষকের কুটীরে, পল্লীর মাঠে-ঘাটে,

ধানের ক্ষেতে, বাংলার দীঘি-সরোবরে, বটতলে, দরিদ্র গৃহস্থের আঙিনায়, তুলসীতলায়ও প্রেমের আলো জ্বেলেছিল ; সেখানেও সরল, নিরক্ষর, নির্জিত মানবাত্মার প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করেছিল অতি গভীরভাবে। তাইতেই এত বড় বিশাল বৈচিত্র্যময় রসঘন সাহিত্য সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল।

বংশগরিমায়, পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক আভিজাত্যে, উচ্চ সভ্যতার আবেষ্টনে এবং রাজরাজেশ্বরের মত মহাসম্মানের উচ্চশিখরে বসে রবীন্দ্রনাথ সাধারণের নাগালের বহু উর্ধ্বে ছিলেন—এ ধারণা অতি স্বাভাবিক ; কিন্তু এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটির সহজ সরল অতি সাধারণ আটপৌরে আসল রূপটি যাঁরা দেখবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা মুগ্ধ হয়েছেন, ধন্য হয়েছেন। তিনি খাঁটি বাঙ্গালীর মত পল্লীসুলভ সেকেলে দরদ নিয়ে আমাদের মধ্যে গ্রামে গ্রামে তাঁর অনন্ত রহস্যময় চিরসুন্দরকে পাবার আশায় ঘুরেছেন,—আমাদের সঙ্গে হাসিখুশি গল্পগুজব রংতামাসা করেছেন ; কেউ তাঁকে ভয় করে নি, সঙ্কোচ করে নি,—মনেও ভাবে নি যে তিনি ধনী, সম্ভ্রান্ত, মহাসম্মানী জমিদার। এমন কি, তিনি যে সহরবাসী সভ্যতাভিমানী বড়লোক,—একথাও কোন গ্রাম্যলোক কখনো চিন্তা করবার অবকাশ পায় নি।

গ্রামের রাস্তায় তিনি এত দ্রুত হাঁটতেন যে, অনেক সাধারণ বলিষ্ঠ পল্লীবাসী তাঁর সঙ্গে হেঁটে উঠতে পারত না। প্রজারা জমিদারির কাজের অবসরে নির্ভয়ে তাঁর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিত। বুড়োরা তাঁকে প্রায়ই 'তুমি' 'তুই' বলত। তাদের সঙ্গে যখন তাঁর গল্প ও উচ্চহাস্যের মধুচক্র জমে উঠত, তখন বাইরের কেউ দেখলে নিশ্চয়ই অবাক হত যে ইনিই কি ঠাকুর-বংশের সূর্য সেই রবিবাবু!

তিনি ছিলেন মস্ত বড়লোক, জমিদার। সংসারে অসাধারণ বড়লোক যাকে বলে তিনি তাই ছিলেন। কিন্তু আমরা আমাদের পল্লীর মধ্যে যখন দল বেঁধে তাঁকে নিয়ে 'রাখীবন্ধন' উৎসব করেছি, বালক সৈন্যদল নিয়ে যখন তাঁর দুইহাতে কব্জী থেকে কনুই অবধি অসংখ্য লালসুতো বেঁধে নেচে-কুঁদে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করেছি, তখন তিনি মস্ত বড়লোক একথা মনেও করি নি! যখন তিনি গ্রামের ছেলেদের দৌড়, লাফ, কুস্তির প্রতিযোগিতা দেখে হেসে হাততালি দিতেন, কাউকে ঠাট্টা ক'রে হো-হো করে হেসে সবাইকে

হাসাতেন, তখন শিশুপ্রিয় রবীন্দ্রনাথকে কেউ মহামানী মহাধনী বলে মনেও করতে পারে নি। তিনি সাধারণের নিকট দুষ্প্রাপ্য ছিলেন না। পল্লীর সেকেলে সুমধুর সামাজিকতা, শিষ্টাচার, রঙ্গপ্রিয়তা এযুগেও তাঁর বাস্তবজীবনে আনন্দলোকের কি অপূর্ব সমারোহের সৃষ্টি করেছিল, তা আমার এই গল্পগুলোতে বলতে চেষ্টা করেছি। তাঁর সহজ গ্রাম্য আটপৌরে রূপটি আমার প্রাণের নিভৃমহলে এখনো আরতির ঘৃতদীপটির মতই জ্বলছে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 'খাঁটি বাঙ্গালী' পল্লীমায়ের আদুরে দুলাল। তিনি তাঁর সোনার বাংলা মায়ের কোলে বসে কি আবেগ নিয়ে বাউলের সুরে গেয়েছেন, "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি"। সেই দরিদ্রা মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বিভোর হয়ে গেয়েছেন, "ওমা, তোমার হাসি আমার প্রাণে লাগে সুধার মত,—মরি হায় হায় রে!" খাঁটি বাঙ্গালী রবীন্দ্রনাথ দেশ-মাতার জন্য "বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, পুণ্য হউক,—সত্য হউক" বলে ভগবানের কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছেন; "ফিরে চল্ মাটির টানে" বলে বাংলার ছেলেদের ঘরমুখী হতে আহ্বান করেছেন। দেশ-বিদেশের বড়লোকদের অজস্র সম্মানের বোঝা বয়ে, অবসন্ন বিরক্ত হয়ে, অসুস্থ মনকে তাজা করবার জন্য কতবার তিনি পল্লীমায়ের বুকে ছুটে এসেছেন! শুধু তাই নয়, তিনি পরজন্মে পল্লীর মধুবৃন্দাবনে গোপ-বালক হয়ে জন্মাবার সাধ করেছেন।

তাঁর "জন্মান্তরের" কামনা—

"আমি ছেড়েই দিতে রাজী আছি সুসভ্যতার আলোক,
আমি চাই না হ'তে নববঙ্গে নবযুগের চালক,
আমি নাই বা গেলাম বিলাত্,
নাই বা পেলাম রাজার খিলাত্,
যদি পরজন্মে পাই রে হ'তে ব্রজের রাখাল বালক,
তবে নিবিয়ে দেবো নিজের ঘরে সুসভ্যতার আলোক।"

প্রাচীন বাংলার যা মর্মবাণী, খাঁটি নিজস্ব সম্পদ, যা শাশ্বত, সত্যিকার অন্তরের ধন, তাকে তিনি আজীবন সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছেন—পূজো করেছেন। তাঁর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মেটাবার জন্য পরজন্মে বাংলার বৃন্দাবনে বাঁশী আর পাঁচন নিয়ে কোন্ ভাগ্যবান নন্দের আলয়ে এসে তিনি অবতীর্ণ হবেন, সেদিনের জন্য আমরা প্রতীক্ষা করছি।

পল্লীর কোন্ নিভৃত পাড়ায়, কোন্ নদীর ঘাটে, কোথায় কোন্ বটতলে, কোন্ গৃহকোণে দুই বিঘা জমির মালিক উপেন, পুরাতন ভৃত্য কেষ্টা, মাসীর বুকের ধন রাখাল, স্বামিহারা মল্লিকা, শ্যামল মেয়ে গিরিবালা, খঞ্জনী-হাতে ঝুঁটিবাঁধা বোষ্টমী, কুড়ি টাকা মাইনের পোস্টমাস্টার, উদ্ধত প্রজা ধনঞ্জয় বৈরাগী, একতারা হাতে কণ্ঠি গলায় বাউল, হালদার গোষ্ঠীর ছোট-বাবু বনোয়ারী, নিঃসন্তান জয়কালী ঠাকরুণ, চিরদুঃখিনী বিন্দুবাসিনী, স্নেহ-কাঙালিনী কাকিমা, গোবেচারী রামকানাই,—এই রকমের কতশত বিচিত্র সাধারণ গ্রাম্য নরনারী যে তাঁর দরদী প্রাণের অন্তরালে নিরন্তর ভিড় করে দাঁড়াত তার অন্ত নেই। তাঁর পূর্বে এদের সুখ-দুঃখের ঘরোয়া কাহিনী এমন করে আর কেউ চিত্রিত করেন নি, এতখানি প্রাণের দরদ ঢেলে দেন নি। সাহিত্যে এরা সবাই একরকম অপাংক্তেয় ছিল, রবীন্দ্রনাথ এদেরই নিয়ে হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা মিশিয়ে একটা প্রাণবান্ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। এরা ড্রইংরুমে বসে পিয়ানো বাজায় না, চা খায় না, টেনিস খেলতে খেলতে খিল্-খিল্ করে হাসে না, শিমলা শৈলে বিহার করতে যায় না, বেয়ারাকে হুকুম করে না, ইংরাজী বুকনী ঝাড়ে না। এরা ডাবা হুঁকায় তামাক খায়, খালি পায়ে মাঠে যায়, হরির লুটে নেচে-কুঁদে গান গায়, তিলক কাটে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না, জমিদারের কাছে হাতজোড় করে, আবার লাঠিও ধরে, মাদুরে শুয়ে জ্বরে কোঁকায়। এরা প্রকৃতিমায়ের আদুরে দুলাল, গেঁয়ো মানুষ—সহজ, সরল, সেকেলে। এরাই সাহিত্যের দরবারে সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী, এরাই তাঁর অপূর্ব সাহিত্যের মানস পুত্র-কন্যা।

দীর্ঘকাল পল্লীজীবন যাপন করে তিনি পল্লীর নিরক্ষর বাউল, ফকির, কীর্তনীয়া, কবি, তরজাওয়ালা, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের গান কী অপূর্ব রসানুভূতি নিয়ে শুনেছেন,—তাদের সঙ্গে প্রাণ খুলে আলাপ করেছেন! কোন্ পল্লীতে কোন্ মরমী, গুণী, প্রেমিক লোক আছেন,—কোন্ অশিক্ষিত গ্রাম্য কবি আপন মনে গান গেয়ে তন্ময় হয়েছেন, তাঁদের খোঁজখবর তাঁর কাছে কখনও অবিদিত থাকত না। তাঁদের তিনি চুম্বকের মত আকর্ষণ করেছেন। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মত তাঁদের খুঁটিনাটি সরল জীবনযাত্রারও যেন তিনি সঙ্গী হয়েছেন।

নৌকার মাঝি মেঠো সুরে বিরহের গান ধরেছে,—'তার প্রেমিকা যুবতী মন ভারী করেছে, তার মান ভাঙবার জন্য পাবনা থেকে দু'টাকা দামের

পাছাপেড়ে সাড়ী আনবার প্রচেষ্টা', পদ্মায় পালতোলা নৌকায় মাঝিরা সারি গান গেয়ে চলেছে, ইস্কুলের মাস্টার তাঁর কাছে এসে আবেদন করছেন, পল্লীবধূরা পদ্মার ঘাটে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাবার জন্য এসেছে, মহিষ পাঁকের মধ্যে নাক ডুবিয়ে আরাম করছে, স্নানের ঘাটে মা ছেলেকে শাসন করছে, খেয়ার মাঝি লোকজন গরু-মহিষ পারাপার করছে, গরুর রাখাল কাজ ফেলে বটের ছায়ায় বাঁশী বাজাচ্ছে,—সাহিত্যে এদের এমন মহিমাময় স্থান রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথমে দিয়েছেন এবং এমন পরিপূর্ণভাবে দিয়েছেন যে, সে সব চিত্র তাঁর মত সহজ সত্যসন্ধ মানুষের সাহিত্যে আপন আপন বৈশিষ্ট্যে ঝল্‌মল করছে। তাঁর সাহিত্যের ভাষা সহজ সরল—সাধারণের প্রাণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সরল অভিব্যক্তি। তাই সে ভাষা অননুকরণীয়,—সে ভাষা 'প্রাণের ভিতর দিয়া মরমে বিঁধিয়া' বসে।

মানুষের কবি সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ শুধু সাধারণ গ্রাম্য অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোকদের ভালবেসে, ভাববিলাসীর মত শুধু তাদের কাহিনী লিখে অমৃত পরিবেশন করেই ক্ষান্ত হন নি—তাদের দুর্দশা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা তাঁর অন্তরে নিরন্তর বেদনা দিয়েছে, এর প্রতীকারের জন্যই তাঁকে কর্মযোগী হতে হয়েছে।

জমিদার হিসাবে গরীব চাষীদের মর্মবেদনা রবীন্দ্রনাথ কী গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন, তা শুনলে তাঁকে দারুণ সাম্যবাদী বলে মনে হবে। তিনি ম্যানেজারকে বেদনাতুর কণ্ঠে অনেক সময় বলতেন—"এই গরীব চাষীরা প্রায়ই কলাইসিদ্ধ খেয়ে দিন কাটায়, একজনের ভাত তিনজনে বেঁটে খায়, শীতকালে খড়ের গাদায় রাত কাটায়, চরের শুক্‌নো ঝাউ দুই ক্রোশ দূরে বয়ে বেচে চারটিমাত্র পয়সা পায়,—আমি অনেক দেখেছি নিজের চোখে। এদের উপর যেন কোন রকমেই অত্যাচার না হয়। এদের পালন করাই তোমাদের ধর্ম। ধর্ম বলে আর কোন জিনিস নেই জেনো।"

সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ তাঁর "রাশিয়ার চিঠিতে" নরনারায়ণের বন্দনা গান গেয়ে নিজের দেশের হীনাদর্শ বেশী করে অনুভব করেছেন। বুকের মধ্যে সেই অপরিসীম দরদ ও ব্যর্থতার জ্বালা নিয়ে তিনি পরপারে চলে গেছেন, রেখে গেছেন—তাঁর বড় সাধের "স্বদেশী সমাজ" গড়বার জন্যে তাঁর দেশবাসীর নিকট সনির্বন্ধ আবেদন।

তিনি সাহিত্যে বা দেশের কাজে কোনদিনই ভাববিলাসী ছিলেন না।

সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ বহুবার স্বচক্ষে দেখেছেন, আগুনে এক গৃহস্থের বাড়ী পুড়ে যাচ্ছে, গ্রামে আগুন নেবাবার জল নেই,—পানীয় জলের অভাবে কত লোক মরতে বসেছে, কিন্তু জল পাবার জন্য চেষ্টা নেই,—চিকিৎসার অভাবে গ্রাম উজাড় হচ্ছে, তবু কোনো প্রতীকারের চিন্তা পর্যন্ত নেই। "অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই" বলে তিনি দেশের নেতাদের সচেতন করবার জন্য কথায় ও কাজে যে অসাধারণ চেষ্টা করেছেন তার তুলনা নেই। বাংলাদেশে প্রকৃত পল্লীসংস্কারের ব্রত সত্যিকার গঠনমূলকভাবে তাঁর আগে আর কেউ গ্রহণ করেন নি। তিনি নিজের শক্তির দিকে একেবারেই তাকান নি,—কারো সমালোচনায় প্রত্যুত্তর করেন নি। দেশের অবজ্ঞাত অসহায় জনসাধারণের জন্য এতবড় ব্যয় ও কষ্টসাধ্য কাজ তিনি নিজেই যথাসাধ্য করবেন বলে পণ করেছিলেন। বাংলাদেশের শতকরা নব্বুই জন নরনারী পল্লীতে "বড় দুঃখ বড় ব্যথা সম্মুখেতে কষ্টের সংসার"-এ দিনের পর দিন জীবনগুলোকে ভাগাড়ের দিকে নিয়ে চলেছে তা সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ সত্যের আলোকে প্রাণের গভীর অনুভূতি মিশিয়ে দেখে ব্যাকুল হয়েছিলেন,—তাদের জন্যে অনেক দুঃখ বরণ করেছিলেন। সে আন্তরিক প্রচেষ্টার অঙ্কুর আজ বৃক্ষে পরিণত হয়েছে।

সেই সহজ মরমী রবীন্দ্রনাথের দেখা পেয়েছিলাম নিজের সৌভাগ্যে ও সুকৃতিতে তাঁরই সাধের সাহিত্যরস-সাধনার তীর্থস্থান ও কর্মস্থান শিলাইদহের একজন সামান্য অধিবাসীরূপে। সে সব কাহিনী আমাদের অন্তরের মণিকোঠায় এখনও জেগে রয়েছে। অনেক কাহিনী গ্রামবৃদ্ধদের মৃত্যুতে আঁধারে মিশে গেছে, কোন কোন কাহিনী বিস্মৃতির তলা থেকে কুড়িয়ে উদ্ধার করা গেছে। হয়তো দু'পাচ বছর পরে সে সব প্রচ্ছন্ন, সত্য কাহিনী একেবারেই হারিয়ে যাবে বা অতি প্রাচীন কাহিনীর মত গল্পে পরিণত হবে। কয়েকটি কাহিনী আমার নিজের জানা ও গ্রামবৃদ্ধদের নিকট থেকে সংগ্রহ করা,—সন-তারিখের হিসাব হয়তো অনেক বিবরণেই সঠিক হবে না। এই রকমের নানা সত্য কাহিনী অনেক লোকের কাছে ছড়িয়ে রয়েছে যা সংগ্রহ করলে একটা মধুচক্র রচনা করা সম্ভব হতে পারে।

তবু এই কাহিনীগুলোই অলোকসামান্য মহাপুরুষ রবীন্দ্রনাথের অন্তরের সত্য পরিচয়। কোন কোন কাহিনীর নায়ক-নায়িকাকে একটু প্রচ্ছন্ন রাখবার জন্য নামধাম গোপন করা হয়েছে।

এই বাংলার মাটির মানুষ—খাঁটি মরমী রবীন্দ্রনাথের সত্য পরিচয় কিছুদিন পরে দেবার চেষ্টা হয়তো ব্যর্থ হবে; এজন্য অমৃতময় পুরুষসিংহের গোপন অন্তরলোকের খবর যতটুকু পেয়েছি, তাই আজ বাঙ্গালীর হৃদয়ের দ্বারে পরিবেশন করে কৃতার্থ হলাম।

তৃতীয় সংস্করণের গ্রন্থ ক্রাউন ১/১৬ আকৃতির, মূল্য ছিল ১টাকা ৮ আনা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮+১২। গ্রন্থখানি ২৯ এপ্রিল ১৯৪৩ কলিকাতা গেজেট-এ 'ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক বঙ্গদেশের যাবতীয় স্কুলের জন্য প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত' হয়। গ্রন্থের প্রচ্ছদপট বহু বর্ণের—সূর্যোদয়ের পটভূমিতে দ্যুলোক-ভূলোকের মধ্যে স্থাপিত রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি।

'সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ'-এর ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৬৮ সালে, 'প্রথম মিত্র-ঘোষ সংস্করণ' হিসাবে এই সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের কাহিনীভাগ তৃতীয় সংস্করণের মতই ছিল, পুস্তকের আকৃতিতে এবং 'লেখকের কথা'য় কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল মাত্র।

'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে 'সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ'-এর কাহিনী যথাযথভাবে গ্রহণ করা হয়েছে, তবে সেগুলির বিন্যাস পরিবর্তিত হয়েছে।

২. পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ

লেখকের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ' বৈশাখ, ১৩৫২-তে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন 'বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স্ লিমিটেড'। এঁরা গ্রন্থখানির ৪র্থ মুদ্রণ পর্যন্ত প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থের পঞ্চম মুদ্রণ '১ম মিত্র-ঘোষ সংস্করণ' হিসাবে বৈশাখ ১৩৬৮-তে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ২য় সংস্করণ এবং ১ম-মিত্র-ঘোষ সংস্করণ আমাদের দেখার সুযোগ হয়েছে। এ গ্রন্থ উৎসর্গ হয়েছে :

পূজনীয়া / শ্রীমতী প্রতিমা দেবী / করকমলেষু—

গ্রন্থের ২য় সংস্করণে লেখকের কথা হিসাবে আছে :

আমার 'সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ' পড়ে অনেকেই গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে অভিজাত রবীন্দ্রনাথের কাহিনী সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে অস্থির করেছেন। তাঁরা ভেবে অবাক হয়েছেন, তিনি পাড়াগাঁয়ের লোকদের এমনভাবে চিনলেন কি করে! তাঁরা হয়তো ভেবেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ সহরে দোতলায় আরাম-

কেদারায় বসে কল্পনার তুলিতে পল্লী-চিত্র এঁকেছেন তাঁর সাহিত্যে। তা কখনো সম্ভব নয় এবং সত্যও নয়। রবীন্দ্রনাথ আদর্শ জমিদার ছিলেন। তিনি জমিদারী করতে গিয়ে যৌবনে নিজে বহুদিন পল্লীতে বাস করেছেন, ঘুরেছেন ; বহু বৎসর বহু পল্লীর বহু নরনারীর চরিত্র অধ্যয়ন করেছেন তাঁর যৌবনে। সহরে বসে শুধু ম্যানেজারের রিপোর্ট পড়ে জমিদারী তদারক করেন নি। তিনি যে চোখে সত্যিকার বাংলার পল্লীকে দেখেছিলেন, সেভাবে অতি অল্প লোকই পল্লীকে চিনতে পেরেছেন। তাই "পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথের" বাস্তব চিত্র এঁকে পাঠক-পাঠিকাদের সামনে ধরতে চেষ্টা করা গেল।

এই কাহিনীগুলো সংগ্রহ করতে অনেকে আমাকে সাহায্য করেছেন। কাহিনীগুলোর সত্যতা সম্বন্ধে পূজনীয় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু আমাকে অনেক তথ্য দিয়েছেন। শিল্পাচার্য নন্দলাল নিজের চোখে দেখা কয়েকটা বাস্তব চরিত্রের ছবি দিয়েও আমাকে আশাতীত সাহায্য করেছেন। তাঁদের আছে আমি ঋণী। ইতি, নববর্ষ, ১৩৫২ সাল।

শান্তিনিকেতন বিনীত, গ্রন্থকার

২য় সংস্করণের 'বিষয়-সূচী'— লালন ফকিরের সঙ্গে মোলাকাৎ, জামাই-বাবুর সমস্যা, জলে ডোবা বৌ, পদ্মাবোটের বিপদ, প্রজার মান, চন্দ্রময়বাবুর চাকরি, গভীর রাত্রে, রসিকদাসের বাহাদুরি, কদা কাঁঠালে, চখা শিকার, ঘোড়সওয়ার, ফটিক মজুমদারের দরবার, জমিদারবাহাদুর, বাবুমশায়ের নজরানা, লালচাঁদ মিঞা, মৃত্যুঞ্জয় রবীন্দ্রনাথ।

এই সংস্করণে 'চিত্রসূচী' ছিল যথাক্রমে—জমিদার রবীন্দ্রনাথ, লালন ফকির*, রামগতি মাঝি*, শিলাইদহে পদ্মাবোট, জমিদারি কাগজে রবীন্দ্রনাথের হুকুম, চরভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ*, আহাররত রবীন্দ্রনাথ, কিসের তরে নদীর চরে চখাচখির মেলা*, তারণ সিং*, ফটিক মজুমদার*।

২য় সংস্করণের এই গ্রন্থের আকৃতি ক্রাউন ১/১৬, কভারে বহুবর্ণের পল্লীচিত্র, প্রকাশক বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স্ লিমিটেড, স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ; ৩/১নং জনসন রোড, ঢাকা। এই গ্রন্থের মুদ্রক শ্রীশশধর চক্রবর্তী, কালিকা প্রেস লিঃ ২৫নং ডি. এল্. রায় স্ট্রীট, কলিকাতা, গ্রন্থের মূল্য ১৻৹ এই গ্রন্থের প্রথম 'মিত্র ঘোষ' সংস্করণ (কার্যত পঞ্চম সংস্করণ) প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৬৮-তে। এ গ্রন্থের আকৃতি এবং

* চিহ্নিত চিত্রসমূহ নন্দলাল বসু-অঙ্কিত।

বিন্যাস সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের—ডিমাই ১/১৬, কভারের অর্ধাংশে পদ্মার একটি রেখা-চিত্র হাল্কা নীলে ছাপা, গ্রন্থের মূল্য তিন টাকা ; ছাপান হয়েছে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস থেকে।

এই সংস্করণে গ্রন্থকারের নিম্নলিখিত নিবেদনটি রয়েছে :

নিবেদন

এই কাহিনীগুলো সংগ্রহ করতে অনেকে আমাকে সাহায্য করেছেন। কাহিনীগুলোর সত্যতা সম্বন্ধে পূজনীয় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু আমাকে অনেক তথ্য দিয়েছেন। শিল্পাচার্য নন্দলাল নিজের চোখে দেখা কয়েকটা বাস্তব চিত্রের ছবি দিয়েও আমাকে আশাতীত সাহায্য করেছেন। তাঁদের কাছে আমি ঋণী। ইতি, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৮

গড়পাড়, চন্দননগর বিনীত, গ্রন্থকার

৩. রবীন্দ্রনাথের উৎস সন্ধানে

লেখকের তৃতীয় গ্রন্থ 'রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধানে'। এ গ্রন্থ লেখক নিজ উদ্যোগেই প্রকাশ করেন। এ পর্যন্ত এ গ্রন্থের একটিমাত্র সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, প্রকাশকাল, ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৬ এবং প্রকাশিকা শ্রীআশালতা অধিকারী, গড়পাড়, চন্দননগর, হুগলি। গ্রন্থের আকৃতি ডিমাই ১/১৬, প্রচ্ছদপটে আছে পদ্মাতীরে প্রজাবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করছে—এমন একটি বর্ণিত-চিত্র। প্রচ্ছদ-শিল্পী লেখকের পুত্র সৌম্যেন অধিকারী। গ্রন্থখানি লেখক 'স্বর্গগতা মাতৃদেবীকে' উৎসর্গ করেছেন। গ্রন্থের মুদ্রক শ্রীননীমোহন সাহা, রূপশ্রী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৯নং এণ্টনি বাগান লেন, কলিকাতা-৯ ; মূল্য ৩৷৷০। এই গ্রন্থের পরিবেশক আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫নং চিন্তামণি দাস লেন. কলিকাতা-৯। গ্রন্থে 'পরিবেশকের নিবেদন' হিসাবে ছিল :

পরিবেশকের নিবেদন

রবীন্দ্রমানসের উৎস তাঁর গভীর মানবতাবাদ। রবীন্দ্রকাব্য ও সাহিত্যের বিভিন্ন তত্ত্ব, দর্শন ও ব্যাখ্যা আলোচনায় শুধু বাংলাভাষায় নয় পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাতেও বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু গভীর মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত পরিচয়, অর্থাৎ তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভার মূল উৎস আজও

জনসাধারণের অজ্ঞাত। লেখক শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী তাঁর পূর্বপ্রকাশিত তিনখানা গ্রন্থে এই সম্বন্ধে নিজের দেখা ও সুদূর পল্লীঅঞ্চলে বিক্ষিপ্ত বহু অজ্ঞাত তথ্য জনসাধারণের নিকট পরিবেশন করেছেন, এবং তাঁর লিখিত সত্যকাহিনী-গুলি যে রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগী জনসাধারণের কাছে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে, তাঁর গ্রন্থ ক'খানার পরপর কয়েকটি সংস্করণেই প্রমাণিত। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সাময়িক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত লেখকের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধ ও কাহিনীগুলি সংকলনে আমাদের এই প্রচেষ্টা রবীন্দ্রচর্চায় যথেষ্ট আলোকপাত করবে, আশা করা যায়। রবীন্দ্রজীবনীর নূতন উপকরণ হিসাবেও এই সত্যকাহিনীগুলি যথেষ্ট মূল্যবান।

এই রচনাগুলি আনন্দবাজার পত্রিকা, দেশ, মাসিক ও দৈনিক বসুমতী, শিক্ষাব্রতী, শিশুসাথী, দীপিকা প্রভৃতি পত্রিকায় ও লেখকের সেকালের রবীন্দ্রতীর্থ পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশের অনুমতির জন্য উক্ত পত্রপত্রিকাদির কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

রচনাগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় লিখবার জন্য মাঝে মঝে পুনরুক্তি দোষ ঘটেছে। আশা করি সে ত্রুটি রসগ্রহণে বাধা হবে না।

এই গ্রন্থে দণ্ডায়মান ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের একখানি আলোকচিত্রের মুদ্রণ আছে।

বর্তমান গ্রন্থে (শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ) উক্ত গ্রন্থত্রয়ের কাহিনীগুলি নতুনভাবে বিন্যস্ত হয়েছে এবং ঠাকুর-জমিদারি ও জমিদার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা যথাসম্ভব তথ্যসহ উপস্থাপিত হয়েছে, বস্তুত একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে এ গ্রন্থ পূর্ব উপাদান নিয়ে নব কলেবর ধারণ করেছে।

অভিমত

রবীন্দ্র-অনুরাগীগোষ্ঠীর কাছে, বিশেষত প্রবীণদের কাছে শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী সুপরিচিত, সুখ্যাত। তাঁর 'সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ', 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সুধী পাঠকসমাজের কাছ থেকে তিনি ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছেন। তৎসমুদয় একত্র করলে একটি ছোটখাট বই হয়ে যায়। লেখকের কোন প্রকার পরিচিতির উদ্দেশ্যে নয়—বাংলাদেশের সুধীসমাজ কেমন আন্তরিকতা নিয়ে লেখকের গ্রন্থ পাঠ

করেছিলেন তার পরিচয় দেওয়ার জন্যে আমরা তার কিঞ্চিৎ আভাস এখানে দিচ্ছি :

অবনীন্দ্রনাথ— সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ বইখানি পেয়ে ধন্য হলেম আপনি সহজ দৃষ্টিতে সেই সহজ মানুষটিকে দেখেছিলেন তাই এই বই এমন সহজ সুন্দর সরল ভাষায় লিখতে পেরেছেন সবাইকে আনন্দ দেবে এই বই আমার ধ্রুব বিশ্বাস।

নন্দলাল বসু— আপনার সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ বইটি পড়ে গুরুদেবকে আবার নিকটে পেলাম। তাঁকে হারানর দুঃখ কতকটা লাঘব হল। তাঁর সহজ রূপটি এই বইটিতে বেশ ফুটেছে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—আপনার বই পড়লাম। আপনার লেখা উপন্যাসের মত ভাল লাগে।

আপনার বই পড়ে মনে হচ্ছে আপনি রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ সম্বন্ধে একখানা পুরো বই লিখতে পারেন।...আপনাকেই লিখতে হবে —কারণ আর কেউ নেই এসব কথা জানে।

প্রমথনাথ বিশী— আপনার লিখিত 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ' অত্যন্ত আনন্দের সহিত পড়িলাম। ইহা যেন 'সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথের' চেয়েও উৎকৃষ্ট হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এ দিকের কথা আর কেহ লেখে নাই। আপনি ছাড়া আর কেহ বোধ করি লিখিতেও পারিবে না।

অনিলকুমার চন্দ— [সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ] বইখানা এক নিশ্বাসে পড়েছি—অতি চমৎকার হয়েছে; আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।...অনেক তথ্য জানলাম —গুরুদেবকে বোঝার কাজে এ সব তথ্য অমূল্য মনে করি। আশা করি আপনার স্মৃতির ঝুলি ঝেড়ে আমাদের আরও অনেক দেবেন।

নির্ঘণ্ট

এই নির্ঘণ্টে রবীন্দ্রনাথ, শিলাইদহ, পদ্মা, কলিকাতা শব্দগুলি বাহুল্য বিবেচনায় নির্ঘণ্টভুক্ত হল না।

সংশোধন ও অতিরিক্ত পাঠ

সংশোধন

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১৭	সেখানের	সেখানকার
৮	২২	মালাকার	কর্মকার
১৮	২৮	ঘড়ির	ঘড়ি ও সোনার চেন
৬৫	৪	৮০। বিঘা	৬০। বিঘা
১০৭	৫	আত্মসমর্পন	সর্বস্ব সমর্পণ
১২৫	২৫	এলাকাটির	এ লোকটির
১৪৪	ফুটনোট	কবির	তাঁরই
১৯৯	শিরোনাম	চন্দ্রময়বাবুর চাকুরি	ঘোড় সওয়ার
২২৯	১২	ঘাঁটি	খাটি (মহালে চিঠি দেওয় ইত্যাদি)
৩৮৩	১০	দূর	শূর
৪৫৩	২১	পদ্মা মেঘনা	পদ্মা-মেখলা

অতিরিক্ত পাঠ

১৯২ রবীন্দ্রনাথের পত্র :

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত, 'স্মৃতি' নামক গ্রন্থে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়-কর্তৃক সংকলিত।

২৪১ জাপানি মিস্ত্রির বৌ :

১. পদ্মা বোট মহর্ষিদেবের আমলের, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এমনভাবে মেরামত করেন যেন নিজের বাড়ির মতো এটি একটি নতুন জলনিবাসে পরিণত হয় (দ্রঃ ছিন্নপত্র, পৃঃ ২০০ ; ৯৩ নং পত্র)।

২. শান্তিনিকেতনের প্রাচীন কর্মীদের কাছে জানা যায় যে এই জাপানি মিস্ত্রিই শান্তিনিকেতনের সুপরিচিত কাইসাহারা। ইনি বহুদিন সপরিবারে শান্তিনিকেতনে ছিলেন। ইনি শ্রীনিকেতনে একটি বড় গাছের ডালে রবীন্দ্রনাথের জন্য একটি কাঠের ঘর তৈরি করেছিলেন। এখন সে ঘরের চিহ্নমাত্রও নেই।

৩১৪ ২ প্যারা, খোসাল কবিরাজ :

এঁর পুরো নাম খোসালচন্দ্র মজুমদার, বাড়ি বরিশাল জেলায়। এঁর আত্মীয় কবিরাজ অবলাকান্ত মজুমদারের সঙ্গে আলাপে খোসাল কবিরাজের পরিচয় পেয়েছি। অবলাকান্তবাবু মহাত্মা গান্ধী রোডে থাকতেন।

৩২৫ লালচাঁদ মিঞা :

এর নাম রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রাবলীতে লিখেছেন 'রূপচাঁদ', (পৃঃ ২১৯, ৬ জুলাই ১৮৯৫)। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতবাবুর ১৩৪০ সালে রচিত রবীন্দ্রজীবনীতে (পৃঃ ২৫৯) এর নাম উল্লিখিত হয়েছে 'লালচাঁদ'। সাজাদপুরের প্রবীণ পেশকার হারানচন্দ্র রায় এর নাম বলেছেন 'লালচাঁদ'।

৩৯৪ "কবির শিলাইদহে অবস্থিতির সুস্পষ্ট তারিখ" :

পুস্তকাকারে আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই—শিলাইদহ থেকে লেখা এ ধরনের প্রায় ৫০'৬০ থানা কবির স্বহস্তলিখিত পত্র বা পত্রের নকল শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে দেখেছি। তার তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়। আবার পুস্তকাকারে না হলেও ছাপা হয়েছে, শিলাইদহ থেকে লিখিত এরূপ পত্র পাওয়া গেছে অনেক। দ্রঃ জীবনস্মৃতি ; রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে শিলাইদহ থেকে লিখিত ১৩১৮ সালের জ্যৈষ্ঠ থেকে ১৩১৯ সালের ৩০শে বৈশাখ পর্যন্ত নয় খানা পত্র—জীবনস্মৃতি, ১৩৫৪ সালের ছাপা, গ্রন্থ-পরিচয় দ্রষ্টব্য। এই সব পত্রের পরিচয় দেওয়া বহু সময় ও বহু পরিশ্রম সাপেক্ষ। মোটকথা, শিলাইদহ থেকে কবির লেখা পত্রের সংখ্যা নির্ণয় প্রায় অসম্ভব। এবিষয়ে দীর্ঘকালব্যাপী স্বতন্ত্র গবেষণার প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে পুরাতন 'প্রবাসী'র ফাইল খুবই মূল্যবান।

১৪৪ মুনশিবাবু :

মুনসিবাবু বৃদ্ধবয়সে অবসর গ্রহণের সময়ে তাঁর সেরেস্তার হাতবাক্স থেকে এই ছড়ার চিরকুটখানা আমাকে দিয়ে যান। এটি সম্ভবত পেশকার বাবুর কোন আত্মীয় আমলার রচিত। তাঁর নামটা মনে আসছে না।

৩০৩ কাহিনী—চখা শিকার :

অন্যতম রবীন্দ্র-পরিকর প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত তাঁর রবিচ্ছবি গ্রন্থে 'মা নিষাদ' প্রবন্ধে বালক রবীন্দ্রনাথের ঘোড়ায় চড়া ও শিলাইদহের বিশ্বনাথ শিকারির সঙ্গে শিলাইদহের জঙ্গলে বাঘ শিকারের যে কাহিনী বলেছেন, সে কাহিনীটি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখেছেন তাঁর 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে, (পৃষ্ঠা ৬৫-৬৮; ১৯৬১ সালের সংস্করণ)। প্রভাতবাবু কিশোর রবীন্দ্রনাথের চিফ্ সাহেবের কুঠিতে (শান্তি-নিকেতনের দু' মাইল দূরে) খরগোশ শিকারের কাহিনী এই প্রবন্ধে বলেছেন। শিলাইদহের চরে চখা শিকার সম্বন্ধে তিনি কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের বলা যে কাহিনীর উল্লেখ করেছেন সেটি কৌতুহলী পাঠক-পাঠিকাদের জন্য হুবহু তুলে দিলাম :

'ছেলেবেলায় রথীন্দ্রনাথ একটু ক্ষীণস্বাস্থ্য ছিলেন। এই কারণে স্নেহশীল পিতার মনে উদ্বেগ ছিল যথেষ্ট। রথীন্দ্রনাথের বয়স যখন দশ বারো বছর, তখন একবার তিনি শিলাইদহে ছিলেন কিছুকাল, রবীন্দ্রনাথও ছিলেন সেখানে। শিলাইদহে এসে রথীন্দ্রনাথ পদ্মার উন্মুক্ত চরে খুব ঘুরে বেড়াতেন। তাঁদেরই জমিদারির অন্তর্গত বিস্তীর্ণ সেই চর—তৃণশস্যহীন, নির্জন, জল বেধে আছে এখানে সেখানে। জলচর পাখীদের নির্ভয় বিচরণ সেই লোকালয়-বহির্ভূত নিভৃতে। স্বভাবতই শিকারীদের লোলুপ দৃষ্টি ছিল সেই সব জায়গায়। রথীন্দ্রনাথের অনুচরদের মধ্যেও এরূপ সন্ধানী শিকারীর অভাব ছিল না। তাদের প্ররোচনায় পদ্মাচরের বিলে পাখী শিকারের নেশা সহজেই সংক্রামিত হল রথীন্দ্রনাথের মনে। তিনি প্রায়ই বন্দুক ঘাড়ে করে বেড়িয়ে পড়তেন শিকারের অন্বেষণে। পুত্রের এই পাখী শিকার প্রবৃত্তিতে রবীন্দ্রনাথ মনে মনে খুবই ক্ষুণ্ণ হতেন, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতেন না। তাঁর এই নীরবতার কারণ আর কিছুই নয়—শিকার উপলক্ষে দৈহিক পরিশ্রম অভ্যাস, মনের ফূর্তি উপভোগ এবং পদ্মার জলসেবিত স্বাস্থ্যবহ বায়ুসেবন,

* * *

রথীন্দ্রনাথের শিকার অভিযানের প্রধান সহচর ছিল তাঁদের বোটের মাঝি একজন। সে ছিল অত্যন্ত উৎসাহী ও নিপুণ শিকারী।

কিছুদিন থেকে চরে একজোড়া চখাচখির গতিবিধি সুরু হয়েছিল আনন্দ-কলরব নিয়ে। তাদেরই একটিকে একদিন প্রাণ হারাতে হল মাঝির অব্যর্থ গুলির সন্ধানে। অন্য পাখীটি প্রাণে বাঁচল বটে, কিন্তু তারপর থেকে সেই সঙ্গীহারা বিরহী পাখীর অবিশ্রাম করুণ বিলাপ যেন নির্জন চরে গুম্‌রে গুম্‌রে অবোধ কান্নার ঢেউ জাগিয়ে তুলল।...সেই বেদনার তীব্র গভীর অনুভূতিতে উদ্বেলিত করে তুলল বহু যুগ পরে আর এক কবির অন্তরকে। রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ তাঁদের চরে পাখী শিকার নিষেধ করে দিলেন কড়া অনুশাসনের সঙ্গে।' —রবিচ্ছবি, পৃ ৬-৭

বলেন্দ্রনাথের 'পশুপ্রীতি' নামক প্রবন্ধের আলোচনাসূত্রে (দ্র. ছিন্নপত্রাবলী, পত্র নং ১১৭, পৃঃ ২৫০) রবীন্দ্রনাথ কেন মুরগী খাওয়া ছেড়ে দিলেন, তার কাহিনী নিজেই লিখেছেন।

—

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী ১৩০৪ সালে [illegible] শ্রাবণ শিলাইদহে জন্মগ্রহণ [illegible] মাত্র চার বৎসর বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। শিলাইদহ এবং কুষ্টিয়ায় তিনি [illegible] জীবন সমাপ্ত করেন [illegible] কলিকাতায় [illegible]। অতঃপর [illegible] কর্মজীবন শুরু [illegible] শিলাইদহে ও কুষ্টিয়ায় [illegible] ১৩২৪ [illegible] [illegible] পরিপূর্ণ [illegible] অতঃপর [illegible] [illegible] পদে যোগদান করেন [illegible] অবসর গ্রহণ করেন।

শ্রীঅধিকারী [illegible] উৎকর্ষ [illegible] করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি [illegible] একখানি হাতে লেখা পত্রিকা সম্পাদনা করেন। পরবর্তী কালে তাঁর বহু কবিতা প্রবন্ধ বহু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচনা মূলত রবীন্দ্রবিষয়ক। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ' [illegible] ঠাকুর [illegible] বিস্তৃত পরিচয় 'শিলাইদহের ইতিকথা' প্রভৃতি অজস্র নতুন উপকরণ এবং 'সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ', 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ' ও 'রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধানে' গ্রন্থত্রয়ের কাহিনীসমূহের সমাবেশে 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ প্রকাশিত হল।

শ্রীঅধিকারী 'অশিক্ষিতের পাঁচালি' (পল্লীচিত্রের কাব্যরূপ) এবং 'কবিতীর্থ' গ্রন্থদ্বয় রচনা করেও সুধী প্রশংসা লাভ করেছেন।

